ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

ইকবাল কাব্যে ইসলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(Islam-East and West in Iqbal's Poems)

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার

সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান

অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

গবেষক

মো. গোলাম মোস্তফা

পি এইচ-ডি. গবেষক

রেজি, নং ৪/ ২০০৭-২০০৮

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মে-২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল কাব্যে ইসলাম: প্রাচ্য ও প্রতীচ্য
পিএইচ-ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ
২০০৭- ২০০০৮
রেজি:ন;-০৪

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

মো. গোলাম মোস্তফা
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
পিএইচ-ডি রেজিস্ট্রেশন নম্বর....
যোগদান তারিখ....

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল কাব্যে ইসলাম: প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

পিএইচ-ডি. গবেষণা অভিসন্দর্ভ

২০০৭- ২০০০৮

রেজি:ন;-০৪

মো. গোলাম মোস্তফা
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

তত্ত্বাবধায়ক
ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক
ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মো. গোলাম মোস্তফা কর্তৃক পিএইচ ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ''ইকবাল কাব্যে ইসলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি আমার প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধায়নে ও নির্দেশনায় রচিত হয়েছে। আমার জানামতে ইতোপূর্বে এ শিরোনামে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভের জন্য কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি । আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত লিখিত কপি পাঠ করেছি|

গবেষককে তাঁর অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করা হলো|

তত্ত্বাবধায়ক

অধ্যাপক ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার
সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

প্রত্যয়ন পত্র

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদের অন্তর্গত ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের পিএইচ.ডি গবেষক জনাব মো. গোলাম মোস্তফা কর্তৃক পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত ‘‘ইকবাল কাব্যে ইসলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য’’ শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভটি সম্পর্কে আমি প্রত্যয়ন করছি যে, এটি রচনায় যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক হিসেবে প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছি। আমার জানামতে উল্লেখিত শিরোনামে পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য কোনো গবেষণাকর্ম সম্পাদিত হয়নি। আমি এ গবেষণা অভিসন্দর্ভটির চূড়ান্ত লিখিত কপি পাঠ করেছি।

গবেষককে তাঁর অভিসন্দর্ভটি পিএইচ.ডি ডিগ্রি লাভের জন্য উপস্থাপন করার অনুমতি প্রদান করা হলো।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান
অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

ঘোষণা পত্র

আমি এই মর্মে ঘোষণা করছি যে,''ইকবাল কাব্যে ইসলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য'' শীর্ষক অভিসন্দর্ভটি আমার মৌলিক ও একক গবেষণাকর্ম। আমার জানামতে এই শিরোনামে ইতোপূর্বে কেউ গবেষণা করেননি। আমি আমার এ গবেষণার বিষয়বস্তু পূর্ণ অথবা আংশিকভাবে কোথাও কোনো ডিগ্রি অর্জনের জন্য উপস্থাপন ও প্রকাশ করিনি।

গবেষক

মো. গোলাম মোস্তফা
পিএইচ.ডি গবেষক

রেজি নং- ৪/২০০৭-২০০৮
যোগদান তারিখ: ২১/০৫/২০০৮

তারিখ: পূন:ভর্তি- ৫০/২০১২-২০১৩

যোগদান তারিখ:২১/০৪/২০১২
ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

কলা অনুষদ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

Dhaka University Institutional Repository

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

ইকবালের কাব্য সাহিত্য ও দর্শনের ওপর ব্যাপক গবেষণার অভিপ্রায় ছিল যখন আমি বিশ্ব বিদ্যালয়ে অনার্স ১ম বর্ষের ছাত্র ছিলাম তখন থেকেই। ইকবাল উর্দু ভাষী হলেও ফারসি কাব্য তাঁর বিশাল অংশ জুড়ে রচিত। বিশ্ববিদ্যালয়ে আমার অধীত বিষয় ছিলো ফারসি ভাষা ও সাহিত্য। ৩য় বর্ষে ইকবালের কাব্য সাহিত্য আমাদের সেলাবাসভূক্ত ছিল বিধায় ইকবালের ফারসি সাহিত্যের প্রতি আমি অনুরাগী হই আরো গভীরভাবে। এছাড়াও আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে ইরানী বিজিটিং প্রফেসর ড. কাযেম কাহ্দূয়ী স্যারের ক্লাসে ইকবালের কিছু ফারসি কবিতার আলোচনা ও ব্যাখ্যা শুনে আমি ইকবালের কাব্য সাহিত্যের প্রতি গবেষণায় আগ্রহী হয়ে উঠি। এবং এম এ শেষ করার পর ইকবালের মতাদর্শ ও চিন্তাধারা শীর্ষক শিরোনামে আমার সম্মানিত তত্ত্বাবধায়ক প্রফেসর ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদারের তত্ত্বাবধানে এম. ফিল ডিগ্রি অর্জন করি।

এরই ধারাবাহিকতায় ইকবালের ওপর পিএইচ.ডি গবেষণা করার মনস্থ করি এবং এ লক্ষ্যেই গবেষণা অভিসন্দর্ভটির শিরোনামের জন্য আমার সম্মানিত শিক্ষক ও যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক প্রসেসর ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান স্যারের সাথে যোগাযোগ করি এবং স্যারের সাথে আলোচনা করি স্যারের পরামর্শানুসারে ইকবাল কাব্যে ইসলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য শীর্ষক শিরোনামটি নির্ধারিত হয়। গত ২০০৭-২০০৮ শিক্ষাবর্ষে আমি পিএইচ.ডি প্রোগ্রামে প্রথম যোগদান করি এবং অত্র বিষয়ে গবেষণা কার্যক্রম আরম্ভ করি।

আমার প্রস্তাবিত এ গবেষণাকর্মের দু'টি মৌলিক দিক রয়েছে। একটি ইকবালের কাব্যে উদার ইসলামি চিন্তাধারা মুসলিম উম্মার উপর কিভাবে প্রভাব ফেলতে পারে তার পর্যালোচনা এবং অপরটি হল তার কাব্যে প্রাচ্য ও প্রতীচ্য প্রসঙ্গে যে বক্তব্য উপস্থাপিত হয়েছে সে সম্পর্কে বিশ্লেষনাত্মক দৃষ্টিভংগী উপস্থাপন করা।

অভিসন্দর্ভটির শেষে প্রয়োজনীয় তথ্যসূত্র ও টীকাটিপ্পনি উল্লেখ করা হয়েছে। তথ্যসূত্র বর্ণনার ক্ষেত্রে গ্রন্থ পঞ্জিতে যে গ্রন্থ যে ভাষায় রচিত হয়েছে সে গ্রন্থের পরিচয় সে ভাষায় তুলে ধরা হয়েছে। একটি বা দু'টি তথ্যের পর পুনরায় সে তথ্যসূত্রটি তুলে ধরার ক্ষেত্রে পুরো তথ্যসূত্র উল্লেখ করা হয়েছে।

তথ্যসূত্রের ক্ষেত্রে আমি ইকবালের মৌলিক দু'টি ভাষার কাব্যসমগ্র কোল্লিয়্যাতে এগ্বা'ল ফারসি ও কোল্লিয়্যাতে ইকবাল উর্দুকে অধিক প্রাধান্য দিয়েছি। এ কাব্য সমগ্রদ্বয়ে ইকবালের সকল মতাদর্শ কাব্যের মোড়কে উপস্থাপিত হয়েছে। এযাবৎ বিভিন্ন পন্ডিত ও ইকবাল বিশেষজ্ঞগণ গবেষণা করেছেন সেসব সহায়ক গ্রন্থও আমি ব্যাপকভাবে অধ্যায়ন করেছি যা আমার অভিসন্দর্ভ প্রণয়নে বিশেষ সহায়ক হয়েছে।

এ গবেষণাকর্মকে সমৃদ্ধভাবে সুসম্পন্ন করার জন্য আমি প্রচলিত গবেষণা পদ্ধতি অনুসরণ করেছি। বানান রীতির ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমির প্রমিত বানান রীতি অনুসরণ করা হয়েছে। তবে ফারসি, উর্দু ও আরবি উচ্চারণ ও এসব ভাষায় যে শব্দাবলী বাংলা ভাষায় প্রচলিত রয়েছে তার খানিকটা পরিবর্তন করা হয়েছে।

এ গবেষণাকর্ম সম্পাদনের লক্ষ্যে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় লাইব্রেরী, ঢাকাস্থ ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানী সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের লাইব্রেরী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় লাইব্রেরী, উর্দু বিভাগের লাইব্রেরীতে সংরক্ষিত গ্রন্থাবলী, ফরিদপুর সরকারি গণগ্রন্থাগার, রাজবাড়ী সরকারি গণগ্রন্থাগার, ইকবাল সংসদ ঢাকা,

ইসলামিক ফাউন্ডেসন বাংলাদেশ, সরাসরি ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েব সাইড থেকে তথ্য উপাত্ত সংগ্রহ করেছি। এছাড়া ইকবাল গবেষক ও লেখকদের কাছ থেকে অনেক দুর্লভ গ্রন্থ সংগ্রহ করেছি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভাগীয় অধ্যাপক আমার শিক্ষক ও গবেষণা নির্দেশক প্রফেসর ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদারের প্রতি আমি গভীরভাবে কৃতজ্ঞ। আমি ইতিপূর্বে ইকবালের মতাদর্শ ও চিন্তাধারা শীর্ষক শিরোনামে ম্যাডামের তত্ত্বাবধানে এম ফিল ডিগ্রি অর্জন করেছি। তিনি এ গবেষণাকর্ম সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ প্রদান ছাড়াও প্রত্যক্ষভাবে তত্ত্বাবধান করেছেন।

বিভাগীয় অধ্যাপক ও আমার শিক্ষক ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খানের কাছেও আমি বিশেষভাবে কৃতজ্ঞ। তিনি আমার এ গবেষণা অভিসন্দর্ভের শিরোনাম নির্ধারণ থেকে শুরু করে এ গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করার জন্য বিভিন্ন তথ্য প্রদান ও গবেষণা পদ্ধতি সম্পর্ক জ্ঞান দানের মাধ্যমে নানাভাবে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন। গবেষণাকর্মটি সমৃদ্ধ করার জন্য বহু সময় তাঁর সান্নিধ্যে আসার চেষ্টা করেছি। স্যারের শত ব্যস্ততার মাঝেও রাত্রি জেগেও তিনি আমার এ গবেষণাকর্মে যথেষ্ট সময় দিয়েছেন ও গবেষণাকর্ম সুচারূভাবে সম্পন্ন করার জন্য তাকিদ দিয়েছেন এবং নানাভাবে উৎসাহ যুগিয়েছেন।

আধুনিক ভাষা ইনষ্টিটিউটের অধ্যাপক আমার শিক্ষক মিসেস শামিম বানু ম্যাডামের প্রতি আমি কৃতজ্ঞ। আমার এ গবেষণায় আমাকে বিভিন্ন দিকনির্দেশনা ও উৎসাহ উদ্দিপনা প্রদান করেছেন। এ গবেষণা কর্মের যে কোনো সমস্যার সমাধানের তিনি আপ্রাণ চেষ্টা ও সহযোগিতা করেছেন।

বিশেষ করে এ গবেষণাকর্মের আদ্যপান্ত যিনি নিখুঁতভাবে দেখে দিয়েছেন তিনি হলেন যিনি সাহিত্যের পরিভাষাসহ শব্দের গাঁথুনি ও বিন্যাসে দিকনির্দেশনা প্রদান করেছেন তিনি হচ্ছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ইকবাল গবেষক ও অধ্যাপক ড. তারিক জিয়াউর রহমান সিরাজী তাঁর প্রতি আমি সশ্রদ্ধ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আমার অভিসন্দর্ভের ওপর অনুষ্ঠিত দু'টি সেমিনারের মুখ্য আলোচক বৃন্দ যেসব পরামর্শ দিয়েছেন আমি আমার গবেষণা কর্মকে সমৃদ্ধ করার জন্য তাঁদের সেসব সুচিন্তিত পরামর্শকে কাজে লাগিয়েছি । যা এর সমৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হয়েছে তাদের প্রতিও রইল আমার আকুণ্ঠ কৃতজ্ঞতা।

এছাড়া প্রফেসর ড. মো. মুহসিন উদ্দীন মিয়া, অধ্যাপক ড.আব্দুস সবর খান, ড. মো. বাহাউদ্দীন, সহকারি অধ্যাপক মো.আহসানুল হাদী, ও জনাব এ বি.এম শফিকুল্লাহ, সহকারী প্রগ্রামার জনাব মো.আব্দুল হান্নান রাজবাড়ী সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়, ড. মুস্তাফিজুর রহমান, বন্ধু-বান্ধব ও সুধীজন যাঁরা এ গবেষণায় সাহায্য সহযোগিতা ও অনুপ্রেরণা দান করেছেন তাঁদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

আর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি যারা সবসময় আমার সার্বক্ষণিক পাশে থেকে এ গবেষণাকর্ম সম্পন্ন করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এবং সহযোগিতা প্রদান করেছেন। পরিশেষে আমি সকলের দোয়া প্রার্থী।

Dhaka University Institutional Repository

সূচিপত্র

পৃষ্ঠা

মুখবন্ধ:
ভূমিকা: ৩

প্রথম অধ্যায়: জীবন ও সাহিত্যকর্ম:

ইকবালের জীবন-সংক্ষেপ ১৬
বংশে তাসাউফের গতিধারা
১৮
খেলাধুলা ও কবুতর পোষা ১৮
চারিত্রিক পবিত্রতা
১৯
ইসমে আযম ১৯
ভিক্ষুকের প্রতি আচরণ ২০
শিক্ষা জীবন ২২
থমাস আরনল্ডের মৃত্যু সংস্পর্শে ইকবাল ২২
ইকবালের শিক্ষকতা জীবন
২৫
উচ্চ শিক্ষার উদ্দেশ্যে বৃটেন গমন ২৭
কাব্য চর্চায় ইকবাল ২৯
ইকবালের জীবনে রাজনীত ৩৪
ইকবালের কর্মজীবন ৪০
ইকবালের দাম্পত্য জীবন ৪২
ইকবালের কাব্য রচনাবলি ৪৮
ইকবালের পত্রাবলি ও বক্তৃতা ৫৮
ইকবালের প্রবন্ধসমূহ ৫৯
ইকবালের ইংরেজি প্রবন্ধ সংকলন ৫৯
ইকবালের রচিত পত্রাবলি ৫৯
ইকবালের ওফাত ৬০

দ্বিতীয় অধ্যায়: কালিমায়ে তায়্যিবায়ে নিহিত রয়েছে ইকবালের খুদী দর্শন ও তার ক্ষেত্র

খুদী দর্শন ও তার ক্ষেত্র ও পরিধি ৬২
খুদী দর্শন ও তার বিকাশ ৬৬
খুদী বেখুদী পরস্পর সম্পৃক্ত ৭০

Dhaka University Institutional Repository

খুদী বিকাশের মাধ্যম বা উপকরণ ৭৩
মুসলিম জাতির সার্বজনীন বিধান ৮২
মুসলিম নেতাদের প্রতি সাবধান বাণী ৮৬
বিশ্বাসীদের বৈশিষ্ট্য নয়া জাহান তৈরী ৮৭

তৃতীয় অধ্যায়: ইকবাল সাহিত্যের স্বরূপ এবং মানুষ ও মনুষ্যত্বের বিশ্লেষণ

ইকবাল সাহিত্যের বিষয়বস্তু ৯৫
আত্মসচেতনতার শিক্ষা ১০১
ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ ১০৩
খিলাফত ও সার্বভৌমত্ব ১০৬
আগেকার মুসলমান ও এখনকার মুসলমান ১১১
মুসলিম ঐতিহ্যবাহী স্থান ১১২
মুসলিম মনীষীদের উপমা হযরত আবুবকর (রা.) ১১৩
সাধক কবিদের অবদান ১১৫
ফরিদুদ্দীন আক্তার ১১৫
মাওলানা জালালুদ্দীন রুমি ১১৬

চতুর্থ অধ্যায়: কাব্যে দৈনন্দিন জীবনের ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি

যে জন সৃষ্টিকুলের উপকার করে সেই আল্লাহর নেক বান্দা ১২০
ইসলামে বংশ নয়, প্রকৃত মর্যাদা খোদাভীতিতে ১২২
কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরিক করোনা ১২৫
তক্‌দির গড়ার দায়িত্ব ব্যক্তির নিজের ১২৭
ইসলামে সমাজ ও ধর্মনীতি পরস্পর সম্পৃক্ত ১৩৫
ইকবাল দর্শনে ইসলামের ন্যায় পরায়ণতা ও অনুকম্পা ১৪২
ইসলামি ন্যায়বিচারের ভিত্তিসমূহ ও বৈশিষ্ট্য ১৪২
সামাজিক ন্যায়বিচার ১৪৩
সামাজিক ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য ১৪৭
মিতব্যয়িতা হল খাঁটি মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব ১৪৯
স্বাধীনতা মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সহায়কশক্তি ১৫১
ইকবাল আশেকে রসুল ছিলেন ১৫৪
আল্লাহ মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করবেন ১৫৬
বিশ্বাসীদের ভিত্তি দেশ নয়, ধর্মীয় আকীদা ১৫৮
ইসলামে পরামর্শ করে কাজ করার শিক্ষা দেয় ১৬২
পরামর্শের উপকারিতাও বৈশিষ্ট্য ১৬৩
বিশ্ব সদা পরিবর্তনশীল এতে নিয়ত আল্লাহর সৃষ্টির প্রকাশ ঘটছে ১৬৫
হালাল জীবিকা অর্জন করা সর্বোত্তম কাজ ১৬৭
একমাত্র চাষীই জমির ফসল ভোগ করার অধিকারী ১৬৯
সাম্রাজ্যবাদ দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে ১৭০

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টিজগতে আল্লাহর জ্ঞান থেকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে ১৭২
উচ্চাকাঙখাই উন্নতির ও সাফল্যের চাবিকাঠি ১৭৪
মুসলিম কাফেরের প্রতি কঠোর মুমিনের প্রতি দয়ালু ১৭৫
চেষ্টা ও কষ্ট সহিষ্ণুতাই হল সৌভাগ্যের প্রসূতি ১৭৭
আল্লাহকে চিনার জন্য জগতের সৃষ্টি ১৭৮
কায়িক শক্তি ও জ্ঞান শক্তি জীবনে উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে ১৮০
আল্লাহ সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব নিয়েছেন ১৮৩
যাকাত দিলে মাল পবিত্র ও বৃদ্ধি হয় অর্থ লিস্পা লোপ পায় ১৮৪
সকলের সাথে সদ্ব্যবহার বড় উপহার ১৮৫
মুমিন মুজাহিদ বিনা অস্ত্রে লড়েযায় ১৮৬
এক আদম সন্তান হিসেবে সবাই সমান ১৮৭
ঈমানদার ব্যক্তি অন্যায় অসত্যের কাছে নত করে না। ১৮৯
আল্লাহ চিরঞ্জীব ১৯০
খাঁটি মোমেনের ভয় ও দুশ্চিন্তা নেই ১৯১
আল্লাহই ফসল উৎপাদনের সকল ব্যবস্থা করেন ১৯২
মানুষই সর্বোত্তম সৃষ্টি ১৯৩
পৃথিবীতে ধন সম্পদ উপার্জন করা অবৈধ নয় ১৯৬
আধ্যাত্মিক শক্তির বলে অলৌকিক ঘটনা ১৯৭
কুরবানী ত্যাগের শিক্ষা দেয় ১৯৯
দানের উৎকৃষ্ট উপমা ২০০

পঞ্চম অধ্যায়: ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ইকবালের কবিতায় ও দর্শন ২০৪

ষষ্ঠ অধ্যায়: ইকবালের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবনা

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিষয়ক আলোচনা ২৩৭
রাজনীতি ও ধর্মনীতি পরস্পর সম্পৃক্ত ২৪৩
ইসলামি রাষ্ট্র ২৪৬
ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য ২৪৮
ইসলামি রাষ্ট্রের কতিপয় নীতিমালা ২৪৯
কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি কাম্য ছিল ২৫২
ইকবাল রাজতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন কেন? ২৫৩
ইকবাল পুঁজিবাদী সরকার পদ্ধতির বিরোধী ছিলেন কেন? ২৫৫
ইসলাম ও গণতন্ত্র ২৫৯
পাশ্চাত্য গণতন্ত্র ২৬১
ইসলামি রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মৌলিক পার্থক্য ২৬৩
সাম্যবাদ ও সাম্যনীতির ভিত্তিসমূহ ২৬৮
সাম্যের ধারণা ও উপমা ২৬৯
স্বাদেশিকতাবাদ ২৭২
ঐক্য ও সম্প্রীতি ও মুসলিম ঐক্যের সূচনা ২৭৫

Dhaka University Institutional Repository

ঐক্যে ইকবালের অবদান ২৭৫
জাতীয়তাবাদ ২৮৪
বিশ্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদ ২৯২
বিশ্ব জাতীয়তাবাদ ২৯৩
ইসলামি শিল্পকলা ও পাশ্চাত্য শিল্পকলার উপর প্রভাব ২৯৪
ইকবাল দর্শন পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর চরম আঘাত ২৯৬
ইসলামি অর্থব্যবস্থা বনাম পাশ্চাত্য অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ৩০০
ইসলামি অর্থনীতির কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে ৩০১
সাহিত্য ও সংস্কৃতি ৩০৪
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সাংস্কৃতিক মূল্যবোধ ৩০৭
উপসংহার: ৩১২
গ্রন্থপুঞ্জি: ৩১৫

Dhaka University Institutional Repository

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পিএইচ.ডি ডিগ্রির জন্য উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ

শিরোনাম

ইকবাল কাব্যে ইসলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

(Islam-East and West in Iqbal's Poems)

তত্ত্বাবধায়ক

ড. কুলসুম আবুল বাশার মজুমদার

সংখ্যাতিরিক্ত শিক্ষক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

যুগ্ম তত্ত্বাবধায়ক

ড. কে এম সাইফুল ইসলাম খান

অধ্যাপক, ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা ।

গবেষক

মো. গোলাম মোস্তফা

পি এইচ-ডি. গবেষক

রেজি, নং ৪/ ২০০৭-২০০৮

ফারসি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা।

মে-২০১৫

Dhaka University Institutional Repository

بسم الله الرحمن الرحيم

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল কাব্যে ইসলাম প্রাচ্য ও প্রতীচ্য

ভূমিকা:

বিংশ শতাব্দীর ইসলামি রেনেসাঁর দিকপাল ড.মুহাম্মদ ইকবাল। বিশ্ব-ইতিহাসের এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ, যুগস্রষ্টা কবি ও দার্শনিকের অবদান সর্বজন স্বীকৃত। মুসলিম মিল্লাতের পরাধীনতার এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে এই ব্যক্তিত্বের আবির্ভাব। ইসলামি উম্মাহর বিপর্যয় ও ঘাত প্রতিঘাতে তখন মহাসংকটকাল চলছিলো। উপমহাদেশ তথা এশিয়া ও আফ্রিকার মুসলিম রাষ্ট্রগুলোর অধিকাংশই ছিল পরাধীনতার শৃংখলে আবদ্ধ। নিজেদের মতভেদ ও অনৈক্যের ফলে আধিপত্যবাদি শক্তির ষড়যন্ত্রে স্বাধীনচেতা এই জাতির ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। ভোগ বিলাসিতা ও দায়িত্বহীনতার দরুন নেতৃত্বের আসন থেকে তারা দূরে ছিটকে পড়ে। শুরূ হয় দুর্বিসহ গ্লানিময় জীবন। হতাশাদীর্ণ মিল্লাত, অশান্ত প্রেক্ষাপটের করূন পরিস্থিতি নিরীক্ষণ করে ইকবাল অনুভূতি প্রবণ হয়ে পড়েছিলেন।

মুসলিম জাতির উত্থান পতনের যুগসন্ধিক্ষণে কুরআনের ভূমিকা অনন্য। এটাকে গ্রহণ বর্জনের ভিত্তিতে জাতীয় জীবনে উত্থান ও পতনের দুটো স্রোতধারার সৃষ্টি হয়েছে। ইকবাল খুলাফায়ে রাশেদার স্বর্ণযুগের অবসান থেকে শুরূ করে ঊনবিংশ শতকের শেষ পর্যন্ত মুসলিম মিল্লাতের চরম অধঃপতন ও গোলামির পেছনে মূল কারণ খুঁজতে গিয়ে এ সত্যকে গভীরভাবে উপলব্ধি করেন। তিনি সেকাল আর একালের মধ্যে কুরআনের ভিত্তিতেই পার্থক্য সূচীত করেন। মর্মস্পর্শী ভাষায় তিনি বলেন,

وہ زمانے معزز تھے مسلماں ہوکر　　اور تم خوار ہوئے تارک قرآں ہوکر

[মুসলমানি নিয়ে তারা মুখ্য ছিল ধরাতলে
আর তোমরা কুরআন ছেড়ে যাচ্ছ আজি রসাতলে।

ইসলামের প্রতি ইকবালের মনোযোগ ছিল অত্যন্ত গভীর এবং সত্যিকার মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে সুক্ষভাবে পর্যবেক্ষণ করতেন তাঁর সমসাময়িক ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও আন্দোলন সমূহকে। তাই তিনি বলেছেন : যেহেতু বর্তমান রাজনৈতিক আদর্শসমূহ যেভাবে ভারতে, রূপ পরিগ্রহ করছে, তাতে তাঁর (ইসলামের) মৌলিক কাঠামো ও প্রকৃতিকে প্রভাবিত করতে পারে, এ জন্যই তিনি রাজনৈতিক ব্যাপারে মনোযোগী হয়েছিলেন। পরক্ষণেই ভারতীয় উপমহাদেশে পাশ্চাত্য ধরণের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রতি ইঙ্গিত করে তিনি মুসলিম জনগণকে হুশিয়ারি জানিয়ে বলেছেন: ‘ইউরোপে জাতীয়তাবাদ বলতে যা বোঝায়, আমি তার বিরোধী । তার কারণ এই নয়, ভারতে জাতীয়তাবাদের বিকাশ সাধন করা হলে তাতে মুসলিমদের বাস্তব নাস্তিকতামূলক জড়বাদের জীবাণু, যাকে আমি আধুনিক মানবতার পক্ষে বৃহত্তর বিপদসম্ভাবনা বলে মনে করি। জাতীযতাবাদী ধারণা অনুযায়ী সংহতির একমাত্র নীতি হচ্ছে ভৌগলিক সীমারেখা ঈমানের বুনিয়াদে মানব ভ্রাতৃত্বের নীতির উপর সংহতি বিধানের ইসলামি ধারণা সেখানে উপেক্ষিত। (ইলাহাবাদের ভাষণ, ২৯, ডিসেম্বর ১৯৩০ ঈ:)

বিদায় হজ্বের ভাষণে রাসুলুল্লাহ (সা) লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের বিশাল সমাবেশের ‘বিশ্ব-ঘোষণায় বলেছিলেন:

জাহিলিয়াতের সকল বিধি বিধান আমার পায়ের তলে রাখলাম ।.........আমি তোমাদের জন্য দু’টো জিনিস রেখে যাচ্ছি যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা এ দুটোকে আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ পথভ্রষ্ট হবে না। এ দুটো জিনিস হলো আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রসুলের সুন্নাহ বা [তাঁর জীবনাচরণ]।

কুরআন মুসলমানদের জীবনী শক্তি। এর বাস্তব অনুসরণের মধ্যেই তাঁদের পার্থিব ও পরকালিন সাফল্য নির্ভরশীল। বস্তুবাদ জড়বাদ ভোগবাদের শিকার হয়ে মুসলমানরা অধ:পতিত জাতির দুর্ভাগ্য বরণ করে সমাজের

Dhaka University Institutional Repository

গলগ্রহ হয়ে পড়েছে। এ বিভীষিকাময় পরিস্থিতিতে তাঁদেরকে মুক্তির পথ দেখাতে পারে একমাত্র হেরার রৌশনূ - আল কুরআন। তাই ইকবাল জাতিকে পথ নির্দেশ করে বলেছেন:

ای مسلمان گرتو خواهی زیستن   نیست ممکن جزبه قرآن زیستن

হে মুসলমান! তোমরা যদি ভূতল মাঝে বাঁচতে সবি চাও
কুরআন ছাড়া মুক্তি বৃথা এটা মেনে নাও ।

ইকবাল কুরআনের শ্বাশত বাণীর আলোকে জীবন্মৃত জাতিতর হৃত স্বাধীনতা ফিরে পাওয়ার আশ্বাস বাণী শুনিয়েছেন।

ہم تو مائل بہ کرم ہیں کوئی سائل ہی نہیں
راہ دکھلائیں کسے؟ رہرو منزل ہی نہیں
تربیت عام تو ہے ، جوہرِ قابل ہی نہیں
جس سے تعمیر ہو آدم کی، یہ وہ گل ہی نہیں
کوئی قابل ہو توہم شان کئی دیتے ہیں
ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نئی دیتے ہیں

দান করতে প্রস্তুত আমি
কিন্তু কেহ প্রার্থী তো নেই
পথ দেখাবো বল কারে
মন্‌যিলের পথিক যে নাই।
শিক্ষা আমার সর্বজনীন
কিন্তু কেহ গ্রহীতা নাই,
আদম যাতে সৃষ্টি হলো,
সেই উপাদান এখন যে নাই,
যোগ্য পেলে রাজার মত
সন্মানিত করি তাদেরে ।

আল্লাহ তায়লা কুরআন মজীদে সত্য ন্যায়ের মানদণ্ডে উত্তীর্ণ মু'মিনদেরকে হতাশামুক্ত জীবন ও বিজয় গৌরবের সুসংবাদ দিয়েছেন। ইরশাদ হয়েছে:

ولا تهنوا و لا تحزنوا وانتم الاعلون ان كنتم مؤمنين

তোমরা হতাশাগ্রস্ত হয়ো না। যদি তোমরা মুমিন হতে পারো, তাহলে তোমরাই বিজয়ী। (০৩:১৩৯)
আরো ইরশাদ হয়েছে:

ان الارض يرثها من عبادي الصالحون

আমার সৎকর্মশীল(সালেহ) বান্দারাই পৃথিবীতে উত্তারাধিকারী হবে। (২১:১০৪)

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে হলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন জ্ঞান, যোগ্যতা, সৃজনশীল প্রতিভা ও অদম্য স্পৃহার। কুরআন মজীদে এ ব্যাপারে ইঙ্গিত দিতে গিয়ে ঘোষিত হয়েছে:

ليس للانسان الا ماسعي

মানুষের জন্য চেষ্টা ব্যতীত কিছুই নেই। (৫৩: ৩৯)

الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا

যারা আমার পথে প্রচেষ্টা চালায় আমি তাদেরকে আমার সাশ্রয়ে অনুগৃহীত করি। [২৯:৬৯]

ইকবাল আল কুরআনের উপরিউক্ত বাণীর প্রতিধ্বনি করেছেন নিম্নোক্ত কাব্য পংক্তিতে:

هر كه او را قوت تخليق نيست　　　پيش ما جز كافرو زنديق نيست

নেই সৃজনী প্রতিভা যার
মোদের কাছে সে কিছু নয়,
কাফির ও যিনদিক, তাহার
আর তো কিছু নাই পরিচয়।

পরাধীন রাষ্ট্রগুলোতে বিজাতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির আগ্রসনে ইসলামি সভ্যাতা সংস্কৃতি ক্রমান্বয়ে তলিয়ে যাচ্ছিল। পাশ্চাত্য জড়বাদী দর্শনের সয়লাবে মুসলমানদের আকীদা বিশ্বাসে ঘূণ ধরেছিল। নৈতিক অবক্ষয়ের ধস্ নেমেছিল অপ্রতিরোধ্যভাবে। চূড়ান্ত পতনের মুখোমুখি মুসলিম জাতির দুর্দশা দেখে ইকবাল মর্মবেদনায় জ্বালাময়ী ভাষায় গাইলেন:

شور ہے، ہو گئے دنیا سے مسلماں نابود
ہم یہ کہتے ہیں کہ تھے بھی کہیں مسلم موجود!
وضع میں تم ہو نصاریٰ تو تمدن میں ہنود
یہ مسلماں ہیں! جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود

উঠছে শোর আজি ধরণী বক্ষে
মুসলিম আর নাহিক হায়!
শুনে হাসি পায় নাহিক' এখন
করে মুসলিম ছিল ধরায়?
রীতি- নীতি তব খ্রিষ্টান সম,
হিন্দু তো তুমি সভ্যতায়,
এই কি হে সেই মুসলিম যারে
ইহুদী ও দেখি লজ্জা পায়?

পরাধীনতার শৃঙ্খলে আবদ্ধ থেকে তাগূতী শক্তির অনুমতি সাপেক্ষে কিছু ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান পালনের মধ্য দিয়ে খিলাফতের দায়িত্ব যথাযথ আঞ্জাম দেয়া যায় না। বরং আল্লাহর বিধি বিধান পালনের অবাধ

স্বাধীনতাই ইসলামি খিলাফতের মূল লক্ষ্য। স্বার্থান্বেষী গোষ্ঠী কিছু সুযোগ সুবিধে দিলেও তাতে আত্মপ্রসাদ লাভের কিছু নেই। উপরন্তু এতে মুসলমানদের জন্য কল্যাণের চাইতে অকল্যাণই ডেকে আনে বেশি। ইকবাল এদিকে ইঙ্গিত করে বলেছেন:

ملا کو اجازت ملی مسجد میں نماز پڑھنے کی
نا لائق سمجھتا ہے کہ یہ دین کی آزادی

ইমাম সাহেব মস্‌জিদে পান
নামাজ পড়ার অনুমতি,
মূর্খেরা ভাবে দীনের আযাদী
এতেই বাগবাগ অতি।

মুসলিম মিল্লাতের এ উদ্বেগজনক অবক্ষয়ের চিত্র ফুটিয়ে তুলছেন আরও হৃদয়গ্রাহী করে নিম্নোক্ত কবিতায়:

ہاتھ ہے زور ہیں الحاد سے دل خوگر ہیں
امتی باعث رسوائی پیغمبر ہیں

বাহু তোদের শক্তিহীন আর
নাস্তিকতার প্রাণ উতলা
নবীর ও যে লজ্জা আসে
তোদেরে উম্মতী বলা।

এভাবে আল্লামা ইকবাল ঘুমন্ত ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতির আত্মসচেতনতা সৃষ্টির প্রয়াস চালিয়েছেন। তার উদাত্ত আহবানের ধ্বনি বিশ্বের মুক্তিকামী জনতার প্রাণে সাড়া জাগিয়েছে।

ইনসানে কামিলের সুমহান আদর্শের মানদণ্ডে ইকবাল মানব চরিত্র গঠনের স্থপতি ছিলেন। জাতিসত্তার আদর্শিক দিকটি বিশেষভাবে পুণর্গঠনে ছিলেন তিনি আপোষহীন। ইকবালের দৃষ্টিতে ‘ইনসানে কামিল’ হচ্ছেন মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ (সা)। নিম্নোক্ত কবিতা পুংক্তিগুলোতে তিনি ইনসানে কামিলের চরিত্র চিত্রণ করেছেন:

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ
غالب و کارآفرین کاکشا کارساز
خاکی و ناری نہاد بندہ مولا صفات ؟
ہر دو جہان غنی اس کی دل بے نیاز
اس کی امیدیں قلیل اسکی مقاصد جلیل

মুমিনের হাত যেন আল্লাহর হাত
তিনি বিজয়ী, চারিত্রিক মাধুর্যতায় রয়েছে তাঁর সুখ্যাতি,

Dhaka University Institutional Repository

তিনি সাহসী, সুদক্ষ নির্মাতা ও সৃষ্টিধর্মী,
মানুষ হয়েও ফিরিশতা চরিত্রের অধিকারী
মহান প্রভুর গুণে গুণান্বিত।
উভয় জগতের লালসা থেকে তার হৃদয় মুক্ত
তাঁর সাধ আশা স্বল্প, কিন্তু তার লক্ষ্য উচ্চ।
(অনুবাদ: সৈয়দ আব্দুল মান্নান)

অন্যত্র তিনি লিখেছেন:

এই নায়েব-ইনসানে কামিল (পূর্ণ মানুষ) শুধু আল্লাহর প্রকৃত খলীফা নন, বরং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ অথবা শ্রেষ্ঠ খুদীর অধিকারী। তিনি মানবতার চূড়ান্ত পরিণতি, তার মধ্যে সর্বোচ্চ শক্তি ও জ্ঞানের সমন্বয় ঘটে। তিনিই এই দুনিয়ার সত্যিকার শাসক এবং তার রাজ্যই দুনিয়ায় আল্লাহর রাজ্য। বলাই বাহুল্য যে, আল্লাহর গুণে গুণান্বিত, আদর্শ চরিত্রের অধিকারী, জ্ঞান-শক্তির অধিকারী এই ইনসানে কামিল বা পূর্ণ মানুষই আল্লাহর দুনিয়ায় আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার জন্য সচেষ্ট থাকেন।

ইকবালের লেখনীতে দুর্দশা ও হতাশাগ্রস্থ জাতির প্রাণে স্পন্দন জেগেছে। গোলামির শৃংখলে আবদ্ধ জাতির ঘোর অনামিশা দূরভীত করে ঊষার আলোকোজ্জ্বল পথের দিশা দিয়েছে। পাশ্চাত্য দর্শনের অসারতা ও ইসলামি দর্শনের কার্যকারিতা প্রমাণের মত দুরুহ কাজে ইকবাল সার্থক অবদান রেখেছেন। তিনি ইসলামের স্বর্ণযুগের আলোকে একটি সমৃদ্ধশালী জাতি গঠনের চেতনায় উন্মেষ ঘটিয়েছেন।

ইসলামের যুগোপযোগী বিজ্ঞান সম্মত ভাষ্যের উপাস্থপনার প্রয়োজনে আল্লামা ইকবাল ইসলামের কালজয়ী জীবন দর্শনের রূপরেখা শিল্পিত অবয়বে বিশ্ববাসীর সামনে পেশ করেন। তার তাত্বিক বিশ্লেষণে পাশ্চাত্য দর্শনের চাকচিক্য ম্লান হয়ে পড়ে। ইসলামের বিশ্বজনীন মানবিক মূল্যবোধ নতুনভাবে তার বৈশিষ্ঠ্যের ঘোষণায় সোচ্চার হয়-ভাগ্যাহত জাতির জীবনে এক যুগান্তকারী নবজাগরণের সূচনা হয়।

বিংশ শতকের বিশ্ব ইসলামি পুনর্জাগরণ ও মুসলিম মিল্লাতের জীবন প্রবাহে যে উদ্দীপনা ও প্রাণ স্পন্দন অনুভূত হচ্ছে তার গোড়ায় রয়েছে ইকবালের কাব্য ঝংকার। মৃত্যুঞ্জয়ী গান গেয়ে তিনি সমাজের স্তরে স্তরে যৌবনের জলতরঙ্গেও সৃষ্টি করেছেন। তাঁর বাণীতে ছিল আশা উদ্দীপনার দীপ্তি, সুরে তাঁর দীপকের ঝংকার।

রাসুল (সা.) এর 'উসওয়ায়ে হাসানা' অনুপম আদর্শের অনুসরণের প্রতি তাঁর উদাত্ত আহবানে সাড়া জেগেছে মুসলিম জাহানের সর্বত্র তথা সারা বিশ্বে। মানবতার মূল্যবোধ সঞ্জীবিত হয়েছে তাঁর মননশীল সাহিত্য সাধনায়, তাঁর চিন্তাধারা মুসলিম বিশ্বে জন্ম দিয়েছে এক বিপ্লবী নবজাগরণের। দীপ্ত চেতনায় জেগে উঠেছে খায়রে উম্মত-সর্বশ্রেষ্ঠ কওমের মুক্তি পাগল সন্তানেরা।

খুদীর জাগরণের আহবান ছিল তাঁর কাব্যের অন্য বৈশিষ্ট্য। বিপর্যস্ত মানবতার সংকট মুক্তির প্রয়াসে তার কাব্য দর্শনে রয়েছে উন্নততর জীবন বোধের সন্ধান। তিনি জাতির কাছে নিবেদন করেছেন:

খুদীর জোরেই মুসলমানের
ঘটতে পারে পূর্ণ বিকাশ:
খুদীই যদি যায় হারিয়ে
তাহলে সে অন্যেরি দাস।
অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরয়শী

Dhaka University Institutional Repository

আজকের বিশ্ব ইসলামি পুনর্জাগরণের জন্য আমরা ইকবালের কাছে চিরঋণী | বিশ্ব মুসলিম সংহতি ,পুনর্জাগরণ এবং নব উদ্যম ও প্রেরণা সৃষ্টিতে তাঁর কবিতার ভূমিকা প্রশ্নাতীত। আসন্ন নব জাগরণ ও তাওহীদের উত্থান তিনি গভীর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে অবলোকন করে ঘোষণা করেছেন:

شب گزراں ہوگئی آخر جلوہ خورشید سے

یہ چمن معمور ہوگا نغمہ توحید سے

ঊষার আলোয় রাঙলো আকাশ
তিমির কুহেলী রজনী যায়,
এবার চমনে তাওহীদি গান
ঝংকৃত হবে ভোরের বায়।

যুগে যুগে অনেক প্রথিতযশা মনীষী ও বিপ্লবী সংস্কারকের আবির্ভাব হয়েছে। তারা অধ:পতিত জাতিতে সত্য ও ন্যায়ের পথে আহবান করেছেন। কিন্তু বাদ সেধেছিল কায়েমী স্বার্থবাদী গোষ্ঠী। তারা এসব মনীষীর উপর চালিয়েছিল অত্যাচারের স্ট্রীমরোলার অকথ্য নির্যাতন ও অপবাদের প্রচারণা। তবুও তাদের মিশন সফলতার দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছিল। আল্লামা ইকবাল ও তাঁর সাহিত্য সাধনার মাধ্যমে মিল্লাতের নব জাগরণের আশাবাদ ব্যক্ত করে বলেছেন:

چاک اس بلبلِ تنہا کی نوا سے دل ہوں جاگنے والے اسی بانگ درا سے دل ہوں

یعنی پھر زندہ نئے عہد، وفا سے دل ہوں پھر اسی بادہ دیرینہ کے پیاسے دل ہوں

عجمی خم ہے تو کیا، مے تو حجازی ہے مری نغمہ ہندی ہے تو کیا، لے تو حجازی ہے مری

বুলবুলির কুহতানে হয়তো
হৃদয় আবার দীর্ণ হবে,
নিদ্রাতুর অলস পথিক
জাগবে আবার ঘন্টারবে।
ওফাদারীর অনুরাগে
প্রাণটি আবার উঠবে জেগে,
পূর্ব-সুরা পান করতে
মনটি আবার ব্যস্ত হবে।
আজম দেশী পাত্র হলেও
সুরা আমার আরব দেশী,
গান যদি ও হিন্দী আমার
সুরটি সেই হেজায দেশী।

আজকের বিশ্বের প্রায় সোয়া কোটি মুসলমান তাওহীদের জীবনবাদে উদ্দীপ্ত| আল্লামা ইকবাল এই জাগরণের ধারাকে গভীর অন্তরদৃষ্টি দিয়ে উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। তাই তিনি অনাগত বনী আদমের উদ্দেশ্য আলোর পথের দিশা দিয়ে গেছেন। বস্তুতপক্ষে তার এই অবিস্মরণীয় অবদানের জন্য তিনি যুগ যুগ ধরে তাওহিদী জনতার হৃদয়ে বেঁচে থাকবেন| জাতি ও তার কাছে চিরঋণী থাকবে

Dhaka University Institutional Repository

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিষয়ে ইকবাল নিজের ও অন্য সকল মানুষের জন্য এই অলঙ্ঘনীয় বাস্তব অক্ষমতার বিষয়টি ধরতে পেরেছিলেন যে, একটি আলোকিত ইনসাফ সমৃদ্ধ পৃথিবীর জন্য তাঁর যে আকন্ঠ পিপাসা, তা মিটতে পারে কেবল আল্লাহ পাক যা- বলেছেন, সেই একমাত্র ইসলাম ও রাসূল (সা:) কে হেদায়াত হিসাবে গ্রহণ করবার মধ্যেমে। এবং এটা শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্য নয়, সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য সত্য। অতএব, ইকবালের নিজস্ব কোন স্বরচিত উদ্ভাবিত মানবতার দর্শন নেই;সর্বকল্যাণময় মানবতা প্রতিষ্ঠার যে ভূবনপ্লাবী নূর যে অব্যর্থ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন একদিন হিজাজ থেকে আবির্ভূত বিশ্বনবী, সেই নূরই ইকবালের চোখের আলো সেই শ্বাশত পথই ইকবালের যাত্রাপথ। এই অর্থে এবং বলা উচিত সকল অর্থেই মানবতার প্রশ্নে ইকবাল আল- কুরআন ও রাসূল (সা:) এর জীবনাদর্শেরই একজন বিশ্বস্ত অনুগত ভাষ্যকার। এবং এজন্যই এডওয়ার্ড ম্যাককাথী তাঁর *'ইকবাল ও ইউরোপ'* প্রবন্ধে খুব পরিষ্কারভাবে বলেছেন, যে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন আমরা দেখি, ইকবালের দৃঢ় বিশ্বাস তা কেবল সম্ভব 'অতীতের সাথে সংযোগ-সাধনে, অতীতের জীবন্ত ধারাকে অবলম্বনে এবং কুরআনের শিক্ষাকে চিরকালীন স্বীকৃতিদানে।' ইকবাল বলেন-

ফিরিয়ে আনো সেই পেয়ালা
আর সেই সঞ্জীবনী সুরা
আবার আমাকে আরোহণ করতে দাও
গৌরবের সুউচ্চ চূড়ায়।'

করতে পারি, সঞ্জীবনী সুরাপূর্ণ এই পেয়ালা আসলে ইসলামের পেয়ালা; আর ইকবাল যে পুনরায় গৌরবের সুউচ্চ চূড়ায় আরোহন করতে চান, গৌরব ও সেই চূড়া হলো মানবতার নির্ভুল কামিয়াবী; এবং আমরা এটাও অনুধাবন করতে পারি ইকবাল তাঁর এই কাঙ্খিত বিজয়কে শুধু একজন ব্যক্তির বা শুধু মুসলিম উম্মাহর বিজয় বলে মনে করেননি, এই বিজয় বিশ্ববিস্তৃত সকল মানুষের বিজয়। এজন্যই তিনি খুব তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন,'দেশপ্রেমই যথেষ্ট নয়' এবং 'সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ একটি বিপজ্জনক বস্তু।' উপলদ্ধি করেছিলেন, মানব জাতিকে বাঁচানো যাবে না যে- পর্যন্ত বিশ্বের চিন্তানায়কগণ সমগ্র মানবজাতিকে একটিমাত্র মানব বিরাট পরিবাররূপে চিন্তা ও অনুভব না করছেন'। এবং এই হেতুই বিশ্বমানবের প্রতিভূরূপে আদমকে সশ্রদ্ধ অভিনন্দন জানিয়ে মাটির এই পৃথিবীর কণ্ঠে উচ্চারিত হয়

প্রজ্ঞার বারিধি তব মানিবে না কোনদিন কোন সীমারেখা
নভের উচ্চতা ছুঁয়ে চিত্তের স্ফুলিঙ্গ তব দূরে দেখা'।

কিন্তু যে স্বপ্ন ইকবাল দেখেছিলেন, গৌরবের সেই সুউচ্চ চূড়ায় কি পৃথিবী আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে? না। সক্ষম যে হয়নি তাঁর কারণ, ইকবাল যে আল- কুরআনের মধ্যে কামিয়াবির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও পথনির্দেশনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, পৃথিবী সেই আল-কুরআনকে গ্রহণ করতে সর্বতোভাবে অনীহাই প্রকাশ করেছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ইকবাল দেখেছিলেন মানবমুক্তির জন্য তাঁর সমসাময়িক সময়ে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ভূমিকা, সম্পূর্ণ মানববৈরী দুই দানবের লড়াই। তারপর, ইকবাল মৃত্যুর অনেক দিন পর এক দানব তাঁর সগৃহেই ভূশয্যা গ্রহণ করলো; দ্বিতীয় দানবটি এখন বিশ্বময় মাতামাতি করছে। কিন্তু কৌতুকের বিষয়, তারও মুখে 'মানবমুক্তির জয়গান । এবং এই প্রসঙ্গে এই কথাটিই উল্লেখযোগ্য যে. এই হিংস্র দানবটির এখন একমাত্র দুশমন হলো ইসলাম। পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামকে বড় ভয় করে, ইসলামকে দেখে বড় লজ্জা পায়। কারণ, পশ্চিমা পুঁজিবাদী জগৎ যত ভালো মানুষের বেশবাস-ই ধারণ করুক, তার কদর্য কুৎসিত চেহারাটা পৃথিবী সমক্ষে তুলে ধরতে পারে একমাত্র ইসলাম; এবং এইজন্যই ইহুদি- নাসারা পশ্চিমাচক্র-যে

Dhaka University Institutional Repository

মানবতার কথা বলে, আপাতমধুর নারীমুক্তি,'মানবাধিকার'ও 'প্রগতির'কথা বলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো দুটি।

প্রথমত: ইসলাম যে নির্ভুল ও অব্যর্থ মানব-কল্যাণের পথ দেখায়, তার বিপরীত পশ্চিমা-পুঁজিবাদও যে যথেষ্ঠ মানবপ্রেমী, এটা দেখিয়ে একটা বিভ্রম সৃষ্টি করতে চায়। দ্বিতীয়ত, ইহুদি-নাসারাদের স্বসৃষ্ট উপাস্য দেবতা পশ্চিমা-পুঁজিবাদ হলো বহু মানুষের বঞ্চনার উপর গড়ে ওঠে কতিপয়ের সুখসৌধ। এই ভয়ংকর ব্যবস্থাপনা যাতে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কাছে একেবার অসহ্য হয়ে না-ওঠে, এ জন্য গণতন্ত্র, নারী স্বাধীনতা, মানবধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবপ্রেম ইত্যাদি কতিপয় শব্দের আঁড়ালে পুঁজিবাদ তার ধারালো মানবরক্ত পিপাসু নখরগুলোকে শুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। অতএব আমরা আজ এই আধুনিক সময়ে যাকে মানবতা বলি বা বলছি, একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবো, সেটা আসলে পুঁজিবাদ ও বস্তুবাদ সৃষ্ট রক্তাক্ত ক্ষতকে ঢেকে রাখার একটি বালখিল্য অপকৌশল মাত্র। পশ্চিমা বিশ্বের এই প্রচণ্ড ফাঁকি ও প্রতারণা ইকবাল বুঝতে পেরেছিলেন, বুঝতে পেরেছিলেন বস্তুবাদ লালিত আধুনিক পশ্চিমা বিশ্ব যা বলে ফাঁকা চিৎকার, শুধু প্রাচ্য নয়, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য সে এক বিপজ্জনক প্রবঞ্চনা। পশ্চিমা বিশ্ব এই 'মহৎ কাজটাই করে চলেছে। যে কারণে কৌতক ও শ্লেষ মিশিয়ে ইকবাল তাঁর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এই দুঃখ নিবেদন যে, তিনি তো আগুন থেকে একটি মাত্র ইবলিস তৈরি করেছিলেন, পশ্চিমা সেখানে আজ মৃত্তিকা থেকে লক্ষ্য লক্ষ্য ইবলিস তৈরি করছেন। বলাই বাহুল্য প্রতীচ্য এই ইবলিসী বস্তুবাদের অমানবিক উন্মত্ততা ধীরে ধীরে সারা জগতের সামনেই আজ একটি ভয়াবহ বাস্তবতা । কিন্তু কত আগেই না ইকবাল এটা ধরতে পেরেছিলেন, বিশ্বটাকে সতর্ক করেছিলেন ।

'পশ্চিমা দৃষ্টি আজ অন্ধ
তার মনের চোখ অবরুদ্ধ
গন্ধ ও রং পান করে সে হয়ে উঠেছে মত্ত
অসত্যের কাছে করছে নতি স্বীকার ।

'মুসলিম জাগরণ এবং মানসিক বিপ্লব সাধনে ইকবাল কাব্যের কতটুকু অবদান রয়েছে, তা অনুধাবন করার সুবিধার্থে তার কাব্যধারাকে মোটামুটি দু'ভাগে বিভক্ত করা যায়। বিলাত পূর্ব কাব্য এবং বিলাতোত্তর কাব্য। ১৯০৫ সালে তিনি বিলাত গমন করেন এবং ১৯০৮ সালে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। বিলাত গমনের পূর্বে তার চিন্তাধারা পুরোপুরি বিকশিত হয়নি। তখন তিনি ছিলেন অখণ্ড জাতীয়তাবাদী ও মায়াবাদী। তাঁর এ সময়কার কাব্যে ভারতীয় জাতীয়তাবাদের শিক্ষা মেলে। এ সময় তিনি ধর্ম নির্বিশেষে হিন্দু মুসলিম সবাইকে দেশপ্রেম, ঐক্য ও ভালবাসার সবক দেন '।

বিলাত্তোর কাব্যে তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদ, খুদী, বেখুদী, মরদে মুমিন, তক্দির, প্রকৃতির উপর আদিপত্য স্থাপন, ইশ্ক, কর্মশীলতা, বিবর্তনবাদ, জীবন-রহস্য, রাজনীতি, সমাজনীতি ইত্যাদি বিষয়ের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন।

ইকবাল ছিলেন আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের সুপন্ডিত এক কালজয়ী চিন্তানায়ক। পশ্চিমা সমাজ, সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছেন অত্যন্ত নিবিড়ভাবে। ধর্ম ও রাষ্ট্রের বিভক্তি থেকে উদ্ভূত পশ্চিমা রাষ্ট্র-ব্যবস্থার বীভৎস চেহেরা দেখে তিনি বারবার শিউরে উঠেছেন এবং এর করুণ পরিণতি সম্পর্কে মানব জাতিকে অত্যন্ত কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দিয়েছেন। তিনি ধর্মনিরপেক্ষতাবাদকে কুফরের সঙ্গে তুলনা করে বলেছেন। 'রাষ্ট্র থেকে যদি ধর্ম বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সেখানে চেঙ্গিজী (স্বৈরাচার) ছাড়া আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনা'। পশ্চিমের গণতন্ত্র সম্পর্কে ইকবালের মূল্যায়ন হচ্ছে: এটি এমন এক শাসন প্রণালী, যেখানে মানুষের মাথাই শুধুই

Dhaka University Institutional Repository

গণনা করা হয়, তার মস্তিষ্ককে ওজন করা হয় না। তিনি পশ্চিমের সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদকে অত্যন্ত নির্মম ভাষায় সমালোচনা করেছেন।

ইকবাল ছিলেন ইসলামি রেনেসাঁ (নবজাগরণ) এর এক মহান স্বপ্নদ্রষ্টা। তিনি মুসলিম উম্মাহকে একটি স্বতন্ত্র জাতিসত্তা রূপে চিহ্নিত করেছেন এবং ইসলামি চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে তারা আবার দুনিয়াকে বুকে মাথা তুলে দাঁড়াবে, এ স্বপ্ন তিনি আজীবন লালন করেছেন। তিনি উপমহাদেশের মুসলিম গরিষ্ঠ অঞ্চলগুলোকে স্বাধীন ও স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশ করার জন্যেও প্রবলভাবে তাগিদ দিয়েছেন। ১৯৪০ সালে মুসলিম লীগের গৃহিত 'লাহোর প্রস্তাবে 'তাঁর রাষ্ট্র-চিন্তার প্রতিফলন ঘটলেও তাঁর বক্তব্যেও কোথাও 'পাকিস্থান রাষ্ট্র তাঁর চিন্তাদর্শের যথার্থ প্রতিফলন ঘটেনি 'যদিও পাকিস্থান কর্তৃপক্ষ তাঁকে 'জাতীয় কবি রূপেই বরণ করে এসেছেন।

আসলে ইকবাল ছিলেন এক কালোত্তীর্ণ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল স্থান-কাল পাত্রের উর্ধ্বে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে এক চিরন্তন দিক নির্দেশনা। ইসলামি উম্মাহ্ অংশ হিসেবে তাঁর চিন্তাদর্শকে জানা ও বোঝা দরকার আমাদের প্রয়োজনেই।

ড.ইকবাল বর্তমান শতকে মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুধীমন্ডলীর কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। জীবন দর্শনের কবি ইকবালের অমূল্য চিন্তাধারা কেবল প্রাচ্য দেশসমূহের নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানের চিন্তার রাজ্যে এক বিপ্লবাত্মক ও কল্যাণ অভিসারী পরিবর্তন এনে দিয়েছে। বিগত কয়েক শতকের পতনমূখী গতিপথে চালিত মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়-গতিহীন জীবনে এনেছে অপূর্ব কর্মোন্মাদনা ও গতিচাঞ্চল্য।

'ইকবালের চিন্তাধারার বুনিয়াদ প্রধানত ইসলামের উপর। ১৯৩০ সালে ২৯শে ডিসেম্বর নিখিল ভারত মুসলিম লীগ অধিবেশনের সভাপতির ভাষণে ইকবাল বলেছিলেন, 'আমি আমার জীবনের শ্রেষ্ট অংশ ব্যয় করেছি ইসলামের সযত্ন অধ্যয়নে-ইসলামের কানুন ও রাষ্ট্রব্যবস্থা,তাঁর তমুদ্দন, তার ইতিহাস ও সাহিত্য অধ্যয়নে। আমার মনে হয়, ইসলামের প্রাণবস্তুতার সাথে এই অবিরাম সংযোগের ফলে তা আমার উপলব্ধিতে যেভাবে প্রকাশ লাভ করেছে, তার ফলে বিশ্বজনীন সত্য হিসাবে ইসলামের তাৎপর্য সম্পর্কে আমি এক ধরনের অন্তদৃষ্টির অধিকার লাভ করেছি।'ইকবালের কাছে ইসলাম প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী নিছক ধর্মানুষ্টান পদ্ধতি নয় বরং এক পূর্ণাংঙ্গ ও সম্পূর্ণ জীবন - বিধান। মানব জীবনের কোনো বিশেষ দিকই ইসলামের আওতার বাইরে পরে না; তাই রাজনৈতিক দর্শনকেও তিনি এই জীবন দর্শনেরই এক অপরিহার্য অংশ বলে মনে করতেন। এই সুষ্পষ্ট ধারণা নিয়েই তিনি জীবনের অন্যান্য দিকের ন্যায় সমভাবে রাজনীতির দিকের মনোযোগী হয়েছিলেন। ইকবালের মতে, ধর্মকে তিনি মনে করতেন ' ব্যক্তি ও রাষ্ট্র উভয়ের জীবনে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ শক্তি বলে'। আধুনিক দুনিয়ার অধিকাংশ চিন্তাবিদ যখন ধর্মকে রাজনীতি থেকে অলাদা করে নিছক ব্যক্তিগত ব্যাপারে পরিণত করবার স্বপক্ষে ক্রমাগত প্রচার চালিয়ে এসেছেন, ইকবাল তখন অকুতোভয়ে ঘোষণা করেছেন: 'ইসলাম মানুষের একত্বকে আত্মা ও বস্তুর সমন্বয়াতীত দ্বৈতবাদে বিভক্ত করে না। ইসলামে আল্লাহ ও বিশ্বপ্রকৃতি, আত্মা ও বস্তু, উপাসনাগার ও রাষ্ট্র পরাস্পরের পরিপূরক''-।

আল্লামা ইকবালের কাব্য সাহিত্যে-ইসলামি ভাবধারার ছাপ; এতে তিনি পবিত্র কুরআন ও হাদিসের আলোকে ইসলামি চিন্তাধারাকে দার্শনিক ও শিল্পীসুলভ দৃষ্টিভঙ্গিতে তুলে ধরেছেন। অতএব তাঁর কাব্যে বিদ্যমান ইসলামি চিন্তা- চেতনাকে উপলদ্ধি করতে হলে একদিকে যেমন কুরআন-হাদিসের মর্মবাণীকে সামনে রাখতে হবে তেমনি অন্যদিকে তাঁর কাব্যেও দার্শনিক ও শৈল্পিক বর্ণনা পদ্ধতিকেও অনুধাবন করতে হবে। বিভিন্ন দার্শনিক বিষয়ের অবতারণা করতে গিয়ে তিনি তাঁর কাব্যে অসংখ্য রূপক, ইঙ্গিত ও উপমা ব্যবহার করেছেন। এসবের মধ্য থেকে তাঁর সঠিক ভাবধারা উদ্ধার করা সহজ ব্যাপার নয়। ইকবালের কাব্য ফার্সীও উর্দু ভাষায় রচিত। এ কবি জীবনব্যাপী ২৫ হাজার পংক্তি রচনা করেছেন মানুষ ও মানবতা পুনরূদ্ধারের অদম্য স্পৃহায়। ইকবাল

Dhaka University Institutional Repository

নিঃসন্দেহে মানবতার কবি। কিন্তু এটা মনে রাখা জরুরি যে, মানুষের মুক্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠা শুধু কবি নয়, যে কোন মানুষেরই ক্ষমতার বাইরে এই পথ ও উপায় নিরঙ্কুশভাবে মহান আল্লাহ পাকের নিজস্ব এখতিয়ারভূক্ত। মানুষ চেষ্টা করতে পারে আপন বুদ্ধি বিবেচনা দ্বারা নানা রকম পথ তৈরীও করতে পারে, কিন্তু সেই পথে মানব বংশের প্রকৃত কোন উপকার তো হয়ই না বরং দুর্ভোগ আরো বৃদ্ধি পায়।

এই জন্যই আল্লাহ পাক নবী রাসুলদের মাধ্যমে যে হেদায়াত বা পথ নির্দেশনা দান করেন মানবতা প্রতিষ্ঠার সেটাই একমাত্র নির্ভুল রূপরেখা এর বাইরে কিছু অনুসন্ধান করলে কী হয় আধুনিক পৃথিবী তারই এক বিপজ্জনক উদাহরণ। ইকবাল এটা বুঝেছিলেন; তাই ইকবাল মানে অন্য কিছু নয়, ইকবাল মানে একটি তাওহীদী কন্ঠস্বর। আল কুরআন ও রাসুল (সাঃ) এর জীবনাদর্শের মধ্যে মানবমুক্তি ও মানবতা প্রতিষ্ঠার যে সঠিক হেদায়াত ও পয়গাম, ইকবাল তারই এক বিশ্বস্ত নকীব, তারই আধুনিক রূপকার।

ইকবালের যা কিছু কথা, কবিতা ও দর্শন, তা সবই আল-কুরআন ও আল-হাদীসকে কেন্দ্র করে পরম আনুগত্যে আবর্তিত। তিনি এমন একজন খাঁটি মুসলমান, যিনি শুধু আনুষ্ঠানিক ইবাদতের মধ্যে আবদ্ধ থেকে ব্যক্তি মুক্তির কথাই চিন্তা করেননি; মুসলিম উম্মাহর গৌরবদীপ্ত ইতিহাসও ঐতিহ্যের আলোকে তিনি তাঁর সমসাময়িক বিশ্ব-মুসলিম মিল্লাতের সমূহ অধঃপাতনকেও নিরক্ষণ করেছেন বেদনাবিদীর্ণ দুটি চোখে। এবং শুধু নিরক্ষণই করেননি, ইসলামের মূল শিক্ষা ও প্রেরণার কাছে ফিরে আসা ছাড়া হৃতগৌরব পুনরুদ্ধারের যে কোন পথ নেই, এই ব্যবস্থাপত্রও দান করেছেন। বলাই বাহল্য, তাঁর কবিতা এবং নানা উপলক্ষে নানা স্থানে প্রদত্ত তাঁর সকল বাণী বক্তৃতা ও নিবন্ধ এই ব্যবস্থাপত্রেরই সুস্পষ্ট লেখ্য ও উচ্চরিত রূপ।

মানবতাবাদ কোন নতুন কথা নয়; বিশেষ করে উনিশ ও বিশ শতকী বিশ্বে মানবতাবাদ' শব্দবন্ধটি একটু বেশিই উচ্চারিত হয়েছে ও হচ্ছে। আর এটাও সত্য যে, পৃথিবীর প্রায় সব খ্যাতিমান কবির অন্যতম প্রধান ও প্রিয় বিষয় হলো মানবতা। আমাদের নিজের দিকে চোখ ফিরায়ে দেখতে পাই, সেই অনেক কাল আগে চণ্ডিদাস যেমন বলেছিলেন, শুনহ মানুষ ভাইও সবার উপরে মানুষ সত্য তাহার উপরে নাই; আজ সেই একই কথা ভূপেন হাজারিকাও বলেন, মানুষ মানুষেরই জন্য'। শুধু বাংলা সাহিত্যে নয়, সব সাহিত্যেই খ্যাত- অখ্যাত-অল্পখ্যাত এমন কবি প্রায় নেই বললেই চলে, যিনি তার কবিতায় মানবতাকে স্পর্শ করতে চাননি। কিন্তু এই মানবতা আসেলে কী? রবীন্দ্রনাথ বলেছেন- অপরের মধ্যে নিজেকে অনুভব করার নামই ভালবাসা। রবীন্দ্রনাথের এই সংকেত থেকে আমরা বোধহয় ধরে নিতে পারি, ধর্ম- বর্ণ নির্বিশেষে বিশ্বের সকল মানুষের মধ্যে নিজেকে অনুভব করতে সক্ষম যিনি তার আপন অনুভবন ক্ষমতাকে নিজের মধ্যে আবদ্ধ না রেখে সর্বময় করে তুলতে পারেন, তিনিই সর্বমানবিক প্রেমে উজ্জিবিত। এবং প্রেমই সম্প্রসারিত অনুভূতি নিয়ে যারা বিশ্বমানবকে ভালো বাসা বাঁধতে চান, তারাই মানবপ্রেমী মানবতাবাদী। সম্ভাব:(ঐঁসধহরংস) ইন্সানিয়াত বা মানবতাবোধ বলতে এই রকমই বুঝায়। সুখের কথা এই যে, সব দেশে সব সৎকবিই এই সর্ব মানবিক প্রেমের গন্ধ সারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়ে একটি স্বর্গতুল্য নতুন পৃথিবী নির্মাণের স্বপ্ন দেখেন।

শুধু কবি নন বিজ্ঞানী, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ সবাই এটা চান। এবং শুধু নিষ্ক্রিয় চাওয়া নয়, তাঁরা এই লক্ষ্যে ব্রতী হয়ে অনেক কাজ ও করেছেন, এখনো করছেন। কিন্তু অতীব পরিতাপের কথা, কোনো কালে কোনো দেশেই, একমাত্র ব্যতিক্রম খোলাফায়ে রাশেদীন ও তৎপরবর্তী কিছুকালের ইসলামি বিশ্ব ছাড়া. কখনো মানব প্রেম নূন্যতম প্রতিষ্টা পায়নি। আজ আমরা যে সময় যে বিশ্বে বাস করছি, সে তো একটা নির্ভুল অশান্তি। নৈতিকভাবে অধঃপতিত দায়িত্বহীন পৃথিবী ইতিপূর্বে আর কখনো দেখা যায়নি। আর্থাৎ অনেকের অনেক আন্তরিক চেষ্টা স্বত্বেও পৃথিবীর প্রকৃত উপকার হয়নি। আরো পরিতাপের বিষয় এই যে, এই ব্যর্থতার দিকটি সারা পৃথিবীর মানবতাবাদী কবিরা তেমন ভালোভাবে দেখতে পাননি। কিছুটা দেখলেও, এই ব্যর্থতার কারণ হিসাবে এটি অনুধাবন করতে

Dhaka University Institutional Repository

চাননি যে, মানবতা প্রতিষ্ঠার কাজটি বস্তুতই মানববুদ্ধি ও প্রজ্ঞারাতীত একটি অসম্ভাব কাজ; বুঝতে চাননি যে, সদিচ্ছা যতই থাক, প্রস্তাবিত পথসমূহ সর্বদাই এক একটি ভুল পথ। সত্যই, মানবতাবাদীদের- জন্য এটা একটা বিরাট ভুল, যা বুঝতে বুঝতেই তাদের এই পৃথিবী নশ্বর জীবনের মূল্যবান আয়ুটুকু অতিবাহিত হয়ে যায়। এবং এ এক অসংশোধনীয় দুর্ভাগ্য; পরবর্তী মানব দরদীরাও একই ভুলের পুনরাবৃত্তির মধ্যে সোৎসাহে আবর্তীত হতে থাকে। এবং আরো দুঃখের কথা যে, কিছুসখ্যক অন্ধ সর্বাত্মাক এই অনিধিকার-চর্চিত ভুলকেই পৃথিবীর জন্য পরম নেয়ামত বলে পরিচয়-দানের চেষ্টায় সর্বাত্মাকভাবে রত ও তৎপর।

আসলে তাৎক্ষনিকভাবে যাই মনে হোক, আবহমানকাল ধরে এটাই বার বার প্রমাণিত হয়েছে, মানব বংশের জন্য মানবতা- প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে আল্লাহ পাকের নির্ভুল হেদায়েত মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোন পথ নেই। বিষয়টি মানুষের একেবারেই সাধ্যাতীত; এবং শুধু সাধ্যেরই অতীত নয়, আল্লাহর হেদায়েতকে অস্বীকার করে নতুন কোন পথ নির্মাণের চেষ্টা রীতিমত মূঢ়তা অনধিকার চর্চাও বটে। ইসলাম এই ধরনের চিন্তা ও চর্চাকে শুধু নিরুৎসাহিত করে না, ক্ষমাহীন ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহস বলে বিবেচনা করে। আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, ইকবাল এই বাস্তবতাকে যথোচিত ঈমানী দৃঢ়তার সঙ্গে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

ইকবাল কি সিজর বা আলেকজাণ্ডারের মত সারা বিশ্বকে পদানত করতে চাঁন ? না, আবার হতেও পারে, কারণ একদিন তো মুসলমানদের জিহাদী কাফেলার কাছে অর্ধেক পৃথিবী আত্মসমর্পণ করেছিল। সেই দীপ্ত ইতিহাস, সেই দুরন্ত ঘোড় সোয়ারদের অজেয় অপ্রতিহত কাফেলার কথা ইকবালের স্মৃতিপটে হয়ত জেগে উঠেছিল। হয়ত আবার অনেক মুহম্মদ বিন কাসেম, তারিক ও মাহমুদ গজনভীর অশ্বক্ষুরধ্বনি পৃথিবী প্লাবী বিজয়ের ইতিহাস রচনা করবে; আবার হয়ত অশ্বরোহী বখতিয়ার খিলজীরা দুর্বার বেগে ছুটে যাবে পৃথিবীর নানা প্রান্তে , নিশ্চিত করে বলা যায় না, হয়ত এই স্বপ্নটিও ইকবালের মধ্যে ছিল। কিন্তু সে কথাটি পরিষ্কার যে, কথাটি নিঃসংশয়ে বলা যায় তা হলো ইকবাল চেয়েছিলেন মানবমুক্তির কল্যাণময় আলোকবর্তিকা হাতে নিয়ে সারা পৃথিবীর অন্ধকারকে বিদুরিত করার এক দুর্নিবার আকাঙ্ক্ষা ও দায়িত্ববোধ নিয়ে চীন আরব হিন্দুস্থান তথা সারা পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে মুসলমান সূর্যরশ্মির মতছড়িয়ে পড়বে। এটা শুধু ইকবালের স্বপ্ন নয়, ইসলামের অপরিহার্য দাবিও বটে। কারণ নবী আর আসবেন না। বিদায় হজ্বে আল্লাহর রাসুল পরিষ্কার ঘোষণা করেছেন, যে হেদায়াত, যে আলোকরেখা,আল্লাহর যে নেয়ামত তিনি রেখে গেলেন, তা সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার দায়িত্ব এখন মুসলিম উম্মহর। তাই ইকবালের আহ্বান —

স্তব্ধ করে দাও তুমি সমস্ত জাতির কোলাহল
জান্নাতের মাধুরীতে উঠুক সম্পূর্ণ হয়ে
সুরধারা মুক্ত প্রাণোচ্ছল'
এবং
প্রশান্তির দিন ফের বয়ে আনো পৃথিবীতে একবার,
শান্তি বাণী দিয়ে যাও যুদ্ধকারী মানুষের জীবনে আবার ,
সমগ্র মানবজাতি শস্যক্ষেত্র, তুমি তার পুণাঙ্গ ফসল।

এই হলো কুরআন ও সুন্নাহকে সামনে রেখে মুসলমানদের প্রতি ইকবালের উদাত্ত আহবান।

পৃথিবীর দুর্ভাগ্য, মুসলিম মিল্লাতের আরো বড় দুর্ভাগ্য, এই জরুরী আহবানে কেউই এখনো যথোচিত কর্ণপাত করছে না। কিন্তু এটা সত্য এবং ইকবালও এটাই সত্য বলে জানেন, তাঁর আহবানে সাড়া দিতে পৃথিবীর যত বিলম্ব হবে, তাওহিদী মুসলমান যতদিন তার উপযুক্ত যোগ্যতা নিয়ে বিশ্ব নেতৃত্বের আসনে সমাসীন হতে বিলম্ব করবে, মানবতার জন্য আকণ্ঠ পিপাসাত্তর এই বিশ্বে প্রকৃত মানবমুক্তির সুপ্রভাত তত বিলম্বিত হবে। কারণ ইসলাম ছাড়া, প্রকৃত মুসলমানদের ইমামত ছাড়া, পৃথিবীবক্ষে শান্তি, কল্যাণ ও ইনসাফ

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় কোন পথ নেই। কারণ যতভাবেই দেখা যাক, আধুনিক পৃথিবীতে ব্যবহৃত ' যে সর্বোৎকৃষ্ট গণতন্ত্র, মানবাধিকার ও নারীমুক্তি বস্তুতই সে এক সর্বগ্রাসী চোরাবালি। এই চোরাবালিতে লুকিয়ে আছে শুধু অধঃপাত, শুধু প্রতারণা; শুধুই শোষণ লুন্ঠন ও ইবলিসের মিথ্যা মানবদের ভান ও অভিনয়-

ফিরিংগীদের বাদশাপনায়
নেই যে কোথাও দিনের নিশান
খোদার কসম দেখছে সবাই,
ওদের ঘরের শয়তানেরা,
জিব্রাঈলের নেই সেথা স্থান।

আসলে যাদেরকে মানবদরদী বলে মনে হয়, তারা দরদী নয়, তারা মানবতার ফেরিওয়ালা। এই সর্বনাশা ফেরিওয়ালাদের হাত থেকে রেহাই পেতে হলে ইসলাম ও মুসলিম মিল্লাতের নেতৃত্ব ছাড়া দ্বিতীয় কোন আশা নেই। এবং যত দেরীতেই হোক ইকবাল বিশ্বাস করেন, এই আশা একদিন বাস্তবরূপ পরিগ্রহ করবেই-

ভাষায় ধরা দেয় না আমার মনের কোণের গোপন ভাব
এই দুনিয়ায় আসছে আবার নও যামানার ইনকিলাব।
দুর হবে এই রাতের আঁধার, সূর্য হেসে উঠবে ফের
এই বাগিচা মুখর হবে সুরে সুরে তাওহীদের।

ইকবাল বর্তমান শতকে মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুধী মণ্ডলীর কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। জীবন দর্শনের কবি ইকবাল অমূল্য চিন্তাধারা কেবল পাচ্য দেশসমূহে নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানের চিন্তার রাজ্যে এক বৈপ্লবিক ও কল্যাণ অভিসারী পরিবর্তন সাধন করেছে। বিগত কয়েক শতকের পতনমুখী গতিপথে চালিত মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়-গতিহীন জীবনে এনেছে অপূর্ব কর্মোদ্যম ও গতিচাঞ্চল্য।

এটা স্পষ্ট যে, ইকবাল যা বলেছেন এবং মুসলিম উম্মাহর জন্য তাঁর যে অবদান, তা কোন তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের বিবেচনাপ্রসূত স্ব-উদ্ভাবিত বিষয়ের মত নয়, তা ছিল আল্লাহ পাকের তরফ থেকে প্রেরিত এক অদৃশ্য ইলহাম-এর প্রতিধ্বনি। প্রকৃতই ইকবাল ছিলেন আল্লাহ কতৃক নির্ধারিত আদেশের এক অনুগত রূপকার, প্রকৃতপক্ষেই তাঁর ভূমিকা ছিল অনেকটা যেন জিহাদের ময়দানে ত্রস্ত বিক্ষিপ্ত মুসলিম মিল্লাতের তরক্কীর জন্য এক সর্বস্ব উৎসর্গিত সিপাহসালারের ভূমিকা। অতএব, সমসাময়িক বৈরিতা, কি নোভোল কমিটির সতর্ক অসতর্কতা, এসব এক একটা এতই তুচ্ছ উপসর্গ, যা ইকবাল অক্লেশে ও স্মিতহাস্যে উপেক্ষা করেছেন। আসলে আমাদের সাধারণ বিষয়বুদ্ধির অনেক উর্ধে ইকবালের অবস্থান। ইকবালের দিল ছিল নিখাদ মুমিন এর দিল, সেই দিলে ছিল হিম্মত; আর তার কন্ঠস্বর থেকে ধ্বনিত অনুরণিত আওয়াজ আল্লাহু আকবার। ইকবালকে তাঁর সমসাময়িক কালে অনেকে চিনতে পারেনি, অনেকে এখনো চেনেন না। কিন্তু এটা সত্য যে, সমগ্র মুসলিম উম্মহর অপূর্ব ধমনীতে তিনি উষ্ণ ও সাহসী রক্ত সঞ্চালনে যে একাগ্র অধ্যবসায়ী ভূমিকা পালন করেছেন, ইসলামের সুদীর্ঘ ইতিহাসে তার সমতুল্য উদাহরণ খুব বেশি নেই। খুবই আনন্দের কথা আধুনিক বিশ্বের ক্রমস: সচেতন মুসলমান আজ আবার ধীরে ধীরে ইকবালের কাছে ফিরে আসছে। আসতেই হবে, কারণ ইসলামের যে মূল প্রাণশক্তি সততা, ইনসাফ ও বীরত্ব সেই অপরিহার্য পাঠ গ্রহনের কথা তীক্ষ্ণ কিন্তু মমতাস্নিগ্ধ কন্ঠে, অন্তত একালে ইকবালের মত আর কেউ উচ্চারণ করেন নি।

প্রকৃতপক্ষে ইকবালের কাব্য সাহিত্য শুধুমাত্র মুসলিম মিল্লাতকেই আলোকিত ও জাগ্রত করেনি; বরং সমগ্র বিশ্বের মানুষকেই এক নতুন আলোর পথ দেখিয়েছেন।

Dhaka University Institutional Repository

প্রথম অধ্যায়
ইকবালের জীবন ও সাহিত্যকর্ম

প্রথম অধ্যায়

ইকবালের জীবন-সংক্ষেপ:

ডক্টর ইকবালের পূর্বপুরুষগণ কাশ্মীর থেকে (পাঞ্জাব) এসে বসতি স্থাপন করেন। তাঁরা ছিলেন কাশ্মীরী ব্রাহ্মণদের সুপরো গোত্রের লোক। তারা আজ থেকে আনুমানিক পৌনে তিনশ' বছর পূর্বে কাশমীরে ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হন। ডক্টর ইকবাল ছিলেন ঐ খান্দানেরই সান। ধারণা করা হয় যে, ভারতীয় উপমহাদেশে বাবরের আগমনের (১৫১৯) প্রায় একশ' বছর পূর্বে তাঁর উর্ধ্বতন পুরুষ বাবা লোলহাজ কোনো এক মুসলিম সাধকের কাছে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন। (খালেদ-১, পৃ. ২৭০) তাঁর পিতামহ শেখ মুহাম্মাদ রফিক ১৮৫৭ খ্রিষ্টাব্দে সিপাহী বিদ্রোহের পর কাশ্মীর থেকে শিয়ালকোটে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। (সাফইয়ারী-২, পৃ. ২৮) ইকবাল এ শহরেই তিনি ১৮৭৭ সালের ৯ নভেম্বর শুক্রবার সিয়ালকোটের এক উচ্চ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। (নুরূদ্দিন - ৩, পৃ. ২৫)

ইকবালের পিতা পারিবারিক ঐতিহ্য হিসেবে শায়খ নুর মুহাম্মদ খুবই সৎ খোদাভীরূ লোক ছিলেন। সিয়ালকোটের একজন প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ছিলেন এবং তাঁর ছোটখাট ব্যবসা ছিল। সততা ও খোদাভীরূতার জন্য গোটা শহরে তিনি জনপ্রিয় ছিলেন। সমাজ কল্যাণমূলক কাজে তিনি ছিলেন নিবেদিত প্রাণ কর্মী। তাঁর দুই পুত্র ছিল: মুহাম্মদ আতা ও মুহম্মদ ইকবাল। এই ইকবালই পরবর্তী সময় এশিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ কবিরূপে পরিগণিত হন। (ইকবাল-৪, পৃ. ১৪) শায়ক নুর মুহাম্মদ তাঁর সন্তানদের উর্দু, ফারসি ও ইংরেজি শিক্ষা দেন। মুহাম্মদ আতা নিজ ছোট ভাই মুহাম্মদ ইকবালের চেয়ে চৌদ্দ বছরের বড় ছিলেন, যিনি প্রকৌশলী পদে প্রতিষ্ঠিত হন। ইকবালের পূর্বপুরূষগণ আধ্যাত্মবাদ ও একেশ্বরবাদে ছিলেন আকৃষ্ট। পূর্বপুরূষদের এ ধারা ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মাদ ও লাভ করেন। আর ইকবালের, মধ্যেও তা স্বাভাবিকভাবে প্রভাব বিস্তার করে। তাই জীবনের শুরু থেকেই ইকবাল পর্যায়ক্রমে ইসলাম ও অন্যান্য ধর্মমত সম্পর্কে গভীরভাবে অধ্যয়ন করেন। ফলে প্রথম জীবনেই তাঁর মধ্যে একটি মৌলিক চিন্তাধারা গড়ে ওঠে। প্রসংগত উল্লেখ্য যে, ইকবাল তাঁর এই বংশধারা সম্পর্কে এক স্থানে বলেছেন:

مرا بنگر کہ در ہندوستان دیگر نمی بینی
کہ برہمن زادۂ رمز آشنائے شمس تبریز است

আমাকে দেখো, কেননা হিন্দুস্তানে তুমি আর দেখবে না
এমন ব্রাহ্মণ-সন্তান যে হয়েছে রূমি ও শামসে তাবরীযের রহস্যবিদ। (ইকবাল-৫, পৃ. ১১৯)

পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশেরই একটি জেলা শিয়ালকোট। পাঞ্জাবের বিভিন্ন আলেম ও মনীষীর সঙ্গে শেখ নুর মুহাম্মাদের ছিলো গভীর সম্পর্ক। কখনো কখনো তিনি তাঁদের সঙ্গে জ্ঞান-বিজ্ঞান নিয়ে আলাপ -আলোচনা করতেন। ধর্মতাত্ত্বিক, দার্শনিক ও আধ্যাত্মিক বিষয়াদি নিয়ে মত বিনিময় করতেন যা ইকবাল গভীর অভিনিবেশ সহকারে শুনতেন। পিতা শেখ নুর মুহাম্মদ ইকবালকে শৈশবকাল থেকেই মনীষীদের বিভিন্নসভা- সমাবেশে উপস্থিত থাকার জন্য অনুপ্রাণিত করতেন। বিশেষ করে তিনি স্নেহময়ী মায়ের কুরআন শিক্ষার প্রেরণা তাঁর ওপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করেছিলো। ইকবালের স্নেহময়ী মা যখন মৃত্যুবরণ করেন তখন ইকবাল ভীষণ মুষড়ে পড়েন। এবং মায়ের উদ্দেশে নিচের শোকগাঁথাটি রচনা করেন।

کس کو اب ہوگا وطن میں آہ! میرا انتظار؟
کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار؟

خاکِ مرقد پر تری لیکر یہ فریاد آوں گا
اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آوں گا؟
تربیت سے تیری میں انجم کا ہم قسمت ہوا
گھر مرے اجداد کا سرمایۂ عزت ہوا
دفترِ ہستی میں تھی زرّیں ورق تیری حیات
تھی سراپا دین و دنیا کا سبق تیری حیات
عمر بھر تیری محبت میری خدمت گر رہی
میں تری خدمت کے قابل جب ہوا، تو چل بسی

হায়! কে আমার জন্য আজ প্রত্যক্ষ করবে স্বদেশে;
আর কে আমার পত্র না পাওয়ার কারণে
অস্থির চিত্তে তার সময় অতিক্রম করবে?
ওগো! তোমার কবরের মৃত্তিকার ওপরে
এই ফরিয়াদ নিয়ে আসবো আমি;
এখন মধ্যরাতের প্রার্থনার সময়
কে স্বরণ করবে আমাকে?
তোমার প্রশিক্ষণ পেয়েই তো আমি
লভেছি তারকারাজিসম প্রভূত সন্মান,
আর হয়েছে গৃহ আমার
(তোমারই বদৌলতে) পিতৃপুরূষের সণ্মানের ভান্ডার।
আমার অস্তিত্বের দফতরে ছিলো সোনালী পত্র তোমারই জীবন;
আর ছিলো ইহকাল ও পরকালের শিক্ষায় ভরপুর তোমার জীবন।
জননী আমার ! তোমার স্নেহ-মমতা আর ভালোবাসায়
লালিত হয়েছে চিরদিন আমার জীবন;
হায়! আমি যখন তোমার সেবার হয়েছি উপযুক্ত,
তখনই তুমি নিলে চিরবিদায়। (হক-৬, পৃ. ৫৫)

অন্যদিকে পিতাকে সম্মান করা, তার আদেশ-নির্দেশগুলো পালন করা ও তা নিজের জীবনে কার্যকরী করার বিষয়গুলোর বিবরণ তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ রোমুযে বিখুদী ও বিভিন্ন গ্রন্থে তুলে ধরেছেন। উল্লেখ্য যে, পিতা-মাতা ইকবালের মধ্যে যে তাওহীদ তথা একত্ববাদ ও খোদাপ্রেমের আলো জ্বালিয়ে ছিলেন তা-ই তাঁর পরবর্তী জীবনে, এমন কি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর মধ্যে আলোকবর্তিকার ন্যায় কাজ করে। আর এ পথ ধরেই তাঁর মধ্যে একটি উদ্দীপনা জেগে ওঠে যা পরবর্তীকালে তাঁর কবিতায় প্রতিফলিত হয় এবং বিশ্বের মানুষকে বিশেষ করে ভারতীয় মুসলিম জনতাকে দীর্ঘদিনের পুঞ্জীভূত কুসংস্কার, গোঁড়ামি, অজ্ঞতা ও অলসতার কবল থেকে মুক্তির পথ দেখায়।

Dhaka University Institutional Repository

বংশে তাসাউফের গতিধারা:

প্রথম মহাপুরূষ বাবা লোল হাজ থেকে শূরূ করে ইকবালের পিতা শেখ নূর মুহাম্মাদ পর্যন্ত তাসাউফের প্রতি বিশেষ ঝোঁক ও তাঁর অভিরূচিকে অটুট পারিবারিক প্রথা ও রীতি হিসেবে চিহ্নিত করা যায়। এ যেন ইকবাল বংশের এক আলাদা বৈশিষ্ট এবং উচ্চতর জীবনের মূল্য বহন করে। ইকবাল এক পত্রে ব্যাখ্যা করেন প্রথম প্রথম নিজস্ব ও পৈত্রিক ধারা অনুপাতে স্বভাবগত ঝোঁক ও প্রবণতা তাসাউফের তথা সর্বেশ্বর বাদের প্রতি ছিল। পরবর্তী পর্যায়ে আল কুরআনের আয়াত সমূহে চিন্তা ভাবনা ও ইসলামের ইতিহাস পর্যালোচনা করতে থাকেন। বিশেষ করে ইউরোপ থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তার উক্ত ভ্রম ধরা পড়লে তিনি তার ঐ প্রবণতার বিরূদ্ধে অমানসিক ও আন্তরিকভাবে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আর জীবন দর্শন হিসেবে জগৎ সমক্ষে নতুন কলেবর তার খুদী বা ব্যক্তিবাদকে তুলে ধরেন। (নুরূদ্দীন- ৩, পৃ. ২৭)

তাঁর পিতামহ সম্পর্কে জানা যায় যে তিনি একজন সুফী দরবেশের প্রভাবাধীন এসে ইসলাম গ্রহণ করেন। ইকবালের পিতা শায়খ নূর মুহাম্মদ (মৃ: ১৭ আগস্ট ১৯৩০ খ্রি. সিয়ালকোট মৃ. ২৫ সেপ্টেম্বর, ১৯২৯) তাঁকে অশিক্ষিত দার্শনিক উপাধি দিয়েছিলেন। তাঁর আর্থিক অবস্থা স্বচ্ছল ছিল না, কুরআন মজিদ পাঠে আগ্রহ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে তিনি ইকবালকে বলতেন এমনভাবে কুরআন পাঠ করো যেনো তা তোমার উপরই নাযিল হচ্ছে। তার মা ইমাম বিবি (মৃ. ৯ নভেম্বর ১৯১৪ খ্রি.) অত্যন্ত দ্বীনদার এবং আল্লাহ ভীরূ মহিলা ছিলেন। তিনি হালাল পন্থায় উপার্জিত অর্থে সন্তানদের লালন পালনের ব্যবস্থা করতেন। তার অনুরোধেই ইকবালের পিতা সরকারি চাকুরী ছেড়ে দেন এবং ব্যবসা বাণিজ্য করে সংসার চালান। দুই ভাই ও চার বোনের মধ্যে ইকবাল ছিলেন সর্বকনিষ্ঠ। তার ভাই শায়খ আতা মুহাম্মদ বয়সে তার ১৪ বছরের বড় ছিলেন।

জন্মের পূর্বে সুফী মনোভাবপন্ন পিতা শেখ নুর মুহাম্মদ স্বপ্নে দেখেন। একটি প্রসস্ত মাঠে বহু লোক। তারা সবাই হাত বাড়িয়ে আকাশে উড্ডয়নরত একটি মনোরম পাখিকে নিজেদের আয়ত্বে আনার জন্য তৎপর। সেখানে তিনিও ছিলেন। পাখিটি কখনো নীচে নেমে আসছে আবার কখনো উপরের দিকে উঠে যাচ্ছে। পরে হঠাৎ করে নীচের দিকে ধাবিত হয় এবং তার কোলে এসে স্থান নেয়। তাঁর পিতা উক্ত স্বপ্নকে অদৃশ্য ইঙ্গিত বলে বিবেচনা করে ব্যাখ্যা করেন তার ঘরে এমন একটি পুত্র সন্তান জন্ম নেবে, যে বড় হয়ে ইসলামের সেবায় আত্মোৎসর্গ করে অস্বাভাবিক খ্যাতি ও কৃতিত্ব লাভ করবে। শেখ নুর মুহাম্মদ একজন খাঁটি মুসলমান ছিলেন। ইকবালের জন্মের সময় পিতা শেখ নুর মুহাম্মদের বয়স ছিল চল্লিশ। এটা ইসলামের একটি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা। বড় ভাই আতা মুহাম্মদের বয়স ছিলো আঠারো। বোন ফাতেমা বিবি শেখ আতা মুহাম্মদের ছোট ছিলেন। অপর বোন তালে বিবি ছিলেন সাত বছরের। বাড়ীতে তখন তাঁর চাচা শেখ গুলাম মুহাম্মদ পরিবার পরিজনসহ বাস করতেন।

খেলাধুলা ও কবুতর পোষা:

ইকবালের বাল্য বন্ধু মুহীউদ্দীন ফওফের, মতে ইকবাল প্রাথমিক শিক্ষা জীবনে অন্যান্য সহপাঠিদের চেয়ে মেধাবী ছিলেন। তাই বলে তিনি পুস্তকের কীটই ছিলেন না। অন্যান্য বালকের ন্যায় পড়তেন ও খেলাধুলা ও করতেন। অবশ্র লেখা পড়ায় খুব পরিশ্রম ও করতেন। অনেক সময় অধিক রাত্র পর্যন্ত জেগে অধ্যয়ন করতেন। বাল্যকালীন দুষ্টমিতে ও তিনি কম ছিলেন না। উপস্থিত বুদ্ধি তার খুব ছিল। কবুতর পোষা গুড়ি ওড়ানো এবং আখরায় গিয়ে মল্লযুদ্ধ করার দৃষ্টান্ত ও পাওয়া যায়। এসব বিনোদন মুলক কর্ম ব্যস্ততায় আর বাল্য বন্ধু তকী ও লালু নামক এক পাহলোয়ান সাথী ছিল। পিতা তাকে এসব নিদোর্ষ খেলাধুলায় কোন সময় বাধা প্রদান করতেন না। কবুতর পোষার সে শখ তার বহু দিন পর্যন্ত ছিল। তিনি বাড়ীর ছাদের উপর ঘন্টার পর ঘন্টা কবুতর উড়ানোর আনন্দ উপভোগ করতেন। কবুতরের উড্ডয়ন থেকে তাদের জাত ও বংশের পরিচয় জানার কৌশল তিনি লালু পাহলোয়ান থেকে শিখেছিলেন। (ইকবাল- ৭, পৃ. ৯)

Dhaka University Institutional Repository

চারিত্রিক পবিত্রতা:

শেখ নূর মুহাম্মদের নিজস্ব ভাবমূর্তি গাম্ভীর্য পবিত্রতার দরূণ তাকে সিয়ালকোটে নগরীতে বিশেষ সন্মানের চোখে দেখা হতো। তার আধ্যাত্মিকতার অভিরুচি এবং ধর্মীয় আবেগ তাঁকে আলেম ও সৎলোকের সমাবেশে টেনে নিয়ে যেতো। তিনি ওসব আসর থেকে নিয়মিত উপকৃত হতেন। কোনো কোনো সময় আলেমদের সমাবেশ তার নিজের বাসভবনে অথবা দোকানে অনুষ্ঠিত হতো। তার আলোচনায় দার্শনিকভাবে ও আধ্যাত্মিক জ্ঞানের বিকাশ ঘটতো। শেখ নুর মুহাম্মদ উর্দু কবিতা ও রচনা করতে পারতেন। এ প্রতিভা তার মাঝে ও ছিল। সুযোগের অভাবে বিকশিত হতে পারেনি। তিনি কিছু কিছু কবিতা পারিবারিক পরিমণ্ডলে আবৃত্তি করা হতো।

শেখ নূর মুহাম্মদের আল্লাহর প্রতি গভীর আকর্ষণ ও ভালবাসা ছিল। তাই আওলিয়ায়ে কেরামদের ন্যায় তার কোনো কোনো সময় বিরহ বেদনায় মন ভরে উঠতো। অন্যের কোমলতার কারণে তিনি তা সহ্য করতে পারতেন না তাই দীর্ঘক্ষণ যাবৎ নীরবে অশ্রুবিসর্জন দিয়ে দিতেন। ইকবাল উর্দুর প্রসিদ্ধ কবি আকবর এলাহাবাদীর নামে।

আগস্ট ১৯১৮ সালে প্রেরিত এক পত্র লিখেন। পরশু রাতে খাবার সময় কোনো এক আত্মীয়ের কথা আলোচনা করেছিল। অতি সম্প্রতি তার মৃত্যু হয়েছে। কথার মাঝে ইকবাল বলে ওঠেন জানি না, বান্দা তার পালনকর্তা থেকে কখন দূরে সরে আছে। এউ ভাবনায় তার হৃদয় এই ভারাক্রান্ত হয়ে যায় যে, তিনি জ্ঞান হারিয়ে ফেলেন রাত এগারোটা বারোটা পর্যন্ত এই অবস্থা কেটে যায়। এ সবই হলো ও নীরব তত্ত্ব ,যা শুধু প্রাচ্যের পীরদের কাছে থেকেই শোনা যেতে পারে। ইউরোপের শিক্ষাঙ্গন গুলোতে এ সব কথার নিদর্শন পাওয়া যায় না। (ইকবাল নামা-৮, পৃ. ৬৭)

শেখ নূর মুহাম্মদের অন্তদৃষ্টি ও খুব প্রখর ছিল। যথা খালেদ নযীর ইকবালের পারিবারিক কিছু ঘটনা বর্ণনা প্রসঙ্গে বলেন, মিয়াজি আগত ঘটনা সম্পর্কে যদি কোনো কথা বলে ফেলতেন, তা পরে সত্যে পরিণত হয়ে যেত। ইকবালের লেখায় এ ধরনের কিছু ঘটনার ও উল্লেখ পাওয়া যায়। আকবর এলাহীবাদীর নামে ১৪ সেপ্টেম্বর ১৯১৮ সালে এক পত্রে তিনি কোলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও মুসলিম নেতাদের পক্ষ থেকে কোনো সভার প্রস্তুতির কথা লিখেন আমাকে ও উক্ত সভায় যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলো।

ইসমে আযম:

ইকবালের ভ্রাতৃষ্পুত্র শেখ এজাম আহম্মদ একবার দাদা নূর মুহাম্মদকে জিজ্ঞেস করলো ইকবালকে, ইসমে আযম শিখিয়েছো কি না? তিনি বলেন, যাদুমন্ত্রের মত কোনো ইসমে আযম আমার জানা নেই যে, পড়ার সাথে সাথেই অলৌকিকভাবে কিছু ঘটে যাবে। হ্যাঁ আল্লাহ পাকের কাছে কায়মন বাক্যে দুয়া কবুল হবার একটা উপায় স্বরণ রাখার যোগ্য। প্রত্যেক দুয়ার পূর্বে ও পরে রাসুলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ সালাম পাঠ। দুরূদের চেয়ে বড় আর কোন ইসমে আযম নেই। তোমার চাচা (ইকবাল) কে আমি এই ইসমে আযমই শিখিয়েছি। আল্লাহ পাকের গুণবাচক নাম সমুহের মধ্যে ইয়া হাইয়্যু, ইয়া কাইয়ূম। এগুলো বেশী বেশী পড়া উচিত (ইকবালকে আমি এই তাকীদই করেছি। (যিন্দা রোধ, পৃ. ২৩)

ইকবালের জীবনের প্রাথমিক পর্যায়ে দূরদৃষ্টি সম্পন্ন পিতার প্রশিক্ষণ দানের সাথে সম্পূর্ণ আলাদা ছিলেন। যারা খোদার প্রেমে বিভোর হয়ে নিজেকে ও নিজেদেরকে হারিয়ে দিয়ে কুরআন পাকের সাথে কোনো সম্পর্ক রাখে না। কুরআন তেলোয়াতে তার সব সময় বিশেষ আগ্রহ ছিল তিনি এতে গভীরভাবে মনোনিবেশ করতেন। ইকবালকে কৈশোরকালে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন তার উল্লেখ বিভিন্ন লেখক বর্ণনা করেছেন। ইকবালের সাথে অদ্যোপান্ত সম্পর্ক রেখেছেন সৈয়দ নযীর নিয়যী। ইকবালকে হুজুর তার রচিত গ্রন্থে ইকবারের যবানী লেখেন এভাবে:

হযরত আল্লামা এর পর বলেন আমি বলেছিলাম কুরআনে পাক অন্তরের রাস্তা দিয়েই বিবেকে প্রবেশ করে। এর সত্যতা এভাবে বোঝা যেতে পারে। আমি তখন কলেজের প্রথম দিকের ছাত্র। আমার অভ্যাস ছিলো

প্রত্যহ ফজর নামাজের পর কালামে পাক তেলওয়াত করা। এ সময় পিতা ও মসজিদ থেকে আসতেন এবং কুরআন তেলওয়াত দেখে নিজের কামরায় চলে যেতেন| একদিন পিতা অন্যান্য দিনের ন্যায় মসজিদ থেকে ফিরে আসেন। আমি তিলওয়াত করছিলাম। তিনি কি মনে করে আমার কাছে বসে পরেন। আমি তেলাওয়াত করতে করতে থেমে যাই| অপেক্ষা করি তিনি কি বলেন? জিজ্ঞেস করলেন তুমি কি পড়ছো, জেনে শুনে এবং দেখে ও এই প্রশ্ন করলেন| এতে আমি বেশ আশ্চার্যান্বিত হই| সবিনয় বললাম কুরআন তেলাওয়াত করছি | জিজ্ঞেস করলেন তুমি যা পড় তা তোমার বুঝে আসে? উত্তরে বলি জ্বি কিছু আরবী তো জানি| কিছু কিছু বুঝি। তিনি আমার কথা নিরবে শুনলেন এবং উঠে নিজ কামরায় চলে যান| আমি অবাক এ প্রশ্নের উদ্দেশ্য কি? কয়েক দিন অতিবাহিত হয়। আমি ও কথা ভুলে যাই। ও ঘটনার ষষ্ঠ দিন সকালে আমি যথারীতি কুরআন তিলাওয়াত করছিলাম। পিতা কাছে বসিয়ে অত্যন্ত নম্রভাবে বলতে থাকেন বাবা কুরআনে পাকের মর্ম সেই ব্যক্তিই উপলদ্ধি করতে পারে যার উপর অবতীর্ণ হয় তুমি কেন কুরআনের তিলাওয়াত এভাবে করনা, যেন তা তোমার উপরই তা অবতীর্ণ হচ্ছে | এমনটি করলে তবেই তা তোমার রন্ধে রন্ধে প্রবেশ করবে।

ভিক্ষুকের প্রতি আচরণ:

একদিন ইকবাল পড়ার ঘরে অধ্যয়ন করছেন। গভীর মনোযোগ সহকারে লেখাপড়া হচ্ছে। বাইরের জগতের সাথে কোন সম্পর্ক নেই। এমন সময় একজন ভিক্ষুক একেবারে বাড়ির ভেতরের গেইটে প্রবেশ করলো। এ গারীবকে যা পারেন সাহায্য করেন। মাগো... ক্ষিধের জ্বালায় আর বাঁচি না। এভাবেভিখারী ইকবালকে বিরক্ত করে তুললো। কানের উপর হাঁক ডাক আর কতো সহ্য করা যায়। একবার দুবার মাফ করার জন্য বললেন। কিন্তু সে নাছর বান্দা; কথায় মোটেও কান দেয় না। শুধু বলেই যাচ্ছে –মাগো... ! ইকবাল এবার চটে গেলেন। আস্তে করে এক টুকরা ইট হাতে নিয়ে সজোড়ে ভিক্ষুকের দিকে মারলেন। এতে ভিক্ষুক আঘাত পেয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। আর ভিক্ষার থলেটি মাটিতে পড়ে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেল। ভিক্ষুকের হাই-মাউ চিৎকার শুনে আন্দর মহল থেকে পিতা শেখ নুর মুহাম্মদ ছুটে এলেন। এসে দেখেন ভিক্ষুকের শোচনীয় অবস্থা | তিনি তাকে তুলে এনে ঘরে বসালেন। তারপর পড়ার ঘরে গিয়ে ইকবালকে বলরেন, কিয়ামতের দিন যখন রাসুলুল্লাহ (সা.) এর উম্মতগণ সমবেত হবেন, সেখানে গাযী, শহীদ, হক্কানী-সাধক, আবেদ, হাফেজ সবাই উপস্থিত থাকবেন। আর তখন এঁদের সামনে রাসুল (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করবেন-আমি একজন মুসলিম সন্তান তোমাকে দান করেছি, তাকে তুমি মানুষ করতে পারলে না| তখন আমি কি জবাব দিবো? ভিক্ষুকের সাথে তোমার এ ব্যবহার আমি অত্যন্ত মর্মাহত ও লজ্জিত| এসময় শেখ নুর মুহাম্মদের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়িয়ে পড়তে লাগলো। ইকবাল লজ্জায় মাথা নত করে রইলেন। অপরাধের জন্য গভীরভাবে অনুতপ্ত হলেন। অবশেষে শেখ নূর মুহাম্মদ ভিক্ষুককে যথাযথ ক্ষতিপূরণ দিয়ে বিদায় করলেন। সেদিন থেকে ইকবাল আর দ্বিতীয়বার এ ধরণের কোন অপরাধ করেননি। (সিদ্দিকী- ৯, পৃ. ৪২)

ইকবালের শৈশব-শিক্ষা পারিবারিক পরিমণ্ডলে ও পুরাতন রীতিতে মহল্লার মক্তবে শুরূ হয়| পাঁচ -ছয় বছর বয়সে পিতা নূর মুহাম্মদ তাঁকে নিজ মহল্লা শাওয়ালায় অবস্থিত মসজিদের মক্তবে ভর্তি করিয়ে দেন| মসজিদের খতিব মাওলানা আবু আব্দুল্লাহ গোলাম হাসানের তত্বাধানে এক বছরের মধ্যেই তিনি পবিত্র কুরআন পড়া সমাপ্ত করেন| কুরআন পাঠ সমাপ্তি উপলক্ষে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে উপস্থিত গণ্যমান্য ব্যক্তিদের মধ্যে সেদিন শামসুল উলামা সাইয়্যেদ মীর হাসান ও (১৮৪৪-১৯২৯) উপস্থিত ছিলেন| তিনি সহসাই ইকবালের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং স্বীয় পাঠশালায় তাঁকে ভর্তি করিয়ে দেয়ার জন্য শেখ নুর মুহাম্মাদের নিকট অনুরোধ করেন|

উল্লেখ্য, সাইয়্যেদ মীর হাসান ছিলেন উচ্চমার্গের ধার্মিক ও সুফি। তিনি ইকবালের মেধা ও বুদ্ধিমত্তায় অনুপ্রাণিত হয়ে নিজস্ব তত্ত্বাবধানে তাঁকে সম্ভাব্য সকল উপায় প্রায় তিন বছর (১৮৮৩-১৮৮৫খ্রি.) যাবৎ উর্দু, ফারসি ও আরবি শিক্ষাদান করেন। তিনি ইকবালকে তাঁর সন্তানের মতোই স্নেহ করতেন। তাই ইকবাল তাঁর এ শিক্ষকের প্রতি জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত কৃতজ্ঞ ছিলেন। সাইয়্যেদ হাসান ভারতীয় মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা প্রবর্তনে আগ্রহী ছিলেন। তাই তিনি নূর মুহাম্মদকে তাঁর উভয় পুত্র আতা মুহাম্মাদ ও ইকবালকে স্কচ মিষন স্কুলে (Scotch Mission school) ভর্তি করিয়ে দেয়ার পরামর্শ দেন। তাঁর পরামর্শক্রমে তিনি ইকবালকে ১৮৮৩ সালে স্কচ মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন। সাইয়্যেদ মীর হাসান নিজেও তখন উক্ত স্কুলের শিক্ষক ছিলেন। এটি ছিলো একটি ইংরেজি মাধ্যম স্কুল। প্রাথমিক স্তর থেকে এফ. এ (Final Arts) পর্যন্ত ইকবাল তাঁর এ সুযোগ শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শিক্ষা লাভ করেন।

ইকবাল সিয়ালকোটের স্কচ মিশন স্কুলে শিক্ষালাভ করে মিশন কলেজে প্রবেশ করেন। শায়খ নূর মুহাম্মদের উস্তাদবর্গের মধ্যে মীর হাসান নামে একজন বড় আলেম ছিলেন, যিনি মিশন স্কুলে আরবি শিক্ষা দিতেন। তাঁর শিক্ষাদানের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি যা বাতলাতেন, তা মনে অংকিত হয়ে যেতো। স্কুলে পড়ার সময়ই ইকবালের মেধার বিকাশ ঘটতে লাগলো। তিনি কবিতা রচনার প্রতি আকৃষ্ট হন। মাওলানা রুমীর কবিতা তাঁর খুবই ভাল লাগতো। ঐ সময় তিনি তাঁর কবিতা সংশোধনের জন্য হায়দারাবাদে অবস্থানরত কবি দাগ দেহলবীর নিকট পাঠাতে আরম্ভ করেন। দাগ কবিতা সংশোধন করে তা ডাকযোগে তাঁর নিকট সিয়ালকোটে পাঠিয়ে দিতেন এ্বং উৎসাহিত করতেন। (আব্দুল্লাহ-১০, পৃ. ১৩)

তিনি ১৮৮৮, ১৮৯১ও ১৮৯৩ সালে যথাক্রমে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও প্রবেশিকা (Matriculation) পরীক্ষায় কৃতিত্বের সাথে উত্তীর্ণ হন। ইকবাল যে তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারী ছিলেন প্রাইমারী স্কুলে থাকাকালীনই তার প্রমাণ মেলে। একদিন ইকবাল স্কুলে দেরিতে আসার কারণে তাঁর শিক্ষক তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজকে তোমার এতো দেরি হলো কেনো? তিনি উত্তরে বলেন: sir, Iqbal (glory)often comes late (স্যার ইকবাল (সৌভাগ্য) সবসময় বিলম্বেই আসে)। সেদিন ইকবালের এই বুদ্ধিমত্তায় শিক্ষক স্বভাবতই বিস্ময়াভিভূত হয়েছিলেন।

ইকবাল ১৮৯৫ সালে স্কচ মিশন কলেজ থেকে এফ, এ (Final Arts) পাশ করার পর উচ্চ শিক্ষা লাভের জন্য পাঞ্জাব প্রদেশের রাজধানী এবং তৎকালীন ভারতের অন্যতম শহর লাহোরে চলে আসেন। কেননা সে সময় শিয়ালকোটে উচ্চ শিক্ষা লাভের কোনো সুযোগ ছিলো না। তিনি লাহোর সরকারি কলেজ থেকে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দে বি.এ পাশ করেন। এ কলেজে তিনি আরবি এবং ইংরেজি সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে বিশেষ ঝোঁক থাকার কারণে একই বছর তিনি দর্শন বিভাগে এম এ. শ্রেণীতে ভর্তি হন।

এখানে উল্লেখ্য যে, ইকবাল সাইয়্যেদ মীর হাসানের সাহচর্যে এসে শৈশবেই ইসলামি ও সুফি ভাবধারা সম্পর্কে সম্যক জ্ঞানের অধিকারী হন। আর এর কারণ হলো সাইয়্যেদ মীর হাসান মুসলমানদের মাঝে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের পাশাপাশি সুফিতাত্ত্বিক জীবন ধারার আগ্রহী ছিলেন। তিনি একদিকে ছিলেন সুদক্ষ শিক্ষক অন্য দিকে ছিলেন একজন বড় মাপের পণ্ডিত। ইকবালের জীবন তাঁর প্রভাব অনস্বীকার্য। তাঁর ব্যক্তিত্ব, পাণ্ডিত্য ও চারিত্রিক গুণাবলি ইকবালকে মোহাবিষ্ট করেছিলো যার ফলে তাঁর সংস্পর্শে এসে ইকবালের মানসিক বিবর্তন ঘটে এবং তিনি একজন প্রকৃত মানুষ ও নিখাদ মুসলমানে পরিণত হন। ইকবাল তাঁর এ শিক্ষাগুরুকে কখনো ভুলে যাননি। তাই তিনি ইংল্যান্ডে যাবার প্রাক্কালে সশ্রদ্ধচিত্তে তাঁর এ শিক্ষকের স্মৃতিচারণ করেছিলেন এভাবে:

وہ شمع بارگہ خاندان مرتضوی
رہے گا مثل حرم جس کا آستاں مجھ کو
نفس سے جس کے کھلی میری آرزو کی کلی
بنایا جس کی مروت نے نکتہ دان مجھ کو

তিনি তো খান্দানে আলী মুর্তাযার আলোর প্রদীপ,
আমার কাছে যাঁর আস্তানা হানামের (কাবা) ন্যায় পবিত্র।
যাঁর নিঃশ্বাসে আমার আকাঙক্ষার কলি প্রস্ফুটিত হয়েছে,
যাঁর মাধুর্যে ভদ্রতায় আমি হয়েছি সূক্ষ্মদর্শী।
আসমান ও যমিনের অধিপতি খোদার কাছে প্রার্থনা আমার,
পুনরায় তাঁর দর্শন লাভে আমায় যেন করেন আনন্দিত। (ইকবাল- ১১, পৃ. ১২৩)

স্মর্তব্য যে, পরবর্তী সময়ে ব্রিটিশ সরকার যখন ইকবালকে দর্শন ও সাহিত্যে অসাধারণ অবদানের জন্য স্যার উপাধি প্রদানের প্রস্তাব করে, তখন তিনি এতে অনীহা প্রকাশ করেন এবং বিষয়টি এড়িয়ে যাবার জন্য তাঁর শিক্ষক সাইয়্যেদ মীর হাসানের কৃতিত্বের প্রতি স্বীকৃতি দানের বিষয়টি ও এ স্যার উপাধীর সাথে শর্ত হিসাবে জুড়ে দেন। অর্থাৎ যদি সাইয়্যেদ মীর হাসানকে শিক্ষা ক্ষেত্রে তাঁর দীর্ঘকালের অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ শামসুল উলামা উপাধি দেয়া না হয় তবে তিনি উক্ত প্রস্তাবিত স্যার উপাধি প্রত্যাখ্যান করবেন বলে অবিভক্ত পাঞ্জাবের ইংরেজ শাসনকর্তাকে জানিয়ে দেন। এ প্রসঙ্গে গভর্নর ইকবালকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, সাইয়্যেদ মীর হাসানের প্রকাশিত কোনো গ্রন্থ আছে কিনা। এর উত্তরে ইকবাল বলেছিলেন: হ্যাঁ আমি স্বয়ং তাঁর জীবন্ত গ্রন্থ'। অতঃপর মীর হাসানকে উক্ত উপাধিতে ভূষিত করার পর ইকবাল স্যার উপাধি গ্রহণ করেন। (শহীদুল্লাহ -১২, পৃ. ৮৫)

থমাস আরনল্ডের (মৃত্যু) ১৯৩০ খ্রি.) সংস্পর্শে ইকবাল:

এম এ. শ্রেণিতে অধ্যয়নকালে ইকবাল দর্শনশাস্ত্রের বড় মাপের পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ অধ্যাপক থমাস উইলিয়াম আরনল্ডের (Thomas w. Arnold) সংস্পর্শে আসেন। তাঁর সান্নিধ্য লাভের ফলে ইকবালের জীবনের মোড় ঘুরে যায়। অধ্যাপক আরনল্ড ইত:পূর্বে আলীগড় কলেজেও অধ্যাপনা করেছিলেন। ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি লাহোর সরকারি কলেজে যোগদান করেন। দর্শন ছাড়াও তিনি ইসলামি জ্ঞান-বিজ্ঞানে যথেষ্ট পারদর্শী ছিলেন। ইকবালের এ শিক্ষক নানাভাবে তাঁর ওপর প্রভাব বিস্তার করেছিলেন। ইকবালের মেধা, বুদ্ধিমত্তা ও ব্যক্তিত্ব অধ্যাপক আরনল্ড বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। আর ইকবাল তাঁর সাহচর্যে থেকে পাশ্চাত্যের চিন্তাধারা সম্পর্কে রগভীর জ্ঞান লাভ করেন এবং পাশ্চাত্য চিন্তাধারায় কল্যাণকর যা কিছু রয়েছে তা অর্জন করতে সক্ষম হন। এক কথায় তাঁদের মধ্যে সাহিত্য ও চিন্তার ক্ষেত্রে একটি সমন্বয় গড়ে ওঠে। (নাদাভী -১৩, পৃ, ০৯)

সাইয়্যেদ মীর হাসানের ন্যায় ইকবাল আরনল্ডেরো অত্যন্ত ভক্ত ছিলেন।

১৯০৪ খ্রিস্টাব্দে প্রফেসর আরনল্ড যখন অবসর গ্রহণ করে লাহোর ত্যাগ করেন ইকবাল তখন মানসিকভাবে মুষড়ে পড়েন এবং তাঁর বিদায় উপলক্ষে নালায়ে ফেরাক (বিচ্ছেদের আর্তনাদ) শীর্ষক একটি কবিতা রচনা করেন। যে কবিতায় আরনল্ডের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় সম্মান ও ভালোবাসার প্রতিফলন ঘটে। কবিতাটির আংশ বিশেষ নিচে তুলে ধরা হলো:

تو کہاں ہے اے کلیم ذرو سینائے علم
تھی تری موج نفس باد نشاط افزائے علم
اب کہاں وہ شوق رہ پیمائی صحرائے علم
تیرے دم سے تھا ہمارے سر میں بھی سودائے علم
کھول دے گا دشت وحشت عقدہ تقدیر کو
توڑ کر پہنچوں گا میں پنجاب کی زنجیر کو
دیکھتا ہے دیدہ حیراں تری تصویر کو
کیا تسلی ہو مگر گرویدہ تقریر کو

তুমি কোথায় হে হঝানের সীনাই চূড়ার মুসা কলীম,
তোমার বিশ্বাস তরঙ্গে ছিলো জ্ঞান-বুদ্ধির আনন্দ সমীরণ।
এখন কোথায় সে জ্ঞানের মরূভূমিতে পথ চলার আগ্রহ-উদ্দীপনা,
আর তোমার প্রশ্বাস থেকেই আমার মাঝে জ্ঞানের মত্ততা।
খুলে দেবে ভীতপ্রদ উন্মত্ত ময়দান অদৃষ্টের বাঁধনকে,
আমি পাঞ্জাবের বেষ্টনী (জিঞ্জির ছিন্ন করে পৌঁছে যাব (তোমার কাছে)
আমার ক্লান্ত দৃষ্টি তোমার বক্তব্য শোনার আগ্রহ কী ছবিতে মিটতে পারে?

(ইবকাল — ১১, পৃ. ১০৫)

ইকবাল ১৮৯৯ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় থেকে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পাশ করেন। পরীক্ষায় কৃতিত্বের কারণে তিনি স্বর্ণপদক লাভ করেন। উল্লেখ্য, এ সময় প্রফেসর আরনল্ড লাহোর গর্ভনমেন্ট কলেজ ত্যাগ করে লাহোরের অরিয়েন্টাল কলেজের অস্থায়ী অধ্যক্ষ হিসাবে যোগদান করেন।

লাহোরে ছাত্র থাকাকালীনই ইকবাল কাব্যচর্চা করতেন। এ সময় লাহোরে খ্যাতনামা কবিদের কবিতা পাঠের যেসব আসর হতো ইকবাল ও সেসব অংশগ্রহণ করতেন। ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে ইকবালের সহপাঠীরা তাঁকে এমনি একশ কবিতা সন্ধ্যায় জোর করে নিয়ে যান। ইকবাল যেহেতু নতুন ছিলেন তাই তিনিই প্রথম তাঁর স্বরচিত গজলটি পরিবেশন করেন। গজলটি শুনে উপস্থিত শীর্ষস্থানীয় কবি মির্যা আরশাদ গোরগানী তাঁর ভূয়সী প্রশংসা করে বলে উঠলেন, কী চমৎকার গযল! এ বয়সে এই শের।' গজলটি একটি চরণ এরূপ:(তারিক-৫৩,পৃ.২১)

موتی سمجھ کے شان کریمی نے چن لئے قطرے جو تھے مرے عرق انفعال کے

মুক্তা মনে করে দয়াময় নিজ করূণায় তুলে নিলেন
পানির ফোঁটাগুলো, যে ছিলো আমার প্রচেষ্টার ঘর্মবিন্দু। (হায়াত-১৩, পৃ. ১১)

শায়খ নূর মুহম্মদ তারঁ সন্তানদের উর্দু, ফারসি ও ইংরেজী শিক্ষা দেন। মুহাম্মদ আতা নিজ ছোট ভাই মুহম্মদ ইকবালের চেয়ে চৌদ্দ বছরের বড় ছিলেন, যিনি প্রকৌশলী পদে প্রতিষ্ঠিত হন।

ইকবাল সিয়াল কোটের মিশন স্কুলে শিক্ষালাভ করে মিশন কলেজে প্রবেশ করেন। শায়খ নূর মুহাম্মদের উস্তাদবর্গের মধ্যে মৌলবী মীর হাসান নামে একজন বড় আলেম ছিলেন, যিনি স্কুলে আরবী শিক্ষা দিতেন। তার শিক্ষাদানের এক বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল এই যে, তিনি যা বাতলাতেন, তা মনে অংকিত হয়ে যেতো। স্কুলে পড়ার সময়ই ইকবালের মেধার বিকাশ ঘটাতে লাগলেন। তিনি কবিতা রচনায় আকৃষ্ট হন। মাওলানা রুমীর কবিতা তাঁর খুবই ভাল লাগতো। ঐ সময় তিনি তাঁর কবিতা সংশোধনের জন্য হায়দরাবাদে অবস্থানরত কবি দ্যাগ দেহলবীর নিকট পাঠাতে আরম্ভ করেন। দ্যাগ কবিতা সংশোধন করে তা ডাকযোগে তাঁর নিকট সিয়ালকোটে পাঠিয়ে দিতেন এবং তাকে উৎসাহিত করতেন।

প্রাইমারী, মিডল ও এন্ট্রান্স পরীক্ষায় ইকবাল উত্তীর্ণ হন এবং বৃত্তিও লাভ করেন। সিয়ালকোটে কলেজ খোলা হলে তিনি ঐ প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হন। উক্ত মৌলভী মীর হাসান তাতে আরবী ও ফারসি শিক্ষা দিতেন। ইকবাল পরিশ্রম করে আরবী ও ফারসি বিশেষ যোগ্যতা অর্জন করেন। সিয়ালকোটে এফ. এ, (ফাইনাল আর্টস) পরীক্ষা পাস করে তিনি উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে লাহোর গমন করেন এবং গভর্নমেন্ট কলেজে ভর্তি হন। ঐ কলেজে আরনল্ড নামে একজন সুযোগ্য ও সহানুভূতিশীল অধ্যাপক ছিলেন, যিনি ইকবালকে খুবই ভাল বাসতেন এবং তার প্রতি সদয় ব্যবহার করতেন।

এ সময় লাহোরে কবি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হতো, যাতে তদানীন্তন সময়ের খ্যাতমান কবিগণ তাঁদের কবিতা শোনাতেন। ইকবালও ঐসব আসরে যেতেন এবং স্বরচিত কবিতা শোনাতেন। ধীরে ধীরে সকলের দৃষ্টি তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হতে লাগলো। তেইশ বছর বয়সে তিনি লাহোরের এক কবি সম্মেলনে একটি গযল আবৃত্তি করেছিলেন। সেখানে তৎকালীন শীর্ষস্থানীয় কবি আরশাদ গোরগানীও ছিলেন। তিনি ইকবালের কবিতায় মুগ্ধ হন। বললেন: 'সুবহানাল্লাহ! এমন বয়সে এই শের!

'ইকবাল বি. এ. পাস করলেন। আরবি ও ইংরেজিতে প্রথম স্থান অধিকার করায় দু'টি পদক পেলেন। অতঃপর কৃতিত্বের সাথে এম. এ. পাশ করেন এবং একটি স্বর্ণপদক লাভ করেন। তিনি প্রথমে লাহোরে ওরিয়েন্টাল কলেজ ও পরে গভর্নমেন্ট কলেজে দর্শনের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। সে সময় তিনি কলেজে অধ্যায়ন করতেন, তখনই তাঁর কৃতিত্বের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৯৯ সালে তিনি 'আনজুমানে হিমায়েতে ইসলাম'এর জলসায় 'নালায়ে ইয়াতীম' (এতিমের ক্রন্দন) শীর্ষক একটি বেদনাদায়ক কবিতা আবৃত্তি করেন। এতে শ্রোতাবর্গের মন বিগলিত হয় এবং তাদের চোখ অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠে। অতঃপর তিনি 'হিমালাহ' 'হিন্দুস্থান হামারা' (ভারত আমাদের ইত্যাদি জাতীয় কবিতা লিখেন, যা পুরো উপমহাদেশে সমাদৃত হয়। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৬)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল এর শিক্ষকতা জীবন:

এম.এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হোয়ার অব্যবহিত পরে তথা ১৮৯৯ সালের ১৩ মে প্রফেসর আরনল্ডের সহায়তায় ইকবাল অরিয়েন্টাল কলেজে আরবি সাহিত্যের ম্যাকলিয়ড-পাঞ্জাব রীডার পদে মাসিক ৭২ টাকা ১৪ আনা বেতনে নিযুক্ত হন তিনি ১৯০৩ সালের ১২মে পর্যন্ত এ পদে বহাল ছিলেন। এ সময়ের মধ্যে তিনি লাহোর সরকারি কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক হিসাবে অতঃপর একই কলেজের দর্শন বিভাগের অধ্যাপক পদেও দায়িত্ব পালন করেন। ১৯০৫ সালে উচ্চ শিক্ষার জন্য ইউরোপে যাবার পূর্ব পর্যন্ত এ কলেজেরই অধ্যাপনা করেছিলেন ইকবাল। অরিয়েন্টাল কলেজে তিনি আরবি সাহিত্য ছাড়াও ইতিহাস ও অর্থনীতি বিষয়ে পাঠ দান করতেন। তিনি কিছুদিনের জন্য লাহোর ইসলামিয়া কলেজে ইংরেজি সাহিত্যের অধ্যাপক হিসাবেও কাজ করেন। (খুরশিদ-১৪, পৃ. ১১৯)

পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, যে সময় তিনি কলেজে অধ্যয়ন করতেন তখন থেকেই তাঁর কাব্য-প্রতিভার বিকাশ ঘটে । ১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দে তিনি আন্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম এর সদস্য হন। ইত:পূর্বে এ সংগঠনের এক অধিবেশনে নালায়ে ইয়াতিম (অনাথের ফরিয়াদ) শীর্ষক একটি বেদনাবিদুর কবিতা আবৃত্তি করেন। এবং কবিতা শুনে শ্রোতারা অশ্রুসিক্ত হয়ে উঠেন। এরপর তিনি হিমালাহ (হিমালয়), হিন্দুস্তান হামারা (ভারত আমাদের ইত্যাদি কবিতা লিখে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেন।

উল্লেখ্য যে, প্রফেসর আরনল্ড ১৯০৪ সালে ইংল্যাণ্ডে চলে যান: কিন্তু তিনি ইকবালের মধ্যে জ্ঞানার্জনের এমন এক উৎসাহ ও উদ্দীপনা সৃষ্টি করে যান, যার ফলে তাঁর চলে যাবার পরের বছরই তিনি ইংলান্ডের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন।

ইউরোপ যাবার পূর্বে ইকবাল ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ তথা অখণ্ড জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন এবং তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় উপমহাদেশের হিন্দু মুসলমানকে ঐক্যবদ্ধ করার স্বপ্ন দেখতেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজেই বলেন:

ابتدا میں بھی قومیت پر اعتقاد رکھتا تھا اور ہندوستان کی متحدہ قومیت کا خواب شاید سب سے پہلے میں نے دیکھا تھا- لیکن تجربے خیالات کی وسعت نے میرے خیال میں تبدیلی کر دی اور اب قومیت میرے نزدیک محض ایک عارضی نظام ہے

> প্রথম আমি জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলাম এবং ভারতবর্ষে আমিই অখণ্ড জাতীয়তাবাদের স্বপ্ন দেখেছিলাম, কিন্তু অভিজ্ঞতা ও চিন্তার প্রসারতা আমার ধারণায় একটি পরিবর্তন এনে দিলো। এখন জাতীয়তাবাদ আমার নিকট নিছক কৃত্রিম ও আপেক্ষিক ব্যবস্থা বলে মনে হয়। (খুরশিদ-১৪, পৃ. ১৫১)

ইকবাল এ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে ১৯০৪ থেকে খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত সময়ে হিন্দুস্থান হামারা (আমাদের ভারতবর্ষ), তাসবীয়ে দার্দ (দুখের চিত্র), সেদায়ে দার্দ (ব্যথার ধ্বনি), তারানায়ে হিন্দী (ভারতের জাতীয় সংগীত), হিন্দুস্তানী বাচ্চুকা কাউমী গীত (ভারতীয় শিশুদের জাতীয় সংগীত) ও নয়া শেওয়ালা (নতুন শিবালয়) প্রভৃতি কবিতা রচনা করেন যা মাখযান নামক পত্রিকা প্রকাশিত হয়। অবশ্য ইউরোপ গমনের পর তাঁর এ মানসিকতার

Dhaka University Institutional Repository

পরিবর্তন ঘটে, যা আমরা যথাস্থানে আলোচনা করবো। নিচে তাঁর স্বদেশী জাতীয়তাবাদের ওপর রচিত একটি কবিতা তুলে ধরা হলো।

سونی پڑی ہوئی ہے مدت سے دل کی بستی
آ ایک، نیا شوالہ اس دیس میں بنا دیں
دنیا کے تیرتھوں سے اونچا ہو اپنا تیرتھ
دامان آسماں سے اس کا کلس ملا دیں

বহুকাল ধরে শূন্য পড়ে আছে এ হৃদয়-বসতি
ওহে এসো, নতুন এক মন্দির এ দেশে স্থাপন করি।
পৃথিবীর তীর্থগুলোর চেয়ে মর্যাদাসম্পন্ন হোক আপন তীর্থভূমি,
আকাশের আঁচলের সাথে তার চূড়াকে মিলিয়ে। (চিশতি- ১৫, পৃ. ২১২)

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে বৃটেন গমন:

বৃটেন পৌঁছে ইকবাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে (Cambridge University) এখানে অধ্যয়নকালে তিনি প্রখ্যাত দার্শনিক ডক্টর জন ম্যাকটেগার্ট (Dr. John Mc Taggart (1866-1925) ফারসি সাহিত্যের পণ্ডিত ও প্রাচ্যবিদ প্রফেসর ই.জি.ব্রাউন (Edward G BROWNE)) ১৮৬২-১৯২৬) ডক্টর নিকলসন (Reynold Alleyne Nicholson) ১৮৬৮-১৯৪৫ খ্রি.) প্রফেসর উইলিয়াম জেমস (১৮৪২-১৯১০ খ্রি.) (Wiliam James) প্রমুখের সংস্পর্শে আসেন এবং তাঁদের নিকট নানাবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ করেন। প্রফেসর নিকলসন ইকবালের তীক্ষ্ণ মেধা ও পাণ্ডিত্যে বিশেষভাবে অনুপ্রাণিত হন। সে অনুপ্রেরণার রেশ ধরেই তিনি ইকবালের আসরারে খুদী কাব্যগ্রন্থের ইংরেজি অনুবাদের মধ্য দিয়ে তাঁকে ইউরোপীয় চিন্তাবিদদের কাছে পরিচিত করে তোলেন।

ইকবাল ১৯০৭ সালের কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটির ট্রিনিটি কলেজ থেকে স্নাতক ডিগ্রী লাভ করেন। এ কলেজটি ইংল্যান্ডের রাজা অষ্টম হেনরী ১৩৫০ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। উল্লেখ্য যে, নিউটন, বায়েরন,ফিটজারাল্ড প্রমুখ মনীষী এ কলেজেই অধ্যয়ন করেছেন। ইকবাল ১৯০৮ খ্রিষ্টাব্দে লিঙ্কন ইন (Lincon's Inn)-এর সদস্য হন এবং এর বার এট ল ডিগ্রী লাভ করেন। ইকবাল ১৯০৫- ১৯০৭ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে দর্শনে ডক্টরেট ডিগ্রী লাভের জন্য জার্মানিতে গমন করেন। জার্মানিতে যাওয়ার কারণ হলো সে সময় ব্রিটিশ বিশ্ববিদ্যালয়ে দর্শনে মাস্টার ডিগ্রীর উর্ধ্বে অন্য কোনো ডিগ্রী অর্জনের সুযোগ ছিলো না। অতএব, ইকবাল (Development of Metaphysics in Persia (পারস্যে অতীন্দ্রিয়দ্যালয়ে উপাস্থাপন করেন। ১৯০৭ সালের ৪ নভেম্বর পি এইচ-ডি ডিগ্রীর জন্য তাঁর মৌখিক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় এবং তাঁকে পিএইচ-ডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়।

জার্মান থেকে লন্ডন ফিরে আসার পর ইকবাল লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন school of oriental studies- এ যোগদান করেন| ডক্টর আরনল্ড ছয় মাসের ছুটি নিয়ে মিশর চলে গেলে তদস্থলে ইকবাল ছয় মাস আরবি ভাষা ও সাহিত্যে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন| দীর্ঘ তিন বছর ইউরোপে অবস্থান করার পর তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন| (নূরূদ্দীন- ৩, পৃ. ৬৮, ৮৪)

জ্ঞান-বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার বিকাশের জন্য বিলাতে থাকাকালীন তিনটি বছর ছিল ইকবালের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ| সেখানকার জীবন ও সমাজ ব্যবস্থাকে অত্যন্ত কাছে পর্যবেক্ষণ করার ফলে তার মাঝে মানসিক বিবর্তন সূচিত হয়। এর পূর্বে তিনি যে দু'টি মৌলিক বিষয় তথা ভৌগলিক বা স্বদেশী জাতীয়তাবাদ ও ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ মতবাদকে (সর্বেশ্বরবাদ) সমর্থন করতেন তা থেকে দূরে সরে আসেন এবং দেশ, বর্ণ ও বংশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করেন। পরবর্তীতে তিনি তাওহীদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচার আরম্ভ করেন এবং তিনি মনে করেন,জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হওয়া উচিত ধর্মীয় বিশ্বাসের ওপর| কেননা বিশ্বের সকল মুসলমান ভাই ভাই।

نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا

Dhaka University Institutional Repository

بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے

সারা বিশ্ব থেকে ভিন্নতর করেছেন এ মিল্লাতের ভিত্তিকে আরবের স্থপতি;

দেশ নয় আমাদের মিল্লাত-কেল্লার ভিত্তি। (ইকবাল -১১, পৃ. ১৬২)

ইকবাল জ্ঞানার্জনের সঙ্গে সঙ্গে ইউরোপের সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ ও বর্ণবাদের ওপর ভিত্তিশীল রাজনৈতিক চিন্তাধারা সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিবহাল হন এবং এ ব্যাপারে তীব্র ঘৃণা ও অসন্তোষ প্রকাশ করেন - যা তাঁর বিভিন্ন রচনা ও কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে। তার মতে ইউরোপে রাজনৈতিক গোলযোগের মূল কারণ হচ্ছে এসব সংকীর্ণ মতাদর্শ।

قلب ما از هند روم و شام نیست
مرزو بوم او بجز اسلام نیست
مسلم استی دل با قلیمی مند
گم مشو اندر جهان چوں و چند
دل بد ست آورکه پنهائی دل
من شود گم این سرائی آت گل
ازر سالت در جهان تکویں ما
ازرسالت دین ما ایمان ما

সিরিয়া, তুরস্ক বা ভারতের সাথে
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়
জন্মভূমি তার আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া
আবদ্ধ করো না তোমার অন্তর
কোন দেশের বন্ধনে,
হারিয়ে ফেলো না তোমার আপনাকে
বিরোধের বিশ্বে
জয় কর অন্তর,
কারণ তার বিপুল প্রসারের মাঝে
আত্মবিলুপ্ত হতে পারে
জল ও কর্দমের সমগ্র পান্থ নিবাস।
নবুয়তের ভিত্তিতে কায়েম হয়েছে
আমার অস্তিত্ব দুনিয়ার বুকে,
নবুয়তের ভিতরেই নিহিত রয়েছে
আমার দ্বীন ও ঈমান। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৭৬)

ইংল্যান্ডে অবস্থানের শেষের দিকে ইকবাল ভীষণভাবে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। এ সময় লন্ডনে তাঁকে ইসলাম সম্পর্কিত ৬টি বক্তৃতা উপস্থাপন করতে হয়েছিলো। তিনি ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রয়ারি মাসে লন্ডনের প্যানইসলামিক সোসাইটির উদ্যোগে ক্যাকস্টন হলে (Caxton Hall) আয়োজিত সেমিনারে প্রথম বক্তব্য প্রদান করেন- যার বিষয়বস্তু ছিলো ইসলামের কয়েকটি দিক। এটিই ছিলো ইকবালের প্রথম বক্তৃতা (Maiden Speech)।

Dhaka University Institutional Repository

এরপর এ মাসের তৃতীয় সপ্তাহে তিনি ইসলামি তাসাউফ বিষয়ে দ্বিতীয় বক্তৃতা প্রদান করেন। তাঁর অন্যান্য বক্তৃতার বিষয় বস্তু ছিলো আধুনিক সভ্যতার ওপর মুসলমানদের প্রভাব, ইসলামি গণতন্ত্র, ইসলাম ও মানুষের প্রজ্ঞা প্রভৃতি। প্রথম বক্তৃতার পরের দিনই লন্ডনের বিভিন্ন সংবাদপত্রে তার বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয়েছিলো। এ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, সুদূর প্রবাসে থেকেও ইকবাল তাঁর অনন্য প্রতিভার স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন।

কাব্যচর্চায় ইকবাল:

কবিতায় ও দর্শনেই ইকবালের কতৃত্ব নিহিত। এজন্যেই তাঁকে বিশ্বের মহান কবি ও দার্শনিকদের অন্যতম বলা হয়ে থাকে। ছাত্র জীবন থেকেই তাঁর কবিতা চর্চা শুরু হয়। বলা যায় যে, তিনি তার প্রিয় শিক্ষক শামসূল উলামা সাইয়্যেদ মীর হাসানের প্রভাবেই কাব্যচর্চায় অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন। প্রথমত ইকবাল তাঁর রচিত কবিতাসমূহ প্রসিদ্ধ উর্দু কবি নবাব মীর্জা দ্যাগ দেহলভীর নিকট সংশোধনের জন্য ডাকযোগে প্রেরণ করতেন। তাঁর পাঠ করে দ্যাগ অত্যন্ত আনন্দিত হন এবং কিছুদিন পর তিনি এ মর্মে ইকবালকে চিঠি লিখেন যে,তাঁর কবিতা সংশোধনের প্রয়োজন নেই। কবি দাগের জীবদ্দশ্যয়ই ইকবালের খ্যাতি সমগ্র ভারতবর্ষে ছড়িয়ে পড়ে। (রেযা- ১৬, পৃ. ৩৫) কবি দ্যাগের মৃত্যুতে ইকবাল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে যে মার্সিয়া রচনা করেন তার একাংশ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

چل بسا داغ آہ! میت اس کی زیب دوش ہے
آخری شاعر جہان آباد کا خاموش ہے
اب صبا سے کون پوچھے گا سکوت گل کا راز
کون سمجھے گا چمیں نالہ بلبل کا راز

দাগ চলে গেলো আর মৃতদেহ শোভা পাচ্ছিল শবাধারবাহীদের কাঁধে,
জাহানাবাদের সর্বশেষ কবি নীরব নিস্তব্ধ হয়ে পড়ে আছে।
আজ প্রত্যুষকে কে জিজ্ঞাস করবে পুস্পের নীরবতার কারণ,
আর কেইবা বুঝবে বাগানে বুলবুলের ক্রন্দনের রহস্য ? (বা- কামাল-১৭, পৃ. ৪০)

মাখযান পত্রিকার সম্পাদক ব্যারিস্টার আব্দুল কাদেরের মতে ইকবালের কার্ব চর্চা এর সূচনা ঘটে ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের কয়েক বছর পূর্বে। তিনি তখন লাহোরে মুশায়ারাগুলোতে অংশগ্রহণ করতেন এবং গজল পরিবেশন করতেন। লাহোরে আগমনের পর ইকবাল এই মাখযান সম্পদকের সাথে ঘনিষ্টতা লাভ করেন এবং ১৯০১ সালের এপ্রিল মাসে তার কুহে হিমালা শীর্ষক কবিতাটি মাখযান পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। তবে এর পূর্বে ও ইকবাল লাহোরের আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক অধিবেশন গুলোতে (নালায়ে ইয়াতীম) ইয়াতীমের ফরিয়াদ ও শিক্ওয়া ও জাওয়াবে শিক্ওয়া (অভিযোগ ও অভিযোগের প্রতি উত্তর) শীর্ষক কবিতা ধারাবাহিকভাবে আবৃতি করে খ্যাতি অর্জন করেন।

ইকবালের অন্তরঙ্গ বন্ধু ব্যারিস্টার শেখ আব্দুল কাদের বাঙ্গে দারা গ্রন্থের ভূমিকা ইকবালের কাব্যচর্চাকে মোটামুটি তিনটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। আর এ কাব্যধারা থেকেই ইকবালের মানসিক বিবর্তনের চিত্র ফুটে ওঠে। প্রথম পর্যায় হিসেবে ধরা হয় কাব্যচর্চার সূচনাকাল থেকে ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দে পর্যন্ত সময়কালকে । দ্বিতীয় পর্যায়

হিসেবে ধরা হয় ইউরোপ থাকাকালীন সময়কে অর্থাৎ ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ সময়কালকে। আর তৃতীয় পর্যায় হিসাবে ধরা হয় ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে বাংগে দারা প্রকাশ হওয়া পর্যন্ত সময়কালকে তথা ১৯২৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত। তবে যুগ বিভক্তি থেকে এটা পরিস্কার বুঝা যায় যে, এ সময়টা কেবল তাঁর দ্বিতীয় উর্দু কাব্যগ্রন্থ বালে জিব্রীল প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত হিসাব করা হয়েছে। এ উর্দু কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হবার পর তাঁর কাব্য রচনার ক্ষেত্রে যে বিবর্তনধারা সূচিত হয় তা নিয়ে নতুন করে আলোচনার অবকাশ রয়েছে। শেখ আব্দুল কাদের সর্বপ্রথম ইকবালের কাব্যচর্চার বিবর্তনধারাকে তিনটি ভাগে ভাগ করেছিলেন। পরবর্তীতে এ মতটি সর্বমহলে গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। শেখ আব্দুল কাদেরের বক্তব্য ছিলো এইরূপ:

میں نے زبردستی وہ نظم ان سے لے لی اور ''مخزن'' کی پہلی جلد کے پہلے نمبر میں جو اپریل ۱۹۰۱ میں نکلا شائع کر دی یہاں سے گویا اقبال کی اردو شاعری کا پبلک طور پر آغاز ہوا اور ۱۹۰۵ تک جب وہ ولایت گئے یہ سلسلہ جاری رہا – اس عرصے میں وہ عموماً مخزن کے ہر نمبر کے لئے کوئی نظم لکھتے اول جو نظمیں جلسہ عام میں پڑھی جاتی تھیں تحت اللفظ پڑھی جاتی تھیں اور اس طرز میں بھی ایک لطف تھا۔

۱۹۰۵ء سے ۱۹۰۸ء تک اقبال کی شاعری کا ایک دوسرا دور شروع ہوا۔ یہ وہ زمانہ ہے جو انہوں نے یورپ میں بسر کیا۔ گو وہاں انہیں لیے بہت کم وقت ملا اور ان نظموں کی تعداد جو وہاں کے قیام میں لکھی گئیں تھوڑی ہے مگر ان میں ایک خاص رنگ وہاں کے مشاہدات کا نظر آتا ہے اس کے بعد ولایت سے واپس آنے پر گو کبھی کبھی اردو کی نظمیں بھی کہتے تھے مگر طبیعت کا رخ فارسی کی طرف ہو گیا۔ یہ ان کی شاعری کا تیسرا دور ہے جو ۱۹۰۸ء کے بعد شروع ہوا۔

আমি অনেকটা জোরপূর্বক সে কবিতা (হিমালা) তাঁর (ইকবাল) কাছ থেকে নিয়ে তা মাখযান পত্রিকার এপ্রিল, ১৯০১ খ্রিস্টাব্দের প্রথম সংখ্যায় প্রকাশ করি। বলা হয়ে থাকে যে, এ সময় থেকেই জনগণের কাছে ইকবালের উর্দু কাব্য প্রতিভার সূচনা ঘটে এবং তা ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তথা তাঁর বিলাত গমন পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। এ সময় তিনি সাধারণ ‘মাখযান’ এর প্রতিটি সংখ্যার জন্য কোনো না কোনো কবিতা লিখতেন। প্রথমদিকে তিনি যে কবিতাগুলো সাধারণ সভা সমিতিতে পাঠ করে শোনাতেন তা তিনি শাব্দিকভাবেই পড়ে শোনাতেন এবং এর ভঙ্গিমাতে ও এক ধরনের মাধুর্য বিদ্যমান ছিলো। ১৯০৫ থেকে ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে পর্যন্ত ইকবালের কাব্য প্রতিভার দ্বিতীয় আর একটি যুগের সূচনা ঘটে। এটা সে সময়ের কথা যখন তিনি কাব্যচর্চার জন্য খুবই কম সময় পেয়েছিলেন। সেখানে অবস্থানকালীন যে কবিতাগুলো তিনি রচনা করেছিলেন তা সংখ্যার দিক দিয়ে নগণ্য হলে ও তাতে সেখানকার বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য প্রতিভাত হয়ে ওঠে।

উল্লেখ্য যে, বিলাত থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি কখনো কখনো উর্দু ভাষায় কবিতা ও লিখতেন, কিন্তু তাঁর প্রকৃতি ফারসিতে কাব্য চর্চার দিকেই ঝুঁকে ছিলো। এটা তাঁর কাব্য প্রতিভার তৃতীয় যুগ যা ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে শুরু হয়।

Dhaka University Institutional Repository

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, মাখযানে তাঁর কবিতা প্রকাশিত হওয়ার পর তিনি যেমন খ্যাতি অর্জন করেন তেমনি কাব্যপ্রেমিকদের বিশেষ দৃষ্টি ও আকর্ষণ করতে সক্ষম হন। ইকবালের এ কাব্যধারা ১৯০৫ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত অব্যাহত থাকে এবং তিনি মাখযান পত্রিকার প্রতিটি ইস্যুর জন্য কোনো না কোনো কবিতা রচনা করতেন। ফলশ্রুতিতে ইকবালের কাব্য প্রতিভা সম্পর্কে ক্রমান্বয়ে মানুষ জানতে থাকে এবং এভাবেই তিনি সমগ্র উপমহাদেশে সুপরিচিত হয়ে ওঠেন।

ইউরোপ যাবার পূর্বে ইকবালের কাব্য প্রতিভার বিকাশ কেবল ভারতীয় উপমহাদেশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিলো। আর এজন্য তখনকার কবিতাসমূহ তিনি উর্দুতেই রচনা করেছেন। কিন্তু বিলাতে থাকাকালীন তাঁর কাব্যকালীন তার কাব্যচর্চার মোড় ঘুরে যায়। বিলাতে অবস্থানকালীন ইকবালের মনোজগতের যে তিনটি বিষয়ের বিবর্তন ঘটে তার মধ্যে একটি হলো, কাব্য চর্চায় উর্দু ভাষার পাশাপাশি ফারসি ভাষাকে অধিক গুরুত্ব প্রধান। আর অপরাপর দু'টি হলো মুসলিম জাতীয়তাবাদের চেতনা ও তাকদির তথা অদৃষ্টে বিশ্বাসের প্রচলিত ধারণার পরিবর্তন আনায়ন অর্থাৎ ওয়াহদাতুল ওয়াজুদ ভিত্তিক জীবন দর্শন পরিহার করে খাঁটি ইসলামি শিক্ষার প্রতি জোর প্রদান। এসময়ে তিনি ফারসিতে কবিতা রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠেন এবং বেশিরভাগ কবিতা তিনি ফারসি ভাষায় রচনা করেন। (তারিক-৫৩, পৃ. ৩২)

১৮৩৫ খ্রিষ্টাব্দে ব্রিটিশ কর্তৃক ফারসির স্থলে ইংরেজিকে রাজভাষা হিসাবে প্রচলিত করার ফলে ভারতীয় উপমহাদেশে ফারসির প্রভাব অধিকতর হ্রাস প্রয়েছিলো। ফলে এতদঞ্চলে ইংরেজি ভাষা ফারসি চর্চার ক্ষেত্রে একটি প্রধান বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছিলো। তা সত্বেও দীর্ঘকাল পরে ইকবাল কাব্য রচনার ক্ষেত্রে উর্দু ভাষার চেয়ে ফারসি ভাষাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন। এর একটা কারণ হলো এই যে, ফারসি ভাষার মাধ্যমে দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশ করা অধিকতর সহজ। ইকবাল নিজেই বলেন:

> আমি শুধু ভারতের জন্য নয়, বরং সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য
> কবিতা রচনা করছি। ফারসি ছাড়া এমন অন্য কোনো ভাষা নেই যাতে
> অন্যান্য দেশের মুসলমানদের কাছে আমার ভাবধারা পৌঁছানো যায়। (আব্দুল্লাহ-১০, পৃ. ১৬)

অর্থাৎ যাতে করে আহবান ভারতীয় সীমান্তের বাইরে ও যেমন আফগানিস্তান ও ইরানসহ মধ্য এশিয়ার বিভিন্ন প্রজাতন্ত্রে সহজে পৌঁছে যেতে পারে। আরেকটি কারণ ছিলো এই যে, একটি উন্নত ও অভিনব দার্শনিক ভাব প্রকাশের ক্ষেত্রে এ ভাষা অধিকতর উপযোগী ছিলো। এছাড়া ইকবাল যেসব মরমী ও আধ্যাত্মিক মনীষীর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁদের বেশিরভাগই ফারসি সাহিত্যের দিকপাল। যেমন মাওলানা জালালুদ্দীন রূমী, কবি হাফেজ শিরাযী, শেখ সা'দী ও শামসে তাবরীযীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায়।

এ বক্তব্যের মাধ্যমে ইকবাল তাঁর মানসিক বিবর্তনেরই আভাস দিয়েছেন। এটা তার মুসলিম মানসেরই ফলশ্রুতি। ইকবাল যে ফারসিকে কাব্যচর্চার অন্যতম ভাষা হিসাবে গ্রহণ করেছেন সে কারণ ব্যাখ্যা করে সাইয়্যেদ মুযাফফর হোসাইন বেরনী যে মত প্রদান করেন তা মূলত: ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গিরই বহি:প্রকাশ।

اقبال زمان فارسی را برای بیان افکار و آرای سیاسی خود برگیزد ' زیرا مثنوی در شعر فارسی از ماهوی دارای خصوصیتی است کہ یہ شیوہ روشتی می تواند عقاید فلسفی و سیاسی را تبیین کند کما اینکہ مثنوی مولانا جلال الد ین از چنین خصوصیتی برخودار است۔ در زبان اردو این قالب شعری اساسا برای روایت و حکایت یہ کار می رود یہ علا وہ' اقبال عمیقا متاثر از مثنوی را کہ قالب شعر فارسی است۔'برای بیان نظام فکری خود برگزید۔

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল ফারসি ভাষা নির্বাচন করেছেন তাঁর দর্শন ও রাজনৈতিক বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য। কেননা ফারসি কাব্যে মাসনাভী এমন এক বৈশিষ্ট্যের কবিতা যার মাধ্যমে আকায়েদ-ধর্ম বিশ্বাস-দর্শন ও রাজনৈতিক বিষয়গুলোকে পরিস্কারভাবে প্রকাশ করা যায়। যেমন মাওলানা জালালুদ্দীনের মাসনাভীগুলো এ বৈশিষ্ট্যে সাফল্যমণ্ডিত। উর্দু ভাষায় এ কাঠামোর কবিতা মূলত কাহিনী ও বর্ণনাধর্মী বিষয়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ইকবাল মাওলানা জালালুদ্দীন রূমীর দ্বারা গভীরভাবে প্রভাবিত ছিলেন। যে কারণে তিনি তাঁর চিন্তাধারারকে সুশৃঙ্খলভাবে বর্ণনার জন্য ফারসি ভাষার মাসনাভী আকৃতির কবিতাকে নির্বাচন করেছেন।
(বারানী-১৮, পৃ. ৩৫)

ইকবাল ফারসিতে কাব্যচর্চায় অগ্রাধিকার দেয়ার একটি অন্যতম কারণ ব্যাখ্যা করতে যেয়ে তাঁর আসরারে খুদী কাব্যগ্রন্থে বলেন:

گرچه هندی در عذوبت شکر است
طرز گفتار دری شیرین تر است
پارسی از رفعت اندیشه ام
در خورد با فطرت اندیشه ام

যদিও হিন্দি ভাষা চিনির মতোই সুমিষ্ট
কিন্তু ফারসি (দারী) ভাষার বাচনভঙ্গি তার চেয়েও অধিক মিষ্ট।
আমার সুউচ্চ চিন্তার বাহন হলো এ ফারসি।
কারণ, এ ভাষা আমার স্বভাবজাত চিন্তার সাথে সংগতিপূর্ণ। (ইকবাল-৫, পৃ. ১১)

তবে দুনিয়ার কোনো ভাষ্যকেই তিনি তাচ্ছিল্যের দৃষ্টিতে দেখেননি। উর্দু ইংরেজি, জার্মান ও আরবি সাহিত্যে তাঁর পদচারণা থেকেও আমরা সহজেই তা উপলদ্ধি করতে পারি। বাংগে দারা ও আরমগানে হেজাযের কবিতা সমগ্র ছাড়াও তাঁর শেক্ওয়া ও জোয়াবে শেকোয়া-এর বিশ্বজোড়া খ্যাতি রয়েছে। এসব এমনই বিদ্রুপপাত্মক ও উদ্দীপনামূলক কবিতা যা অসংখ্য মানুষের অনুভূতিতে আজো নাড়া দিচ্ছে। মুসলিম জাতির জন্য ইকবালের হৃদয় যন্ত্রণা তাঁর কাব্যের পরতে পরতে গভীরভাবে প্রতিভাত হয়েছে।
ইকবাল মাঝে মাঝে হিন্দী ভাষায় ও কবিতা লিখতেন। হিন্দী ভাষায় রচিত তাঁর নয়া শাওয়ালা শীর্ষক কবিতার দু'টি চরণ উদাহরণস্বরূপ তুলে ধরা হলো:

شکتی بھی شانتی بھی بھگتوں کے گیت میں ہے
دھرتی کے باسیوں کی مکتی پریت میں ہے

ভক্তদের সংগীতে নিহিত মুক্তি ও শান্তির বাণী,
এ ধরিত্রীবাসীর মুক্তি নিহিত প্রেমপ্রীতির মাঝে। (ইকবাল -১১, পৃ. ১১৫)

এ কবিতাটি ইকবালের দেশ প্রেমের (Patriotism) একটি বড় দৃষ্টান্ত। তিনি ভারতের হিন্দু-মুসলমান উভয় জাতিকেই সুনজরে দেখতেন। এই কবিতার আবেদন খুবই চিত্তাকর্ষক। অনেক সমালোচক ও ইকবালের মানসপ্রসূত ঐক্য তথা হিন্দু মুসলমান ঐক্যের বিষয়টি-যা আলোচ্য বিধৃত হয়েছে, একটি উৎকৃষ্ট কবিতা বলে আখ্যায়িত করেছেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল যে কত বড় মাপের কবি ছিলেন, তা বিভিন্ন কবি ও মনীষীর মূল্যায়ন থেকে অনুমেয়। ইরানের সাম্প্রতিককালের শক্তিমান কবি মালেকুশ শোয়ার বাহার (কবি সম্রাট বাহার) ইকবাল সম্পর্কে চমৎকার মন্তব্য করেছেন। তিনি বলেন:

عصر حضر خاصۀ اقبال گشت   واحدی کز صد هزاران بر گذشق
هیکلی گشت از سخنگویی بپا   گفت کل اصید فی جوف الفرا
شاعران گشتند جیشی تاز و مار   وین مبلوز کردگار صدسوار

বর্তমান যুগতো কেবল ইকবালেরই জন্য,
যিনি একজন, কিন্তু অতিক্রম করে গেছেন লক্ষ জনকে।
কথার গাঁথুনিতে এমনি আকৃতি পরিগ্রহ করে
যা জেব্রার পেটে সকল শিকার প্রবাদের যথার্থতা প্রমাণ করে।
কবিদের কাফেলা যখন হয়ে গেলো বিপর্যস্ত আর বিভ্রান্ত
তখন এ মহান যোদ্ধাই সম্পন্ন করলেন শত অশ্বারোহীর কর্ম। (শা'দরাভা'ন-১৯, পৃ. ১১)

উল্লেখ্য যে, ইংল্যান্ডে থাকাকালীন ইকবাল কাব্যচর্চায় তেমন একটা সময় দিতে পারেন নি। কারণ, তাঁকে তখন ব্যাপক পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতে হয়েছিলো ঠিক সে সময় তিনি একবার কবিতা চর্চা ছেড়ে দেয়ার চিন্তা-ভাবনাও করেছিলেন। তখন তিনি মনে করতেন কবিতা চর্চায় যে সময় ব্যয় হয় সে সময়কে অন্য কোনো জাতীয় কল্যাণমূলক কাজে ব্যয় করাই উত্তম। কিন্তু তার শিক্ষাগুরু প্রফেসর আরনল্ড ও বন্ধু স্যার শেখ আব্দুল কাদের তাঁর এ মতকে সমর্থন করেননি, বরং তাঁরা তাঁর কাব্যচর্চা অব্যাহত রাখার পরামর্শ দেন। ইকবাল ও তাঁদের সে অনুরোধ রক্ষা করে কবিতা চর্চা চালিয়ে যান। (সাফইয়ারী ৭৮, তারিক পৃ. ৩৫) আর ইকবালের এ কাব্য চর্চার মূল উদ্দেশ্যই হচ্ছে বিশ্বের মুসলিম মিল্লাতের সকল মানুষকে ব্যক্তিত্বসম্পন্ন ও প্রকৃত মানুষ হিসেবে গড়ে তোলা | ইকবাল বলেন:

شعر را مقصود اگر آدم گری است   شاعری هم وارث پیغمبری است

কবিতার উদ্দেশ্য যদি হয় মানবতার পরিচর্যা
তাহলে কবিতাও নবীদেরই উত্তরাধিকার। (ইকবাল-৫, পৃ. ২৯৪)

ইকবালের জীবনে রাজনীতি:

আল্লামা ইকবাল শুধু কবি ও দার্শনিকই ছিলেন না, দেশের একজন প্রথম শ্রেণির আইনবিদ হওয়ার সাথে সাথে তিনি রাজনীতিবিদ হিসাবে ও ছিলেন স্বীকৃত। তবে অনীহা ও ছিলো প্রচুর| বন্ধুরা যখন রাজনীতি চর্চায় আত্মনিয়োগ করার জন্য তাঁকে বার বার অনুরোধ করেন তখন তিনি বলেন:

ہوس بھی ہو تو نہیں مجھ میں ہمت تگ و تاز
حصول جاہ ہے وابستہ مذاق تلاش
ہزار شکر، طبیعت ہے ریزہ کار مری
ہزار شکر، نہیں ہے دماغ فتنہ تراش
یہ عقدہ ہائے سیاست تجھے مبارک ہو
کہ فیض عشق سے ناخن مرا ہے سینہ خراش

আকাঙ্ক্ষা থাকলও আমার মাঝে নেই ধুমধামের হিম্মত,
পদমর্যাদা লাভের বিষয়টিতো চেষ্টার সাথেই জড়িত।
হাজার শোকর, আমার স্বাভাব প্রকৃতি হলো সূক্ষদর্শী,
হাজার শোকর, বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারী মস্তিস্ক নেই আমার।
ওহে রাজনীতির মারপ্যাচ তোমাকে মোবারকবাদ,
কারণ আমার অন্তরতো বিধীর্ণ হচ্ছে প্রেমেরই দহনে। (ইকবাল বা-কামাল-১৭, পৃ. ৪৪)

এতদ্‌সত্বেও ইকবাল ছিলেন রাজনীতিবিদ, সমাজ সংস্কারক ও সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তিত্ব। কেননা তাঁর সমগ্র রচনায় রাজনৈতিক তত্ব ও তথ্য বিশেষভাবে অনুরণিত হয়েছে। তাই ইকবাল-সাহিত্যকে কেবল কাব্যসাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করা সমীচীন হবে না: বরং তাঁর কাব্যে যে রাজনৈতিক তথ্য বিধৃত রয়েছে তা সচেতনভাবে

Dhaka University Institutional Repository

পরখ করা প্রয়োজন। মূলত জীবনাদর্শের বাস্তব রূপায়ন রাজনৈতিক মতাদর্শ প্রকাশের মাধ্যমে ফুটে ওঠে। সে কারণে তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাদর্শন অনুধাবনের মাধ্যমে আমরা তাঁকে পুরোপুরি উপলদ্ধি করতে সক্ষম হবো। তাই বলা যায় যে, ইকবালের কাব্যে ও রাজনীতি পরস্পর অবিচ্ছিন্ন। তাঁর কাব্যকে কখনোই স্বীয় রাজনৈতিক চিন্তাধারা থেকে আলাদা করে দেখা সম্ভব নয়। (আ. রহীম ২০. পৃ. ২২)

ইকবালের ইউরোপ থেকে স্বদেশে প্রত্যাবর্তনের বছর অর্থাৎ ১৯০৮ সালের ২৮ ডিসেম্বর অল ইন্ডিয়া মোহামেডান এডুকেশন্যাল কনফারেন্স এর বার্ষিক অধিবেশনে অংশগ্রহণের জন্য ঢাকার নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ অমৃতসরে গমন করেছিলেন। এ সময় পাঞ্জাবের কাশ্মীরী মুসলমান সংস্থা এর পক্ষ থেকে ইকবাল একটি প্রতিনিধি দলসহ সেখানে আসেন। তাঁদের দাবিসমূহ খাজা সাহেবের নিকট ব্যক্ত করেন এবং ব্রিটিশ সরকারের নিকট সেগুলো উপস্থাপনের জন্য তাঁকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। উল্লেখ্য যে, পূর্বেই ইকবালের সাথে নওয়াব সলিমুল্লাহ ঘনিষ্ঠতা ছিলো। ভারতীয় মুসলমানদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসাবে খাজা সাহেব উক্ত দাবিসমূহ ইংরেজ সরকারের নিকট তুলে ধরার প্রতিশ্রুতি দেন। এ উপলক্ষে নোয়াব সলিমুল্লাহর উদ্দেশ্যে ফারসি ভাষায় লিখিত একটি মানপত্র ও প্রধান করা হয়। এ মানপত্রটি ইকবাল নিজেই পাঠ করে শুনান। এছাড়া ১৯১১ সালে বঙ্গভঙ্গ বা বঙ্গবিভাগ রদ; এর মাধ্যমে রব বাংলার গণমানুষের যে অধিকার কেড়ে নেওয়া হয়েছিল সে ব্যাপারও ইকবাল তাঁর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছিলেন। ধারণা করা হয় যে, এ সময় থেকেই ইকবালের রাজনৈতিক জীবনের সূচনা হয়।

ভারতীয় উপমহাদেশে ব্রিটিশ শাসন শোষণের ইতিহাস যেমন দীর্ঘ তেমনি তাদের নিপীড়ন ও ছিলো ভয়াবহ। জালিয়ানোয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড (Carnage/atrocities) সেসব নিপীড়নেরই একটি। পাঞ্জাবের অমৃতসরের জালিয়ানোয়ালাবাগে যে বীভৎস হত্যাযজ্ঞ সংঘটিত হয়েছিলো তা শুধু ভাবতেই নয় এর জন্য পৃথিবীর সর্বত্রই ব্রিটিশের বিরুদ্ধে ঘৃণা ছড়িয়ে পড়েছিলো। ১৯১৯ সালের ১৩ এপ্রিল তথা ব্রিটশ কালের শেষ ধাপে এ জঘন্য হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয়। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিদ্রোহ কালের ইংরেজদের বৃহৎ নরঘাতী তান্ডবের পরবর্তীকালে এ হত্যাকাণ্ড কখনো ভুলের যাবার নয়। জোহরলাল নেহরূর ভাষায়- হাজার হাজর মানুষ আহত হয়েছিলো সেখানে, সেই মৃত্যুর ফাঁদ থেকে পালাবার কোনো পথই ছিলোনা। অমৃতসর কথাটাই এখন প্রায় নর হত্যার সমার্থক হয়ে গেছে। (নেহেরূ-২১, পৃ. ৭১৮)

আমাদের আশ্চার্যান্বিত হতে হয় এ জন্য যে, যে ব্রিটিশ কমান্ডার জেনারেল ও ডায়ার (O'Dyer) স্বহস্তে নিরীহ মানুষের ওপর গুলি চালিয়েছিলেন ইংল্যান্ডের হাইস অব লর্ডস এর একটি বিতর্ক সভায় সে ডাক্তারের ওপরই প্রশংসার পুস্পবৃষ্টি বর্ষণ করা হয়েছিলো। আর তার বিরূদ্ধে প্রতিবাদ বা নিন্দা খুব সামান্যই হয়েছিলো।

বিশ্বকবি রবীন্দনাথ ঠাকুর ও মর্মান্তিক হত্যাকণ্ডের প্রতিবাদে ব্রিটিশ প্রদত্ত নাইটহুড (Knighthood) প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। আর অন্যদিকে মহাকবি ইকবালের অন্তরে যে ঘৃণার উদ্রেক হয়েছিলো তারই বহ:প্রকাশ ঘটেছিলো তাঁর এ অনলবর্ষী কবিতায়:

ہر زائر چمن سے یہ کہتی ہے خاک باغ
غافل نہ ہو جہاں میں گردوں کی چال سے
سینچا گیا ہے خوں شہیداں وے کا تخم
تو آنسوؤں کا بخل نہ کر اس نہال سے

Dhaka University Institutional Repository

বাগানের ধুলিকণা প্রতিটি দর্শনার্থীকে এ কথা বলে যায়:
আকাশের চাতুর্যের কারণে তুমি জগদতে নির্লিপ্ত হয়ো না ।
সিঞ্চিত হলো শহীদের রক্তে তারই বীজ,
তাই সেসব তরুনের তরে অশ্রু বিসর্জনে তুমি কার্পণ্য করো না। (রফিক-২২, পৃ. ১০৪)

ইকবাল ১৯২৬ সালে পাঞ্জাব আইন পরিষদের সদস্যপদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন এবং তাতে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী থেকে তিন হাজার ভোটের ব্যবধানে অনায়াসে বিজয়ী হন। আইন পরিষদের সদস্য থাকাকালে তিনি অনেক গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করেণ। তাঁরই উদ্যোগে ইসলামি আদর্শের অনুকূলে অনেক আইন প্রণীত হয়েছিলো।

১৯২৭ সালে যখন সায়মন কমিশনের রিপোর্ট নিয়ে মুসলিম লীগ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে পড়ে তখন ইকবাল মুসলিম লীগের এক অংশের সঙ্গে যোগ দেন এবং এর সেক্রেটারি জেনারেল নিযুক্ত হন।

১৯২৮ সালের শেষের দিকে দক্ষিণ ভারতের মাদ্রাজ মুসলিম এডুকেশন এসোসিয়েশন কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে দাক্ষিণাত্য সফরের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করেন। এ বছরই তিনি নেহেরূ রিপোর্ট প্রত্যাখ্যান করেন এবং মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ও তাঁর কংগ্রেস সমর্থকদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত মুসলিম লীগের বিপরীতে গঠিত (All India Muslim conference) অথবা All Parties India Muslim conference) নামে গঠিত সংগঠনের ১ জানুয়ারী দিল্লীতে অনুষ্ঠিত বৈঠকে তিনি যোগদার করেন। উল্লেখ্য ভারতীয় উপমহাদেশের বিশিষ্ট রাজনীতিজ্ঞ জনাব শফি ও জনাব ফাজলী হোসেনকে সাথে নিয়ে তিনি এ সংগঠনটি দাঁড় করেছিলেন।

কনফারেন্স সমাপ্তির পর তিনি ২ জানুয়ারি দিল্লী থেকে মাদ্রাজের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী হিসাবে ছিলেন চৌধুরী মুহাম্মদ হোসাইন ও মৌলবী মুহাম্মদ; আব্দুল্লাহ চোগতাই। ৫ জানুয়ারি মাদ্রাজ পৌঁছলে শহরের নাগরিকদের পক্ষ থেকে উষ্ণ সংবর্ধণা দেয়া হয়। মাদ্রাজে পৌঁছার পুর্বে ৩ জানুয়ারি তিনি বোম্বাইয়ে (মুম্বাই) এক দিনের জন্য যাত্রা বিরতি করেন। এ সময় তিনি বাংলার, হায়দারাবাদ, মহিশুর প্রভৃতি স্থান সফর করেন। তিনি ১০ জানুয়ারি সিরাঙ্গাপটমে অবস্থিত টিপু সুলতানের মাযারও যিয়ারত করেন। বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য যে, এ বছরের ৫ জানুয়ারি থেকে ১৯ জানুয়ারি পর্যন্ত সময়ে তিনি ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ে যে ভাষণ প্রদান করেন এগুলোকে খোতবাতে মাদারেস বা Madras Speech বলা হযে থাকে। এ বক্তৃতাগুলোর সংকলন The Reconstructions of Religious Thought in Islam Oxford University Press থেকে সর্বপ্রথম প্রকাশিত হয়। এ বক্তৃতা সংকলন যা ৭টি বক্তৃতার সমন্বয়ে গ্রথিত- ইকবালের জীবনের এক বড় কীর্তি এবং বিশ্বের মানুষ তথা বিশেষ করে বিশ্ব মুসলিম যুগ যুগ ধরে এর দ্বারা উপকৃত হয়ে এসেছে এবং ভবিষ্যতে উপকৃত হবে। বিশেষ করে পণ্ডিত ও বুদ্ধিজীবী সমাজ। ইকবালের মাদ্রাজ সফর ও সেখানে প্রদত্ত তাঁর অমূল্য ভাষণগুলো মোটামুটি মুসলিম সমাজে একটি চৈন্তিক বিপ্লবের সূচনা করেছে।

এ বছরের ২৫ সেপ্টেম্বর তাঁর শ্রদ্ধেয় শিক্ষক মৌলভী সাইয়্যেদ মীর হাসান (জন্ম ১৮ এপ্রিল,১৮৪৪) শিয়ালকোটে ইন্তেকাল করেন। ১৭ নভেম্বর তিনি লাহোর থেকে আলীগরের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হন। আলীগড়ে অবস্থানকালে আলীগড় শিক্ষক, বুদ্ধীজীবী গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ ও ছাত্রদের সাথে মিলিত হন।

১৯ নভেম্বর স্ট্রেচী হলে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মচারী ও ছাত্রদের উদ্দেশ্যে গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য রাখেন। এ সময় তাকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ইউনিয়নের আজীবন সদস্য করা হয়। এছাড়া একটি বিশেষ কনভোকেশনের মাধ্যমে তাঁকে ডক্টর অফ লিটারেচার (D.Lit) উপাধিতে ভূষিত করা হয়। (লেনিন -২৩, পৃ. ২৪,২৭)

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩০ সালের ডিসেম্বর এ এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ইকবাল সভাপতি মনোনীত হন। সভাপতির ভাষণে তিনি প্রথমবারের মতো উপমহাদেশের মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব করেন।-যা তখনো ছিলো একটি কল্পনা মাত্র। তাঁর সুচিন্তিত প্রস্তাব Muslim India within India -এর সূত্র ধরেই পরবর্তীতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। কেউ কেউ মনে করেন —যা করেন পাকিস্তান এ নামকরণটি তাঁর নয়। এই নামের উদ্যোক্তা ছিলেন কেব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত চৌধুরী রহমত আলী ও খাজা আব্দুর রহীমসহ কয়েকজন মুসলিম ছাত্রনেতা। তবে তাঁরা এই নামকরণের প্রস্তাবটি ইকবালের নিকট উপস্থাপন করেছিলেন তাঁর দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান উপলক্ষে। অবশ্য ১৯৩০ সালে এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে সভাপতির ভাষণেই তিনি মুসলমাদের জন্য একটি নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন বলে জানা যায়। ভারতে হিন্দু- মুসলিম বিরোধ মিটিয়ে ফেলার জন্যই তিনি এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এ ভাষনের এক পর্যায়ে তিনি বলেন:

I would like to see the Punjab.North-west Frontier province. Sind and Batuchistom amalgamated into a single state.Self- government within the British Empire or without the British Empire the formation of a conosolidated North West Indiam Muslim state appears to me to be the final destins.at least of Narth West India (shamloo -24.p. 13)

আমি দেখতে চাই পাঞ্জাব, উত্তর- পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, সিন্ধু ও বেলুচিস্তানের সমন্বয়ে যেন একটি একক রাষ্ট্র গঠিত হয়। গোটা ভারতের ভিতরে বা বাইরে স্বায়ত্বশাসিত একটি সম্মিলিত উত্তর পশ্চিম ভারতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা আমার কাছে মুসলমানদের শেষ ভাগ্য বলে মনে হয়, অন্ততপক্ষে উত্তর-পশ্চিম ভারতের জন্য।

নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, ইকবাল পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা। এর পাশাপাশি তিনি বাংলার মুসলমানদের নিয়েও চিন্তিত ছিলেন। ইকবালের এলাহাবাদ প্রস্তাবে বাংলার কথা না থাকলেও পরবর্তী সময় তিনি কায়েদে আযমের নিকট এক পত্রে বলেছেন, ‘বাংলায় মুসলমানরাও স্বতন্ত্র জাতিরূপের পরিগণিত হওয়ার অধিকারী। (আব্দুল্লাহ - ২৫, পৃ. ২৬০)

মুসলিম লীগের উক্ত অধিবেশনের পরেই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে যোগদানের জন্য ইকবালের নিয়ন্ত্রণ করা হয়। এ উদ্দেশ্যে তিনি ১৯৩১ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর লন্ডনে পৌঁছান। ভারতীয় মুসলমানদের একজন প্রতিনিধি হিসাবে তিনি এ অধিবেশনে যোগদান করেন। এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিলো ভারতে ব্রিটিশ আইনের কিছু সংশোধনী নিয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গোলটেবিল বৈঠক আহত হওয়ার পূর্বে ভুপালের নোয়াবের আহ্বানে ভারতীয় মুসলিম নেতৃবৃন্দের যে সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ইকবাল সেখানে ও অংশগ্রহণ করেন।

এ অধিবেশনের উদ্দেশ্য ছিলো গোলটেবিল বৈঠকে সম্মিলিত দাবিনামা উপস্থাপন। লন্ডনে যাবার পথে ইকবাল বোম্বের তাজমহল হোটেলে কিছু সময়ের জন্য অবস্থান করেন এবং আতিয়া ফায়েজীর বাসভবন আইওয়াই রাফাতে একটি ভোজ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহন করেন। গোলটটেবিল বৈঠকে তিনি তাঁর পুরো দায়িত্ব পালন করেন। বৈঠক ১৯৩১ সালের ১ ডিসেম্বর পর্যন্ত চলতে থাকলে ও ত্যাগ করে ইকবাল ২১ নভেম্বর স্বদেশের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন।

এ সফর উপলক্ষে ইকবাল লন্ডনে ১১৩, সেন্ট জেমস কোর্ট, বার্কিংহাম গেট, এস ডব্লিউ -১ এ অবস্থান করেন। যেখানে অনেক মনীষী, রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ও সাহিত্যমোদী এসে ভিড় জমাতেন। এদের মধ্যে ভারতবর্ষ বিষয়ক ব্রিটিশ মন্ত্রী স্যার শিমুয়েলম স্যার ডেনিস রাস, তুরস্কের স্বাধীনতা সংগ্রামী মুস্তাফা কামাল পাশা কর্তৃক

Dhaka University Institutional Repository

নির্বাসিত গাজী রউফ বে, কর্নেল ফেরার, প্রফেসর গিব, সাইয়্যেদ যিয়াউদ্দীন তাবাতাবায়ী প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য। এছাড়া এ সময় ইকবাল বিভিন্ন শিক্ষা ও সাহিত্য সমাবেশে ও ভাষণ দানের সুযোগ লাভ করেন।

দেশে প্রত্যাবর্তনের পূর্বে তিনি রোম, প্যারিস, মিশর, স্পেন, ফিলিস্তিন প্রভৃতি দেশ সফর করেন। ফিলিস্তিনে তিনি মু'তামারে আলম আল ইসলামি সম্মেলন এ অংশগ্রহণ করেন। তিনি এসব দেশের বুদ্ধিজীবী ও রাজনীতিবিদদের সঙ্গে মিলিত হয়ে বিশ্বের বিভিন্ন সমস্যা সম্পর্কে আলোচনা করেন। (ফারুকী- ২৬, পৃ. ১৩৭)

উল্লেখ্য যে, কনফারেন্স থেকে ফিরে আসার সময় তিনি প্যারিসে প্রখ্যাত ফরাসি দার্শনিক প্রফেসর হেনরী বারগসাঁর (Henri BERGSON) (1859-1941 খ্রি.) সাথে সাক্ষাত করেন। বারগসাঁ ছিলেন প্রকৃতিবাদের ঘোর বিরোধী। ইকবাল তাঁর সাথে আলোচনা প্রসংগে নবী করিম (সা.) এর لا تِشبوا الیٰھر فان الدھرھو অর্থাৎ যুগ বা কালকে তোমরা মন্দ বলো না, কারণ কাল বা সময়ই হলো আল্লাহ) হাদীসটি উপস্থাপন করেন। বারগমাঁ বিস্মিত হয়ে বললেন, ইসলামের নবী এমনটি বলেছেন? ইকবাল প্রত্যুত্তরে বললেন:

زندگی از دھر و دھر از زندگی است   لا تسبو الدھر فرمان نھی است

জীবন হলো কাল বা যুগ আর কালই হলো জীবন

নবীর আদেশ হলো, সময় বা কালকে মন্দ বলো না। (সাফাইয়ারী -২৭, পৃ. ৩৯)

এ সময় মুসোলিনীর সাথে ইকবালের গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষাত ঘটে। এসময় ইটালিতে মুসোলিনীর দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিলো। মুসোলিনী পূর্বেই ইকবালের আসরারে খুদী এর ইংরেজি অনুবাদ পড়েছিলেন এবং তিনি এ কাব্যগ্রন্থ পাঠে এতোটাই প্রভাবিত হন যে, ইকবালকে তাঁর দরবারে আমন্ত্রণ জানাতে বাধ্য হন। ইকবাল তাঁর আমন্ত্রণ গ্রহণ কনরে তাঁর সাথে সাক্ষাত করেন। দীর্ঘ সময়ব্যাপী এ বৈঠকে পরস্পর বিভিন্ন বিষয়ে আলাপ—আলোচনা করেন। এ বৈঠকে মুসোলিনীই ইকবালের নিকট কিছু পরামর্শ ও চান এবং ইকবাল তা প্রদান করেন। ইকবাল মনে করেন যে, ইটালি একটি নতুন জাতি। তাই তিনি এ জাতির সঠিক পথ অবলম্বনে পাশ্চাত্যের ধ্বংসপ্রাপ্ত সভ্যতা থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে প্রাচ্যের অধ্যাত্মিক ও জীবনদায়িনী সভ্যতার প্রতি দৃষ্টি দেয়ার আহ্বান জানান। রোম নগরীর উদ্দেশে তাঁর এ আহ্বান তিনি মুসোলিনী কবিতায় বর্ণনা করেন। কবিতার অংশ বিশেষ তুলে ধরা হলো।

رومتہ الکبری ! دگرگوں ہوگیا تیرا ضمیر

اینکہ می بینم بہ بیداریست یارب یا یہ خواب!

چشم پیراں کہن میں ندگانی کا فروغ

نوجواں تیرے ہیں سوز آورو سے سینہ تاب

হে মহান রোম নগরী! বদলে গেছে তোমার অন্তর,

হে মহান প্রভূ! এখানে যা কিছু দেখেছি জানি না তা স্বপ্ন কি বাস্তব।

প্রাচীন বৃদ্ধজনের চোখে জীবনের ঐজ্জ্বল্য আজ

তোমার যুবকরা আকাঙ্কার দহনে তপ্ত। (ইকবাল-১১, পৃ. ৪৮১)

১৯৩১ সালের ২৪ নভেম্বর ইটালির বিখ্যাত রয়্যাল একাডেমির ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রফেসর ফালমিকি সাথে সাক্ষাত করেন এবং তাঁকে উক্ত একাডেমিতে এক সমাবেশে ভাষণ প্রদানের জন্য জানান। ১৯৩১ সালের ২৬ নভেম্বর ইকবাল উক্ত সমাবেশে গুরুত্বপূর্ণ ভাষণ দেন। এ সমাবেশে রোম নগরীর বিশিষ্ট গুণী বুদ্ধীজীবী ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসরগণ উপস্থিত ছিলেন। অনেক মহিলা ও সমাবেশে যোগদান করেন। তাঁর ভাষণের বিভিন্ন

Dhaka University Institutional Repository

অংশ রোমান ভাষায় অনুবাদ করে প্রচার করা হয়। এ সময় ইটালির শিক্ষিত ও সুধীমহল ইকবালের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। এসব কর্মকাণ্ড থেকেই অনুধাবন করা যেতে পারে যে, ইকবাল ইউরোপে কতটা সমাদৃত হয়েছিলেন। এ সময় তাঁর সফরসঙ্গী ছিলেন মাওলানা গোলাম রাসুল মেহের।

দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক শেষে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে ইকবাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স এর প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। সংগঠনের কার্যক্রমে ইকবালের ইতিবাচক ভূমিকা ইতিহাসের পাতায় স্বরণীয় হয়ে রয়েছে। এ সংগঠনটি বিশেষত: ১৯৩৪ সাল পর্যন্ত উপমহাদেশের রাজনীতিতে বিশেষ গুরূত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

এ বছরের ১৭ নভেম্বর লন্ডনে অনুষ্ঠিত তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকে ও ইকবাল যোগদান করেন। এ উপলক্ষে ১৫ ডিসেম্বর দি ন্যাসনাল লীগ অব লন্ডন তাঁর সম্মানে এক সংবর্ধনার আয়োজন করে। এরপর তিনি ২০ ডিসেম্বর প্যারিস হয়ে স্পেনের রাজধানী মাদ্রিদে গমন করেন। ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের ৫ জানুয়ারি মাদ্রিদ থেকে তিনি কর্ডোভায় গমন করেন। এবং এখানকার এক সাহিত্য সম্মেলনে ভাষণ দেন। তিনি পুনরায় মাদ্রিদ থেকে প্যারিসে আসেন এবং সেখান থেকে ইটালীর ভেনেস নগরীতে যান। অতঃপর তিনি বোম্বের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠকের কার্যক্রম ও ইকবালকে আকৃষ্ট করতে পারেনি।

১৯৩৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে তদানীন্তন বাদশাহ নাদের শাহ গাযী কর্তৃক আমন্ত্রিত ভারতীয় তিন জন মনীষীর মধ্যে ইকবাল অন্যতম। অপর দুজন ছিলেন আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর স্যার সাইয়্যেদ রাস মাসউদ ও সাইয়্যেদ সোলায়মান নদভী।

এ সময় প্রতিনিধি দল আফগান বাদশা নাদের শাহের নিকট শিক্ষা সংস্কার বিষয়ক এক সুচিন্তিত পরিকল্পনা উপস্থাপন করেন এবং নাদের শাহ তা সাদরে গ্রহন করেন। কাবুল থেকে প্রত্যাবর্তনের অব্যবহিত পরই নাদের শাহ আততায়ীর হাতে নিহত হন। কিন্তু এতদসত্বেও তাঁদের প্রদত্ত পরিকল্পনা বহুলাংশে আফগান সরকার কর্তৃক কার্যকর হয়। কাবুল সফরকালে ইকবাল বাদশাহর জন্য একখানা পবিত্র কুরআন নিয়ে যান এবং তাঁকে উপঢৌকন হিসাবে প্রদান করেন। তাঁর হাতে পবিত্র কুরআন সমর্পণ করতে গিয়ে ইকবাল বলেন, বিশ্বরহস্য ও উজ্জ্বল নিদর্শনে পরিপূর্ণ আল্লাহর বাণী এই গ্রন্থ আপনাকে উপহার দিচ্ছি। এ-ই আমার জীবন, আমি ফকির। কাবুল সফর সংক্রান্ত ইকবালের অভিব্যক্তিসমূহ তাঁর জীবনের শেষ পর্বে লেখা ফারসি মাসনাভী মুসাফির-এ লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইকবাল কাবুলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদায় অবস্থান করেন এবং ওখানকার বুদ্ধিজীবী ও শিক্ষিত মহলে তিনি ও তাঁর অন্যান্য সফরসঙ্গী বিপুলভাবে সমাদৃত হন। কাবুল থেকে লাহোরে ফিরে আসার পর পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে ডি. লিট (D. Lit) উপাধিতে ভূষিত করে।

১৯৩৪ সালের ১০ জানুয়ারি তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। ঈদের নামায পড়ে বাড়িতে এসে গরম সেমাইর সাথে দধি মিশিয়ে খাওয়ার ফলে তাঁর কন্ঠনালীতে মারাত্মক সমস্যা দেখা দেয়। এতে তিনি ভিষণ অস্বস্তিবোধ করেন এবং পরিণামে তাঁর কন্ঠস্বর ও রহিত হয়ে যায়। ফলে সে সময় তিনি আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলাম —এর অষ্টম সভাপতি নির্বাচিত হন। নভেম্বর মাসে তিনি পুনরায় আলীগড় সফর করেন এবং আলীগড় মুসলিম ইউনিভার্সিটির ছাত্র ও কর্মচারিদের সমাবেশে ভাষণ দান করেন।

১৯৩৫ সালের দিকে ইকবালের অসুস্থতা বৃদ্ধি পায় এবং তাঁর বন্ধু স্যার রাস মাসউদের আহবানে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে ভুপাল গমন করেন। তিনি হামিদিয়া হাসপাতালে মাসাধিককালে অবস্থান করে চিকিৎসা করান। এরপর তিনি দিল্লীতে যান এবং প্রসিদ্ধ ইউনানী হাকিম নাবিনার পরামর্শ গ্রহণ করেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে এই অসুস্থ ও বেদনাদায়ক দিনগুলোতে তাঁর আর্থিক অনটন দেখা দেয় এবং এক বন্ধুর কাছে তাঁর হাল অবস্থা জানিয়ে পত্র লেখেন:

Dhaka University Institutional Repository

For more than a your I have done nothing. The sources of income hove dried up (Rafique 22. P. 182)

দীর্ঘ এক বছরের অধিক সময় ধরে আমি কোনো কিছুই করছি না।
আমার আয়ের নিঃশেষ হয়ে গেছে।

এ অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে ভুপালের নওয়াব তাঁর জন্য আজীবন মাসিক ৫০০ রূপি পেনসন মঞ্জুর করেন। এ সময় তিনি জাভেদ মঞ্জিলে তিনটি কক্ষ নিয়ে অবস্থান করতেন এবং এর ভাড়া বাবদ মাসিক ৫০ রূপি পুত্র জাভেদের একাউন্টে জমা দিতেন। চিকিৎসার উদ্দেশ্যে তিনি পুনরায় ভুপাল যান এবং সেখান থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে দিল্লীতে সংক্ষিপ্ত সময়ের জন্য অবস্থান করেন। তিনি বিখ্যাত উর্দু কবি হালীর জন্মস্থান পানিপথে অনুষ্ঠিত হালীর জন্ম শতবার্ষিকী অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ। এ জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানটি ভুপালের নোয়াব উদ্বোধন করেন। ইকবাল অনুষ্ঠানে উপস্থাপন করার জন্য ফারসিতে একটি সুন্দর কবিতা রচনা করেন, কিন্তু অতীব পরিতাপের বিষয় যে অসুস্থতার জন্য তা আবৃত্তি করতে পারেন নি।

طواف مرقد حالی سزد ارباب معنی را
نوائے او بجانہا افگند شورے کہ می دانم
بیا تا فقر و شاہی در حضور او بہم سازم
تو بر خاکش گہر افشان و من برگ گل افشانم

হালীর সমাধিতে কেবল তত্ত্বজ্ঞানীদের বিচরণই মানায়,
তাঁর সুর মূর্ছনা বহু হৃদয়ে উদ্দীপনা এনে দেয়, তা আমি জানি।
এসো কি ফকির বাদশা সকলে তার সমীপে একত্র হই,
তুমি ছড়াবে তার কবরে মুক্তা আর আমি ছড়াবো পাপড়ি। (নুরূদ্দীন-৩, পৃ. ১৭৪)

ইকবালের কর্ম জীবন:

১৮৯৯ -এ এম.এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবার সঙ্গে সঙ্গে ইকবাল লাহোরের ওরিয়েন্টাল কলেজে ইতিহাস ও দর্শন শাস্ত্রের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। অল্পদিন পরে ১৯০১ এ তিনি সরকারি কলেজে ইংরেজি ও দর্শন শাস্ত্রের সহকারি অধ্যাপক পদ লাভ করেন। ১৮৯৯-এ পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয়াধীন এরিয়েন্টাল কলেজের, ম্যাকলোড পাঞ্জাব, এরাবিক রীডার ও নিযুক্ত হন। ১৯০৩-এ লাহোর সরকারি কলেজে স্থায়ী এ্যাসিস্টান্ট প্রসেসর পদে নিযুক্ত হন। ১৯০৩ -এ বিশ্ববিদ্যালয় ওরিয়েন্টাল কলেজ লাহোর গবেষণা, সম্পাদনা অধ্যাপনা ও আরবি গ্রন্থ প্রকাশনা কার্যে নিয়োজিত হন এবং আঞ্জুমানে মুসল, আনে কাশ্মীরী লাহোর এর সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

১৯০৯ - এ তিনি সরকারি কলেজ লাহোর অধ্যাপক পদে নিযুক্ত হন এবং এক বছর (১৯১০-এপর্যন্ত) সেখানে অধ্যাপনায় কর্মরত থাকেন। ১৯০৮-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বৃটিশ কমিটির কর্মপরিষদের সদস্য নির্বাচিত হন। ৬ মাস লন্ডনে আরবির অধ্যাপনা করেন। লাহোর চীফ কোর্টে আইন ব্যবসায়ের জন্য আবেদন করেন। ইকবাল ১৯১১-এ পাঞ্জাব প্রিভেন্সিয়াল এডুকেশন কনফারেন্সের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯২০-এ হন আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের জেনারেল সেক্রেটারি। সেপ্টেম্বর ১৯২৪ পর্যন্ত উক্ত পদে বহাল থাকেন। ১৯২৩ -এ জ্ঞান-বিজ্ঞান ও সাহিত্যে অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ সরকার কর্তৃক 'স্যার' উপাদিতে ভূষিত হন। ১৯২০-এ তিন বছরের জন্য লাহোর থেকে প্রাদেশিক সভার সদস্য নির্বাচিত হন। ১৯৩২-এ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের

সভাপতি নির্বচিত হন। ১৯৩৩ সালে পাঞ্জাব বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ‘ডিলিট’ সন্মানে ভূষিত হন। ১৯৩৪-এ দুরারোগ্য রোগের শিকার হয়ে পড়েন। স্বাস্থ্যের অবনতি হেতু তিনি আইন ব্যবসা ত্যাগ করেন। আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ইকবালকে ৫০০ টাকা (বর্তমান টাকায় লক্ষাদিক টাকা) দান করা হয়। ১৯৩৭-এ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক এবং ১৯৩৮-এ উসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক তাঁকে ‘ডিলিট’ উপাদিতে ভূষিত করা হয়। (সুলতান-২৮, পৃ. ৮)

ইস্তফা:

১৯০৮-এ সরকারি কলেজ লাহোর থেকে অধ্যাপনা পদে ইস্তফা প্রদান করেন ১৯০৮-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারি পদ থেকে ইস্তফা দেন। ১৯৩০-এ আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের জেনারেল কাউন্সিল ও কলেজ কমিটি থেকে ইস্তফা দেন।

১৯০৮-এ অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের বৃটিশ কমিটির কর্মপরিষদের সদস্য নির্বচিত হন। আঞ্জুমানে কাশ্মীরী মুসলমান লাহোর এর সাধারণ সম্পাদক নির্বাচিত হন। উক্ত সংস্থারপক্ষ থেকে অমৃতসরে অনুষ্টিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি হিসাবে ঢাকার নবাব সলিমুল্লাহর সন্মানে মানপত্র পাঠ করেন। ১৯১১-এ পাঞ্জাবে প্রিভেন্সিয়াল এডুকেশন কনফারেন্সের সেক্রেটারি নিযুক্ত হন। ১৯১৯-এর ৩০ শে ডিসেম্বর প্রথম বিশ্বযুদ্ধ অবসানের পর মৈত্রী শক্তি কর্তৃক ত্বকীদের সাথে প্রস্তাব পেশ করেন। ১৯২৬-এ পাঞ্জাবের লেজিসলেটিভ কাউন্সিলের সদস্যপ্রার্থী হন। ১৯২৭-এর ৫ই মার্চ পাঞ্জাব আইন সভায় ১৯২৭-২৮ সালের বাজেট উপলক্ষে ভাষণ দেন। ১০ই মার্চ সরকারের শিক্ষা বিভাগের বাজেট রারসের সমালোচনা করে ভাষণ দেন। ১লা মে লাহোরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সন্মেলনে সরকারের যুক্ত নির্বাচন আইনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ১৮ই জুলাই সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সমালোচনা করে পাঞ্জাব আইন সভায়, ৯ই নভেম্বর আইন কমিশনের সমালোচনা করে ভাষণ দেন।

১৯২৮-এর ২৩শে ফেব্রয়ারী ভুমি রাজস্বের উপর আয়কর উসূল করার প্রস্তাবের উপর পাঞ্জাব আইন সভায় ভাষণ দেন। ২৪ শে জুন অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সেক্রেটারী পদ থেকে ইস্তাফা দেন। ২৫ শে ডিসেম্বর মুসলিম লীগের অন্যতম প্রতিনিধি হিসেবে স্যার মুহাম্মদ শফির নেতৃত্বে কমিশনের সঙ্গে সাক্ষাত করেন। ২৯ শে ডিসেম্বর দিল্লীতে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় মুসলিম সম্মেলনে ভাষণ দেন। এবং মুসলমানদের স্বতন্ত্র কার্যক্রম গ্রহণ করার পরামর্শ দেন।

১৯৩০ -এর ৩০শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে মুসলিম লীগের ঐতিহাসিক বার্ষিক সন্মেলনে সভাপতির ভাষণ দেন। উত্তর-পশ্চিম ভারতে একটি স্বতন্ত্র ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ঐতিহাসিক ধারণা পেশ করেন। ১৯৩২ -এর ১লা জানুয়ারী জেরুজালেমে অনুষ্ঠিত ইসলামি লীগ সন্মেলন সম্পর্কে সিভিল ও মিলিটারী গেজেটের প্রতিনিধি তাঁর সাক্ষাৎ গ্রহণ করেন। ১লা জানুয়ারী বিশ্ব সন্মেলন সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ফেব্রয়ারীতে অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের সভাপতি নির্বাচিত হন। ১৯৩২ -১২ ই জুন বি.এ শ্রেণিতে পাঠ্য তালিকা থেকে ইকবালের ইতিহাস

Dhaka University Institutional Repository

খারিজ করার প্রতিবাদে মুসলিম ইনসষ্টিটিউট হলে অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ সভায় সভাপতিত্ব করেন। ২৯ শে জুন অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের ব্যবস্থাপনা কমিটির বৈঠক স্থগিত হওয়া সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ৬ই জুলাই দ্বিতীয়বার বিবৃতি দেন। ২৫ শে জুলাই শিখদের দাবী-দাওয়া সম্পর্কে, ৪ঠা আগস্ট স্যা যোগেন্দ্র সিং কতৃক প্রস্তাবিত শিখ মুসলিম সমস্যা সম্পর্ক, ১০ই আগস্ট শিখ মুসলিম সমস্যা সম্পর্কে মতবিনিময় সম্পর্কিত অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্সের কার্যকরী কমিটির প্রস্তাবের ব্যবস্থামূলক বিবৃতি দেন। ২৪ আগস্ট সরকারের সাম্প্রদায়িকতামূলক ফয়সালা সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ৮ই অক্টোবর জাতীয়তাবাদী মুসলিম নেতৃবৃন্দের লখনী সন্মেলন সম্পর্কে এবং২৭ই অক্টোবর লখনী সন্মেলনে গৃহীত প্রস্তাব সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ১৭ই নভেম্বর তৃতীয় গোলটেবিল বৈঠক অংশগ্রহন করের। ১৫ই নভেম্বর বৃটিশ কমনসভায় ভাষণ দেন। ১৯৩৩ -এর ২৬ শে ফেব্রয়ারী গোলটেবিল বৈঠকের ফলে গঠিতব্য বিধান সম্পর্কে, ২৬শে ফেব্রয়ারী ইউরোপের পরিস্থিতি সম্পর্ক, ৪ঠা মার্চ শ্বেতপত্র সম্পাদিত সাংবিধানিক প্রস্তাব সম্পর্কে, ১৬ই মে তুইর্স্তানেবিদ্রোহ সম্পর্কে, ৭ই জুন কাশ্মীর রাজ্যে দাঙ্গা সম্পর্কে, ২০শে জুন অল ইন্ডিয়া কাশ্মীর কমিটির সভাপতিত্ব থেকে ইস্তফা দান সম্পর্কে, ১৪ ই পাঞ্জাবে সাম্প্রদায়িকতামূলক সরকারী ফয়সালা সম্পর্কে, ৩রা আগস্ট কাশ্মীর প্রশাসন সংস্কার সম্পর্কে বিবৃতি দেন। ২রা অক্টোবর কাশ্মীর আন্দোলনে এর সভাপতিত্ব গ্রহণের প্রস্তাব গ্রহণে অস্বীকৃতিমূলক বিবৃতি দেন। ফলে গঠিতব্য বিধানের ধারণা পেশ করেন।

ইকবালের দাম্পত্য জীবন:

ইকবালের দাম্পত্য জীবন কতটা সুখকর ছিলো তা বলা মুশকিল। ইবালের প্রথম বিয়ে হয়েছিলো ১৮৯৩ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষার অবিবাহিত পরে। গুজরাটের প্রখ্যাত ডাক্তার অবসরপ্রাপ্ত সিভিল সার্জন আতা মুহাম্মদের কন্যা তিনি বলেন করিম বিবির সঙ্গে এ বিয়ে সম্পন্ন হয়। সে সময় করিম বিবির বয়স হয়েছিলো ১৯ বছর আর ইকবালের বয়স ১৬ বছর। তাঁর এ স্ত্রীর গর্ভে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একটি কন্যা ও অপরটি পুত্র। কন্যা মেরাজ বেগমের জন্ম হয় ১৮৯৬ সালে এবং পুত্র আফতাব ইকবালের জন্ম হয় ১৮৯৮ সাল এ। মেরাজ বেগম এক দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে ১৯১৫ সালে ১৯ বছর বয়সে ইন্তেকাল করেন। এটা দুঃখজনক হলেও সত্য যে করিম বিবির সাথে ইকবালের সম্পর্কের অবনতি ঘটে বৈবাহিক জীবনের প্রায় শুরু থেকেই। তবে ১৯০৮ সালে লন্ডন থেকে প্রত্যাবর্তনের কিছুকাল পরেই একটি মীমাংসার মাধ্যমে উভয়ই স্বতন্ত্র জীবন যাপন করেন।

১৯১০ সালে ইকবাল লাহোররের এক কাস্মীরী পরিবারের মেয়ে সরদার বেগমের সঙ্গে পরীণয়সূত্রে আবদ্ধ হন। এ সময় ইকবালের বয়স হয়েছিলো তেত্রিশ বছর আর সরদার বেগমের বয়স উনিস। এখানে একটি বিপত্তি ঘটেছিলো অর্থাৎ সরদার বেগমকে ঘরে তুলে আনার পুর্বেই তার চারিত্রিক ব্যাপারে ইকবালের নিকট কয়েকটি বেনামী পত্র আসলে কিছুটা সন্দিহান হন এবং মানসিকভাবে বিমর্ষ হয়ে পড়েন।

তিনি বন্ধুবান্ধবের সাথে পরামর্শ করেন এবং বিষয়টি তদন্ত করে দেবার চিন্তাও করেন। এ অবস্থায় তাঁর এক পুরানো বন্ধু সাইয়্যেদ বশির হায়দারের পরামর্শ ও অনুরোধে ১৯১৩ সালে লুধিয়ানোর নোলাক্ষা সম্ভ্রান্ত বংশের কুলীন রমণী মুখতার বেগমকে বিয়ে করেন। এদিকে সরদার বেগম সম্পর্কে ইতঃপুর্বে যা রটনা করা হয়েছিলো তা ফাঁস হয়ে যায়। জনৈক উকিল সরদার বেগমের সাথে তার ছেলের বিয়ে দিতে না পেরে এ বেনামী পত্রের মাধ্যমে ইকবালের মনে সংশয় সৃষ্টি করেছিলেন অন্যদিকে অপেক্ষ্যমান সরদার বেগম ও ইকবালকে এসব মিথ্যা কল্পকাহিনী বিশ্বাস না করার পত্রযোগে অনুরোধ জানিয়েছিলেন। বিষয়টি পরিস্কার হতে হতে ইতোমধ্যে অনেক সময় পার হয়ে যায়। ইকবাল এতে ভীষণভাবে অনুতপ্ত হন এবং মুখতার বেগমের পরামর্শ অনুযায়ী সরদার বেগমের ঘরে তুলে নিয়ে আসেন। (তারিক-৫৩, পৃ.৪৬)

এভাবেই তাঁর দাম্পত্য জীবনের দীর্ঘ দিনের সংকটের পরিসমাপ্তি ঘটে এ দীর্ঘ একাকী জীবন তাঁর খাদেম আলী বখশ ব্যতীত আর কেই ছিলো না। ইকবালের শেষোক্ত দুই স্ত্রীর মধ্যে গভীর মিল ও সদ্ভাব ছিলো । এতে ইকবাল ও প্রীত হন কিন্তু ১৯২৩ সাল পর্যন্ত উভয় স্ত্রীই নিঃসন্তান ছিলেন।

১৯২৪ সালের প্রথম দিকে উভয় স্ত্রীই সন্তানসম্ভাবনা হন। মুখতার বেগম সন্তান প্রসবের জন্য পিত্রালয়ে যান। কিন্তু একই বছর ২১ অক্টোবর সেখানে তিনি জ্বর ও নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুর কোলে ডলে পড়েন। অসুস্থতার খবর পেয়ে এর দুর্দিন পুর্বে ইকবাল লুধিয়ানার মুখতার বেগমকে দেখতে যান।

১৯২৪ সালের ১৫ অক্টোবর দ্বিতীয় স্ত্রী সরদার বেগমের গর্ভে ড. জাভেদ ইকবাল জন্মগ্রহণ করেন। যিনি পাকিস্তান সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি পদে অধিষ্ঠিত থেকে পিতার সুনাম অক্ষুন্ন রাখেন। এ স্ত্রীর গর্ভে ১৯৩০ সালের ৩০ আগস্ট ইকবালের আরেকটি কন্যা সন্তান ও জন্ম লাভ করে যার নাম রাখা হয় মুনিরা বেগম উল্লেখ্য যে, ইকবালের জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত জাভেদ ও মুনিরা পিতার সান্নিধ্যেই ছিলেন। ইকবালের জীবনের স্বরণীয় শেষ মুহুর্তগুলো

১৯৩৬ সালের দিকে ইকবালের স্বাস্থ্য ক্রমান্বয়েই ভেঙ্গে পড়ে। কিন্তু তাঁর পরে ও এ বিষয়টি তাঁর জন্য স্বরণীয় হয়ে আছে। এবছরের আগস্ট মাসের দিকে তিনি মুসলিম লীগের পাঞ্জাব পার্লামেন্টরি বোর্ডের চেয়ারম্যান মরোনীত হন। এ বছর কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ লাহোরে জাভেদ মঞ্জিলে তার সাথে সাক্ষাৎ করতে আসেন। আর এ বছরই তিনি আঞ্জুমানে হেমায়েতে ইসলামের বার্ষিক সভায় শেষবাবের মতো জনসমক্ষে উপস্থিত হন। বিশেষভাবে উল্লেখ্য যে, এ বছরই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে সন্মানসূচক ডি.লিট উপাধি প্রদান করে।

১৯৩৭ সালের দিকে ইকবালের বাম চোখটির দৃষ্টিশক্তি প্রায় রহিত হয়ে যায়। তিনি তখন খবরের কাগজ ও পড়তে পারতেন না। তাই পুত্র জাভেদ ইকবাল তাঁকে নিয়মিত সংবাদপত্র পড়ে শোনাতেন। এ বছরের কোনো এক সময়ে তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধু স্যার রাস মাসউদ, মৃত্যুবরণ করলে তিনি শোকাভিভূত হয়ে পড়েন। এ অসুস্থ অবস্থায় ও তিনি বন্ধুর শোকে একটি কবিতা রচনা করেন। এ বছরই এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের সুবর্ণ জয়ন্তী উপলক্ষে তাঁকে ডক্টর অব লিটারেচার উপাধি প্রদান করে।

ইকবাল অসুস্থ থাকাকালীন ও দেশের ভবিষ্যৎ চিন্তা ভাবনা থেকে বিরত থাকেননি। তাঁর মানসিক বিবর্তনের ছোঁয়া সব সময়ই তাঁর মনে দোলা দিয়ে যেত মৃত্যুর মাত্র দশ মাস পুর্বে তথা ১৯৩৭ সালের ২১২ জুনে কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহকে লেখা এক পত্রে উল্লেখিত কয়টি লাইন থেকেই তা পরিস্কার বোঝা যায়-যা ছিলো তাঁর এলাহাবাদে প্রদত্ত ভাষণেরই দ্বিরুক্তি:

A separate federation of Muslim Previnces reformed om the lives I have suggested above. Is the only course by which we can secure a peaceful India and save Muslims from the domination of Non Muslims .why should not the Muslims of North –west India and Bengal be considered asd matins entited to self determination just as other nations in India and outside India are (umar -29, p. 08)

মুসলিম প্রদেশগুলোর একটি আলাদা ও স্বতন্ত্র ফেডারেশন আমার উপরোক্ত পরামর্শের ভিত্তিতে যদি পূন:গঠিত হয় তা হলে এটাই হবে একমাত্র কর্মপন্থা যার মাধ্যমে আমরা একটি নিশ্চিত নিরাপদ ভারতবর্ষ অর্জন করতে পারি এবং অমুসলিমদের আধিপত্য থেকে মুসলমানদের রক্ষা করতে পারি। বাংলা এবং উত্তর -পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের মুসলমানদেরকে কোনো কতগুলো জাতি হিসাবে বিবেচনা করা হবে না যা আখ্যায়িত হবে আত্মপ্রত্যয় নামে, যেমন ভারতবর্ষে এবং বাইর এর জন্য জাতিগুলো রয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

১৯৩৮ সালের ১ জানুয়ারিতে অল ইন্ডিয়া রেডিও এর লাহোর স্টেশন থেকে তাঁর নববর্ষের বাণী প্রচারিত হয়। এ বছর ১ লা মার্চ হায়দারাবাদের ওসমানিয়া বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর অনুপস্থিতিতে তাঁকে ডি. লিট উপাধিতে ভূষিত করে। এ সময় তাঁর স্বাস্থ্যের ভীষণ অবনতি ঘটে| তিনি মারাত্মক শ্বাসকষ্টে ভুগে দুর্বল হয়ে পড়েন, কিন্তু মানসিক দিক থেকে তখনও ছিলেন সবল | মৃত্যুর ঠিক একদিন পূর্বে ইকবাল যে সর্বশেষ শ্লোকটি আবৃত্তি করেন তা হচ্ছে এই:

ســـــرود رفته باز آيد كه نايد
نسيمى از حجاز آيد كه نايد
سر آمـــــد روزگار اين فقيرى
دگـــــر داناى راز آيد كه نايد.

হারানো গান হয়তো আবার বেজে উঠবে —নয়তো না
হেজাযের নির্মল বাতাস হয়তো প্রবাহিত হবে নয়তো না
এ ফকিরের দিনগুলো শেষ এলো
রহস্যজ্ঞাত জ্ঞানী ব্যক্তি হয়তো আসবে হয়তো আসবে না। (ইকবাল -৫, পৃ. ৪৩৫)

মৃত্যু শয্যায় শায়িত ইকবাল যখন তাঁর প্রভুর সাথে মিলিত হওয়ার প্রহর গুনছিলেন তখন তাঁর ভাই শেখ আতা মুহাম্মদ তাঁর পাশে বসে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন| কিন্তু মর্দে মুমিন ইকবাল তাঁর ভাইয়ের সান্ত্বনার জবাবে তৎক্ষনিক যে কথা বলেছিলেন তা হলো এই :

نشان مرد مومن با تو گويم   چو مرگ آيد تبسم بر لب اوست

একজন মর্দে মু’মিনের পরিচয় আমি তোমায় বলে যাই,
যখন মৃত্যু উপস্থিত হয়, অধরে তাঁর মুচকি হাসি ফুটে ওঠে। (নাদাভী- ৩০, পৃ. ৪৯)

এ মর্দে মুমিন ও আত্মসচেতন মহান ব্যক্তিত্ব, আধুনিক ভারতের প্রজ্ঞার ভূষণ অভিধায় অভিহিত মানবতার দূত মহাকবি ইকবাল ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল সকাল পাঁচটায় লাহোরে জাভেদ মঞ্জিলে ইন্তিকাল করেন। ইকবাল ছিলেন চিরম্লান এক মহীরুহ | কবি হাফিজের ভাষায় বলা যায় যে :

هر گز نمیرد آنكه دلش بعشق ثبت است   بر جريده ى عالم دوام ما

যাঁর হৃদয় প্রেমে সঞ্জীবিত সে ব্যক্তি কখনই মরে না
আমাদের স্থায়ীত্ব সংরক্ষিত পৃথিবীর খাতায় চিরন্তনভাবে। (নাদাভী- ৩০, পৃ. ৩৮)

ইকবাল এর জীবরে বিভিন্ন সময় নানা পর্যায়ে মানসিক বিবর্তন সূচিত হয় এ বিবর্তন নিছক মানব কল্যাণ ও গোটা মুসলিম বিশ্বের উন্নতিকল্পেই সাধিত হয়েছিলো। ইউরোপে থাকাকালীন যে সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি ও তীক্ষ্ণ অনুভূতি ইকবাল পোষণ করেছিলেন তারই ফলশ্রুতিতে তাঁর কাব্যিক দৃষ্টি ভঙ্গির ও পরিবর্তন ঘটে। খোদ ইউরোপ থেকেই তিনি ইউরোপীয় সভ্যতার বিপরীতে অবস্থান নেন এবং পাশ্চাত্যের বিরোদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করেন। ইকবাল তার মানসিক বিবর্তনের পরিণত পর্যায়ে এসে যে মতাদর্শ প্রচার করেছেন তার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিলো কুরআন, হাদিস ও ইসলামি ঐতিহ্য। যে কারণে তাঁর অধিকাংশ কাব্য ও রচনাবলিতে কুরআন ও হাদীসের বাণী অনুরণিত হয়েছে। বিভিন্ন কবিতায় তাঁর এ মানসিক বিবর্তনের প্রকাশ ঘটেছে। যেমন বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

دیار مغرب کسے رہے والو! خدا کی بستی دکاں نہیں ہے کھرہ جسے تم سمجھ رہے ہو وہ اب زرکم عیار ہوگا
تمہاری تہذیب اپنے خنجر سے آپ ہی خودکشی کرے گی جوشاخ کازک پہ آشیانہ بنے گا ناپائدار ہوگا

হে পাশ্চাত্যবাসী, আল্লাহর এই পৃথিবী তোমাদের দোকানঘর নয়,
তোমাদের এই কল্পিত খাঁটি সোনা তার মূল্যমান হারাতে বসেছে।
তোমাদের সভ্যতা নিজ ছোরা দিয়ে নিজেই আত্মহত্যা করবে,
দুর্বল ও ক্ষীণ শাখার উপর নির্মিত বাসা কখনো স্থায়ী হতে পারে না। (ইকবাল ১১, পৃ. ১৬৭)

তিনি আরো বলন:

می از میخانه مغرب چشیدم　　بجان من که درد سرخریدم
نشستم با نکو یان فرنگی　　ازآن بی سود ترروزی ندیدم

পশ্চিমের শরাবখানায় আমি পান করেছি রঙিন সুরা,
তাতে লাভ হয়নি কিছুই আমার
শিরপীড়া ব্যতীত,
পশ্চিমা পূর্ণস্নাদের সাহচর্য লাভ করেছি আমি দীর্ঘকাল,
নিরর্থক সময় কাটেনি আমার
তার চেয়ে আর কোনদিন। (ইকবাল -৫, পৃ. ৪৪৭)

আমরা ইতিপূর্বে তাঁর জীবন ও কর্মের উল্লেখ করার পাশাপাশি তাঁর মানসিক বিবর্তনের বিষয়টিও আলোচনা করেছি। ইকবালের মানসপটে মূলত প্রধান তিনটি বিপ্লবী চিন্তা ভাবনার উদ্রেক হয়। এ মানসিক বিপ্লবগুলো পর্যায়ক্রমে সৃষ্টি হয়েছে এবং তা ফলপ্রসূও হয়েছে। প্রথমত স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব, দ্বিতীয়ত তাঁর স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রদান যা পূর্বে অখণ্ড জাতীয়তাবাদের ধারণায় চিত্রিত ছিলো। তৃতীয়ত তক্‌দিরের প্রচলিত ভাবধারায় পরিবর্তন আনা তথা নেতিবাচক সুফি ভাবধারার বিরুদ্ধে এগিয়ে আসা যা আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি। আর এসব বিষয় বিবেচনার্থে তাঁর কাব্যগুলোকে আমরা মোটামুটি দুটি পর্যায়ে বিতর্ক করতে পারি।

ইংলান্ড যাওয়ার পূর্বের কাব্য এবং ইউরোপ থেকে ফিরে আসার পর রচিত কাব্য। কারণ, ইউরোপ যা ওয়ার পুর্বে তাঁর চিন্তাধারার পূর্ণাঙ্গ বিকাশ আমরা দেখতে পাই না। সে সময় তিনি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে তথা হিন্দু-মুসলিম সবাইকে দেশপ্রেম, ঐক্য ও ভালোবাসার শিক্ষা দেন। ইউরোপ থেকে ফিরে এসে তিনি মুসলিম বিবর্তনবাদ, জীবন রহস্য, রাজনীতি, সমাজনীতি, ঘুমন্ত মুসলমানদের জাগিয়ে তোলা ইত্যাকার নানা বিষয়ে কাব্যচর্চা করেন। এসব কাব্যমূল্য সময়ের গণ্ডিতে অতিক্রম করে অনন্তকাল টিকে থাকবে বলেই আমাদের বিশ্বাস।

ঐ সময় শায়খ আবদুল কাদের লাহোর থেকে ‘মাখযান’ নামক একটি মাসিক পত্রিকা প্রকাশ করেন (১৯০১) ইকবালের সর্বপ্রথম কবিতা এবং বেশীর ভাগ কবিতাই ঐ পত্রিকায় প্রকাশিত হতে থাকে। ইকবাল ও শায়খ আব্দুল কাদেরের মধ্যে খুবই মিল মহব্বত ছিল। ইকবালের প্রথম প্রকাশিত কবিতা হিমালয়ে মাখযান পত্রিকায় প্রকাশিত হয় ১৯০১ সালে।

ইউরোপ গমনের পূর্বে ইকবাল অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদ সমর্থন করতেন। তখন তিনি উপমহাদেশের হিন্দু মুসলিম-সবাইকে ভৌগলিক দৃষ্টিকোণ থেকে এক জাতিভূক্ত বলে মনে করতেন। এই দৃষ্টিভঙ্গি নিয়েই তিনি ‘মাখযান’পত্রিকায় ১৯০৪ সালে ‘তাসবীরে দর্দ (দুখের চিত্র)’,‘তারানায়ে হিন্দী’(ভারতীয় জাতীয় সংগীত), ১৯০৫ সালে ‘হিন্দুস্তানী বাচ্চুকা কওমীগীত’ (ভারতীয় শিশুদের জাতীয় গীত)

Dhaka University Institutional Repository

'নয়া শেওয়ালা' (নতুনমন্দির) ইত্যাদি প্রকাশ করেন। বিলাত গমনের পর তাঁর এ মনোভাব পরিবর্তন ঘটে এবং তিনি ধর্মীয় বিশ্বাস তথা তওহীদ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রচার আরম্ভ করেন। তিনি বলতে লাগলেন বিশ্বের সকল মুসলমান একজাতিভুক্ত। (নূরূদ্দীন- ৩, পৃ. ৩০)

ঐ সময় ইকবালের দৈনন্দিন জীবন পদ্ধতি ছিল এই যে, তিনি ভোরে উঠে নামাজ পড়তেন এবং নামাজের পর উচ্চস্বরে কুরআন শরীফ তেলাওয়াত করতেন। অত:পর ব্যায়াম করতেন। কলেজের সময় হলে খানাপিনা ছাড়াই কলেজে চলে যেতেন এবং দুপুর বেলা এসে খানা খেতেন। সাধারণত তিনি একবেলাই খেতেন। ভোরে চাও পান করতেন না। তবে রাতের বেলা মাঝে মাঝে লবণ চা খেতেন। এক কিস্তি একাধারে দুইমাস তিনি রাতের বেলা তাহাজ্জুদের নামাজ পড়েছিলেন।

১৯০৪ সালে লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজের প্রফেসর আরনল্ড চাকরি ছেড়ে বিলাত চলে গিয়েছিলেন। ১৯০৫ সালে ইকবাল ও উচ্চশিক্ষার জন্য ইউরোপ রওয়ানা হন। ইংল্যান্ড পৌঁছে ইকবাল কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করেন এবং দর্শনের শিক্ষালাভ করতে থাকেন। কেম্ব্রিজে দর্শনের শিক্ষা লাভ করতে থাকেন। কেম্ব্রিজে দর্শনের পরীক্ষা পাস করে তিনি ইরানের অধ্যাত্ম দর্শন বিষয়ে একটি গ্রন্থ রচনা করেন। এজন্য জার্মানীর মিওনিক বিশ্ববিদ্যালয় তাঁকে পিএইচ- ডি. ডিগ্রী প্রদান করে। জার্মান থেকে ফিরে এসে ব্যারিস্টারী পরীক্ষা পাস করেন। ঐ সময় প্রফেসর আরনল্ড লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় আরবীর প্রফেসর ছিলেন। তিনি যখন ছুটিতে গিয়েছিলেন, তখন ইকবাল ছয় মাস তাঁর স্থলাভিষিক্ত হয়ে আরবী শিক্ষা দেন।

ইউরোপ গিয়ে ইকবাল এমন এক দুনিয়া দেখলেন, যা ছিল তার জন্য সম্পূর্ণ নতুন। তিনি দেখলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার যেমন গুণ আছে, তেমনি দোষও আছে। এর বাহ্য চমক চোখ ঝলসায় বটে। কিন্তু এর ভেতরটা ফাঁকা । এ সভ্যতা পুঁজিবাদ ও জড়বাদ ভিত্তিক। এতে আধ্যাত্মিকতার লেশ নেই। এতে তার মনে চোট লাগলো। তিনি ভাবলেন, যদি সকল মানুষ আদম সন্তান হয়, তবে মানুষে মানুষে এত পার্থক্য কেন! এই লুটপাট কতদিন চলবে! মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য কি এটাই হবে, যা ইউরোপীয় জাতিসমূহের রয়েছে। তিনি ইউরোপে বসেই ইউরোপীয় সভ্যতার বিরুদ্ধে কলম ধারণ করলেন:

[হে পাশ্চাত্যবাসী! খোদার দুনিয়া ব্যবসায়ের জায়গা নয়!
যে সোনাকে তোমরা ভাবছো খাঁটি, তা এখন প্রমাণিত হবে মেকি!
আত্মহত্যা করবে তোমাদের সভ্যতা নিজ ছোরাতেই,
যে পাখির বাসা তৈরি হয় দুর্বল শাখায়, তা হয় অস্থায়ী ।] (ইকবাল-১১, পৃ. ১৫০)

পূর্বেই বলা হয়েছে, ইউরোপ গমনের পূর্বেই ইকবাল ভৌগলিক জাতীয়তাবাদ ইসলাম সম্পর্কে গবেষণা করে তিনি এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, দেশ, বর্ণ ও বংশ ভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলে তা বিশ্বমানব-ঐক্যের পক্ষে হবে অনিষ্টকর। তাই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হওয়া প্রয়োজন ধর্মীয় বিশ্বাস। এতে বিশ্ব জাতির সংখ্যা এবং মানুষে মানুষে অনৈক্য হ্রাস পাবে। মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হবে তওহীদ তথা ইসলাম। বিশ্বের সকল মুসলমান হবে ভাই ভাই। ইউরোপে থাকাকালেই তিনি লিখলেন:

নিরালা সারে জাহাঁ-সে-ইস-কো আরব-কে মে'মার নে বানায়া
বেনা হামারে হিসারে মিল্লাত-কী- ইত্তেহাদে ওয়াতান নাহী হায় । (ইকবাল-১১, পৃ. ১৪৪)

Dhaka University Institutional Repository

[সারা জাহান থেকে ভিন্নতর করেছেন এ মিল্লাতকে আরবের স্থপতি (নবীজী), ভৌগলিক সীমার ঐক্য নয় আমাদের মিল্লাত-কীল্লার ভিত্তিমূল।] ১৯০৮ সালে ইকবাল বিলাত থেকে স্বদেশ ফিরে আসেন এবং লাহোর গভর্নমেন্ট কলেজে আবার অধ্যাপনা আরম্ভ করেন। তাঁর মাসিক বেতন ছিল পাঁচ'শ টাকা। অধ্যাপনার পাশাপাশি তার ওকালতি করারও অনুমতি ছিল। বিলাত থেকে ফিরে আসার পর ফারসিতে কবিতা রচনার প্রতি তার আগ্রহ বেড়ে যায়। কারণ ফারসিতে দার্শনিক ভাবধারা প্রকাশ করা ছিল তার পক্ষে অধিকতর সহজ। কিছুকাল তিনি উর্দু কবিতা লেখা ছেড়েই দেন। তিনি বলতেন: 'আমি শুধু ভারতের জন্য নয়, বরং সারা বিশ্বের মুসলমানের জন্য কবিতা রচনা করছি। ফারসি ছাড়া এমন অন্য কোন ভাষা নেই যাতে অন্যান্য দেশের মুসলমানদের কাছে আমার ভাবধারা পৌছানো যায়। (জাবিদ ইকবাল-৪, পৃ. ১৮)

মহাকবি আল্লামা মুহাম্মদ ইকবাল বিংশ শতাব্দীর এক অসামান্য দার্শনিক ও চিন্তাবিদ। তিনি গতানুগতিক ধারার কোন কবি বা সাহিত্যিক ছিলেন না। তিনি ছিলেন জীবনবাদী ও আদর্শ-প্রেমিক এক কবি ব্যক্তিত্ব। তাই কাব্য ও সাহিত্য চর্চায় তিনি 'শিল্পের জন্য শিল্প'নীতিতে বিশ্বাস করতেন না। শুধুমাত্র নান্দনিক পিপাসা চরিতার্থ করার জন্যেও তিনি সাহিত্য চর্চা করেননি। তাঁর কাব্যেও প্রধান উপজীব্য হচ্ছে মানব কল্যাণ। এজন্য মৌল প্রেরণা হিসেবে তিনি বেছে নিয়েছেন পৃথিবীর মহত্তম আদর্শ ইসলামকে। তাঁর কাছে ইসলাম শুধুমাত্র একটি ধর্মমতই ছিলনা,বরং ইসলামের মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছেন জীবনের সকল দিক ও বিভাগের জন্যে একটি পরিপূর্ণ দিক নির্দেশনা। ইসলামের মাধ্যমেই তিনি ফিরে পেতে চেয়েছেন মুসলমানের হারানো গৌরব ও মর্যাদা।

ইকবালের দ্বিতীয় বড় অবদান হলো-তার স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদের ধারণা প্রচার। স্যার সৈয়দ ও নওয়াব সলিমুল্লার পথ ধরে ইকবাল সাহিত্য ক্ষেত্রে তওহীদ ভিত্তিক স্বতন্ত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রচার করে মুসলিম জাতিকে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অমুসলিম জাতিসমূহ থেকে পৃথক করে রাখেন। ফলে তারা স্বতন্ত্রভাবেই তাদের লক্ষ্যস্থলের দিকে এগুতে থাকে। মুসলিম জাতি যদি রাজনীতি ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে অমুসলিম জাতির সংঙ্গে মিশে যেতো, তবে তারা দুর্বল থেকে দুর্বল হয়ে পড়তো এবং ব্রিটিশ সরকারের কাছে তাদের দাবী-দাওয়া টেকানোও মুশকিল হতো। ইকবালের মুসলিম জাতীয়তাবাদ প্রচারের ফলে বিশ্ব মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার পথও প্রশস্থ হয়। খেলাফত আন্দোলন ছিল মুসলমানদের ধর্মীয় আন্দোলন। ইকবাল ঐক্য ধারণ করেছিলেন বলেই ইকবাল খেলাফত আন্দোলন থেকে বিরত ছিলেন।

ইকবালের তৃতীয় বড় অবদান হলো-তিনি নেতিবাচক সুফীবাদের বিরুদ্ধে জোরালোভাবে কলম ধরেন। নেতিবাচক ধারণার সুফীগণ পূর্ব নির্ধারিত তক্দিরের কথা শোনাতেন এবং এমনি করে মুসলিম জাতির বড় একটি অংশকে পঙ্গু ও নিষ্ক্রিয় করে রেখেছিলেন। ইকবাল তাঁর কাব্যে শিক্ষা দিলেন- কর্মের নামই তক্দীর। কর্মই মানুষের ভাগ্য নিয়ন্ত্রন করে। সুফীরা আরো শিক্ষা দিতেন যে, মানুষের সত্তা ও ব্যক্তিত্বকে আল্লাহর সত্তায় বিলীন করলেই সত্যিকার স্থায়ী জীবন পাওয়া যায়। ইকবাল বললেন-এমন শিক্ষা ইসলাম বিরোধী। ইসলাম বলে-যে ব্যক্তি নিজ আত্মাকে চেনে এবং তাকে উন্নীত করে, সে খোদাকে ও চিনতে পারে। সুতরাং আত্মাকে লীন করার প্রশ্নই আসে না। ইকবাল তকদীরের সঠিক ধারণা দিয়ে ধর্মের বড় একটি সংস্কার সাধন করেন।

উক্ত তিনটি বড় অবদান ছাড়া ইকবালের আরো অনেক কৃতিত্ব রয়েছে, যেগুলো দিয়ে ইতোপূর্বেও মুসলিম জাতি তাদের বাস্তব জীবনে উপকৃত হয়েছে, এখনো হচ্ছে, এবং তাদের উত্তর সুরিরাও ভবিষ্যতে উপকৃত হবে। তাই জাতি ইকবালের কাছে চিরঋণী।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালের কাব্য রচনাবলি:

'ইকবালের রচনার হাতেখড়ি শুরু হয় ১৯০৫ সালের পূর্ব থেকেই। ওই সময় উর্দুতে এমন কিছু চিত্তাকর্ষক কবিতা রচনা করেন যেগুলোতে তার প্রকৃতি প্রীতি ও দেশাত্মবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। ১৯০৫-১৯০৮ সালে ইউরোপে অবস্থানকালে তিনি বিশ্ব ইসলামাবাদের প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন। ১৯০৮ ১৯২৪ পর্যন্ত তিনি যে সকল কবিতা রচনা করেন সেগুলোর মূল বিষয় ছিল ইসলামের সমকালীন অবস্থার ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা। ১৯২০ এর দশকে তার রচিত কবিতাসমূহের আধ্যাত্মিক গভীরতা প্রবলভাবে পরিচালিত হয়। এ পর্যায়েই তিনি মানুষের ব্যক্তিত্ব (খুদী)স্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীনতার প্রতি আগ্রহী হয়ে ওঠেন। এ বিষয়ে তার অনুভূতি সুস্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে আসরার-ই খুদি ও রমুজ-ই বিখুদি নামক দুটি ফারসি কাব্যগ্রন্থে। এ ছাড়া তার পয়ামই মাশরিক, জবর-ই কালিম জাবিদনামা প্রর্ভতি ফারসি কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত। তার উর্দু কাব্যগ্রন্থের মধ্যে বিখ্যাত দুটি গ্রন্থ হলো, বালই জিব্রাইল ও জরব-ই- কালিম ১৯২৮-২৯ সালে মাত্রা প্রদত্ত তার দুটি ভাষণের সমবায়ে প্রকাশিত হয় ইসলামের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন শীর্ষক ইংরেজী গ্রন্থ The Reconstruction of the Thought in Islam গ্রন্থটিতে তার দার্শনিক প্রজ্ঞা, অগাধ পান্ডিত্য ও মৌলিকতার পরিচয় সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়েছে। ইসলামের দার্শনিক ব্যাখ্যার এরূপ মৌলিক গ্রন্থ বিরল। (ফিরোজা-৩১, পৃ. ২৫০)

ইকবালকে উর্দু ভাষার কবি বলা হলেও তিনি একই সাথে উর্দু ফারসি উভয় ভাষাতেই ক্ষমতার সাথে কাব্য রচনা করেন। তার মোট কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা এগারটি এর মধ্যে আটটি ফারসি এবং উর্দুতে তিনটি। আসরারে খুদী (১৯১৫), রুমূযে বেখুদী, (১৯১৮), পায়ামে মাশরিক (১৯২২),যাবুরে আজম (১৯২৭), জাবীদনামা (১৯৩২), [পচ় চে বায়াদ করদ আয় আকওয়ামে মাশরিক (১৯৩৬),] বাংগে দারা (১৯২৪), বালে জিব্রীল (১৯৩৫),যারবে কালীম (১৯৩৬) এগুলোর মধ্যে প্রথম ছয়টি গ্রন্থ ফারসিতে এবং শেষ তিনটি উর্দুতে রচিত। তাঁর সর্বশেষ রচনা 'আরমুগানে হিজায' ১৯৩৮) তার মৃত্যুর পর প্রকাশিত হয় (১৯৩৯)। গ্রন্থটির অধিকাংশ ফারসিতে। উর্দু ভাষায় ইকবালের রচিত কাব্যগ্রন্থগুলো বাংগে দারা (১৯২৪), বালে জিব্রীল (১৯৩৫), যারবে কালীম (১৯৩৬)

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যগ্রন্থ ছাড়াও ইকবালের রচিত দশটি প্রবন্ধও দশটি চিঠি বা পত্রসাহিত্য রয়েছে। তাঁর প্রবন্ধসমুহের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি প্রবন্ধের মধ্যে রয়েছে

১. ইকতিসাদ (অর্থ বিজ্ঞান) প্রকাশিত ১৯০৩ সাল। ২. The Development of Metapysics in Persia প্রকাশকাল ১৯০৯ সাল। ৩. Six lectures on reconstruetion of religius the thought in islam প্রকাশকাল ১৯৩০সাল। ৪.ফাল সাফায়ে আযম (পারস্যে প্রজ্ঞান চর্চার বিকাশ গ্রন্থের উর্দু অনুবাদ।)প্রকাশকাল ১৯৩৬ সাল। ৫.হরফে ইকবাল (রোজাতিক ভাষণ ও বিবৃতি সংকলন) প্রকাশকাল ১৯৪৫ সাল। (ফিরোজা -৩১, পৃ. ২৫১)

ইকবাল ছিলেন মূলত কবি এবং তাঁর রচনাবলির সিংহভাগই কবিতা। কিন্তু এতদসত্ত্বেও তিনি বহু মূল্যবান গদ্য রচনা রেখে গেছেন। শুধু তা-ই নয়, বরং তিনি গদ্যচর্চায় উৎসাহিত করার জন্য যুবকদের উদ্দেশ্যে বলেছিলেন:

এ যুগে ভারতবর্ষ, বিশেষ করে এদেশের মুসলমানদের জন্য গদ্য রচনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে । যদিও লোকেরা খুব দ্রুত কবিতা রচনায় আগ্রহী হয়ে ওঠে। কারণ তারা পড়াশুনা, জ্ঞান গবেষণা ও অনুসন্ধান ছাড়াই সুনাম সুখ্যাতি অর্জন করতে চায়। এ যুগে খুব অল্প সংখ্যক কবি আছেন যাদের কবিতা ভবিষ্যত বংশধরদের নিকট পৌছবে। তোমরা যুবক, তোমরা কখনোই এ ভ্রান্ত কর্মপন্থা অনুসরণ করো না। আমাদের এমন লেখকেরই বেশি প্রয়োজন যারা পড়াশুনা ও নির্ভুল জ্ঞান গবেষণা করে বিভিন্ন বিষয়ে লিখবে এবং নিজেদের ও জাতির সংস্কার করবে। (আসার- ৩২, পৃ. ৬৬)

ইকবাল অত্যন্ত উঁচুমানের সাহিত্য, অতীন্দ্রিয়বাদ, দর্শন ও ধর্মীয় এতিহ্যের উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি অতীত ও বর্তমানের ইসলামি এবং প্রাচ্যের চিন্তাধারা, সংস্কৃতি, মানবিকতা ও মৌলিকতা সম্পর্কিত বিষয়গুলোকে আত্মস্থ করেছিলেন এবং তা সম্পূর্ণভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পেরেছিলেন। ধর্ম, দর্শন, কলা, রাজনীতি,অর্থনীতি, মুসলিম জীবনব্যবস্থার পুনর্জাগরণ এবং বিশ্ব ভ্রাতৃত্ববোধের প্রতি ছিলো তাঁর প্রগাঢ় আন্তরিকতা ও আগ্রহ।তাঁর উর্দু ভাষায় রচিত গদ্যগুলো ছাড়াও ইংরেজি ভাষায় তাঁর পারদর্শিতাই ফুটে উঠেছে। মূলত তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করার উৎকৃষ্ট মাধ্যম ছিলো তাঁর রচিত কবিতাগুলো-যার বেশিরভাগই তিনি ফারসি ভাষায় রচনা করেছেন। তিনি যেসব বিষয় চিন্তা করতেন এবং তা ভাবতেন তা সবই প্রকাশ পেতো তাঁর কবিতার মাধ্যমে। এখানে আমরা তাঁর রচিত গদ্য ও পদ্য গ্রন্থগুলোর ওপর ধারাবাহিকভাবে সংক্ষেপে আলোকপাত করবো।

এলমুল একতেসাদ (ধনবিজ্ঞান):

এটি হচ্ছে আল্লামা ইকবালের প্রথম গ্রন্থ। তিনি ১৯০০ তেকে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এ গ্রন্থটি রচনা করেন। এটি উর্দু ভাষায় লেখা অর্থনীতি বিষয়ক তাঁর প্রথম গ্রন্থ।ইকবাল স্যার কৃষ্ণপ্রসাদকে এক পত্রে উল্লেখ করেন, যখন থেকে লেখনি হাতে তুলে নিয়েছি তখন থেকে বহু বই-পুস্তক লিখেছি। আমার প্রথম গ্রন্থটি উর্দু ভাষায় লিখেছি অর্থনীতির ওপর। প্রফেসর স্যার থমাস আরনল্ড তাঁকে এ গ্রন্থ রচনায় উৎসাহিত করেন। আল্লামা শিবলি

Dhaka University Institutional Repository

নো'মানী (মৃত্যু ১৩৩২হি.) গ্রন্থটির কোনো কোনো অংশ সংশোধনের ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেন। (ইকরাম-৩৩, পৃ. ২৪-২৫)

The Development of Metaphysics in Persia

আল্লামা ইকবালের দ্বিতীয় প্রকাশিত গ্রন্থ The Development of Metaphysics in Persia (পারস্যে অধিবিদ্যার অগ্রগতি) এটি ইকবালের পি এইচ-ডি ডিগ্রী লাভের উদ্দেশ্যে ইংরেজি ভাষায় লিখিত ও জার্মানীর মিউনিক বিশ্ববিদ্যালয়ে উপস্থাপিত অভিসন্দর্ভ। গ্রন্থটি ১৯০৮ সালে ইংল্যান্ড থেকে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটির ভূমিকায় তিনি বলেন.'আমি ইরানি চিন্তাধারার যৌক্তিক ধারাবাহিকতা তুলে ধরার চেষ্টা করছি'। এতে পারস্যের চিন্তাধারার ধারাবাহিকতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে এবং সুফিদর্শন সম্পর্কে ও বিস্তারিতভাবে আলোকপাত করা হয়েছে। ইকবালের মতে সত্যিকার ইসলামি সুফিবাদ ঘুমন্ত সত্তাকে জাগিয়ে তুলে মানুষকে জীবনের উচ্চ শিখরে পৌঁছায়ে দেয়।

আসরারে খুদী (আত্মসত্তার রহস্য):

ফারসি ভাষায় রচিত ইকবালের প্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ আসরারে খুদী । কাব্যগ্রন্থটি ১৯১৫ সালে প্রকাশিত হয় । এরপর থেকেই ইকবাল বিশ্বসমাজে একজন দার্শনিক বকি হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি ভারতবর্ষ থেকে বৃটেনসহ গোটা ইউরোপ মহাদেশে বিপুলভাবে সমাদৃত হয়। অধ্যাপক নিকলসন এর ইংরেজি তরজমা ভূমিকাসহ প্রকাশ করেন। ইংরেজ সমালোচকগণ বিভিন্ন উন্নতমানের সাময়িকীতে (Magazine) এ গ্রন্থের ভূয়সী প্রশংসা করেন। উল্লেখ্য যে, এসব সমালোচনা প্রকাশিত হওয়ার পরেই ব্রিটিশ সরকার ১৯১৩ সালে তাকে স্যার (sir) উপাধি প্রদান করেন। একাব্যগ্রন্থটির নামকরণ করা হয় অত্র গ্রন্থে বিধৃত একটি শ্লোক থেকে, যেখানে খুদী মতবাদ ও খুদী থেকেই বিশ্ব ব্যবস্থাপনার মূল বিষয় উৎসারিত এবং খুদীর দৃঢ়তার ওপরেই সৃষ্টিজগতের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান রয়েছে-এ চিন্তাধারার উন্মেষ ঘটেছে। শ্লোকটি নিম্নরূপ:

پیکر هستی ز آثار خودی است هر چه می بینی ز اسرار خودی است
خویشتن ز چون خودی بیدار کرد اشکارا عالم پندار کرد

অস্তিত্বের কাঠামো গঠিত হয় আত্মসত্তার প্রভাব থেকে
যা কিছু দেখছো সবটাই হচ্ছে আত্মসত্তার রহস্য।
যখন এ খুদী নিজেকে জাগ্রত করে তোলে
তখন নুজের মাঝে বিশ্বজগত উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। (ইকবাল-৫, পৃ. ১১)

ইকবাল দুবছর সময়ের মধ্যে আসরারে খুদী রচনা করেন। তিনি এ গ্রন্থের রচনা সম্পর্কে নিজেই এভাবে মন্তব্য করেন।কোনো কোনো ঐ গ্রন্থের কবিতা রচনার কাজে এতই মশগুল হয়ে যেতাম যে, ঘুমাতাম না। ভারতের মুসলমানরা বহু শতাব্দি যাবৎ ইরানি চিন্তাধারায় প্রভাবাধীন। তারা আরবি, ইসলাম ও তার লক্ষ্য-উদ্দেশ্যের আদৌ কোনো খবর রাখে না। তাদের সকল সাহিত্যিক আশা-আকাঙ্খা সামাজিক লক্ষ্য ইরানি চিন্তাধারা থেকে উৎসারিত। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এরূপ দাবি করা নয় যে, আমি আমার একাব্যগ্রন্থের মাধ্যমে ইসলামের প্রকৃত রূপের উপর থেকে আবরণ অপসারণ করবো এবং রাসুলউল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াস সাল্লাম যেভাবে

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামকে উপস্থাপন করেছেন সেভাবে ইসলামকে উপস্থাপন করবো। সুফি-দরবেশ হবার দাবিদার লোকেরা একে তাসাউফের ওপর হামলা বলে গণ্য করেছেন। অধম্য তাঁদের এ ধারণা অনেকাংশে সত্য। ইনসাআল্লাহ, গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে তা তুলে ধরবো। (ইকরাম- ৩৩, পৃ. ২৬)

এরপর ১৯২০ সালে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক আর এ নিকলসন Secrets of the self ইরান আমে আসরার খুদী এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। প্রফেসর মুহাম্মাদ ইউসুফ সেলিম চিশতি উর্দু ভাষায় আসরারে খুদী এর ব্যাখ্যা রচনা করেন। প্রফেসর ই.জি ব্রাউন ১৯২১ সালে এয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটি (Royal Asiatic society) এর সাময়িকীতে আসরারে খুদী এর অনুবাদের ভুলত্রুটিসমূহ সংশোধন করেন তা নতুন করে পেশ করে। ফরেস্টার গ্রন্থটির ওপর বিস্তারিত সমালোচনা লিখেন এবং আল্লামা ইকবালকে তাঁর মিল্লাতের মহান পথপ্রদর্শক বলে আখ্যায়িত করেন। ইউরোপের খ্যাতনামা সাহিত্য সমালোচক হারবাটি বীড় আসরারে খুদী এর ভূয়সী প্রশংসা করেন। তিনি বলেন যে, আসরারে খুদী যুবকদের মধ্যে পরিপূর্ণ প্রভাব বিস্তার করেছে। তিনি একে কবিতার অলৌকিকত্ব বলে অভিহিত করেন এবং একে উজ্জ্বল আয়নার সাথে তুলনা করে বলেন যে, এতে আধুনিক দর্শনের বেশিরভাগ দিকই প্রতিফলিত হয়েছে। (তারিক-৫৩, পৃ. ৫৪)

আল্লামা ইকবাল তাঁর আসরারে খুদী গ্রন্থে যেসব বিষয় আলোচনা করেছেন তা হচ্ছে সৃষ্টিজগতের প্রাণের ধারাবাহিকতা বিদ্যমান, 'উদ্দেশ্য-লক্ষ্যসমূহের বাস্তবায়নের মাঝেই খুদীর প্রাণশীলতা নিহিত, অন্যের কাছে হাত পাতা তথা কারো মুখাপেক্ষী হওয়ার মধ্যদিয়ে মানুষ খুদীকে দুর্বল করে ফেলে, খুদী যখন প্রেম-ভালবাসা থেকে শক্তি অর্জন করে তখন তা সৃষ্টি জগতের প্রকাশ্য ও গোপন শক্তিসমূহকে আয়ত্তাধীন করে নেয়, খুদীকে অস্বীকৃতির বিষয়টি পরাজিত চরিত্রকে দুর্বল করে ফেলে, 'মুসলিম জাতিসমূহ গ্রিক দার্শনিক প্লেটোর তাসাউফ ও সাহিত্যের দ্বরা দারূনভাবে প্রভাবিত হয়েছে, তাই তিনি (প্লেটো যে কর্মপদ্ধতি গ্রহণ করেছেন তা এবং তাঁর কল্পনাসমূহ পরিত্যাগ করা ও তা থেকে দূরে থাকা অপরিহার্য, কবিতার গূঢ় তাৎপর্য এবং ইসলামি সাহিত্যের সংস্কার, খুদীর প্রশিক্ষণের তিনটি পর্যায়: আনুগত্য আত্মপ্রবৃদ্ধির নিয়ন্ত্রণ বা আত্মসংযম এবং আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব, 'হযরত আলী (রা.) এর নাম সমূহের গূঢ় তাৎপর্যের ব্যাখ্যা, 'মারভ এর এক যুবকের কাহিনী–যে হযরত আলী হুজবিরী (রাহ) এর নিকট গিয়ে তার ওপর তার শত্রুদের জুলুম সম্পর্কে অভিযোগ করেছিলো, তৃষ্ণার্ত এক পাখির, হীরক ও কয়লার কাহিনী, 'শেখ ও ব্রাহ্মণের কাহিনী এবং 'গঙ্গা নদী ও হিমালয়ের কথোপকথন। এতে ইতিহাস-ঐতিহ্যকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকার মধ্যেই একটি জাতির জীবনের যে ধারাবাহিকতা নিহিত রয়েছে সে বিষয় আলোকপাত করা হয়, 'মুসলমানের জীবনের লক্ষ্য হবে আল্লাহর বাণীকে বুলন্দ করা এবং জিহাদের লক্ষ্য যদি পার্থিব হয় তাহলে তা ইসলামের বিধি বহির্ভূত, বাবায়ে সাহারায়ী নামে দেয়া উপদেশ, তরবারির যুগ 'ও প্রার্থনা ইত্যাদি।

উল্লেখ্য যে, অত্র কাব্যগ্রন্থের কবিতায় এরূপ দীর্ঘকায় শিরোনাম তিনি ব্যবহার করেছেন-যা আমরা ওপরে লিপিবদ্ধ করেছি।

রোমুযে বেখুদী (আত্মলোপের রহস্যাবলি):

আসরারে খুদী কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের অব্যবহিত পরেই ইকবাল এর দ্বিতীয় অংশ রচনায় মনোনিবেশ করেন। পূর্বোক্ত গ্রন্থের কথা উল্লেখ করেছিলেন। সে অনুযায়ী তিনি রচনার কাজ দ্রুততার সাথে সম্পন্ন করেন। রোমুযে বিখুদী-কে আসরারে খুদী এর দ্বিতীয় খণ্ড বলা চলে। এটি ১৯১৮ সালে প্রকাশিত হয়। আল্লামা ইকবাল এ গ্রন্থটি মুসলিম জাতির নামে উৎসর্গ করেন। তিনি এ গ্রন্থে প্রমাণ করেন যে, ইসলামের বিধি বিধানই একমাত্র ও মবোর্ত্তম জীবন বিধান। তাই তিনি আলোচ্য গ্রন্থে ইসলামের বিভিন্ন মূলনীতি ও বিধানগুলো সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করেন এবং স্মরণ করিয়ে দেন যে, খুদীর (আত্মসত্তার) বৈশিষ্টসমূহের হেফাজত করা এবং এরপর জাতির বিকাশ, বিস্তার ও পূর্ণতার নিমিত্ত স্বীয় ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্যকে উৎসর্গ করা মুসলিম জাতির অপরিহার্য কর্তব্য। অর্থাৎ ব্যক্তিকে সমাজের জন্য স্বীয় অস্তিত্বকে উৎসর্গ করতে হবে। গ্রন্থটির পরবর্তী সংস্কারণে এই কাব্যগ্রন্থকে

Dhaka University Institutional Repository

আসরারে খুদী ও রোমুযে বিখুদী একত্র করে আসরার ও রোমুয নামে প্রকাশ করা হয়। মুসলমানরা যে শ্রেষ্ঠ জাতি এ গ্রন্থের শুরুতে ইকবাল সে কথাই ব্যক্ত করেছেন। তিনি বলেন:

ای ترا حق خاتم اقوام کرد   بر تو آغاز را انجام کرد

ও হে, তোমাকে আল্লাহ সকল জাতির মুকুট করেছেন
সকল কিছুর সূচনা তোমার তরেই সম্পন্ন করেছে। (ইকবাল ৫, পৃ. ৫৫)

এর পরপরই তিনি ব্যক্তির সাথে মিল্লাত বা জাতির সম্পর্ক যে ওতোপ্রোতভাবে জড়িত রয়েছে সে সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য তুলে ধরে বলেন :

فرد را ربط جماعت رحمت است   جوهر او را کمال از ملت است

সমাজের সাথে ব্যক্তির সম্পর্ক আশীর্বাদতুল্য
আর জাতির মাধ্যমেই পূর্ণতা আলোচিত হয়েছে প্রকৃতি। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৫৮)

এ কাব্যগ্রন্থে যেসব বিষয় আলোচিত হয়েছে তা হলো: মুসলিম মিল্লাতের প্রতি উৎসর্গ, 'ব্যক্তি ও মিল্লাতের সম্পর্ক' ব্যক্তি সমষ্টির দ্বারা মিল্লাতের উৎপত্তি এবং নবুওয়াতের মাধ্যমে তার শিক্ষার পূর্ণতা ' তাওহীদের প্রথম স্তম্ভ হলো মুসলিম মিল্লাতের মূল স্তম্ভ, 'হতাশা, দুঃখবোধ ও ভীতি সমস্ত পাপাচারের উৎস এবং তা জীবণীশক্তি ও তাওহীদকে ধ্বংস করে দেয়, তীর ও তলোয়ারের বিতর্ক, সিংহ I ও বাদশাহ আওরঙ্গজেবের কাহিনী, দ্বিতীয় স্তম্ভ রিসালাত, রিসালাতে মুহাম্মাদী (সা.এর লক্ষ্য মানব সন্তানদের জন্য স্বাধীনতা, সাম্য ও ভ্রাতৃত্ব সৃষ্টি করা, ইসলামি ভ্রাতৃত্ব প্রসঙ্গে আবু উবাইদ ও জাকানের কাহিনী, ইসলামি স্বাধীনতা এবং কারবালার ঘটনার গূঢ় রহস্য, যেহেতু মুহাম্মাদী মিল্লাত তাওহীদ ও রিসালাতের ওপর প্রতিষ্ঠিত সেহেতু তার কোনো ভৌগলিক সীমারেখা নেই, জন্মভুমি মিল্লাতের ভিত্তি নয় 'মুহাম্মাদী মিল্লাতের জন্য কালিক সীমাবদ্ধতা নেই, অতএব, তার টিকে থাকার বিষয়টি ও প্রতিশ্রুতি নয়, আদর্শ ছাড়া মিল্লাত গঠিত হয় না এবং মুহাম্মাদী মিল্লাতের আদর্শ হচ্ছে কুরআন, পতনের যুগে তাকলীদ (অনুসরণ) ইজতিহাদের তুলনায় উত্তম, খোদায়ী আদর্শের অণুসরণেরই জাতীয় জীবনের জন্য ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য কেন্দ্র অপরিহার্য এবং ইসলামি মিল্লাতের কেন্দ্র বায়তুল হারাম (কাবাগৃহ)' প্রকৃত একতা জাতীয় লক্ষ্যকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করা থেকে উৎসারিত হয় এবং মুহাম্মাদী মিল্লাতের লক্ষ্য হচ্ছে তাওহীদের হেফাজত ও বিস্তার, বিশ্বব্যবস্থার শক্তিকে করায়ত্ত করার মধ্য দিয়েই জাতীয় জীবনের সম্প্রসারণ ঘটে, জাতীয় জীবনের পূর্ণতা এতে নিহিত যে, মিল্লাত বিবক্তের মতোই খুদী কে (আত্মসত্তা) অনুভব করবে এবং জাতীয় ঘটনাবলির সংরক্ষণ থেকেই এ অনুভূতির উদ্ভব ও পূর্ণতা প্রাপ্তি সম্ভব, মাতৃত্ব থেকেই প্রাণীকুল টিকে থাকে আর ইসলামের মাতৃত্ব হচ্ছে এর হেফাজত ও এর প্রতি সম্মান প্রদর্শন, নারীকুল শিরোমণি ফাতেমা যাহারা মুসলিম নারীদের জন্য পরিপূর্ণ অনুসরণীয় আদর্শ, 'ইসলামে বর্ণিত নেশাকর দ্রব্যাদি প্রসঙ্গে, গ্রন্থের মাসনাভীর (দ্বিপদী) সংক্ষিপ্তসার সূরা এখলাসের ব্যাখ্যায় নিহিত, এবং রাহমাতুল্লিল আলামীন (সা.) এর খেদমতে কবির স্বীয় অবস্থা বর্ণনা ইত্যাদি। (তারিক-৫৩,পৃ.৫৭)

পায়ামে মাশরেক (প্রাচ্যের বাণী):

জার্মান ভাষায় প্রসিদ্ধ কবি গ্যাটের দিওয়ানে গারবী (West-Ostlicher Divan) গ্রন্থের প্রত্যুত্তরে আল্লামা ইকবাল পায়ামে মাশরেক কাব্যগ্রন্থটি রচনা করেন। এ গ্রন্থটি আফগানিস্তানের তৎকালীন বাদশাহ আমীর আমানুল্লাহ খানকে উৎসর্গ করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে, আমীর আমানুল্লাহ খানের পিতা আমীর হাবিবুল্লাহ খান ১৯১৯ সালে নিহত হওয়ার পরেই তিনি আফগানিস্তানের সিংহাসনে আরোহন করেন। এ সময় থেকেই তিনি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। কেননা তিনি এটাকে দাসত্বই মনে করতেন। আর এ কারণেই ইকবাল তাঁর

Dhaka University Institutional Repository

প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। ইকবাল পায়ামে মাশরেক কাব্যগ্রন্থের রচনা শুরু করেন ১৯১৮ সাল থেকে এবং তা সমাপ্ত করেন ১৯২৩ সালে।

এ কাব্যগ্রন্থটি শুরু হয়েছে লালায়ে তুর (সিনাই পর্বতের টিউলিপ) শিরোনামের একটি দীর্ঘ কবিতা দিয়ে যাতে ১৬৩ জোড়া দ্বিপদী রয়েছে। দ্বিতীয় অংশের নাম আফকার (চিন্তাধারা)। এ অংশে গযল ও খণ্ড কবিতা স্থান পেয়েছে। চতুর্থ অংশের শিরোনাম নাক্শে ফারাঙ্গ (ইউরোপের চিত্র) এবং সর্বশেষ খোরদেহ (বিবিধ) শিরোনামে অনেকগুলো কবিতা এ অংশে সন্নিবেশিত হয়েছে। এতে তিনি নিপশে শোফেন হাওয়ার, হেগেল, টলস্টয়, অগাস্ট কোঁত, আইনস্টাইন প্রমুখ পাশ্চাত্যের বিজ্ঞানী, দার্শনিক ও কবি-সাহিত্যিক এবং রুমী ও গালিব সম্পর্কে বক্তব্য তুলে ধরেছেন।

گمان مکن که بیایان رسید کار مغان
هزار باده ناخورده در رگ تاك است

মনে করোনা,শুড়ি পীরের কাজ হয়ে গেছে;
আঙ্গুর লতায় এখনো সুপ্ত রয়েছে অসংখ্য ধরনের শরাব,
যার স্বদ তুমি এখনো উপভোগ করনি। (ইকবাল-৫, পৃ. ১০৮)

বাংগে দারা, (ঘন্টাধ্বনি):

উর্দু ভাষায় ইকবালের সর্বপ্রথম প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থ হচ্ছে বাংগে দারা-যা এ ভাষায় অনন্য কাব্যগ্রন্থ। এটি ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। আল্লামা ইকবাল তাঁর এ গ্রন্থে শেকোয়া (অভিযোগ), শামো শায়ের (মোমবাতি ও কবি), জোয়াবে শেকোয়া (অভিযোগের জবাব), তুলুয়ে ইসলাম (ইসলামের অভ্যুদয়) ও খেযরে রাহ –এর ন্যায় উচ্ছ্বাস ও উদ্যম সৃষ্টিকারী কবিতাসমূহ স্থান দিয়েছেন। এসব কবিতায় তিনি ভারতীয় উপমহাদেশের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুরাবস্থা তুলে ধরে হিন্দু-মুসলিম নির্বিশেষে ভারতবাসীকে উপনিবেশবাদের এর বিরুদ্ধে জাগ্রত করার চেষ্টা করেন, তিনি একই সাথে স্বাদেশিক ও বিশ্বজনীন ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। বাংগে দারা এখনো পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও ভারতে অন্যতম বহুল পঠিত গ্রন্থ। এতে অন্তর্ভূক্ত কবিতা ও গজলগুলো বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কবিতা সন্ধ্যায় পাঠ করা হয়েছে এবং মাখযান পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁর প্রাথমিক জীবন রচিত বিখ্যাত উর্দু কবিতাগুলো ও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। অনেকটা বিলম্বে গ্রন্থিত হলেও তাঁর এ কাব্যগ্রন্থটি ভারতবর্ষে বিপুলভাবে সাড়া জাগিয়েছিলো। এতে তিনি মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিষয়টি অত্যন্ত জোড়ালোভাবে উপস্থাপন করেন। এর পাশাপাশি ইসলামি ভাবধারাপুষ্ট কবিতাসমূহ এতে অন্তভুর্ক্ত রয়েছে যা তিনি ইংল্যান্ড থেকে প্রত্যাবর্তনের পর রচনা করেছিলেন। মাঝখান পত্রিকার সম্পাদক ব্যরিস্টার আব্দুল কাদের গ্রন্থটির ভূমিকাংশে উল্লেখ করেন যে, এ কাব্যগ্রন্থটি তিনটি পর্যায়ে রচিত। প্রথম অংশে রয়েছে ১৯০৫ সালের পূর্বে রচিত দেশাত্মবোধক কবিতাসমূহ দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বিলাতে অবস্থানকালীন রচিত কবিতাসমূহ এবং তৃতীয় অংশে রয়েছে ১৯০৮ সাল থেকে পরবর্তী সময়ে রচিত কবিতাগুলো।

ইকবাল ইউরোপে অবস্থানকালে ইসলামি মূলনীতি প্রচার করতে যেয়ে এক স্থানে উল্লেখ করেছিলেন:

میں ظلمت شب میں لے کے نکلوں گا اپنے ماندہ کاروں کو
شور فشاں ہوگی آہ میری نفس مرا شعلہ بار ہوگا

আমি ক্লান্ত শ্রান্ত কাফেলাকে নিয়ে তিমির রজনীতে বেরিয়ে পড়বো

Dhaka University Institutional Repository

আমার দীর্ঘশ্বাসের আহ! ধ্বনি থেকে উদগত হবে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ। (চিশতি-১৫, ভূমিকা অংশ)

যাবুরে আজম (অনারব সংগীত):

গ্রন্থটি ১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয়। যাবুরে আজম (অনারব সংগীত) কাব্যগ্রন্থটির প্রথম ও দ্বিতীয় শিরোনাম গোলশানে রাযে জাদীদ (নতুন রহস্যের ফুলবাগান)। তিনি শেষ মাহমুদ শাবেস্তারীর লেখা গুলশানে রায এর জবাবে গুলশানে রাযে জাদীদ রচনা করেন। এতে ইকবাল নয়টি প্রশ্ন উপাস্থাপন করেন এবং এরপর প্রতিটি প্রশ্নের বিস্তারিত জবাব প্রদান করেন। তিনি আধুনিক মন মানসের উপযোগী করে প্রদান করেন। তিনি করর্মজগতে এসব বিষয়ের প্রভাবে ও তুলে ধরেন। চতুর্থ ভাগের শিরোনামে বান্দেগী নামে (গোলামির কথিকা) এতে তিনি দাসত্বের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। এতে তিনি যন্ত্রসঙ্গীত ও চিত্রকলার ন্যায় শিল্পসমূহকে গোলামির শিল্প হিসাবে সমালোচনা করেন। এরপর তিনি গোলামির ধর্ম ও প্রেমিকদের ধর্মের মধ্যে তুলনা করেন ও তার সবশেষে তিনি স্থাপত্য শিল্পকে মহানুভবদের বৈশিষ্ট্য বলে উল্লেখ করেন ও তার প্রশংসা করেন। প্রফেসর আরবেরী নামে যাবুরে আজম এর ইংরেজি অনুবাদ করেন। কবি বান্দেগী নামে এর একস্থানে বলেন:

دین و دانش را غلام ارزان دهد   تا بدن را زنده دارد جان دهد

গোলাম সেতো সন্ধ্যায় বেঁচে দেয় তার ধর্ম ও বিবেককে
শরীরকে সে জীবন্ত রাখতে দেয় বিসর্জন। (ইকবাল -৫, পৃ. ১৮৪)

জাভিদ নামে (অমর লিপি):

আল্লামা ইকবাল এ কাব্যগ্রন্থটি ১৯২৯ সালে ইতালীয় কবি দান্তের ডিভাইন কমেডি (The Divine comedy) এর জবাবে লেখা শুরু করেন এবং ১৯৩২ সালে তা সমাপ্ত ও প্রকাশিত হয়। তিনি এ গ্রন্থটি স্বীয় পুত্র জাভিদ ইকবালের নামে নামকরণ করেন। জাভীদ নামে (উমর লিপি) ইকবালের অন্যতম অমর কাব্যগ্রন্থ।

মূলত ইকবাল হযরত নবী করীম (সা.) এর মিরাজের ঘটনাবলি ও গূঢ় তাৎপর্য নিয়ে লেখার ব্যাপারে অনেক আগ থেকেই চিন্তা করে আসছিলেন। ইতমধ্যে ডিভাইন কমেডি এর ওপর রচিত এক সমালোচনা থেকে স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এর অনেক দৃশ্যই রাসুলে আকরাম (সা.) এর মিরাজের ঘটনাবলি থেকে নেয়া হয়েছে। এরপর তিনি জাভীদ নামে রচনায় হাত দেন।

এ গ্রন্থের শুরুতে ইকবাল মুনাজাত শীর্ষক একটি কবিতা অন্তর্ভুক্ত করেন। এরপর পর্যায়ক্রমে তিনি আসমান ও যমিনের ভাষায় কিছু বক্তব্য উপস্থাপন করেন। অতঃপর ইকবাল মাওলানা রুমীর একটি প্রসিদ্ধ গযলের দ্বারা স্বীয় বক্তব্যের সূচনা করেন। এর মধ্যদিয়ে তিনি দেখাতে চেয়েছেন যে, রুমীর গযলকে ভূমিকা হিসেবে গ্রহণ করার পর রুমীর আত্মা তাঁর নিকট নেমে আসে। ইকবাল তাঁর নিকট সৃষ্টির রহস্য জিজ্ঞেস করেন। রুমী তার বিস্তারিত জবাব দিলে ইকবালের মনে অস্থিরতার সৃষ্টি হয়। এরপর একজন ফেরেশতা এসে ইকবালের নিকট রহস্যাবলি ব্যক্ত করেন। এরপর ইকবাল মাওলানা রুমীর পথনির্দেশ অনুসরণে তাঁর সাথে চন্দ্রলোকে গমন করেন। সেখানে রুমী তাঁকে একজন ভারতীয় আরেফের (বিশ্বমিত্র) সাথে পরিচয় করিয়ে দেন এবং তিনি বিভিন্ন আধ্যাত্মিক বিষয়ে আলোচনা করেন।

এক সময় ইকবাল রুমীর সাথে তাওয়াসিন পান্তরে উপনীত হন এবং সেখানে গৌতম বুদ্ধ, যারতুশত ও হযরত মুহাম্মদ (সা.) কে দেখতে পান। এরপর তঁরা বুধ গ্রহে উপনীত হন। সেখানে তাঁরা সাইয়্যেদ জামালুদ্দীন আফগানী ও সাইয়্যেদ হালীম পাশার সাক্ষাত পান। তঁদের সাথে ইকবাল সমাজতন্ত্র, রাজতন্ত্র প্রাচ্য পাশ্চাত্য

Dhaka University Institutional Repository

কুরআনী জগত ইত্যাদি বিষয় আলোচনা করেন। এরপর তঁরা শুক্রগ্রহে পৌছেন। এখানে তাঁরা প্রাচীনকালের দেবতাদের জলসা দেখতে পান। তারপর শুক্রগ্রহের সমুদ্রে অবগাহন করেন এবং ফেরাউনের আত্মার সাথে কথা বলেন। অতঃপর তাঁরা মঙ্গলগ্রহে যান এবং সেখানকার এক দার্শনিকের সহায়তায় শহর পরিদর্শন করেন ও তক্‌দির বা নিয়তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

এরপর তাঁরা বৃহস্পতি গ্রহে নেমে আসেন এবং সেখানে মানসুর হাল্লাজ গালিব ও ইরানের এক কালের প্রসিদ্ধ মহিলা কবি কুরবাতুল আইন তাহেরার সাক্ষাত পান এবং তাঁদের প্রত্যেককেই এক একটি গযল শুনিয়ে দেন। সেখান থেকে তাঁরা শনি গ্রহে উঠে আসেন। এখানে তাঁরা স্বীয় জাতির সাথে বিশ্বাসঘাতকতাকারী বাংলার নবাব মীর জাফর ও মহীশূরের টিপু সুলতানের বিশ্বাসঘাতক তেওয়ান মীর সাদেকের সাক্ষাত পান এবং তাদেরকে শাস্তি ভোগ করতে দেখেন। এরপর তিনি ভারত উপমহাদেশের আত্মাকে আর্তনাদ করতে দেখেন। এখানে তিনি ভারতবর্ষের পরাধীনতা ও রাজনৈতিক অস্থিরতার প্রসংগ তুলে ধরেন।

এরপর তাঁরা রভোকের অনন্ত পথে চলে যান এবং সেখানে জার্মান দার্শনিক নিটশেকে সত্য সন্ধানে দিশেহারা অবস্থায় দেখতে পান। এ দিশেহারা অবস্থা ইকবালকে ব্যথিত করে। অত:পর তাঁরা জান্নাতুল ফেরদাউসে যান এবং পাঞ্জাবের শাসক আব্দুস সামাদের কন্যা শারফুন্নেসার প্রাসাদ দেখতে পান। এরপর তাঁরা আমীর কাবীর, সাইয়্যেদ আলী হামেদানী ওমোল্লা তাহের গাণী কাশ্মীরীর সাথে সাক্ষাত করেন। এ সময় ইকবাল ইংরেজদের পক্ষ থেকে কাশমীরকে গওলাব সিং এর নিকট বিক্রি করা সম্পর্কে বলেন:

باد صبا اگر به جنیوا گذر کنی
حرفی زمابه مجلس اقوام بازگوی
دهقان و کشت وجوی و خیابان فروختند
قومی فروختند وبه ارزان فروختند

হে পবের হাওয়া ! যদি জেনেভায় যাও তা হলে
জাতিপুঞ্জের নিকট আমাদের একটি কথা পৌঁছে দিও।
কৃষক, কৃষিক্ষেত্র, খাল ও নালা ,আর রাস্তা-ঘাট সবই বিক্রি করে দিয়েছে
একটি জাতিকে বিক্রি করেছে, আর কতই না সস্তায় তা বিক্রি করেছে। (ইকবাল -৫, পৃ. ৩৬০)

এখানে তিনি ভারতীয় প্রাচীন কবি তত্বহরির সাথে সাক্ষাত করেন। এরপর তিনি নাদির শাহ, আহমদ শাহ আবদালী ও শহীদ টিপু সুলতানের প্রাসাদে যান এবং তাঁদের কাছে মনোবেদনা ব্যক্ত করেন। এরপর কবি বেহেশত থেকে ভূলোকে ফিরে আসেন এবং আল্লাহ তায়ালার মহিমা ঘোষণা করে এ ভ্রমনের সমাপ্তি টানেন। উর্ধ্বলোকে পরিভ্রমণের বিষয়বস্তুর দৃষ্টিকোণ থেকে দান্তেরর ডিভাইন কমেডি এবং সুফি দার্শনিক মহীউদ্দীন ইবনুল আরাবীর আল ফুতুহাতুল মাক্কিয়্যাহ এরসাথে ইকবালের জাভীদ নামে-এর তুলনা করা চলে। কিন্তু এ ক্ষেত্রে উক্ত গ্রন্থদ্বয়ের সাথে জাভীদ নামে এর বড় ধরনের দু'টি পার্থক্য হচ্ছে ইকবাল বেহেশতের কথা যতটা এনেছেন সে তুলনায় দোযখের দিকে কম দৃষ্টি দিয়েছেন, কেবল শনিগ্রহে রক্তের গহ্বরে শাস্তির কথা উল্লেখ করেছেন। সবচেয়ে বড় পার্থক্য হচ্ছে ইকবাল উর্ধ্বলোকে গিয়ে ও মৃত্যুলোকের সমস্যাবলির সমাধান খুঁজেছেন। গ্রন্থের শেষে তিনি স্বীয় পুত্র জাভীদকে সম্বোধন করে মুসলিম যুবসমাজকে ধর্মের মূল শিক্ষায় উদ্ভুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। যেমন তিনি বলেন:

در ره دین سخت چون الماس زی   دل بحق بر بند وسواس زی

ধর্মের পথে তুমি কঠিন হিরক খণ্ডের ন্যায় বেঁচে থাকো

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহর সাথে হৃদয় বাঁধো আর কুমন্ত্রণাহীন জীবন লাভ করো। (ইকবাল -৫, পৃ. ৩৮৪)

প্রফেসর আলেসান্দো বাউসানী (Professor A Bausami) ইতালীয় ভাষায়
জাভীদ নামে-এর পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন।

Reconstruction of Religious Thought in Islam

এটি হচ্ছে ইংরেজি ভাষায় প্রদত্ত ইকবালের সাতটি ভাষণের সংকলন: ১৯২৯ সালে মাদ্রাজ, হায়দারাবাদ ও মহিশৌরে তিনি এ ভাষণগুলো প্রদান করেন এবং পরবর্তী বছর তা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সর্বপ্রথম Oxford University press হতে প্রকাশিত হয়। ভাষণগুলোর বিষয়বস্তু নিম্নরূপ:

১। knowledge and religious Experience (জ্ঞান ও ধর্মীয় অভিজ্ঞতা)

২। The philosophical tests of the Revelation of Religiuo Experince দর্শনের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রত্যাদেশ সম্বন্ধীয় ধর্মীয় অভিজ্ঞতা)

৩। The conception of God and the Meaning of prayer (খোদাতত্ব ও ইবাদতের মর্মবাণী)

৪। The Human Ego .his Freedom and Immortality (মানবীয় খুদী, তার স্বাধীনতা ও অমরতা)

৫। The Spirit of Muslim Culture (ইসলামি সংস্কৃতির মর্মবাণী)

৬। The Principle of Moverment in the Structure of Islam (ইসলামি ব্যবস্থাপনায় গতিশীলতার বিধান)

৭। Is Religion Possible? (ধর্ম কি সম্ভব)

ইকবাল ইসলাম ও দর্শন এর দৃষ্টিতে এসব বিষয়ের আলোচনা করেন। পূর্বসূরীরা স্রষ্টাতত্ব ও প্রকৃতি সম্বন্ধে যে দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশ করতেন ইকবাল বুদ্ধিভিত্তিক সমাজের পথনির্দেশের জন্য সে সবকে নতুন ভঙ্গিতে প্রকাশ করেন। এ গ্রন্থ রচনার মধ্য দিয়ে ইকবালের দার্শনিক যোগ্যতার পরিচয় ঘটে। গ্রন্থটি উর্দু ও ফারসি ভাষায় অনুদিত হয়েছে।

বালে জিব্‌রীল (জিবরাইলের ডানা):

এটি হচ্ছে ইকবালের দ্বিতীয় উর্দু কাব্যগ্রন্থ। দীর্ঘ বিরতির পর ইকবাল পুনরায় এই উর্দু কাব্যগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থটি ইকবালের ইন্তেকালের তিন বছর পূর্বে ১৯৩৫ সালে প্রকাশিত হয়। ইকবালের উর্দু কাব্যের শীর্ষে রয়েছে বালে জিব্‌রীল গ্রন্থটি। এতে গযল কবিতা, চতুষ্পদী কবিতা,শ্লেষাত্মক কবিতা প্রভৃতি স্থান পেয়েছে। এছাড়া মুসলিম জাতির হৃদয়ে আন্তরিকতা ও দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন এবং মুসলিম উম্মহর সদস্যদেরকে সত্যিকারের বিশ্বসীরূপে তৈরি করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় দৃষ্টিভঙ্গি ও বুদ্ধিমত্তা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে এগুলো রচনা করেন। এর শেষভাগের কতগুলো কবিতা রচনার প্রেরণা তিনি স্পেনের মুসলিম যুগের রচনাবলি থেকে লাভ করেন। তিনি ১৯৩৩ সালে লণ্ডনে অনুষ্ঠিত গোলটেবিল বৈঠক থেকে প্রত্যাবর্তনের পথে স্পেনে যাত্রা বিরতিকালে এসব রচনার সাথে পরিচিত ও এর দ্বারা প্রভাবিত হন। এসব কবিতার মাধুর্য অতুলনীয়। এসব রচনায় আধুনিক শিক্ষায় তুলনায় ধর্মীয় শিক্ষার প্রতি অধিক গুরত্ব প্রদান করা হয়েছে। যেমন:

چشم بینا سے ہے جاری جوئے خون

Dhaka University Institutional Repository

علم حاضر سے ہے دیں زار و زبوں

দৃষ্টিমান চোখ থেকে রুধিরাশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে,
আধুনিক জ্ঞানের দ্বারা ধর্মের মর্যাদাহানি ঘটছে। (ইকবাল-১১, পৃ. ৪৬২)

অর্থাৎ ইকবাল বলতে চেয়েছেন যে, মুসলমানরা আধুনিক তথা পাশ্চাত্য শিক্ষা লাভ করে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেছে। আর এ অবস্থা দেখে প্রকৃত মুসলমানদের অন্তরে একটা বেদনা সঞ্চারিত হয়। সমাজের নিগৃহীত ও শ্রমিক শ্রেণিকে জাগরিত করার লক্ষ্যে তিনি শোষকের বিরুদ্ধে যে সংগ্রামের আহ্বান জানান তা তাঁর এ কাব্যগ্রন্থের এক জায়গায় বিধৃত হয়েছে এভাবে:

اٹھو! مری دنیا کے غریبوں کو جگا دو
کاخ امرا کے در و دیوار ہلا دو
جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

'ওঠ,-দুনিয়ার গরীব ভুখারে জাগিয়ে দাও।
ধনিকের দ্বারে ত্রাসের কাঁপন লাগিয়ে দাও।
কিষাণ মজুর পায় না যে মাঠে শ্রমের ফল,
সে মাঠের সব শস্যে আগুন লাগিয়ে দাও। (ফররুখ -৩৫, পৃ. ৩৩৫)

যারবে কালীম (মুসার আঘাত):

এটি হচ্ছে আল্লামা ইকবালের তৃতীয় উর্দু কাব্যগ্রন্থ। কবি যারবে কালীম কাব্যগ্রন্থটিকে বর্তমান যুগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের ঘোষণা বলে অভিহিত করেছেন। কাব্যগ্রন্থটি ১৯৩৬ সালের মে মাসে প্রকাশিত হয়। আর এর দু'বছর পরই কবি মৃত্যুবরণ করেন। ইকবালের কাব্যগ্রন্থগুলোর মধ্যে যারবে কালীম বিশেষ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিলো, সংক্ষিপ্ত আকারে হলেও এর মধ্যে মুসলমানদের অনেক ব্যথা-বেদনার কথা উপস্থাপিত হয়েছে। এতে ছয়টি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় সন্নিবেশিত হয়েছে যাতে ইকবাল দুনিয়ার সকল সমস্যাবলিকে ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে আলোচনা করেছেন। এগুলো হচ্ছে (:১) ইসলাম ও মুসলিম (২) শিক্ষা-দিক্ষা ও প্রশিক্ষণ, (৩) নারী, (৪) সাহিত্য ও শিল্পকলা, (৫) প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের রাজনীতি,ও (৬) মেহরাবে গোল আফগানের চিন্তা প্রভৃতি উল্লেখ্য, এছয়টি অধ্যায় ছাড়াও অত্র কাব্যগ্রন্থের শুরুতে তিনি ভূপালের নওয়াব স্যার হামিদুল্লাহ খানকে নিবেদন করে ফারসিতে একটি কবিতা রচনা করেন। যেমন তিনি বলেন:

زمانه با امم ایشیا چه کرد و کند
کسی نه بود که این داوتان فروخواند
تو صاحب نظری آنچه در ضمیر من است
دل تو بیند و آندیشه تو می داند
بگیر این همه سر مایه بهار از من
که گل بدست تو از شاخ تازه تر ماند

দেখো এশিয়ার জাতিগুলোর সাথে যুগের কি বিচিত্র আচরণ

এই কাহিনী পাঠের মতো উপযুক্ত দেখছিলো তো কাউকে আর
আমার হৃদয়ে যা কিছু আছে তার সূক্ষ্মদর্শী তুমি
তোমার হৃদয়ে যা দেখছে, তা তোমার চিন্তা উপলব্ধি করছে।
আমার কাছ থেকে তুমি গ্রহণ করো বসন্তের এ সকল পুঁজি
কেননা ফুল তোমার হাতে শাখার চেয়েও সতেজ থাকবে। (ইকবাল-৫, পৃ. ৫২১)

আল্লামা ইকবাল উক্ত অধ্যায়গুলোতে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে অত্যন্ত সংক্ষেপে কিন্তু পূর্ণাঙ্গভাবে আলোচনা করেছেন। এতে তিনি কাল্পনিক ব্যক্তি মেহরাবে গোল আফগানের চিন্তাদর্শন নামে আফগান জনগণের উদ্দেশে যে মুক্তির পথ প্রদর্শনমূলক বাণী দিয়েছেন তা অন্যান্য মুসলিম জাতির জন্যে শিক্ষণীয়। ইকবাল মুসলমানদেরকে তাদের ব্যক্তিত্বের মাঝে আমূল পরিবর্তনের আহ্বান জানিয়ে বলেন:

تری دعا سے قضا تو بدل نہیں سکتی مگر ہے اس سے یہ ممکن کہ تو بدل جائے

কেবল তোমার প্রার্থনায় ভাগ্যতো পরিবর্তিত হবে না,
তবে তাতে অন্তত তুমি বদলে যাওয়া সম্ভবপর (ইকবাল-১১, পৃ. ৬৭৬)

এ কাব্যগ্রন্থের এক স্থানে ইকবাল বলেন:

کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے   مومن کی یہ پہچاں کہ گم اس میں آفاق

কাফেরের লক্ষণ হলো সে দিগন্তে হারিয়ে যায়
আর মুমিনের লক্ষণ হলো দিগন্ত তার মাঝে হারিয়ে যায়। (ইকবাল ১১, পৃ. ৫৫৭)

মুসাফির (পরিব্রাজক):

এটি একটি ফারসি মাসনভী কাব্যগ্রন্থ | নাদির শাহের আমন্ত্রণে ১৯৩৩ সারে আফগানিস্থান সফরের সময় ইকবাল এটি রচনা করেন। এ গ্রন্থে প্রথমে তিনি সীমান্তবর্তী আফগান গোত্রসমূহের সম্বোধন করে বক্তব্য রাখেন। এরপর তিনি কাবুলে নাদির শাহের সাথে সাক্ষাত করেন। অত:পর মোগল বাদশা বাবরের কবর যিয়ারত করেন। এতে তিনি বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান ও বিভিন্ন সমাধিস্থল পরিদর্শনের বর্ণনা করেছেন। তিনি আফগানিস্তানের সমকালীন বাদশাহ জহীর শাহের প্রতি উপদেশের মাধ্যমে এ গ্রন্থ সমাপ্ত করেন।

(পাস চে ব'য়াদ কারদ এই আকওয়ামে শারক?)
(তাহলে কি করতে হবে হে প্রাচ্যের জনগোষ্ঠী!)

এটিও ইকবালের অন্যতম ফারসি কাব্যগ্রন্থ। গ্রন্থটি ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি এভাবে শুরু করা হয়েছে- মাওলানা রুমী সুসংবাদ দিচ্ছেন যে, প্রাচ্য এবার দীর্ঘ ঘুম থেকে জেগে উঠেছে| এরপর তিনি ইকবালকে উপদেশ দেন যাতে করে তিনি প্রাচ্যকে ধর্ম ও রাজনীতির তাৎপর্য জানিয়ে দিতে পারেন। ইকবাল এ কাব্য দু'টি বিষয় তুলে ধরেন। একটি হলো হেকমাতে কালিমী তথা মুসার প্রজ্ঞা বা দর্শন ও হেকমাতে ফিরাউনী বা ফেরাউনের দর্শনের মধ্যকার তুলনা। এরপর তিনি লাইলাহা ইল্লাল্লাহ এবং দারিদ্র্য ও স্বাধীন ব্যক্তি শিরোনামে তাওহীদ, তাসাউফ এবং মুমিন ব্যক্তির গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যসমূহের ব্যাখ্যা পেশ করেন। এরপর শরীয়তের রহস্যাবলি ও তরীকতের গূঢ় রহস্য তুলে ধরেন। অত:পর ভারতীয়দের জন্য অনুপ্রাণিত করেন ও বিপ্লবের আহ্বান জানান। সবশেষে তিনি মহানবী (সা.) এর বরাবরে আবেদন পেশ করেন।

আল্লামা ইকবাল স্বয়ং গ্রন্থটি রচনার পটভূমি সম্পর্কে বলেছেন যে, অসুস্থ অবস্থায় তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, স্যার সাইয়্যেদ আহমাদ তাঁকে নবী করীম (সা.)- এর নিকট আবেদন জানাতে বলেছেন: জেগে উঠেই তিনি নবী করীম (সা.) আবেদনস্বরূপ কয়েক ছত্র কবিতা লিখে ফেলেন: এরপর তিনি ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে ওঠেন এবং গ্রন্থটি রচনা করেন। উল্লখ্য যে, মুসাফির কাব্যগ্রন্থটি এ কাব্যগ্রন্থেরই একটি অংশ হিসাবে গণ্য করা হয়|

Dhaka University Institutional Repository

আরমগানে হেজায (হিজাযের উপঢৌকন):

ইকবালের সর্বশেষ গ্রন্থ হচ্ছে আরমগানে হেজায যা তাঁর মৃত্যুর পরে প্রকাশিত হয়। এতে কবির শেষের দিকের চিন্তাধারা প্রকাশিত হয়েছে। গ্রন্থটির দু'টি অংশ রয়েছে। প্রথম অংশ ফারসি ও দ্বিতীয় অংশ উর্দুতে লেখা। ফারসি ভাগে যে কবিতাগুলো রয়েছে তার শিরোনাম হচ্ছে (১) হুজুরে পাক (আল্লাহ তায়ালার সমীপে), (২) হযুরে রেসালাত (রাসুল (সা.) এর সমীপে) হুযুরে মিল্লাত (জাতির খেদমতে), (৪) হুযরে আলামে এদসানী (মানব জগতের উদ্দেশ্যে, (৫) বে ইয়ারানে তারিক (পথের বন্ধুদের প্রতি) এসব কবিতায় ভারতীয় উপমহাদেশের জনগণের এবং অন্যান্য মুসলিম জাতিসত্তার তথা গোটা বিশ্বের মুসলমানদের দুর্দশা তুলে ধরার পাশাপাশি বাহ্যিক ও ভাষা দৃষ্টির অধিকারী যেসব আলেম প্রকৃত সত্যকে উপেক্ষা করে কুসংস্কার ও ভিত্তিহীন ধারণা-কল্পনাকে আঁকড়ে আছেন তাঁদের কঠোর সমালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অংশ তথা উর্দু অংশে যেসব কবিতা স্থান পেয়েছে তার মধ্যে শয়তানের পরামর্শ সভা হলো অন্যতম এবং এটি ইকবালের এক অনবদ্য সৃষ্টি। এতে তিনি বিশ্বের রাজনৈতিক পরিস্থিতির সমালোচনা করেছেন। তাঁর এ কবিতাটি আরবি ও ফারসিতে অনূদিত হয়েছে। ইকবাল তাঁর এ কাব্যগ্রন্থের ফারসি অংশের এক জায়গায় ইউরোপীয় সভ্যতার সমালোচনা করে বলেন:

مئ از میخانه مغرب چشیدم بجان من که درد سرخریدم
نشستم با نکو یان فرنگی ازآن بی سود تررو زی ندیدم

পশ্চিমের শরাবখানায় আমি পান করেছি রঙিন সুরা,
তাতে লাভ হয়নি কিছুই আমার
শিরঃ পীড়া ব্যতীত,
পশ্চিমা পূর্ণস্বাদের সহচার্য লাভ করেছি আমি দীর্ঘকাল,
নিরর্থক সময় কাটেনি আমার
তার চেয়ে আর কোনদিন। (ইকবাল ৫, পৃ. ৪৪৭)

পত্রাবলি ও বক্তৃতা- বিবৃতির সংকলন:

ইকবালের পত্র, ভাষণ ও বিবৃতি যেসব সংকলন প্রকাশিত হয়েছে তার একটি বিবরণ তুরে ধরা হলো :ইকবালনামা শীর্ষক গ্রন্থটি আল্লামা ইকবালের উর্দুতে লেখা চিঠিপত্রের সংকলন। এটি ইকবালনামা শিরোনামে দুই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে প্রথম খণ্ডে ২৬৭ টি ও দ্বিতীয় খণ্ডে ১৮ টি চিঠি স্থান পেয়েছে।এসব চিঠিপত্রের বেশিরভাগ থেকেই ইকবালের জীবন সম্পর্কে ধারণা লাভ করা যায় এবং এ কারণে তাঁর রচনাবলি ও চিন্তাধারার ওপর গবেষণার ক্ষেত্রে এর মধ্যেই গুরূত্ব রয়েছে।

ইকবাল বিভিন্ন সময় বিভিন্ন খ্যাতনামা ব্যক্তির কাছে যেসকল পত্র দিয়েছিলেন তা বিভিন্ন নামে প্রকাশিত হয়। যেমন ইকবাল ও মহারাজা শ্রীকৃষ্ণ প্রসাদের মধ্যে১৯৪২ সালে প্রকাশিত হয়। আতিয়া বেগমকে ইংরেজিতে লেখা ইকবালের পত্রাবলির একটি সংকলন জিন্নাহর লিখিত ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়। মাকাতিবে ইকবাল শীর্ষক আর একটি পত্র সংকলন ১৯৫৪ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিতত হয় । এটি জলদ্বরের থান নিয়ায উদ্দীনকে লেখা ইকবালের ৭৯ টি পত্রের সংকলন । Speches and statements of Iqbal শিরোনামে ইংরেজি ভাষায় ইকবালের ভাষণগুলোর একটি সংকলন ১৯৫৪ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়। আনোয়ারে ইকবালনামে

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালের প্রবন্ধ ও বিবৃতির সংকলন যা ১৯৬৭ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। Letters and writing of Iqbal নামক সংকলনটিতে ইকবালের কয়েকটি ইংরেজিতে লেখা প্রবন্ধ স্থান পেয়েছে | গ্রন্থটি ১৯৬৭ সালে করাচী থেকে প্রকাশিত হয়। গোফতারে একবাল (ইকবালের উক্তি) নামক ইকবালের গুরূত্বপূর্ণ ভাষণ ও চিঠিপত্রের সংকলন যা ১৯৬৯ সালে লাহোর থেকে প্রকাশিত হয়।

মাকালাতে ইকবাল (ইকবালের প্রবন্ধসমূহ):

এ সংকলনটিতে উর্দু ভাষায় লেখা ইকবালের পাঁচটি অমূল্য প্রবন্ধ, নিজ কাব্য গ্রন্থসমূহের ভূমিকাংশ ও উর্দু ভাষায় অনূদিত ছয়টি ইংরেজি প্রবন্ধ অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। সংকলনটি ১৯৪৯ সালে হায়ারাবাদ থেকে প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলোর শিরোনাম এরূপ: (ক) ১) উর্দু ভাষা,২) পাঞ্জাবে উর্দু ভাষা ৩) জাতীয় জীবন, ৪) সাহিত্য সম্পর্কে বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর নির্দেশনা, ৫) ভৌগলিক সীমান্ত ও মুসলমান।

খ) স্বীয় গ্রন্থাবলির জন্য উর্দু ভাষায় লেখা ইকবালের ভূমিকা। এগুলো হচ্ছে আসরারে খুদী, রোমুযে বিখুদী ও পাইয়ামে মাশরেক-এর ভূমিকা।

গ ছয়টি ইংরেজি প্রবন্ধের উর্দু অনুবাদ, এগুলো হচ্ছে ১) অধ্যাবসয়ের দর্শন (নিকলসনকে লেখা পত্র),২) ইসলামি মিল্লাতের প্রতি সংস্কারমূলক দৃষ্টিপাত, ৩) মুসলিম লীগের সভায় প্রদত্ত সভাপতির ভাষণ, ৪) খতমে নবুওয়াত, ৫) চোখতাই মোরক্কার প্রশংসা ও ৬) কাবুল সাহিত্য সমিতির সভায় প্রদত্ত ভাষণ।

ইকবালের ইংরেজি প্রবন্ধের সংকলন:

১৯০০ সাল থেকে ১৯২২ সাল পর্যন্ত ভারত ও বৃটেনের বিভিন্ন সাময়িকীতে প্রকাশিত ইংরেজি প্রবন্ধের সংকলন। এগুলো হচ্ছে:

১) আব্দুল করীম জীলীর দৃষ্টাতে নিরঙ্কুশ একত্ববাদের মতবাদ:
২) ইসলামের রাজনৈতিক চিন্তা;
৩) ইসলাম ও খেলাফত;
৪ ইসলামি প্রজাতন্ত্রের ব্যাখ্যা;
৫) আপেক্ষিক দর্শনের আলোকে খুদী;
৬) জীবনের অভ্যন্তরীণ উপাদান গঠন;
৭ খোশহাল খান খাটক: আফগানি সৈনিক ও কবি;
৮ মুসলিম আলেমদের গভীর জ্ঞান গবেষণার সমর্থন;
৯ ধর্মের অস্তিত্ব কি সম্ভব? (অ্যারিস্টেটলিয়ান সোসাইটির পদক্ষেপ সমূহের সংক্ষিপ্তসার):
১০) ম্যাক টিগার্টের দর্শনও
১১) শারীরিক পুনরূত্থান প্রসঙ্গ;

রচিত পত্রাবলী হলো:

১. শাদে ইকবাল -১৯৪২
২. ইকবালনামা- ১৯৪৫
৩. আতিয়া ফরজীকে লেখা ইকবালের পত্রাবলী (ইংরেজী) -১৯৪৭
৪. মাকতীবে ইকবাল -১৯৫৪
৫. মকতুবাতে ইকবাল -১৯৫৭
৬. আনোয়ারে ইকবাল -১৯৬৭
৭. লেটারস এ্যান্ড রাইটিংস অব ইকবাল -১৯৬৭
৮. মাকাতীবে ইকবাল বনামে গেরামী- ১৯৬৭
৯. নাওয়াদেরে ইকবাল-বনামে মহারাজা কৃষ্ণ প্রসাদ- ১৯৭৬

Dhaka University Institutional Repository

১০. রুহে মাকাতীবে ইকবাল -১৯৭৭
১১, কায়দে আযমের নামে ইকবালের পত্রাবলী (ইংরেজী)? (নুরুদ্দীন-৩, পৃ. ৩৪)

ওফাত:

১৯৩৪ সালে ইকবাল অসুস্থ হয়ে পড়েন। ১৯৩৫ সালে তাঁর স্ত্রীবিয়োগ হয়। এতে ইকবালের স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হয়। ধীরে ধীরে তাঁর স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে। ১৯৩৮ সালের ২১ এপ্রিল আল্লামা ইকবাল ইনতেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ওফাতের সময় তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৫ বছর ১ মাস ২৯ দিন। লাহোর শাহী মসজিদের পাশ্ববর্তী বাগানে মরহুমকে সমাহিত করা হয়।
ইকবালের বিয়োগে অনেকেই শোক ও মন্তব্য প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নআহ এবং কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের শোকবার্তা নিম্নে প্রদত্ত হলো।
কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ বলেন:

তিনি বিশ্বজোড়া খ্যাত একজন অতুলনীয় কবি ছিলেন। তাঁর রচনাবলী চিরদিন বেঁচে থাকবে। তিনি দেশ ও জাতির জন্য যেসব কার্যাবলী সম্পাদন করেছেন, তা বড় ভারতীয় ব্যক্তির সংগে তুলনীয়। .... তাঁর বিয়োগ এ সময় সারা দেশের জন্য, বিশেষত মুসলমানদের জন্য বিরাট একটি ক্ষতি।

২৫ মার্চ, ১৯৪০ সালে ইকবাল দিবস এর সভায় সভাপতিত্ব করতে গিয়ে কায়েদে আযম বলেন : ভারতে ইসলামি শাসনের প্রতিষ্ঠা দেখার জন্য যদি আমি বেঁচে থাকি এবং সে সময় যদি আমাকে বলা হয় যে তুমি ইকবালের রচনাবলী নেবে নাকি যে কোন ইসলামি স্টেটের সর্বোচ্চ কর্মকর্তা পদে অধীষ্ঠিত হবে এ দুটির মধ্য থেকে যে কোন একটি বস্তু বেরছে নাও তবে আমি প্রথমোক্ত বস্তুকেই গ্রহণ করবো।
ইকবালের তিরোধানে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ বলেন:

স্যার মুহাম্মদ ইকবালের মৃত্যু আমাদের সাহিত্যজগতে এমন একটা শূন্যতা সৃষ্টি করেছে যাকে একটি ধ্বংসাত্মক ক্ষতি বলা যায় এবং যা পূরণ হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। পৃথিবীতে ভারতের মর্যাদা খুবই সীমিত। তাই এমন একজন কবির মৃত্যুশোক, যাঁর কাব্যখ্যাতি বিশ্বজোড়া দেশের জন্য (তাহের ফারুকী পৃ. ৫৯)

মাকাতীবে ইকবাল এর ভূমিকায় ড. মুহাম্মদ আব্বাস আলী হায়দারাবাদীর নামে কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি পত্র রয়েছে। ঐ পত্রে ইকবাল সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের যেসব মন্তব্য রয়েছে তন্মধ্যে কিছুটা কথা নিয়ে পেশ করা হলো:

ইকবালের কাব্যের ভাগ্যে যে জনপ্রিয়তা ও খ্যাতি জুটেছে তার উপর ভিত্তি করে আমি এই নিশ্চিত ধারণা পোষণ করি যে, ইকবালের ঐসব রত্নখচিত সাহিত্যে অবশ্যই স্থায়িত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের উপাদান রয়েছে। এটা বলতে আমার কষ্ট হচ্ছে যে, কোন কোন সমালোচক আমার ও স্যার মুহাম্মদ ইকবালের সাহিত্যকে বিরূপ সমালোচনার মাপকাঠি দিয়ে বিচার করে তারা দেশে ভুল ধারণা প্রচার করছে। আমার বিশ্বাস, স্যার মুহাম্মদ ইকবাল এবং আমি সাহিত্য, সৌন্দয্য ও সত্য প্রকাশের দুজন নির্ভীক সেবক। আমরা উভয়ই সীমান্তের ঐ বিন্দুতে মিলিত হচ্ছি, যেখানে পৌঁছে মানুষের মন মস্তিস্ক বিশ্বমানবতাকে তার সর্বোকৃষ্ট সুন্দরতম ও চিরস্থায়ী উপহার দিতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

দ্বিতীয় অধ্যায়

কালেমায় তায়্যিবায় নিহিত রয়েছে ইকবালের-খুদী দর্শন ও তার ক্ষেত্র:

দ্বিতীয় অধ্যায়

কালেমায় তায়্যিবায় নিহিত রয়েছে ইকবালের-খুদী দর্শনের রহস্য:

فاعلم انه لا اله الا الله

[সুতরাং তুমি জেনে রেখো, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (কুরআন, ৪৭:১৯)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল দর্শনের কেন্দ্রবিন্দু হল খুদী ও' বেখুদী'| এর মানে-আত্মশক্তি অনুভব করে তা প্রতিষ্ঠিত করা এবং সৃষ্টিরাজির উন্নতি বিধানে তা নিয়োজিত করা। এই খুদীর সকল রহস্য 'লা-ইলাহা ইল্লাললাহ' তওহীদের এই কালেমায় নিহিত রয়েছে। (আব্দুল্লাহ-৩৬, পৃ. ২৬)

ইসলাম ধর্মের প্রথম ও প্রধান নির্দেশ হলো এক আল্লাহর দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন করা| আল্লাহর একত্বে বিশ্বাসের ধারণার নামই হলো তাওহীদ। ইসলামকে বলা হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা| ইসলামের বুনিয়াদ পাঁচটি নীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। (এক.) আল্লাহ ছাড়া কোন মাবুদ নেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহর রাসুল (দুই.) নামাজ কায়েম করা (তিন.) যাকাত দেওয়া (চার.) হজ পালন করা এবং (পাঁচ.) রমযান মাসে রোজা রাখা। মানব জীবনেব পূর্ণ বিকাশ সাধনই ইসলামের লক্ষ্য| মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যা ইসলামি ব্যবস্থায় অন্তর্ভূক্ত হয়নি। বস্তুত মানব জীবনের পার্থিব ও অপার্থিব ঐহিক ও পারত্রিক উভয় দিকই ইসলামের জীবন বিধানের অন্তর্গত।

ইসলাম আল্লাহর একত্বের ওপর সর্বাদিক গুরূত্ব প্রধান করে। ইসলাম ধর্মালম্বী মুসলমানগণ কেবলমাত্র মহান আল্লাহ তায়ালার কাছেই মাথা নত করে| অন্য যে কোন প্রধান ধর্মের মতো ইসলাম ও বিশ্বাস ও আচার, তত্ব ও অনুশীনের উল্লিখিত দুটি দিক সুস্পষ্টভাবে চিহ্নিত| ধর্মের নির্দেশনাবলীতে বিশ্বাস স্থাপন করা ও তার যথার্থ অনুশীলন করার জন্য ইসলাম সকল বিশ্বাসকে জোর তাগিদ দিয়েছে। আল্লাহ বিশ্বভূবনের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা, কুলমাখলুকাতের মালিক-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ তায়ালার জন্য। তার সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি তাঁকেও কেউ জন্ম দেয়নি। মহাপ্রভুর কোন শরীক নেই। তিনি অনন্ত শক্তি ও অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী।

ইসলামের মূলমন্ত্র ও ঈমানের সর্বপ্রথম নীতি হলো লাইলাহা ইল্লাল্লাহু'' আল্লাহ ব্যতীত কোনো উপাস্য নেই। মহান আল্লাহ বিশ্বভুবনের সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা কুলমাখলুকাতের মালিক-সমস্ত প্রশংসাই আল্লাহতায়ালার জন্য। তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই। তিনি এক ও অদ্বিতীয়। তিনি কাউকে জন্ম দেননি | মহাপ্রভুর কোনো শরিক নেই। তিনি অনন্ত শক্তি ও অপরিসীম জ্ঞানের অধিকারী।

পরকাল ও ইহকাল উভয় জগতের বাস্তবতার কথা উচ্চারণ করেই ইসলাম মুসলমানদের জ্ঞান, সত্য তথা সামাজিক মূল্যবোধ অর্জনে উদ্বুদ্ধ করেছিল। ইসলামি একত্বের ধারণা এক ধরণের সমন্বয় পদ্ধতির নির্দেশ করে। এই নির্দেশনার মধ্যে রয়েছে অংশ থেকে সমগ্রের দিকে অগ্রসর হওয়ার এক নির্দিষ্ট উপায়ের-অর্থাৎ সব অস্তিত্বের মধ্যে এক প্রকার একত্ব অনুভবের শিক্ষাকে সামাজিক মর্যাদা হিসেবে স্বীকৃতি দান ইসলাম ধর্মের এক উল্লেখযোগ্য দর্শন। ধর্মীয় শিক্ষাই নয়, সামগ্রিককালে পার্থিব বা ধর্মনিরপেক্ষ শিক্ষা বলতে যা বুঝায় ইসলামের দৃষ্টিতে তা কোন মতেই উপেক্ষিত নয়।

ইসলাম পুরোহিত তত্বের কোন স্বীকৃতি নেই| ইসলাম মানুষকে গৃহত্যাগ করেন সন্যাসব্রত পালন করতে উৎসাহী করে না, সংসার ও সমাজজীবনের সার্বিক দায়িত্ব পালন ও সভ্যতা ও সৌভ্রাতৃত্বের নীতিতে পারস্পরিক সহোযোগিতা সহমর্মিতার মনোভাব দিয়ে জীবনযাপনের প্রেরণা যোগায় ইসলাম। ইসলামে মানুষ ও স্রষ্টার মধ্যে কোনো পুরোহিত বা মধ্যবর্তী শক্তির অস্তিত্বকে স্বীকার করেনা, আল্লাহর সৃষ্ট মানুষই তার হৃদয় অকরণ উজাড় করে দুই হাত প্রসারিত করে সরাসরি আল্লাহর কাছেই তাঁর দয়া ও করূনার জন্য ফরিয়াদ জানাতে পারে। এ ক্ষেত্রে ধনী দরিদ্র উচু-নীচু, শেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গের মধ্যে কোনো তারতম্য নেই| গৃহী মানুষ তার অবস্থান করেই পবিত্র ও পরিশীলিত জীবন যাপনের মাধ্যমে আল্লাহর এবাদত করতে পারে| এখানেই সে তার ইহকালিন ও পরকালিন সুখ

শান্তির জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানাতে পারে। ইসলাম ধর্মে এরূপ বিধানই দেওয়া আছে। (ফিরোজা ৩১, পৃ. ৫২-৫৩)

প্রকৃত অর্থে, মুসলমানগণ কখন ও হজরত মুহাম্মদ (সা.) কিংবা অন্য কোনো মানব সত্তার উপাসনা করনি। তারা বিশ্বাস করে এসেছে যে, মুহাম্মদ (সা.) তাঁর পূর্ববর্তী অরংখ্য নবীদের মতই একজন নশ্বর মানুষ ছিলেন। তবে মানবতার প্রতি এটা পরম আদর্শবাদ যে, একজন মানুষ নবুয়তের মত উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পারে।

মূল কথা হলো হযরত মুহাম্মদ (স) এর ওপর আল্লাহর ঐশী কিতাব কুরআন নাযিলের পর এই পবিত্র আসমানি গ্রন্তের অনুসারীরা ইসলাম ধর্মালম্বী মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ইসলাম শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ এবং তাঁর প্রদত্ত আইনের অনুবর্তন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ইচ্ছাকে অত্যন্ত কল্যাণময় ও দয়াশীলরূপে এবং তাঁর আইনকে অত্যন্ত উপকারী ও ন্যায়ানুরূপে বিবৃত হয়েছে। ইসলামে আল্লাহ শব্দটি অত্যন্ত সরল অথচ দৃঢ়তার সাথে আব্হানস্বরূপ তুলে ধরেছে। শব্দটির প্রকৃত মর্মার্থ হলো, একক ও অভিন্ন শ্বশত খোদা, যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, সমস্তপ্রভুর প্রভু এবং সমস্ত সম্রাটের সম্রাট।

ইসলাম স্রষ্টা এবং সৃষ্টি, মানুষের জীবন ও সৃষ্টি জগত নিয়ে আলোচনা করে। ইসলামি জীবন দর্শন অনুসারে আল্লাহতায়ালা বিশ্বভূবনের মালিক, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। ''স্ববর্ণিত যা কিছু আছে সবকিছুরই মালিক খোদা।

জাবিদ নামা' আল্লামা ইকবালের একটি প্রসিদ্ধ পুস্তক। তাতে ''মুহকামাতে আলিমে কুরআনী'' একটি শিরোনামে রয়েছে তার এক পংক্তিতে তিনি আল্লাহ মানব জাতি এবং বিশ্বের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবদান উল্লেখ করে বলেন:

"হে অধম ! তুমি স্রস্টাকে অস্বীকার করলে ও নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবদান অস্বীকার করা কি তোমার পক্ষে সম্ভব?

বস্তুবাদীরা আল্লাহকে দৃশ্যমান না পেয়ে তার অস্তিত্ব নিয়ে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। আবার কেউ কেউ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে। তবে মুসলমানরা এদের থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রম। ইসলাম ধর্মের মূলমন্ত্রই শুরু হয় অদৃশ্যের উপর বিশ্বাস নিয়ে। এখানে আলোচনার মূল কথা হলো, বস্তুবাদীরা আল্লাহতে অস্বীকার করতে পারে, অদৃশ্য সমস্ত বস্তু ও বিষয়কে অলীক ভেবে সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে পারে; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের বরকতময় অক্ষত অলৌকিক ঘটনাবলী, তাঁর প্রচারিত ধর্ম এবং তাঁর অনুসারীদেরকে তো তাঁরা অস্বীকার করতে পারে না। ইসলামের ঐতিহ্যবাহী উজ্জ্বল ইতিহাস, যুগোপযোগী বাস্তবধর্মী বিধান, উন্নয়নে অভিনব চিন্তা ও পন্থা গোটা বিশ্বে ইসলামি জাগরণের ঢেউ, বিজয়পর্ব সবই দৃশ্যমান। এগুলির কোনটাই কেউ অস্বীকার করতে পারে না। এ কারণে বস্তুবাদীদের পক্ষেও আল্লাহ ও রসুল (সা.) কে অস্বীকার করার উপায় নেই। যেমন একটা চিত্র চিত্রকরের জন্য, একটা প্রাসাদ তাঁর বড় নির্মাণকারীর জন্য দলিল বহন করে , তেমনি একটা জাতি ও ধর্ম তাঁর মহান প্রবর্তক ও প্রতিষ্ঠাতার জন্য দলিল বহন করে । শেখ সাদী (রহ.) বলেন দিনের আলোতে বাদুর যদি দেখতে না পায়, তাহলে এটা বাদুরের জন্মগত স্বভাব সূর্যের এতে কোন ত্রুটি নেই বরং ক্ষতি ও নেই। (শরিফ-৩৮, পৃ. ৭৬) ইকবাল বলেন :

Dhaka University Institutional Repository

لا الہ الا اللہ

خودی کا سر نہیں لا الہ الا اللہ

خودی ھے تیغ فساں لا الہ الا اللہ

یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے

صنم کدہ ہے جہاں ، لا الہ الا اللہ

کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا

فریب سود وزیاں !لا الہ الا اللہ

یہ مال ودولت دنیا یہ رشتہ وپیوند

بتان وہم وگماں!لا الہ الا اللہ

خرد ہوئی ہے زمان ومکان کی زناری

نہ ہے زماں ،نہ مکان! لا الہ الا اللہ

یہ نغمہ فصل گل ولالہ کا نہین پابند

بہار ہو کہ خزاں، لا الہ الا اللہ

اگر چہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں

مجھے ہے حکم اذاں، لا الہ الا اللہ

অনুবাদ:

খুদীর গোপন রহস্য নিহিত রয়েছে-‘ লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’
-তওহীদের এ কালেমায় ;
খুদী হলো তলোয়ার’এর শান হলো-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু’।
(খাঁটি তওহীদ ছাড়া খুদীর তলোয়ার কোন কাজে আসবে না।)
এ দুনিয়া একটি মুর্তিখানা, এখানে বুলন্দ করতে হবে তওহীদের আওয়াজ;
বন্ধ করতে হবে এ আওয়াজ ইব্রাহীমের পদানুসারীরাই;
খুঁজে বেড়াচ্ছে যামানা এমন ব্যক্তিকেই।
মন লাগিয়েছো তুমি দুনিয়ায়, যা ধোঁকা বই কিছুই নয়.*
দিতে হবে আওয়াজ লা-ইলাহা-র,লাভ-লোকসনের ধোকা কাটিয়ে উঠে।
দুনিয়ার ধন-সম্পদ, আত্মীয়তা, বন্ধুত্ব- এসব মুর্তিসম,
ভিত্তিহীন ধারণারই সৃষ্টি, স্থায়ী সত্য-লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

পরে’ আছে বুদ্ধি, স্থান-কালের পৈতা;
বস্তুত স্থান-কাল বলতে কিছুই নেই;
সত্য শুধু লা ইলাহা ইল্লাললাহ্ ।
গোলাম বা লালা ফুলের ঋতু শর্ত নয় লা ইলাহার গানের জন্য;
এর জন্য সমান শীত-বসন্ত-সকল ঋতু।
(জাতি উন্নতির পথে থাকুক বা অবনতির পথে-
সব সময় তওহীদের বাণী বুলন্দ করা চাই।)
বাসা বেঁধেছে মূর্তি জাতির আন্তরীনে,
পেয়েছি আদেশ মূর্তি ভাঙ্গারব লা-ইলাহা-র আঘাতে।
(মুসলমানের মধ্যে অনেক অনৈসলামিক
ভাবধারা, অনৈসলামিক তমদ্দুন, আচার অনুষ্ঠান
অনুপ্রবেশ করেছে। ইকবাল এ ব্যাপারে
দৃঢ় প্রতিজ্ঞ যে, তিনি লা ইলাহা-র আঘাতে এসব
চুরমার করে দিবেন। (ইকবাল-৩৯, পৃ. ৭-৮)
অনুবাদ : (আব্দুল মান্নান তালিব)

*এখানে ইঙ্গিত করা হয়েছে কুরআনের এই আয়াতে প্রতি:

وما الحيوة الدنيا الا متاع الغروره

(এ দুনিয়ার জীবন ধোঁকা বই কিছুই নয়।)

প্রকৃত অর্থে, মুসলমানগণ কখনও হযরত মোহাম্মদ (সা.) কিংবা অন্য কোন মানব সত্তার উপাসনা করেনি। তারা বিশ্বাস করে এসেছে যে, মোহাম্মদ (সা.) তার পূর্ববর্তী অসংখ্য নবীদের মতই একজন নশ্বর মানুষ ছিলেন। তবে মানবতার প্রতি এটা পরম আদর্শবাদ যে, একজন মানুষ নবুয়তের মত উন্নত মর্যাদায় অভিষিক্ত হতে পেরেছে।

মূল কথা হলো, হযরত মোহাম্মদ (সা.) এর ওপর আল্লাহর ঐশী কিতাব কুরআন নাযিলের পর এই পবিত্র আসমানি গ্রন্থের অনুসারীরা ইসলাম ধর্মালম্বী মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ইসলাম শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ এবং তার প্রদত্ত আইনের অনবর্তন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ইচ্ছাকে অতন্ত কল্যাণময় ও দয়াশীলরূপে এবং তার আইনকে অত্যন্ত উপকারী ও ন্যায়ানুরূপে বিবৃত হয়েছে। ইসলামে ‘আল্লাহ’ শব্দটি অত্যন্ত সরল অথচ দৃঢ়তার সাথে আহবানস্বরূপ তুলে ধরেছে। শব্দটির প্রকৃত মর্মার্থ হলো, একক ও অভিন্ন শ্বাশত খোদা, যিনি সমগ্র বিশ্বের স্রষ্টা, সমস্ত প্রভু এবং সমস্ত সম্রাটের সম্রাট। (ফিরোজা-৩১, পৃ. ৫৩)

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুর রশ্মি হল ঈমানের জ্যোতি বা শক্তি এই শক্তির বলে সকল ভয়ভীতি দূরভীত হয় সকল অহমিকা চুরমার হয়ে যায়। এই অনস্তিত্বের পৃথিবীতে আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা সে করে না। সকল কিছুই তার কাছে তাঁর অতি সামান্য বস্তু বলে মনে করে। স্ত্রী, সন্তান, সন্ততি সম্পদ এ সকল কিছুর প্রেম অন্ধ করতে পারে না। এক আল্লাহর প্রেমে বিভোর থাকে। জীবন তার কাছে মূল্যহীন বাতাসের চেয়ে ঈমান হল শক্তি আর ঈমানী শক্তির উপাদান হল কালিমা, নামাজ, রোজা, হজ্ব, যাকাত, ও সকল প্রকার সৎকর্ম। একাত্ববাদের চেতনায় সে সকল অন্যায় থেকে মুক্ত হয়। ইসলামে পরিপূর্ণভাবে প্রবেশ করতে পেরে মোমেন বান্দার আত্মা শক্তিশালী হয় সকল প্রকার সৎকর্মের মাধ্যমে এবং অসৎকর্ম থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে রাখে এবং সর্বশক্তির উৎস আল্লাহর কাছেই সকল বিষয়ে ভরসা, সাহায্য ও প্রার্থনা করে থাকে। আল্লাহ প্রদত্ত আইনের মাধ্যমে নিজের জীবনকে পরিচালিত করে। (মান্নান- ৪০ , পৃ. ৫৮)

Dhaka University Institutional Repository

খুদী দর্শন ও তার বিকাশ:

খুদী দর্শনের মূল অর্থ হচ্ছে ব্যক্তিসত্তা বা আত্মশক্তি ও আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ও তার বিকাশ। ব্যক্তির এই আত্মশক্তির বিকাশ অনেকভাবে ঘটে থাকে। আত্মম্ভরিতা বা অহমিকা নয়, বরং ব্যক্তির মধ্যে যে 'আমি' বা খুদী আছে তাকে গড়ে তোলা| বাস্তব সত্তা-নিজের জোরেই এই সত্তা অস্তিত্বশীল। অতীন্দ্রিয় অনুভূতির মাধ্যমে আমরা এই সত্তার সাক্ষাত পেয়ে থাকি। খুদীর স্বাজ্ঞাতিক (অতীন্দ্রিয়) জ্ঞান আমাদের অভিজ্ঞতার বাস্তবতা সম্পর্কে প্রত্যক্ষ অবিচল আস্থা সৃষ্টি করে| স্বজ্ঞার মাধ্যমে শুধু খুদীর অস্তিত্ব সম্পর্কেই জানা যায় না, এর স্বরূপ ও বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেই জানা যায়। স্বজ্ঞার মাধ্যমে জ্ঞাত খুদী মূলত নিয়ামক, স্বাধীন ও অমর। খুদীর জাগরণের আহবান ছিল ইকবাল কাব্যের অনন্য বৈশিষ্ট্য। বিপর্যস্ত মানবতার সংকট মুক্তির প্রয়াসে তার কাব্য দর্শনে রয়েছে উন্নততর জীবন বোধের সন্ধান। তিনি জাতির কাছে নিবেদন করেছেন:

খুদীর জোরেই মুসলমানের
ঘটতে পারে পূর্ণ বিকাশ:
খুদীই যদি যায় হারিয়ে
তাহলে সে অন্যেরি দাস। (ইকবাল- ১১, পৃ. ৫২)
অনুবাদ : গোলাম সামদানী কোরয়শী

ইকবাল একই সাথে কবি ও দার্শনিক| তাঁর দার্শনিক সত্তা ও কবি সত্তা অবিভাজ্য। এ দুই ধরণের বৈশিষ্ট্য ও চিন্তাবিদের মধ্যে এরূপ দৃষ্টান্ত একান্তই বিরল| প্রকৃত পক্ষে তাঁর দর্শন হচ্ছে সত্তা সম্পর্কিত দর্শন তথা তাঁর উদ্ভাবিত খুদী দর্শন। ইকবাল বিশ্ব মানবের জন্য আশা আন্দের বাণী নিয়ে এসেছেন এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন যে, লোভ- লালসা সদৃশ যে উপাদানগুলো মানুষকে কৃত্তিম বড়ত্ব তথা অহমিকার জন্য উস্কে দেয়, প্রকৃত পক্ষে তা-ই মানুষকে আশা ও আনন্দ লোক বঞ্চিত করে থাকে। তাঁর মাঝে খুদী-দর্শন সৃষ্টির হওয়ার পূর্বক্ষণে তিনি যে ভাবনায় লিপ্ত ছিলেন সে বিষয়ে আসরারে খুদীর সূচনাতে তিনি বলেন:

ذره ام مهر منیر آن من است — صد سحر اندر گریبان من است
فکرم انئ آهو سر فقر اک بست — کو هنوز از نیستی بیرون نجست
در جهان خورشید نو زانیده ام — رسم و آنین فلک نادیده ام
نغمها از زخمه بی پرواستم — من نوای شاعر فرداستم
ای بسا شاعر که بعد از مرگ زاد — چشم خود بربست و چشم ماگشاد
رخت باز از نیستی بیرون کشید — چون گل از خاک مزار خود تمید
برقها خوابیده در جان من است — کوه و صحرا باب جسلان من است
ذره از سوز توایم زنده گشت — پرگشود و کرمک تابنده گشت
همچوکس رازی که من گویم نگفت — همچو فکر من در معنی نسفت

অনুবাদ:

আমি অণু, দেদিপ্যমান সূর্য সে আমারই
আমরা আস্তিনে লুকায়িত শত প্রভাত।
আমার চিন্তা সেই হরিণ পৃষ্ঠের জিনের ফিতা সম
এখনো যা অনস্তিত্ব থেকে আসে নি বেরিয়ে।
আমি এ বিশ্বে নতুন সূর্য হয়ে জন্ম নিয়েছি

উর্ধ্বলোকের নিয়ম ও আদর্শ দেখিনি এখনো।

আমি সঙ্গীত, বাজনায় সুর তোলার প্রয়োজন নাই আমার
আগামী দিনের কবির আমি সুমধুর সুর।
কত যে কবি মৃত্যুর পরে জন্ম নিলো
নিজেদের চোখ মুদে আমাদের চোখ খুলে দিলো।

অনস্তিত্ব থেকে মান-অভিমানের বস্ত্র আনলো
আপন গোর হতে কুসুম স্বরূপ ফুটে উঠলো।
বহু বিদ্যুৎআছে ঘুমিয়ে আমার প্রাণের মাঝে
পর্বত ও মরু আমার বিচরণ মাঠের প্রবেশ দুয়ার।
আমার সুরের মূর্ছনায় অণুরা জীবিত হলো
মেলিল পাখা আর জোনাকিতে পরিণত হলো
আমি বলি সেই গূঢ় রহস্য বলে নি যা কেউ

আমার চিন্তা সম গূঢ়তত্ব ব্যক্ত করেনি কেউ । (ইকবাল -৫, পৃ. ৫)

ইকবালের খুদী দর্শনের মূল কথাই আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা ও তার বিকাশ ঘটানো। আমরা জানি যে ইকবাল তাঁর কাব্যের প্রতিটি স্তরেই খুদীতত্ত্বের আলোকে তাঁর মতাদর্শ প্রকাশ করেছেন। ইকবাল আরো বলেন:

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندہ سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا

খুদীকে এইরূপ উন্নত কর যে, তোমার ভাগ্যলিপি লেখার পুর্বে খোদা যেন তোমায় শুধান, কি তোমার অভিপ্রায়। (ইকবাল-১১, পৃ. ৪১৩)

ইকবাল বাস্তব ও সমকালীন জীবনকে অস্বীকার করেন নি বা দূরে সরে থাকেন তিনি তাঁর বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ আসরারে খুদীতে জীবন বিমুখ সুফিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ব্যক্ত করেন। ইকবাল দর্শনের প্রত্যয়শীলতা মানুষের শ্বাশ্বত জয়যাত্রার অভিজ্ঞান। নতুন দিনের কল্লোলিত জীবনের ছন্দ তাঁর দর্শনের বীণায় মুখর হয়ে উঠেছে । পুরনো অতীতের নির্ভীকতাকে ভেঙ্গে ফেলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীর স্বপ্ন রঙিন চিত্র তিনি নির্মাণ করেছেন। ইকবাল মহাজীবনের কবি। তাঁর কবিতার সত্য যেমনি ভুগোলের সীমানাকে অতিক্রম করেছে, তেমনি আত্মকেন্দ্রিকতার ক্ষুদ্র বৃত্তকেও ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়েছেন। খরতরঙ্গ অতিক্রম করে তিনি মানবতার আলোঝলোমল মুক্ত পৃথিবীর জয়গান গেয়েছেন। এক বক্তৃতায় ইকবাল উল্লেখ করেন কুরআনের ধারণায় জীবন সদা পরিবর্তনশীল। তাই ইসলামের আইন পদ্ধতি সময়ের সাথে সামাঞ্জস্যপূর্ণ বিবর্তনের উপযোগী। কিন্তু এই পরিবর্তন কোন বল্গাহীন ধারায় চলতে পারেনা। সুতরাং পরিবর্তনটা হচ্ছে নিজের অভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তির উপর নির্ভরশীল। ইকবালের খুদী প্রচণ্ড ইচ্ছাশক্তি সম্পন্ন গতিশীল শক্তি কিন্তু তা বাধন হারা জীবন ধারণার দ্বারা পুষ্ট নয়। কুরআনীয় নীতি পদ্ধতি ও ব্যবস্থাদির আলোকে জীবন বিকাশের অনুকূল এক কল্যাণকর হাওয়ায় তার বর্ধন। (ফাহমিদ- ৪১ ,পৃ. ৩৬)

আল্লাহ তায়ালা বলেন :

ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم

[আল্লাহ কোনো সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন বরেন না,
যতক্ষণ না তারা নিজের অবস্থার নিজেই পরিবর্তন করে।] (আল কুরআন :১৩:১১)

ইকবালের মতে, আমরা প্রত্যোক্ষভাবেই এটা লক্ষ্য করতে পারি যে, খুদী হচ্ছে একটি অকাট্য সত্য ও বাস্তবতা যা প্রকৃতই ‘অস্তিত্ববান’। আর তা হচ্ছে আমাদের ব্যক্তিসত্তার মূল কেন্দ্র। অতএব, তাকে অবশ্যই

'খুদী' নামকরণ করতে হবে। খুদী যখন ঐশী অনুপ্রেরণা (ইলহাম)-এর সাহায্যে আবিস্কৃত হয় মূলত তখন তা হয় পথনির্দেশের মাধ্যম। মূলত খুদী হচ্ছে পর্যবেক্ষক ও বিচারক এবং ভালো-মন্দ চিহ্নিতকরণ ও পরিমাপ ক্ষমতার অধিকারী। খুদী যে কর্মতৎপরতা চালায় স্বত:ই সে তার মূল্যমান নির্ধারণ করে। তবে এ নির্ধারণ কেবল তখনই সংঘটিত হয় যখন সে স্বেচ্ছায় ও উদ্দেশ্য সহকারে কর্মতৎপরতা চালায়। তাই কোনোরূপ কর্মতৎপরতা চালানো ব্যতিরেকে তার অস্তিত্বের মূল্যায়ন হবে না এবং স্বেচ্ছায় ও উদ্দেশ্য সহকারে কর্মসম্পাদন ব্যতিরেকে তার জন্য কোনো সাফল্যই থাকতে পারে না।

খুদী সবসময়ই একটি সুনির্দিষ্ট পথে অগ্রসর হয়। আর এ পথে অগ্রসর হওয়ার কারণে সত্তাগতভাবেই সে পথ প্রদর্শকের ভূমিকা পালন করে থাকে। খুদী তাঁর ঝোঁক প্রবণতা, আগ্রহ ও আশা আকাঙ্ক্ষার কারণে উদ্দেশ্য ও ইচ্ছাশক্তির অধিকারী একটি শক্তিশালী ব্যক্তিত্বের আকারে বিকশিত ও পূর্ণতার অধিকারী হয়।

খুদী ঝোঁক প্রবণতা, আগ্রহ ও আশা আকাঙ্ক্ষারপ্রয়োজনীয় পরিবেশের মুখাপেক্ষী। এ কারণে শুধু বিকাশের জন্যই নয়, বরং খুদীর জীবন অবিকল সত্যের সাথে, অন্য কথায়, দিগন্ত বিস্তৃত বাস্তবতার সাথে তথা জগত বা সমাজ বা বাস্তব সত্যের সাথে।

সমাজ ও সংসার থেকে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় খুদী বিকশিত হতে পারে না। এ কারণে খুদীকে প্রতি পদেই এক ধরণের অখুদী (বিখুদী)-এর মুখোমুখি হতে হয়।

এখানে একটি প্রশ্ন আসে, তা হচ্ছে: খুদীর তৎপরতা কি তার নিজ থেকে উদ্ভূত, না কি পরিবেশ থেকে? অন্য কথায়, খুদী কি মুক্ত স্বাধীন? না তা নয়। একটা অত্যন্ত সহজ সরল কথা হলো এই যে, আমরা আমাদের জীবনের চলার পথে স্বেচ্ছায় উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ও হিসাব নিকাশ করে যে কর্ম তৎপরতা চালাই সে ক্ষেত্রে আমরা অবশ্যই আমাদের স্বকীয় সত্তা- বহির্ভূত প্রভাবশালী উপাদানসমূহ থেকে মুক্ত ও স্বাধীন। আমরা অনবরত সন্মুখ পানে এগিয়ে যাচ্ছি। তবে আমাদের স্বাধীনতার পাশাপাশি আমাদেরকে সরাসরি অনুপ্রাণিত করাও হতে পারে।

যদিও মানুষ পূর্ব থেকে প্রস্তুত একটি পরিবেশে জীবন যাপন করে, কিন্তু এতদসত্ত্বেও সে ঐ পরিবেশকে তার পছন্দমতো পরিবর্তন ও পুনর্গঠন করার ক্ষমতা রাখে। অন্যদিকে সে যে পরিবেশে বসবাস করে তা যদি তার স্বাধীনতাকে ব্যাহত করে তাহলেও সে নিজের মতো করে চলার শক্তি রাখে। অতএব, সমস্যাবলি ও বাধার বৈশিষ্ট্য হচ্ছে কেবল এই যে, তা খুদীর অন্তদৃষ্টি ও শক্তিকেই বৃদ্ধি করে।

এ অবস্থা মানুষের জাগ্রত ও সচেতন হওয়ার এবং তার মধ্যে বিবেকবোধের উদয় হওয়ার কারণ হয় যাতে সে চিন্তা-ভাবনা করে, উপায় সন্ধান করে এবং তার স্বাধীন ব্যক্তিসত্তার অন্ত:স্থল থেকে ও তার সত্তার মাঝে নিহিত রহস্যাবলি থেকে সাহায্য গ্রহণ করে এবং স্বাধীনভাবে সমস্যাবলির সমাধান উদ্ভাবন করে।

এ প্রেক্ষাপটে সুস্পষ্ট যে, খুদীকে প্রথম পর্যায়ে তার পরিবেশের বিরূদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে এবং এ সংগ্রামের মাধ্যমে স্বীয় পরিবেশকে জয় করতে হবে। এ বিজয়ের ফলে সে মুক্তি ও স্বাধীনতায় উপনীত হয় এবং পূর্ণতম স্বাধীনতার অধিকারী সত্তা আল্লাহর নৈকট্যে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করে।

পরবর্তী পর্যায়ে খুদী তার এ প্রবণতাকে রক্ষাপূর্বক এবং স্বীয় প্রকৃতির কামনা বাসনাকে প্রতিরোধ করার মাধ্যমে এক স্থিতিশীল অবস্থার অধিকারী হয় এবং তা হতে গিয়ে তাকে চাপ ও বঞ্চনা সহ্য করতে হয়। কেবল বের পরেই তার পক্ষে অবিনশ্বরতার মর্যাদায় উন্নীত হওয়া সম্ভবপর হয়। (রেযা-১৬, পৃ. ৬৫-৬৮)

ইকবালের এ খুদীতত্ত্বের পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণ করতে যেয়ে ইরানের সমকালিন বিশিষ্ট দার্শনিক ও সমালোচক অধ্যাপক আয়াতুল্লাহ মুতাহহারী তাঁর চলতি শতাব্দীর ইসলামি আন্দোলন গ্রন্থে বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালের দর্শনের মর্ম হচ্ছে, ‘আত্মোপলদ্ধি’। তিনি ভাবতেন যে, প্রাচ্যের ইসলাম তার প্রাণ হারিয়ে ফেলেছে। এটির পুনরূদ্ধার প্রয়োজন। তিনি বলেন যে, একজন লোক যখন তার পরিচয় হারিয়ে ফেলে তখন তার ব্যক্তিত্ব পর্যদস্ত হয়ে পড়ে কিংবা সে ব্যক্তিত্বহীন হয়ে পড়ে। সে আপন সত্তা থেকে অনেক দূরে সরে যায় এবং নিজের কাছে নিজেই আগন্তক হয়ে পড়ে।

তার আপন সত্তার অবস্থানই নিজ থেকে সরে যায়। আর যাঁর প্রতি তিনি গভীরভাবে অনুরক্ত এবং যাঁর প্রভাব তাঁর জীবন ও আদর্শের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিলক্ষিত হয় সেই মাওলানা রূমীর ভাষায় ‘সে অন্যের জমিতে ঘর বানায় আর নিজের কাজ করার বদলে অন্যের কাজ করে । ইকবাল বলেন এবং, একজন ব্যক্তির মতো সমাজ ও যখন তার পরিচয় হারিয়ে ফেলে তখন তার ব্যক্তিত্বের পক্ষেও আঘাত খাওয়া ও পর্যুদস্ত হ ওয়া স্বাভাবিক। এতে সে নিজের উপর বিশ্বাস, আত্মমর্যাদাবোধ ও নিজের ক্ষমতায় আস্থা হারিয়ে মাটির সাথে মিশে যায়। ইকবাল বিশ্বাস করেন যে, পাশ্চাত্যের কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রভাবে এসে ইসলামি সমাজ বর্তমান অবক্ষয় ও ক্রম-বিলুপ্তির সন্মুখীন হয়েছে এবং আত্মপরিচয় হারাতে বসেছে। এই সমাজের প্রাথমিক উপাদান এবং ইসলাম ও ইসলামি সভ্যতার প্রাণকেন্দ্রের আসল উপাদানগুলো হচ্ছে ‘খুদী বা ‘আত্মা’ এবং সঠিক ইসলাম, কৃষ্টি ও প্রেরণার পুররূত্থানের প্রতি মনোনিবেশ করা। এটাই হচ্ছে ইকবালের ‘খুদী’ বা আত্মা সম্পর্কিত দর্শনের সার সংক্ষেপ।

মুসলমানদেরকে তাঁদের মহত্ব, সাংস্কৃতিক সাধ্য ও তাদের সম্প্রদায়ের যোগ্যতা পুনরূদ্ধারে সহায়তা প্রদান করার বিরামহীন প্রয়াস চালিয়ে গেছেন তিনি। তাঁর লেখনী, বক্তৃতা ও বক্তব্যে তিনি বার বার ইসলামের হারানো গৌরবের স্মৃতিচারণ করেছেন। তিনি ইসলাম ঈমানদারদের মতাদর্শে প্রত্যাবর্তনের উপর জোর দিয়েছেন। এ কারণেই ইকবাল ইসলামের মহান ব্যক্তিদেরকে ইতিহাসের অন্ধকার থেকে এনে সমাজের কাছে নতুনভাবে পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। তাই ইসলামি সমাজ তাঁর কাছে কৃতজ্ঞতার ঋণী। (মূর্তাজা-৪২, পৃ. ৩৩-৩৪)

ইকবাল খুদীদর্শনের মোড়কে গোটা ব্যক্তি জীবনে এক বিশাল পরিবর্তন আনতে চেয়েছিলেন। তাঁর মতে, যেসব উপাদানের ভিত্তিতে মানুষের খুদী দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে, প্রেম ও ভালোবাসা, দারিদ্র্য, সাহসিকতা, ধৈর্য ও সহনশীলতা, হালাল উপার্জন ও সৃজনশীলতা। এ উপাদানগুলো তিনি তাঁর বিখ্যাত আসরারে খুদী কাব্যগ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণিত সে উপাদানগুলো সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা হলো:

Dhaka University Institutional Repository

ব্যক্তি ও সমাজ ওতোপোতভাবে জড়িত
খুদী ও বেখুদী পরস্পর সম্পৃক্ত:

খুদীর অস্তিত্ব মূলত: ইচ্ছাময় | ইচ্ছা নামক সৃষ্টিশীল শক্তিই আমাদের ব্যক্তিত্বের উৎস| ইচ্ছাশক্তি (খুদী বা আত্মা) প্রেমের দ্বারা বলীয়ান হয়। প্রেম ইচ্ছাকে শক্তি প্রদান করে, নব জীবন দান করে। তা জীবনের নতুন তাৎপর্য দান করে, জীবনকে নব বলে বলীয়ান করে তোলে। প্রেম খুদীকে সুরক্ষিত করে। (The Ego is fortified by love বা Ishq) মূল ও আদর্শের সৃষ্টি ও তাহার রুপায়ণ প্রয়াস খুদীর সর্বোচ্চ রূপ। (আলম- ৪৪, পৃ. ৪৯০)

কুরআনে আছে:

يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم

[হে ঈমানদারগণ ! তোমরা আপন ব্যক্তিত্ব (খুদী) কে মজবুত কর।''] (৫: ১০৫)

من عرف نفسه فقد عرف ربه

[যে নিজের আত্মাকে চিনেছে, সে নিশ্চয়ই খোদকে চিনেছে।] (যরীফ, সীরাতে ইকবাল ৪৪, পৃ. ১৯৬)

ইকবালের খুদী বলতে বুঝায়: আত্মশক্তি উপলব্ধি করা ও আত্মপ্রতিষ্ঠা করা। বেখুদী বলতে বোঝায়: আত্মশক্তি অর্জনের পর মানুষ ও সৃষ্টির সেবায় তা উৎসর্গ করা। খুদী ও বেখুদী বলতে বোঝায়: মানুষের মধ্যে আল্লাহ বিপুল শক্তি সুপ্ত রেখেছেন। মানুষের উচিত, প্রকৃতির নিয়ম কানুন জেনে প্রাকৃতিক শক্তিকে উদঘাটিত করা এবং এর শক্তির সাথে লড়ে যাওয়া এবং তদ্বারা উদ্ভাবিত শক্তিকে মানুষ ও সৃষ্টির সেবায় নিয়োজিত করা। ইকবাল বলেন:

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں　　موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

ব্যক্তি বাঁচে জাতির সাথে সম্পৃক্ত হয়ে, একা সে কিছুই নয়,
যেমন তরঙ্গ বাঁচে সাগরে, এর বাইরে তা কিছুই নয়। (ইকবাল- ১১, পৃ. ২১০)

বলার অপেক্ষা রাখে না, স্বয়ং সম্পূর্ণ ও স্থায়ী সমাজ ব্যবস্থার জন্য ব্যক্তি ও সমাজ তথা ব্যক্তি জীবন- উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে। এর জন্য ব্যক্তিজীবনকে ও সমাজজীবন উভয়ের জন্যই সুনির্দিষ্ট জীবন পদ্ধতি থাকতে হবে। ইসলাম ব্যক্তিজীবনকে যেমন সমাজজীবনে লয় করে দিতে চায় না, তেমনি তাঁকে এমন এখতিয়ারও দিতে চায় না, যা সমাজ জীবনের জন্য ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াতে পারে। ব্যক্তি জীবনের উন্নতি অবশ্যই দরকার। কিন্তু তা চরম ও পরম উদ্দেশ্য হতে পারে না। আসল উদ্দেশ্য হলো- ব্যক্তি জীবনের উন্নতির মধ্য দিয়ে ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন উভয়েরই উন্নতি বিধান করা। বিষয়টি এভাবে বোঝানো যেতে পারে। ধরুন, একটা কাফেলা পথ অতিক্রম করে চলেছে, অথচ কাফেলার প্রত্যেকটি মানুষের আলাদা আলাদা সত্তাও অটুট থাকছে।

এখন প্রশ্ন উঠতে পারে-ব্যক্তি জীবনের উন্নতির ফলে সমষ্টি-জীবনের উন্নতি কিভাবে হতে পারে? দৈনন্দিন জীবনের প্রতি আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করলে বুঝতে পারি যে, দুনিয়ার প্রতিটি বস্তু আত্মবিকাশে মগ্ন। পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য তা যথাসাধ্য চেষ্টা করে যাচ্ছে। এর মধ্য দিয়ে সমষ্টি জীবনের ও উন্নতি সাধিত হচ্ছে। ইকবাল বলেন:

ہر چیز ہے محو خود نمائی　　ہر ذرہ شہید کبریائی

ے ذوق نمود زندگی موت   تعمیر خودی میں ہے خدائی

অনুবাদ:

প্রত্যেকটি বস্তু আত্মপ্রকাশে মগ্ন,
প্রত্যেকটি অনু আপন বড়ত্ব প্রতিষ্টায় প্রাণান্ত।
আত্মপ্রকাশের চেতনাবিহীন জীবন -মৃত্যুরই নামান্তর,
খুদী প্রতিষ্ঠার মধ্যে রয়েছে খোদায়িত্ব। (ইকবাল - ১১, পৃ. ৭৯)

শিশির কণা এবং ফুলের মধ্যে আত্মপ্রকাশের সাধ রয়েছে। ফুল শত পর্দা ফেঁড়ে আপন সাধ মেটাতে চায়। ইকবালের ভাষায় শিশির কণার বক্তব্য শুনুন। শিশির কণা ফুলকে বলছে:

شبنم :
من از فلک افتاده تو از خاک دمیدی
از ذوق نمود است دمیدی که چکیدی
در شاخ تپیدی
صد پرده دردی
بر خویش رسیدی!

অনুবাদ:

শিশিরের কথা:
অবতীর্ণ হয়েছি আমি আকাশ থেকে
উদগত হয়েছ তুমি (ফুল) মাটি থেকে
উদগত হয়েছে তুমি আত্মপ্রকাশের লাগি
ফুটেছ তুমি ফুল শাখায়,
ফেড়ে শত আবরণ;
আত্মপ্রকাশে হয়েছ তুমি সক্ষম। (ইকবাল- ৫, পৃ. ১৪০)

মোটকথা, প্রত্যেক কণা অনুকণা আত্মপ্রকাশে উদগ্রীব। আত্মপ্রকাশের বিষয়ে ইকবাল আরো বলেন:

چه لذت یا رب اندر بست و بود است   دل بر ذره در جوش نمود است
شگافد شاخ را چون غنچه گل   تبسم زیر از ذوق و جود است

অনুবাদ:

হে রব কি যে মজা জীবনের মধ্যে' আত্মপ্রকাশের চেতনা রয়েছে প্রতিটি
অনুকণার প্রাণে। ফুটে যখন ফুলের মুকুল গাছের ডাল ছেদ করে
আপন ওজুদ লাভ করে তা হাস্যমুখ হয়ে। (ইকবাল-৫, পৃ.২১)

প্রতিটি বস্তুর অভ্যন্তরে যতটুকু শক্তি নিহিত হয়েছে, সেই পরিমাণেই তা আত্মপ্রকাশে সক্ষম হয়। ইকবাল বলেন:

যখন খুদী হারায়, তখন তা মরুতে পরিণত হয়,
এরূপ যখন সাগর তরঙ্গে প্লাবিত হয়,
তখন তা অভিযুক্ত করে সাগরকে।
বীজ যখন উদগত হওয়ার শক্তি পেল,

ইকবাল বলেন:

چون حیات عالم از زور خودی   پس بقدر استواری زندگی است

অনুবাদ: টিকে আছে বিশ্বের জীবন খুদীর জোরেই, বিশ্ব জীবনের ভিত রচিত হয় খুদীর শক্তিতেই। (ইকবাল- ৫ , পৃ. ১৪)

বিশ্বের যে বস্তু খুদী হারায়, তা দুর্বল হয়ে পড়ে এবং ক্রমান্বয়ে আপন অস্তিত্ব বিনষ্ট করে ফেলে। মৌসুমী বারিবিন্দু যখন খুদী অর্জন করে, তখন তার ওজুদ মুক্তায় পরিণত হয়। বীজ যখন উদগত হওয়ার শক্তি লাভ করে, তখন তা মাটির বক্ষ ছেদ করে বেরিয়ে আসে। কিন্তু পাহাড় যখন আপন শক্তি হারিয়ে ফেলে, তখন তা বালিকণা হয়ে মরূতে পরিণত হয়। জমিন, চাঁদ ও সুর্যেও দৃঢ়তা অনুসারেই তাদের শক্তি বিভিন্ন হয়ে থাকে । চাঁদের শক্তি কম বলেই তা পৃথিবীর চারদিকে আবর্তন করে। কিন্তু সূর্য অধিকতর শক্তিশালী বলে তা নিজের জায়গাতেই স্থির থাকে এবং পৃথিবী তার চারদিকে আবর্তন করে।

ইকবাল বলেন:

قطره چون حرف خودی از بر کند   بستی بے ما یہ را کبیر کند
کوه چون از خود رود صحرا شود   شکوه سنج چوشش دریا شود
سبزه چون تاب دمید ازخویش یافت   ہمت او سینہ گلشن شگافتہ
چون زمین بر بستی خود محکم است   ماه پایند طواف پیهم است
بستی مهر از زمین محکم تراست   پس زمین مسحور چشم خاور است

অনুবাদ:

উন্নত করে নেয় বারিবিন্দু যখন নিজ খুদীকে   তখন তার মূল্যহীন অস্তিত্ব পরিণত হয় মুক্তায়
পাহাড় যখন খুদী হারায়, তখন তা মরূতে পরিণত হয়,   মরূ যখন সাগর তরঙ্গে প্লাবিত হয়,
তখন তা অভিযুক্ত করে সাগরকে।   বীজ যখন উদগত হওয়ার শক্তি পেল,
তার সাহস বাগানের বক্ষ ভেদ করে বেরিয়ে এল।
পৃথিবী তার খুদীকে দুর করে নিয়েছে,   চাঁদ তাই সদা তার চারদিকে আবর্তন করছে।
সূর্যের অবস্থান অধিকতর দৃঢ় পৃথিবীর চাইতে   তাই পৃথিবী তার চারদিকে আবর্তন করছে।

(ইকবাল- ৫, পৃ. ১৪-১৫)

উপরিউক্ত বর্ণনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, বিশ্বের প্রত্যেকটি বস্তুর মধ্যে আত্মপ্রকাশের স্পৃহা রয়েছে এবং সেগুলোর মধ্যে পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের প্রক্রিয়া চলছে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত এবং আল্লাহর খলীফা। তাই স্বভাবতই তার মধ্যে আত্মপ্রকাশের শক্তি রয়েছে অধিকতর। অতএব, মানুষের অবশ্য কর্তব্য হলো খুদী তথা আত্মশক্তিকে উন্নত করা। আত্মশক্তির এই উন্নয়নের উপর নির্ভর করে মানুষের জাগতিক ও আত্মিক উন্নতি। এটাই তার জন্য প্রকৃতিকে বশীভূত করার একমাত্র চাবিকাঠি। আত্মশক্তিকে উন্নত করে মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে তার মানে এই জ্ঞানের বদৌলতে সে খোদাকে ও ভালরূপে চিনতে পারে।

এই সম্পর্কে ইকবাল বলেন:

تری نگاه میں ثابت نہیں خدا کا وجود   مری نگاه مین ثابت نہیں وجود ترا
وجود کیا ہے؟ فقد جوہر خودی کر نمود   کر اپنی فکر کہ جوہر ہے بے نمود ترا

অনুবাদ:

নেই কোন প্রমাণ খোদার ওজুদের তোমার চোখে,   নেই কোন প্রমান তোমার ওজুদের আমার চোখে।

ওজুদ কী ? শুধু খুদী রতনের বিকাশ সাধন, চিন্তা কর নিজের, হয়নি বিকশিত তোমার খুদী রতন।
(ইকবাল -১১, পৃ ২৮)

অর্থাৎ যে নিজের আত্মিক শক্তির পরিচয় লাভ করেছে, সে খোদার পরিচয়ও পেয়েছে। আত্মশক্তির উদ্ভাবনের পর সেই শক্তিকে নিয়োজিত করতে হবে সমাজ ও সৃষ্টির উন্নয়ন কর্মে। খুদী মানে আত্মশক্তির প্রতিষ্ঠা: বেখুদী মানে আত্মত্যাগ ও বিনয়। খুদী বেখুদী পরস্পর সম্পৃক্ত। একটি অপরটির পরিপূরক। খুদী ছাড়া বেখুদী ফকীরী ও ভিক্ষাবৃত্তির পর্যায়ে পড়ে। আবার বেখুদী ছাড়া খুদী শয়তানী খুদীতে পরিণত হতে পারে; খুদীর ও শক্তি তখন জোর জুলুমের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। অন্যকথায় খুদী শক্তির প্রয়োগক্ষেত্র হলো বেখুদী তথা মানবজাতি ও যাবতীয় সৃষ্টি।

খুদী বিকাশের মাধ্যম বা উপকরণ:

খুদী কোন না পরিবেশের মধ্যেই বিকাশ লাভ করে কিন্তু এই পরিবেশ খুদীকে যান্ত্রিকভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। এ সব উপাদানের মাধ্যমে খুদী দৃঢ় ও শক্তিশালী হয়ে থাকে সেগুলো হচ্ছে প্রেম ও ভালবাসা, দারিদ্র, সাহসিকতা, ধৈর্য্য স্থৈর্য, হালাল উপার্জন ও সৃজনশীলতা। এ উপাদানগুলো তিনি তাঁর বিখ্যাত আসরারে খুদী কাব্যগ্রন্থে ধারাবাহিকভাবে উপস্থাপন করেছেন। তাঁর বর্ণিত এসব উপাদানসমূহ সংক্ষিপ্তভাবে বিশ্লেষণ করা হলো।

প্রেম ও ভালবাসা:

প্রেম হচ্ছে এমন একটি চেতনার নাম যা এ বিশ্বকে নবরূপ দান করে। আর এ চেতনা তাৎপর্য ও বৈশিষ্ট্য এমনই যে তা জটিল ও দিশেহারা অবস্থার গ্রন্থি উন্মোচন করে এবং তা এমন এক প্রতিষেধক যা মানব প্রজাতির সকল রোগেরই নিরাময় করে থাকে। এ শব্দটি অত্যন্ত ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এর মানে হচ্ছে গ্রাস করা ও আত্মস্থ করার আগ্রহ ও আকাঙ্ক্ষা। এর সমুন্নত ও পরিপূর্ণতাপ্রাপ্ত তাৎপর্য হচ্ছে মূল্যবোধ ও আদর্শের সৃষ্টি এবং তার বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা যা প্রেম, প্রেমিক ও প্রেমাষ্পদকে পরস্পর থেকে সুস্পষ্ট করে দেয়। ইকবাল বলেন:

مومن از عشق است و عشق از مومن است   عشق را نا ممکن ماممکن است

জীবনের থেকেই মুমিনের উৎপত্তি আর মুমিন থেকেই প্রেম প্রেমের মাধ্যমেই জয় করা যায় আমাদের সকল অসম্ভব। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৭৪)

এ প্রেমের পরিণতি সম্পর্কে ইকবাল আরো বলেন:

از محبت چون خودی محکم شود   قوتش فرمانده عالم شود

যখন প্রেমের দ্বারা খুদী দৃঢ় ও শক্তিশালী হবে
তখন এর শক্তি গোটা বিশ্বের শাসক হবে। (ইকবাল -৫, পৃ.১৯)

দারিদ্র:

ফাকর তথা দারিদ্র খুদীকে শক্তিশালী করার আরেকটি অন্যতম উপাদান-যার উদ্দেশ্য হচ্ছে এ দুনিয়া ও অন্য দুনিয়ার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন। অতিরিক্ত সুযোগ সুবিধা, অন্যদের ওপর শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাধান্য এবং অন্যদের সম্পদের জন্য লোভ না থাকা। প্রকৃত পক্ষে ইকবালের মতে ফাকর (দারিদ্র) পরিভাষাটির সংজ্ঞা হলো (পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য্যের প্রতি চরম নিরাসক্তি) (মেহের- ৪৫, পৃ. ৩৩)
ইকবাল বলেন:

چیست فقر ای بندگان آب و گل   یک نگاه راه بین یک زنده دل

فقر کار خویش را سنجیدن است   بر دو حرف لا اله پیچیدن است

ওহে পানি আর মৃত্তিকার গোলাম ফাকর (দারিদ্র)কী
এতো হলো একটি জীবন্ত হৃদয় আর একটি দূরদর্শী দৃষ্টিপাত
ফাকর হলো নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্যকর্ম গুছিয়ে নেয়া,
আর তা লা ইলাহা এই দুটি শব্দে নিজকে জড়িয়ে ফেলা। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৩৯৫ - ৩৯৬)

ইকবাল আরো বলেন:

فقر مومن چیست تسخیر جهات   بنده از تاثیر او مولا صفات

মুমিনের দরিদ্রতা কী (এর উদ্দেশ্য সব কিছু জয় করা
এর প্রভাবে বান্দা অর্জন করে গুণাবলি। (ইকবাল –৫, পৃ. ৩৯৭)

সাহসিকতা:

শারীরিকই হোক বা নৈতিক হোক, সাহসিকতা ছাড়া এ পৃথিবীর বুকে কোনো গুরত্বপূর্ণ পদক্ষেপ গ্রহণ করা কোনো মানুষের পক্ষেই সম্ভব নয়। দুর্বল ও ভীরু লোকেরাই সমস্যাবলির সামনে আত্মসমর্পন করে। এই সাহসিকতার বদৌলতেই ব্যক্তি কঠিন বিপদাপদে পড়েও তার ঈমান সংরক্ষণ করবে এবং কোনো অবস্থায়ই নৈতিক মূল্যবোধসমূহ পরিত্যাগ করবে না। ইকবাল বলেন:

در جهان نتوان اگر مردانه زیست   همچو مردان جهان سپردن زندگیست

যদি সাহসিকতার সাথে এ পৃথিবীতে বেঁচে থাকা না যায়
তবে বীরের ন্যায় আত্মোৎসর্গ করাই হলো প্রকৃত জীবন। (ইকবাল- ৫, ৩৫)

ধৈর্য ও স্থৈর্য:

অন্যদের মতামত শ্রবণ করা ও তাদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য বুঝার জন্য ধৈর্য্য ও সহনশীলতার প্রয়োজন রয়েছে এই পৃথিবীতে। খুদীই ব্যক্তির মাঝে শৃঙ্খলাজনিত শক্তি গড়ে ওঠে। তাই সকল দিক বিবেচনায়ই খুদীর বিকাশের জন্য অত্যন্ত উপকারী। ইকবাল বলেন :

حرف بد را لب آوردن خطاست   کافر و مؤمن همه خلق خداست

মন্দ ভাষায় কথা বলা ভুল অন্যায়,
কেননা, মুমিন আর কাফের সবই মহান আল্লাহর সৃষ্টি। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৩৮৫)

হালাল উপার্জন:

হালাল উপার্জন জীবিকা কথাটি অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ মানুষের কর্মতৎপরতার সকল দিকই এর আওতাভুক্ত। হালাল জীবিকা ছাড়া ইবাদত কবুল হয়না। মানুষের বড় পরীক্ষাই হল রিযিকের পরীক্ষা। ইকবাল বলেন

اکل حلال خلوت و جلوت سر دین صدق مقال تماشاے جمال

অনুবাদ:

সত্য কথা বলা, হালাল রুজি খাওয়া
এটাই ধর্ম পালনের সারবত্তা,
একাকীত্ত ও লোকালয়-উভয় স্থানে অবলোকন

করা যায় আল্লাহর সৌন্দর্য। (ইকবাল -৪৬, পৃ. ২৪০)

ইকবাল আরো বলেন:

تا ندانی نکتہ اکل حلال بر جماعت زیستن گردد و بال

অনুবাদ:

বৈধ উপায়ে রুজি করার মধ্যে যে হেকমত আছে
তা না জানলে সামাজিক জীবন যাপন করা হবে ঝুঁকিপূর্ণ। (ইকবাল -৪৭, পৃ. ৩৭)

پشیمان شو اگر لعلی ز میرث پدرخواهی کجا عیش برون آوردن لعلی که در سنگ است

যদি পিতৃপুরুষ থেকে মণিমাণিক্য পেতে চাও, তবে লজ্জিত হও
খনি থেকে মণিমুক্তা তুলে আনা কতই না আনন্দের বিষয়। (রসুল - ২৫, পৃ.৩৪)

উত্তাধিকারসুত্রে প্রাপ্ত সম্পদের প্রতি নির্ভরশীল না হয়ে বৈধ পন্থায় জীবিকা উপার্জনের শিক্ষা দিয়েছেন। অন্যের করুণা ও অনুগ্রহের মাধ্যমে প্রাপ্ত সম্পদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে তোলে।

সৃজনশীলতা:

ইকবাল সৃজনশীলতার ওপর অতিমাত্রায় গুরুত্ব আরোপ করেছেন। ইকবালের মতে, সৃজনী শক্তি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। ইহা মানুষকে খোদার সাথে মিলন ঘটায়। বলাবাহুল্য যে, সৃজনশীলতা হচ্ছে এমন একটি শক্তি যা মানুষের ব্যক্তিত্বকে শক্তিশালী ও সবল করে। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রতিনিয়ত পরিবর্তন চলছে। এই পরিবর্তনের কারণ, মানুষের সৃজনী ক্রিয়া। পরিবর্তিত জীবনের জটিল বিরোধের মোকাবিলা করার জন্য, বাঁচার জন্য মানুষের বুদ্ধির বিকাশ সাধন অপরিহার্য।

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے سرِ آدم ہے ضمیرِ کن فکاں ہے زندگی

জীবিতদের মাঝে বেঁচে থাকতে চাইলে নিজের পৃথিবী নিজেই গড়ে নাও,
আদমের রহস্য হও তাই হয়ে গেলো এর গূঢ়তত্ত্বই হলো প্রকৃত জীবন। (ইকবাল- ১১, পৃ. ২৮৭)

ইকবাল ব্যক্তির সৃজনশীল প্রতিভার প্রতি গুরুত্বারোপ করেন নিম্নোক্ত কাব্য পুঙতি

هر که اور اقوت تخلیق نیست پیش ماجز کافرو زندیق نیست

নেই সৃজনী প্রতিভা যার মোদের কাছে সে কিছু নয়,
কাফির ও যিনদিক, তাহার আর তো কিছু নাই পরিচয়। (ইকবাল-৫, পৃ. ২৫৭)

উপরিউক্ত উপাদানগুলো মানবীয় ব্যক্তিসত্তা বা ব্যক্তিত্ব তথা খুদীকে শক্তিশালী করে থাকে। তবে এর পাশাপাশি এমন কতগুলো উপাদানও রয়েছে যেসব উপাদান খুদীকে সমৃদ্ধ ও শক্তিশালী করার বিপরীতে খুদীকে দুর্বল করে তুলে। এগুলো হলো ভয়, ভিক্ষাবৃত্তি, মুখাপেক্ষিতা, দাসত্ব ও বংশপূজা, কর্মবিমুখতা তাই এসব উপাদান ও প্রভাব পরিহারের ফলে খুদীকে শক্তিশালী করে গড়ে তোলা সম্ভব। প্রতিটি ব্যক্তিকে খুদীর তাৎপর্য উপলদ্ধি করতে হবে এবং এর মাহাত্ম্য রক্ষা করে সমাজে জীবন যাপন করতে হবে এবং সমাজের মাঝেই কাজ করতে

হবে। অতএব, খুদীর পরিপূর্ণ বিকাশ ও পূর্ণতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করার জন্য কোনো ধরনের সমাজ অপরিহার্য আমাদেরকে তাও নির্ণয় করতে হবে।

ইকবাল যে আদর্শ সমাজ ও রাষ্ট্রের স্বপ্ন দেখেছেন, সেখানে মানুষের সামাজিক মর্যাদা তার জাতি বর্ণ অথবা সম্পদ দ্বারা নির্ধারিত হয় না, বরং তা নির্ধারিত হয় জীবনের ধরন দ্বারা, সেখানে আত্মার সাম্যের ওপর মানবসমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। উদরের সাম্যের উপর নয়। ইকবাল তাঁর রমুযে-ই বেখুদীতে আদর্শ রাষ্ট্র গঠনে আটটি বিষয় অপরিহার্য বলে গণ্য করেছেন।

১. মানব সমাজের আধ্যাত্মিক ভিত্তি হবে তাওহীদ:

সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এর ভিত্তি হতে হবে নৈতিক আত্মিক তাওহীদি মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। অন্যথায় সে সমাজের পতন অনিবার্য। এই বিষয়টাকে এভাবে ব্যাখ্যা করা যেতে পারে

বর্ণগত চিন্তা-বিশ্বাসগত বা ভৌগলিক বিবেচনায় বিশেষ সুযোগ সুবিধার ভিত্তিতে যে সমাজ অস্তিত্ব লাভ করে সে সমাজের অবস্থা নড়বড়ে ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত জমকালো ভবনের ন্যায়। সমাজকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে হলে এর ভিত্তি হতে হবে নৈতিক ও আত্মিক । এবং এ ভিত্তি বেতখানি মজবুত হতে হবে যে, কোনো বিরোধী উপাদানই তার উপরে প্রভাব বিস্তার করতে পারবে না।

আমাদের জন্য ও নৈতিক ও আত্মিক ভিত্তি তাওহীদ মূলনীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। এ কারণেই আমাদের লক্ষ্য হতে হবে বৈশ্বিক ঐক্যের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা। কারণ, আমরা আগেই এ মূলনীতিকে গ্রহণ করে নিয়েছি যে, মানব প্রজাতির সকল সদস্যই এক ভ্রাতৃ- সম্প্রদায়।

মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে তাওহীদের মূলনীতি এ বিশ্বের পরস্পর বিচ্ছিন্ন ও বিভক্ত মানব প্রজন্মকে নিরবচ্ছিন্ন ও সুদৃঢ় ঐক্যে ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসী।আর এ মূলনীতিই সমাজের সকল সদস্যের জন্য চিন্তা ও কর্মের ঐক্যের (unity of Thought and Action) আয়োজন করে থাকে। এ কারণেই সকল বৃহৎ ধর্মেই এ মূলনীতির অনুসরণ করে থাকে।

বাইবেলের ওপর টেস্টামেন্টের বহির্গমণ পুস্তক -এর ২০তম অধ্যায়ের প্রথম থেকে পঞ্চম পদে বলা হয়েছে:

> আর ঈশ্বর এ সকল কথা বললেন আমি তোমার ঈশ্বর সদাপ্রভূ......
> আমার সাক্ষাৎতোমার অন্য দেবতা না থাকুক। তুমি নিজের জন্য
> খোদিত প্রতিমা নির্মাণ করো না ; উপরস্থ আকাশে এবং নিচে পৃথিবীতে
> ও পানির ভিতরে যা যা আছে সে সবের কোনো মূর্তি নির্মাণ করো না:
> তুমি সে সবের নিকট প্রণিপাত করো না: (রেযা-১৬, পৃ. ৭৭)

আর পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে:

ان الله لا يغفر ان يشرك به و يغفر ما دون ذالك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افتري اثما عظيم

অবশ্যই আল্লাহ তাঁর সাথে কোনো কিছুকে শরীক করাকে ক্ষমা করবেন না এবং এতব্যতীত আর যা কিছু পাপকর্ম আছে তা যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করে সে অত্যন্ত বড় পাপে লিপ্ত হয়। (সুরা নিছা :৪৮)

সকল মানুষ সমাজে যে ঘৃণা-বিদ্বেষ, মতানৈক্য ও বিভক্তি সৃষ্টি করে তার মোকাবিলার একমাত্র একত্বের মহৌষধ হচ্ছে আল্লাহর প্রতি ঈমান। মনোবিজ্ঞানীদের দৃষ্টিতে আল্লাহর একত্বের প্রতি ঈমান একটি সমাজের জন্য এমন এক ভিত্তি তৈরি করে দেয় যা মানব সমাজের প্রকৃত ঐক্যের নিশ্চয়তা বিধান করে এবং এ মূলনীতির

ওপর গুরূত্ব আরোপ করে যে, মানব সমাজের সকল সদস্য এক ভ্রাতৃ সম্প্রদায় হিসাবে সৃষ্ট হয়েছে এবং তারা নৈতিক ও আত্মিক জ্যোতির আওতায় পরস্পর সম্পর্কভূক্ত| কেবল এ চিন্তাই ঐক্য বিধানকারী একমাত্র শক্তি হিসেবে ভুমিকা পালন করতে এবং মানব সমাজের পরস্পর শত্রুতাভাবাপন্ন বিচ্ছিন্ন ও শিবিরের বিভক্তিকে দূরীভূত করতে সক্ষম।

نقطه ادوار عالم لا اله — انتهای کار عالم لا اله
زانکه در تکبیر راز بود تواست — حفظ و نشر لااله مقصود تواست
فکر انسان بت پرستی بتگری — هر زمان در جستجوی پیکری

পৃথিবীর কালচক্রের মিলন বিন্দু লা-ইলাহা
জগতের সকল কাজের চূড়ান্ত পর্যায় লা ইলাহা
যেহেতু তাকবিরের মাঝেই তোমার অস্তিত্বের রহস্য লুকায়িত
অতএব, লা-ইলাহার সংরক্ষণ ও প্রচারই হোক তোমার লক্ষ্য।
মানবীয় চিন্তা থেকেই মূর্তিপূজা ও মূর্তি রচনায় সূচনা|
সকল যুগেই সে সন্ধান করে আকৃতির। (ইকবাল- ৫ পৃ. ৯৮-৯৫)

২.তাওহীদ ভিত্তিক সমাজব্যবস্থা গঠনের জন্য থাকবে আধ্যাত্মিক প্রত্যাদেশ তথা নবুওয়াত (Prophethood):

ইলহাম বা নবুওয়াত ভিত্তিক নেতৃত্ব অপরিহার্য: অর্থাৎ নবুওয়াতের প্রতি ঈমান হচ্ছে আদর্শ সমাজের ভিত্তি প্রস্তরস্বরূপ। তাওহীদ ভিত্তিক সমাজ গঠনের পূর্ণরূপ দান করেছেন সর্বশেষ নবী (স.)| মানব প্রজাতির পূর্ণতা অভিমুখী অভিযাত্রায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে ভূমিকা পালন করেছেন তা ছিলো এ ক্ষেত্রে মৌলিকতম ও সর্বাধিক প্রভাবশালী ভূমিকা| তাঁর যুগের লোকেরা তাঁর প্রতি যে ভালোবাসা, মনের টান ও আত্মউৎসর্গের পরিচয় দিয়েছেন তা মানব প্রজাতির সত্যপ্রেমের মানদণ্ড| এভাবে তাঁরা প্রত্যাদেশ ও ইলহামের অধিকারী ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি তাদের ঋণ পরিশোধ করেন।

জনগণ কর্তৃক হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর অনুসরণ সব সময়ই জনগণের মুক্তির উৎস হিসাবে ভূমিকা পালন করেছে এবং তাঁর বিরাট ও মহিমান্বিত ব্যক্তিত্ব এমন এক সংস্থার সৃষ্টি করে যেখানে সকলের নিষ্ঠা ও আনুগত্য একটি স্থানে গিয়ে মিলিত হয়। এর ফলে প্রবৃত্তির সকল ধ্বংসাত্মক লালসা নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। বস্তুত নবুওয়াতের প্রতি ঈমান হচ্ছে আদর্শ সমাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্বরূপ।
ইকবাল বলেন:

حق تعالی پیکر ما آفرید — وز رسالت در تن ما جان دمید
حرف بی صوت اندر این عالم بدیم — از رسالت مصرح موزون شدیم
از رسالت در جهان تکوین ما — از رسالت دین ما آئین ما
از رسالت صد هزار ما یک است — جز و ما از جز و ما لا ینفک است
دین فطرت از نهی آموختیم — در ره حق مشعلی افروختیم
پس خدا بر ما شویعت ختم کرد — بر رسول ما رسالت ختم کرد

আল্লাহ তা'য়ালা সৃষ্টি করেছেন আমাদের দেহ অবয়ব
আর রিসালাত দ্বারা প্রাণ ফুঁকে দিলেন তাতে
এ জগতে নিঃশব্দ হরফ (অক্ষর) সম ছিলাম আমরা
রিসালাতের মাধ্যমেই কবিতার ছন্দোবদ্ধ পঙক্তি হয়েছে

রিসালাত দ্বারাই এ জগতে আমাদের স্থায়িত্ব
রিসালাত দ্বারাই আমাদের ধর্ম আমাদের আদর্শ
রিসালাতের কারণ আমরা শতসহস্র এক হয়েছি
অংশ ও আমরা পরস্পর অবিচ্ছেদ্য
নবীর নিকট থেকে শিখলাম প্রকৃতির ধর্ম
আর সত্যের পথে জ্বালালাম বিশাল মশাল
বস্তুত খোদা আমাদের উদ্দেশ্যে পূর্ণ করে দিলেন শরীয়ত
আমাদের রাসুল দ্বারাই রিসালত সমাপ্ত করেন। (ইকবাল -৫, পৃ, ৬৮, ৭১)

৩. কুরআনের আইন:

সমাজকে পরিচালিত করার জন্য একটি মৌলিক নীতিমালা অপরিহার্য: প্রতিটি সমাজের জন্যই আইন-কানুন থাকা অপরিহার্য। আইন কানুন হচ্ছে সমাজের নিয়ামক শক্তি। আর সেই নীতিমালা-বিধিবিধানই হচ্ছে আল কুরআন। মুসলমানদের জন্য তাদের আইন ও সামাজিক শৃঙ্খলা কুরআন থেকেই উৎসারিত হয়।

মূল্যবোধের ক্ষেত্রে বিভিন্ন আন্দোলন ও উত্থান-পতনের পরিণতিতে যখন এক প্রজন্মের বাস্তব সত্যগুলো ও অলঙ্গনীয় বিষয়গুলো পরবর্তী প্রজন্মের নিকট কাল্পনিক ও অন্তঃসারশূন্য সামাজিক চুক্তি বলে প্রতিভাত হয় তখন বিরাজমান আইন কানুন সমাজ-মানুষের জীবনে স্থিতিশীলতা প্রদান করে ও শান্তির নিশ্চয়তা বিধান করে। এই পরিবর্তনশীল বিশ্বে আইনের মর্যাদা হচ্ছে একটি জাহাজের নোঙ্গরের ন্যায়। সমাজে যখন অশান্তি ও অস্থিরতা সৃষ্টি হয় এবং লোকদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ দেখা দেয় নিরাপত্তা উধাও হয়ে যায় এবং মূল্যবোধ অকার্যকর হয়ে পড়ে তখন আইন অন্ধকারে আলো বিচ্ছুরিত করার ন্যায় ঐ সমাজকে নিরাপদ তীরের দিকে এগিয়ে যাবার জন্য পথ প্রদর্শন করে। তাই এতে সন্দেহের অবকাশ নেই যে, সঠিক আইন-কানুনের অভাবে সামাজিক জীবন বিশৃঙ্খলা ও অশান্তির শিকার হয়ে থাকে। আর মুসলমানদের জন্য তাদের আইন ও সামাজিক শৃঙ্খলা কুরআন থেকেই উৎসারিত হয়।

نقش قران چونکه در عالم نشست — نقشه های پاپ و کاهن را شکست
چونکه در جان رفت جان دیگر شود شود — جان چو دیگر شد جاهان دیگر
اندر او ندبیر هتی غرب و شرق — قدرت اندیشه پیدا کن چو برق

কুরআনের নকশা যখন জগতে হলো প্রতিষ্ঠিত
পোপ ও রাব্বীর নকশাগুলো হলো ছিন্নভিন্ন।
যখন তা প্রাণে প্রবেশ করে হয় অন্য প্রাণ
প্রাণ যখন অন্য হয় তখন হয়ে যায় অন্য এক জগত
তার মাঝেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল কর্ম কুশলতা
চিন্তার শক্তির অধিকারী হও বিদ্যুৎসম। (ইকবাল ৫, পৃ. ৩১৭)

৪.একটি আধ্যাত্মিক কেন্দ্র থাকবে:

মুসলমানদের জন্য এ কেন্দ্র হচ্ছে পবিত্র মক্কা। ইকবালের মতে: পৃথিবীর সকল উপাসনালয়ের মধ্যে সর্ব প্রথম ইবাদত খানা হচ্ছে কাবা ঘর। আমরা এর পৃষ্ঠপোষক আর এ হচ্ছে আমাদেরই প্রহরী ও রক্ষা কবচ। সমাজের মানুষের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক কর্মতৎপরতা এ কেন্দ্র থেকেই পরিচালিত হয়। এ তৎপরতা সমাজদেহের জন্য রক্ত সরবরাহ করে যা তার প্রাণের জন্য অপরিহার্য। আর সমাজ কেন্দ্র হচ্ছে সমাজদেহের হৃদপিণ্ডস্বরূপ যা শরীরের দূষিত রক্তকে পরিশোধন করে তার জন্য তাজা রক্ত সরবরাহ করে এবং সে রক্তকে শরীরের দূরতম

Dhaka University Institutional Repository

প্রান্তে পৌঁছে দেয়। যতক্ষণ পর্যন্ত সমাজে এরূপ কেন্দ্র বিদ্যমান থাকে এবং এভাবে অনবরত তাজা রক্ত সরবরাহ অব্যাহত রাখে ততক্ষণ পর্যন্ত কোনোরূপ আলসেমি ব্যতীতই গোটা শরীর তার দায়িত্ব কর্তব্য পালন করতে থাকে। মুসলমানদের জন্য এ কেন্দ্র হচ্ছে পবিত্র মক্কা তাদের অন্যান্য গৌণকেন্দ্র এখান থেকেই শক্তি সংগ্রহ করে থাকে। ইকবাল তাঁর এ তত্বকে এভাবে তুলে ধরেছেন:

زمانه کهنه بتاں را هزار بار اراست من از حرم نگنشتم که پخته بنیاد است

সময় পুরানো মূর্তিগুলোকে হাজার বার সুসজ্জিত করেছে
আমি হারাম শরীফকে ছেড়ে যাইনি, কারণ তার ভিত্তি বড়ই মজবুত।

এছাড়া তিনি উর্দু ভাষায় একটি আন্তর্জাতিক ইসলামি সঙ্গীত রচনা করেছেন। তাতে তিনি মক্কা সম্বন্ধ্যে বলেন:

دنیا کے بت کدوں میں پہلا وہ گھر خدا کا
ہم اس کے پاسباں ہیں وہ پاسباں ہمارا

পৃথিবীর সকল উপাসনালয়ের মধ্যে সর্বপ্রথম ইবাদতখানা হচ্ছে কাবাঘর
আমরা এর পৃষ্ঠপোষক আর এ হচ্ছে আমাদেরই প্রহরী ও রক্ষা কবচ । (ইকবাল -১১, পৃ. ১৮৬)

৫. একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকতে হবে :

সমাজ ও সমষ্টিকে তথা সকলকে সে সুনির্দিষ্ট লক্ষ্যে উপনীত হবার জন্য চেষ্টা সাধনা করতে হবে। যে কোনো জনগোষ্ঠীর জন্যই একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য থাকা অপরিহার্য আর সে লক্ষ্যকে সুদৃঢ় রাখার জন্য চেষ্টা-সাধনা চালিয়ে থাকে। এ ক্ষেত্রে মুসলমানদের ক্ষেত্র হচ্ছে আল্লাহর একত্ব বা তাওহীদের প্রচার। কারণ তাদের জন্য এর চেয়ে উজ্জ্বলতর কোনো ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করা যায় না। অন্যরা হয়তো এ জন্য বিভিন্ন পার্থিব ক্ষেত্রের কথা চিন্তা করতে পারে, যেমন দেশ দখল বা রাজনৈতিক আধিপত্য। কিন্তু এসব ক্ষেত্র এমন নয় যা মানুষের মধ্যে সমুন্নত লক্ষ্যে চেষ্টা সাধনা ও আত্মত্যাগের চেতনা প্রবিষ্ট করাতে পারে । বরং একটি আত্মিক ও নৈতিক উপাদান এ কাজ সম্পাদন করতে পারে।

৬. প্রাকৃতিক শক্তির ওপর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করতে হবে:

প্রকৃতিকে আয়ত্তাধীন ও পরিচালনা করা জরুরি। এর মানে হচ্ছে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাহায্যে তাদেরকে প্রকৃতির রহস্যাবলি অধ্যায়ন ও তা নিয়ে গবেষণা করতে হবে। আমরা যদি ব্যক্তির জন্য এ কাজের প্রয়োজনীয়তার কথা বলি তাহলে আমরা বলতে পারি, এ সমস্যা প্রতিটি সমাজের জন্যই জীবন মৃত্যুর সমস্যা । বস্তুত বর্তমানে পাশ্চাত্য জগত যে প্রাধান্য ও আধিপাত্যের অধিকারী তা প্রাকৃতিক সম্পদের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণের কারণে। এবং তা অর্জিত হয়েছে প্রকৃতি নিয়ে অধ্যয়ন ও গবেষণার ফলে তা অন্যদিকে প্রাচ্যের অধ:পতনের অন্যতম কারণ প্রাকৃতিক সম্পদ ও প্রকৃতি বিজ্ঞানের প্রতি অমনোযোগিতা ও উপেক্ষা।

৭. যে পন্থায় ব্যক্তির খুদী বিকাশ লাভ করে থাকে, সমষ্টির খুদীকেও সে পন্থায়ই বিকাশ করতে হবে:

যে সমাজ শান্তি ও সৌভাগ্যের অধিকারী হতে চাইবে সে সমাজের জন্য সামষ্টিক ও সামাজিক খুদীর বিকাশ সাধন এবং তাকে পূর্ণতার স্তরে উপনীতকরা অপরিহার্য। আর প্রত্যেক জাতিই তার সৌভাগ্য ও সাফল্যের যুগে কতগুলো সুস্থ ঐতিহ্য সৃষ্টি করে। কখনো তাদের ওপর দুর্ভাগ্যের রাত নেমে এলে তারা ঐসব ঐতিহ্যকে আঁকড়ে ধরে থেকে সুদিনের প্রতীক্ষা করতে পারে।

Dhaka University Institutional Repository

৮. খুদীকে মাতৃত্বের অনুভূতির সংরক্ষক হতে হবে:

ইকবালের দৃষ্টিতে মানবসমাজের জন্য একটি আদর্শ সমাজের স্থিতি প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাতে সেই বৈশিষ্ট্য ও সুযোগ সুবিধার সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম বহিঃপ্রকাশ ঘটাতে হবে যা একজন মায়ের সত্তায় সমুদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। মা যেমন তার সতীত্ব, দৃঢ়তা ও অতুলনীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য দ্বারা মানব জগতের পূর্ণতা অভিমুখী যাত্রাকে উপাস্থাপন করে থাকে।

এ থেকে আমরা দেখতে পাই যে, আল্লামা ইকবাল খুদীর দর্শন উপস্থাপন করে কেবল ব্যক্তি মানুষের বিকাশ ও পূর্ণতা জন্য একটি পূর্ণ চিত্র ও পরিকল্পনাই উপস্থাপন করেন নি, বরং এর মাধ্যমে তিনি সমাজের মূল ভিত্তিকে তুলে ধরেছেন।

এ বিস্তারিত আলোচনায় আর ও দুটি গুরত্বপূর্ণ বিষয় থেকে যাচ্ছে আর তা হচ্ছে : মানুষের আয়ত্তাধীন বৈশ্বিক প্রকৃতি এবং নিরঙ্কুশ সত্যের তথা চুড়ান্ত সত্যের গূঢ় তাৎপর্য।

আমরা ইতঃপুর্বে লক্ষ্য করেছি যে, ইকবালের দৃষ্টিতে খুদীর জীবন মানে হচ্ছে পরিবেশের সাথে খুদীর পারস্পরিক সম্পর্ক। এর মানে হচ্ছে-খুদী তার পরিবেশের ওপর নিয়ন্ত্রণের অধিকারী এবং এ বিপরিতে পরিবেশ ও খুদীর ওপর প্রভাব বিস্তারকারী। এভাবে খুদীর জীবন বাইরের জগত বা পরিবেশ আত্মস্থ বা বিলুপ্ত হয়ে যায়। আর এটা অত্যন্ত সুস্পষ্ট যে, বাইরের পরিবেশ এক অকাট্য সত্য। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রশ্ন জাগে যে, বাইরের জগতের সঠিক প্রকৃতি কী?

ইকবাল বাইরের জগতের প্রকৃতিকে নির্ণয় ও চিহ্নিত করার লক্ষ্যে কিয়াস এর (যৌক্তিক উপসংহার পদ্ধতির) সাহায্য নেবার চেষ্টা করেন। কিয়াস অনুযায়ী খুদী হয়তো এ মর্মে বিশ্বাস পোষণ করবে যে, প্রাকৃতিক জগত ও কালের প্রবাহে টিকে থাকে, কিন্তু প্রকৃত ব্যাপার হলো এই যে, কাল একমাত্র যাকে ধারণ করে আছে তা হচ্ছে খুদী। এ দৃষ্টিকোন থেকে প্রাকৃতিক জগত হচ্ছে একটি অনন্য জগত। বিশ্বের প্রকৃতি যদি হয়ে থাকে খুদী তাহলে ফলাফল দাঁড়াচ্ছে এই যে, খুদী মানে হচ্ছে জীবন, আর জীবন অনবরত পরিবর্তিত হয়ে চলেছে। অর্থাৎ মানুষের জীবনধারা থেমে নেই। (রেযা-১৬, পৃ. ৮২)

এছাড়া ও খুদীর তিনটি স্তর রয়েছে, যেমন اطاعت বা আনুগত্য ضبط نفس বা আত্মনিয়ন্তণ نیابت الهی বা খোদার প্রতিনিধিত্ব। এ তিনটি পর্যায়ের প্রত্যেকটির একটি করে উদাহরণ ইকবালের ভাষায় তুলে ধরা হলো। ضبط نفس বা আত্মনিয়ন্ত্রণ

هر كه بر خود نيست فرمانش   روان مى شود فرمان پذيراز ديگران

যার নিজের উপর নিয়ন্তন কোন নাই
সে তো অন্যের ফরমান বহন করতেই ব্যস্ত। (ইকবাল -৫ , পৃ. ৩০)

نیابت الهي বা খোদার প্রতিনিধিত্ব:

نایب حق در جهان بودن خوش است   بر عناصر حکمران بودن خوشس
نایب حق همچو جان عالم است   هستی او ظل اسم اعظم است

অনুবাদ:

পৃথিবীতে আল্লাহর প্রতিনিধি হওয়া বড়ই আনন্দের বিষয়।
সৃষ্টিজগতের শাসক হওয়া সেও তো আনন্দেরই কথা।

খোদার প্রতিনিধি সেতো এই মহাবিশ্বর প্রাণ স্বরূপ
তাঁর অস্তিত্ব ইসমে আযমের ছায়া স্বরূপ। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৩১)

ইকবাল মনে করেন, আল্লাহর প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব পালনের লক্ষ্যে মানুষের জন্য স্বীয় ব্যক্তিত্ব বা আত্মসত্তাকে জাগ্রত করা অপরিহার্য। তার মতে যে নিজেকে আয়ত্ব করতে পেরেছে এবং স্বীয় সত্তাকে সঠিকভাবে চিনতে পেরেছে সে জগতের সাধারণ ও সর্বজনীন মর্মবাণী ও খুদীর গূঢ়রহস্য সম্পর্কে অবহিত হয়েছে।

আল্লাহকে জানার প্রথম মঞ্জিল হচ্ছে নিজেকে জানা। ইকবাল মনে করেন, মানুষের মর্যাদা ও মহানত্বের অন্যতম গুরূত্বপূর্ণ স্তম্ভ হচ্ছে তার খুদী (আমিত্ব)। প্রকৃতপক্ষে খুদী হচ্ছে বিশ্বজগতের সকল সৃষ্টির কেন্দ্রীয় বিষয়। খুদী তার সামনে থেকে সকল বাধা বিঘ্ন ও কাঠিন্যকে অপসারণ করে এবং সে মানুষ স্বাধীন ইখতিয়ারের অধিকারী হয়ে যায়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রাক্তন প্রফেসর আব্দুল হাই ইকবালের খুদী দর্শনের ব্যাখ্যা করেছেন এভাবে:

> ''মানুষের সর্ববিধ মুক্তির পথ হলো তার আমিত্ব বা অহং এর নির্মিতিতে। শুধু তোমাকে জানো ইকবালের এ বাণী নয় ইকবাল বলেন তোমার ভিতরে যে 'আমি' (খুদি) আছে তাকে গড়ে তোলো, যে 'আমি' কারো কাছে মাথা নত করতে জানে না, ঝঞ্ঝাসঙ্কুল দৈব-দুর্বিপাকের মধ্যে যে আমি মাথা উঁচু করে থাকে, যে আমি পূর্ণতায় ও সমগ্রে উদ্ভাসিত, যে আমি প্রেমে-সমৃদ্ধ ও ভিক্ষাবৃত্তিতে দুর্বল-স্বতন্ত্র মানুষ তোমার জয় বিঘোষিত হচ্ছে। দুর্বার এ আমি কে গড়ে তোলবার জন্য ইকবাল তিনটি স্তরের নির্দেশ দিলেন। (১) নিয়ম-শৃঙ্খলা-কারণ শৃঙ্খলাতেই আজাদী নিহিত। (২) আত্মসংযম- কারণ যে নিজেকে শাসন করতে পারে না, অপরকে সে কী করে শাসন করবে। (৩) খোদার প্রতিনিধিত্ব যার সমর্থন হযরত মোহাম্মদের (সা.) 'তোমার মধ্যে খোদার গুণাবলী গড়ে তোলো এই বাণীতে। তা হলে দেখতে পাচ্ছি স্বাতন্ত্রবাদই জীবন-যার পূর্ণতম রূপ ব্যক্তিত্ব ও আমিত্বের পরিপূর্ণ বিকাশে।'' (আ.হাই-৪৮, পৃ. ২৫৬-২৫৭)

এই পৃথিবী সদা পরিবর্তন ও গতিশীল এবং সৃষ্টিশীলতার মিশ্রণে ড. ইকবাল যে চিন্তাধারা ব্যক্ত করলেন মানবিকতার আসমান জুড়ে তা এক কল্যাণ প্রদীপ হয়ে জ্বলছে।

Dhaka University Institutional Repository

মুসলিম জাতির সার্বজনিন বিধান:

قد جاء كم من الله نور وكتب مبين

[তোমাদের নিকট এসেছে আল্লাহর নিকট থেকে এক জ্যোতি ও স্পষ্ট কিতাব।] (৫:১৫)
কুরআন হলো মিল্লাতে ইসলামীর জীবন-বিধান।

আদর্শ নবীর আদর্শ শিক্ষা নীতি সুদখোরী, ঘুষখোরী, হারামখোরী, মদখোরী, গৃহযুদ্ধ, গোত্রীয় আক্রোশ, বংশীয় মর্যাদার অহমিকা, অন্যায়, অবিচার, শোষণ, শিরক, নাফরমানী এবং অন্যান্য অপকর্ম হতে জাতিকে মুক্তি দেয়। জাতিকে তিমির অন্ধকার থেকে বের করে তির্যক আলোর মধ্যে দাঁড় করিয়ে দেয়। আল-কুরআন তাঁকে ''সিরাজুম মনির বা দীপ্তিমান ভাস্কর'' বলে আখ্যায়িত করেছে। কেননা, তিনি চিন্তাধারা এবং আত্মার অন্ধকার থেকে মুক্তি দিয়েছেন। তিনি বজ্রকণ্ঠে এই ঘোষণা দেন যে, অন্ধকার যুগের নীতি প্রথা আজ পদদলিত হল।, (হিস্টরী-৪৯, পৃ. ৫৩৯)

আল্লামা ইকবাল ইসলামের সার্বজনীন নতুন বিপ্লব সম্বন্ধে বলেন,

তিনি পৃথিবীতে নতুন সংবিধান চালু করেন
তিনি বিগত সমস্ত তখতে শাহী উল্টে ফেলেন। (শরীফ, ৩৮, পৃ. ১৪০)

প্রত্যেক জাতির জীবন মরণের জন্য অবশ্যই একটা জীবন-বিধান থাকে, যার অনুসরণ করে তারা নিজেদের জীবনকে উন্নীত করতে পারে, তাদের ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে। প্রত্যেক সভ্য জাতি তাদের নিজেদের আইন কানুনকে অবশ্য পালনীয় বলে মনে করে। যে জাতির গঠনতন্ত্র নেই, তারা কখনো মাথা তুলে দাঁড়াতে পারেনা। এ সম্পর্কে ইকবাল বলেন:

حفظ قرآن عظیم آئین تست　　　　حرف حق را فاش گفتن دین تست

مرد حق از کس نگیرد رنگ وبو　　مرد حق از حق پذیرد رنگ وبو
جز حرم منزل ندارد کاروان　　غیر حق در دل ندارد کاروان

অনুবাদ:

তোমার আইন মহান কুরআনের সংরক্ষণ,
তোমার ধর্ম - সত্য প্রকাশ।
করে না গ্রহন সৎলোক খোদার রংরূপ।
করে গ্রহন সৎলোক খোদার রংরূপ।
নেই মনযিল আর কোন, মক্কা ছাড়া মুসলিম কাফেলার,
আল্লাহ ছাড়া নেই কিছু মনে এই কফেলার। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৮৫-৮৬)

মেজর আর্থার গ্লিন লিওয়ার্ড বলেছেন এটাই একমাত্র সেই বস্তু যা হযরত মুহম্মদ (সা.)তাঁর অনুসারীদেরকে আল্লাহর মজবুত রশির দ্বারা ধর্মের সাথে যুক্ত করে দিতেন যে, ইসলাম থেকে আলাদা হওয়ার কোন পরিস্থিতিই হতনা। আল্লাহর এই মজবুত রশি হল ‘‘আল-কোরআন (লিওনার্ড-৫০ ,পৃ. ১০৩)

আল্লাহ বলেন:

‘তোমরা সবাই আল্লাহর রশি (কুরআন) কে সম্মিলিত ভাবে শক্ত করে আঁকরে ধর এবং তোমরা মতানৈক্যের দিকে যেয়োনা।’। (আল-কুরআন-৩:১০৩)

অর্থাৎ সবাই কুরআনকে অনুসরণ করেই এক মানুষ এক প্রাণের মত হয়ে সবাই থাকুক। এটাই কাম্য

আল্লামা ইকবাল বলেন:

আমরা তাঁর বদৌলতে ভাই ভাই হয়ে গেছি,
চিন্তা চেতনায় মোরা একাকার হয়ে গেছি। (শরীফ,৩৮, পৃ. ২০২)

হায় আফসোস! যখন মুসলমানদের হাত থেকে এই রশি ছিড়ে গেছে তখন থেকে মুসলমান পদে পদে লাঞ্জিত হতে শুরূ করেছে।

আল্লামা ইকবাল বলেন,

সমাজ গঠন কুরআনী আইন ছেরেছে যখন জাতি,
বিলীন হয়ে অস্তিত্ব তাদের হয়েছে সব মাটি
মুসলিম জাতি উঁচ হয় শির কুরআনী দৌলতেই,
বিশ্বনবীর দ্বীন সফলতা সুপ্ত ছিল এতেই।
পাতাও যদি সুবিন্যস্ত হয় ফুল হয় তার নাম,
ফুলে ফুলে মিলিত হলে ফুলতোড়া হয় তার নাম। (ইকবাল ৫,পৃ. ৫৭)

আল্লামা ইকবাল আমাদেরকে অন্য শব্দে একথাই বোঝাতে চেয়েছেন:

আমাদের ধর্মীয় অস্তিত্বের মূল হল কুরআন,
আমাদের সুসংহত জীবনের মূল হল ফোরকান।

মূল কথা হলো, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর ওপর আল্লাহর ঐশী কিতাব কুরআন নাজিলের পর এই পবিত্র আসমানি গ্রন্থের অনুসারীরা ইসলাম ধর্মালম্বী মুসলিম হিসেবে পরিচিত হয়। ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে ইসলাম শব্দের মর্মার্থ হচ্ছে আল্লাহর ইচ্ছার নিকট আত্মসমর্পণ এবং তার প্রদত্ত আইনের অনবর্তন। পবিত্র কুরআনে আল্লাহর ইচ্ছাকে অত্যন্ত কল্যাণময় ও দয়াশীলরূপে এবং তার আইনকে অত্যন্ত উপকারী ও ন্যায়ানুরূপে বিবৃত হয়েছে।

মুসলমানের জীবন-বিধান এবং আইনের কিতাব হলো-কুরআন মজীদ, যা জীবনের সকল শাখাকে নিয়ন্ত্রণ করে। এটা এমন একটা গঠনতন্ত্র, যাতে মানব জীবনের পুর্ণাঙ্গ বিধান পাওয়া যায় এর হিকমত চিরস্থায়ী, এর আদেশ-নিষেধ হেদায়াতের চাবিকাঠি। এর কোন বিধান প্রকৃতি-বিরোধ নয়। এই বিধানের অনুসরণ করলে মানুষ উন্নতির চরম সীমায় পৌঁছতে পারে। জীবন হয় নিরাপদ ও সুখের।

ইকবাল বলেন:

ملتے را رفت چوں آئیں زدست   مثل خاک اجزائےاو از بم شکست
بستئ مسلم زآئین است و بس   باطن دین نبی ص این است وبس
برگ گل شد چوں زآئیں بستہ شد   گل زآئیں بستہ شد گلدستہ شد
نغمہ ازضبط صدا پیدا ستے   ضبط چوں رفت ازصدا غوغاستے
تو ہمی دانی کہ آئیں تو چیست؟   زیر گردوں سر تمکین تو چیست؟
آں کتان زندہ قراں حکیم   حکمت او لایزال است وقدیم۔
نسخہ اسرار تکوین حیات   نے ثبات از قوتش گیرد ثبات

অনুবাদ:

ছুটে যায় যদি কুরআন, মিল্লাতের হাত থেকে,
খসে পড়ে তার অঙ্গনিচয় মাটির মতন।
নির্ভর করে মুসলিমের ওজুদ এই আইনের উপর,
এটাই স্বরূপ নবীর (স.) মিল্লাতের, অন্য কিছু নয়।
পাপড়িনিচয় হয়ে যায় ফুল, আইনের অনুগামী হয়ে,
হয়ে যায় ফুলনিচয় ফুলের মালা, নিয়মের অধীন হয়ে।
হলে স্বর নিয়ন্ত্রিত, রূপ নেয় তা গানের,
হারালে নিয়ন্ত্রন, রূপ নেয় তা শোরগোলের।
তুমি জান- কী তোমার আইন?
আকাশ তলে কোথায় তোমার মান গৌরবের চাবিকাঠি:
এক জিন্দা কিতাব কুরআনে হাকীম,
মহিমা তার চিরস্থায়ী।
আছে এতে জীবন সৃষ্টি রহস্য,
স্থায়িত্ব পায় অস্থায়ী বস্তু কুরআনের শক্তি বল (ইকবাল -১১, পৃ. ১৩৯-১৪০)

জাতির উচিত হবে তা আরো কঠোরভাবে পালন করা। তা না হয় জাতির টিকে থাকাই হবে মুশকিল।

ইকবাল অন্যত্র বলেন:

گر تو می خواہی مسلمن زیستن * نیست ممکن جز بقران زیستن

অনুবাদ: বাঁচতে চাও যদি মুসলমান হয়ে,
তবে নাই উপায় বাঁচার, কুরআন ব্যতিরেকে।

আল্লাহ তায়ালা মুসলমানকে কুরআনের বিধান এ জন্য দিয়েছেন, যাতে এর অনুসরণ করে সত্যিকার অর্থে তারা খিলাফতের উপযুক্ত হতে পারে। ইকবালের মতে এই বিধান কঠোরভাবে পালন করতে হবে। কেউ এ বিধানের কোন একটি দিকের বিরোধিতা করলে মুসলিম জাতির উচিত হবে তা আরো কঠোরভাবে পালন করা। তা না হয়, জাতির টিকে থাকাই হবে মুশকিল।

ملت از آئین حق گیرد نظام   از نظام محکمے خیزد دوام
اے کہ باشی حکمت دیں را امیں   با تو گویم نکتۂ شرح مبین
چوں کسے گردد مزاحم بے سبب   با مسلماں در ادائے مستحب
مستحب را فرض گردانیده اند   زندگی را عین قدرت دیده اند
شارع آئیں شناس خون وزشت   بہرتو ایں نسخۂ قدرت نوشت
تا شعار مصطفے از دست رفت   قوم را رمز بقا از دست رفت

অনুবাদ:

দৃঢ়তা লাভ করে মিল্লাত, আল্লাহ-ও আইন,
স্থায়িত্ব লাভ করে তা, দৃঢ় বিধানে।
হে ধর্ম-রহস্যের আমানতদার!
বলবো তোমার কাছে স্বচ্ছ শরা-ও মর্মকথা।
মুখোমুখি হলে কেউ, অহেতুক বাধার, কোন মুসলমানের
মুসতাহাব আদায় করতে গিয়ে
তবে করবে আদায় শক্তি প্রয়োগে,
মুসতাহাব্-কে ফরজ ভেবে
আইন ভাল কি মন্দ-জানেন আল্লাহই তা ভাল
রচিলেন তিনি এই শক্তি বার্তার কিতাবে তোমার তরে
ছুটে গেলে আত থেকে নবীজীর নিদর্শন
ছুটে যাবে সে জাতির বেঁচে থাকার অধিকার। (ইকবাল -৫১, পৃ. ১৪৬-১৪৮)

ইসলামের এই জীবন-বিধানের অর্থ বন্টনের এমন সুষ্ঠ ব্যবস্থা রয়েছে, যাতে বিশেষ কোন শ্রেণির হাতে দেশের ধন-সম্পদ পুঞ্জীভূত না হয়। এখানে কোন মানুষের উপর স্বৈরশাসন প্রয়োগের অধিকার কোন মানুষের নেই। এই বিধানে মানুষের প্রতি মানুষের মর্যাদাবোধের ব্যবস্থা রয়েছে। এই জীবন-ব্যাবস্থায় জাতিগতভাবে বংশ, গোত্র, ভাষা বা বর্ণের কোন পার্থক্য নেই। কুরআনের বিশ্বজোড়া ধ্যান ধারণার মধ্যে প্রকৃতি বিরুদ্ধে কোন আইন কানুন নেই। এই জীবন-বিধান সম্পূর্ণ স্বভাব-সম্মত।

ইকবাল বলেন:

داستاں کهنه شستی باب باب   فکر را روشن کن از ہم الکتاب
چیست قرآں؟ خواجه را پیغام مرگ   دستگیر بنده ہے ساز وبرگ
بیچ خیر از مردک زر کش مجو   لن تنالوا البر حتی تنفقوا

অনুবাদ:

ধুঁয়ে মুছে ফেল পুরনো পুঁথির প্রতিটি অধ্যায়,
করে নাও উজালা, তোমার চিন্তাকে, কুরআনের আলোকে।
কুরআন কী? পুঁজিবাদীদের মরণ-বার্তা-বাহ,
অসহায় বান্দার পুরোপুরি সহায়ক।

Dhaka University Institutional Repository

করোনা আশা কোন মঙ্গলের, অর্থ লোভীর কাছে,
না করলে দান পছন্দ সই বস্তু, পাবে না কখনো পুণ্য। (ইকবাল- ৫১, পৃ. ৮৮ -৮৯)

ইকবাল পরাধীন ভারতে জন্মগ্রহণ করলেও মন মানস গঠিত হয়েছিল এক আত্মমর্যাদাশীল ও স্বাধীন মানুষ হিসাবে। তাই তাঁর জাতির অধ:পতন, দাসত্বপ্রীতি ও হীনমন্যতা দেখে তিনি বিচলিত হয়ে পড়েন। ইকবাল অত্যন্ত গভীরভাবে কুরআন অধ্যয়ন করেন এবং গোটা যিন্দেগীতে এর অধ্যয়ন থেকে কখনো বিরত থাকেননি। এ অধ্যায়ন ও অনুশীলন তাঁর মধ্যে এমন এক স্বর্গীয় ব্যক্তিত্ব সৃষ্টি করেছিল যার ফলে তাঁর জীবন হয় সাফল্যমন্ডিত এবং তিনি জাতিকে ও কুরআনের অনুকরণ ও অনুস্মরনের নির্দেশ দেন।

ইসলামি ইতিহাস সাক্ষ্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত মুসলমানেরা আল্লাহর নাযিল করা এই মহান ও জীবন্ত গ্রন্থকে নিজেদের আলোকবর্তিকা হিসেবে গ্রহণ করেছে ততদিন তারা শক্তি, উন্নতি এবং ঐক্যের সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ থেকেছে। তবে তখন থেকে তারা এই নতুন প্রাণ সঞ্চারকারী মহা ঐশী গ্রন্থকে অবমূল্যায়ন শুরূ করেছে তখন থেকে তারা বিপথগামী এবং রহমত থেকে বঞ্চিত হতে শুরূ করেছে। (ইসলামের অবদান- ৫২, পৃ. ৯)[১]

আল্লামা ইকবাল কুরআনের মূল্যায়ন বা অবমূল্যায়নের সুফল ও কুফল সম্বন্ধে এক সমীক্ষা পেশ করে বলেন:

দুস্য থেকে দিশারী হয়েছে কুরআনের বদৌলতে,
জ্ঞানহীন তাপস হয়েছে কুরআনের বদৌলতে
বেদুঈন হয়েছে জ্ঞান সাগর কুরআনের বদৌলতে,
চোখ ধাঁধাঁনো আবিষ্কারে বিশ্ব ধন্য কুরআনের বদৌলতে।
হে মুসলিম! আজ ঈমান তোমার প্রথার জালে আবদ্ধ,
সর্বত্র জীবন তোমার অমুসলিম ভাবধারায় শৃংখলিত।
তুমি কুরআন বিমুখ হয়ে আজ পদে পদে লাঞ্ছিত,
প্রতিকুল যুগের দোহাই দিয়ে থাকছ অলস বঞ্চিত।
হে মুসলিম! জীবন তোমার শিশিরের ন্যায়রোদে মিশে চলছে,
অথচ জীবন্ত কুরআন তোমাতে প্রাণ সঞ্চার করতে সদা তোমায় ডাকছে।
(শরিফ-৩৮, পৃ. ১৭৮)

জাতীয় নেতাদের প্রতি সাবধান বাণী:

ইকবাল ‘ আয় পীরে হরম’ কবিতায় মুসলিম নেতৃবৃন্দের প্রতি লক্ষ্য করে বলেন, ইংরেজদের দু’শ বছরের শাসন এবং তাদের তহযীব-তমদ্দুন আমিদের জাতিকে বিলাসী করে তুলেছে। জাতিকে এখন আত্মপরিচয় লাভ করতে হবে। হে নেতৃবৃন্দ। জাতির এই অস্থিরতার চিকিৎসার জন্য আপনারা কোন একটা ব্যবস্থা বের করে নিন:

হে মুসলিম নায়ক ! ছেড়ে দিন খানকা পদ্ধতি,
বুঝে নিন আমার প্রাত: গানের উদ্দেশ্য।
রাখো খোদা! তোমার নো জোয়ানদের নিরাপদ,
শিক্ষা দাও তাদের অহং ত্যাগের ,আত্ম-পরিচয়ের।
দিয়াছ তুমি পাথর ফাঁড়ার শিক্ষা,
দিয়েছে পাশ্চাত্য তাদের আরাম আর বিলাসিতার সবক।
ভেঙ্গে দিয়েছে মন তাদের দুশ’বছরের গোলামী,
কর বাহির তাদের অস্থির চিত্ততার কোন একটি ঔষধ।

Dhaka University Institutional Repository

হে খোদা ! যাচ্ছি বলে ইশকের জোশে নিজের রহস্য-কথা,
দাও আমার অস্থির-চিত্ততার পুরস্কার।

জাতিকে বিপদাপন্ন দেখে জাতীয় নেতাদের প্রতি সম্বোধন করেন। তাঁদের প্রতি সাবধান-বাণী উচ্চারণ করে বললেন, তোমাদের কর্তব্য হলো-জাতিকে এই সংকট-মুহূর্তে সঠিক পথে পরিচালিত করা, তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করা। কবি নজরুল দেশের কাণ্ডারী তথা নেতাদের স্বরণ করিয়ে দিলেন যে, তোমরা কি পথ ভুলে যাবে, 'মাঝ-পথ' ত্যাগ করবে ? তোমাদের উপর নেতৃত্বের মহাভার অর্পিত হয়েছে; তাই জাতি হানাহানি করণেও তাদের টেনে নিতে হবে। ১৯২৬ সনে কলকাতায় রাজরাজেশ্বরী মিছিল উপলক্ষে সাম্প্রদায়িক তথা হিন্দু –মুসলিম দাঙ্গা সংঘটিত হলে নজরূল ' কাণ্ডারী হুঁশিয়ার ' কবিতাটি লিখেন। এটি তাঁর স্বদেশ প্রেমের গানগুলোর মধ্যে অন্যতম:

অসহায় জাতি মরিছে ডুবিয়া, জানে না সন্তরণ,
কাণ্ডারী! দেখিব তোমার মার্তমুক্তি-পণ
হিন্দু'না এরা মুসলিম ? ওই জিজ্ঞেসে কোন জন?
কাণ্ডারী !বলো, ডুবিছে মানুষ, সন্তানমোর মা'র
কাণ্ডারী !তুমি ভুলিবে কি পথ?তাজিবে কি পথমাঝ?
করে হানাহানি তবু চলো টানি, নিয়াছ যে মহাভার।

কবি পরবর্তিকালে মুসলিম সমাজের জননেতাদের ডেকে বলেন: ''আল্লাহর উর্ধ্বের জালাল-শক্তিকে স্পর্শ করতে হবে তাঁদের, যারা দেশকে পরিচালিত করতে চান। (আব্দুল্লাহ-৬৮, পৃ. ১০৬-৭)

উপরিউক্ত আলোচনার শেষে আমরা বলতে পারি যে, পবিত্র কুরআনই হলো মানুষের জীবন চলার একমাত্র পথ। এর বিধানদাতা স্বয়ং আল্লাহ। এর অনুস্বরণে আল্লাহর রাসুল ও তার সাহাবীগণ হয়েছেন ধন্য ও কামিয়াব। সেই কুরআনের পথের পথিক হবেন মানুষ এবং এর গন্তব্য স্থল হলো আল্লাহর সন্তুষ্টি, দুনিয়ার শান্তি ও আখিরাতের মুক্তি তথা জান্নাত।

বিশ্বাসীগণের বৈশিষ্ট্য নয়া জাহান তৈরী:

আল্লাহ রাব্বুল -আলামীন এ পৃথিবী ও তার মধ্যস্থ যাবতীয় বস্তু মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করেছেন। ইকবাল মূলত: কুরআনে বর্ণিত এতদসংক্রান্ত ভাবধারাকেই তাঁর কাব্যে রূপান্তরিত করেছেন। কেননা পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا

[এ পৃথিবীর বস্তুনিচয় আল্লাহ তোমাদের (মানুষের) নিমিত্তেই সৃষ্টি করেছেন।] (আল- কুরআন : ২: ২৯)

ইকবালের মতে, সৃজনী শক্তি মানুষের শ্রেষ্ঠ গুণ। ইহা মানুষকে খোদার সহিত মিলন ঘটায়। এই বিশ্ব অভিব্যক্তি

প্রক্রিয়া খোদা মানুষের মর্মে অংশ গ্রহন করেন। যেমন আল্লাহ কুরআনে ঘোষণা করেণ। মানুষের পারিপার্শ্বিক অবস্থার নিরন্তর পরিবর্তন চলছে। এই পরিবর্তনের কারণ মানুষের সৃজনী ক্রিয়া। পরিবর্তিত জীবনের জটিল বিরোধের মোকাবেলা করার জন্য, বাঁচার মত বাঁচিবার জন্য মানুষের বুদ্ধির বিকাশ সাধন অপরিহার্য। (রাশীদুল -৪৩,পৃ. ৪৯৪)

ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا ما بانفسهم

(আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না,
যতক্ষণ না তারা নিজের অবস্থার নিজেই পরিবর্তন করে।) (কুরআন: ২৫: ১১)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ অনস্তিত্ব থেকে কোনো অস্তিত্বের সৃষ্টি করতে পারে না। সে পারে আল্লাহর সৃষ্টিতে নিজের জ্ঞান - বুদ্ধি প্রয়োগ করে এবং শ্রমশক্তিকে কাজে লাগিয়ে তাঁর সৃষ্টবস্তুতে সংযোজন ঘটাতে ও আরও উন্নত আকারে তা উপস্থাপন করতে। ফলে মানুষ যতই কল্যাণকর ও সূক্ষ্মতর জিনিসকে আয়ত্ত করতে থাকে, ততই তার মনে ক্ষণে ক্ষণে আল্লাহর সৃষ্টির ওপর সংযোজনের আশা আকাঙ্খা জাগে। কুরআনের ভাষায় আল্লাহ মানুষকে অস্থিরচিত্তরূপে সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহর সৃষ্টির মধ্যে অধিকতর সুকুমার বৃত্তির অনুশীলন করার সখ থাকে মানুষের।

ইকবালের মতে মানুষের জীবনের উদ্দেশ্য হল-বিশ্ব প্রকৃতিকে বশীভূত করা। এটা অবধারিত যে,আল্লাহর সৃষ্টিতে কোনো প্রকার ত্রুটি-বিচ্যুতি নেই;কিন্তু তারপরও এই প্রকৃতিতে কিছুটা অপূর্ণতা মানবীয় দৃষ্টিতে পরিলক্ষিত হয় যার পরিপূর্ণতা দান আল্লাহর প্রতিনিধি (খলিফা) মানুষের ওপরেই ন্যস্ত হয়েছে সৃষ্টিকর্তার পক্ষ থেকে-যাতে করে মানুষ তার জ্ঞান-বুদ্ধি প্রয়োগ করে তা সম্পূর্ণতার দিকে নিয়ে যেতে পারে এবং নিজের সৃষ্টি-প্রতিভাকে অধিকতর কার্যকর করে তুলতে পারে। নতুন নতুন সৃষ্টির মধ্য দিয়ে সে তাঁর বলিষ্ঠ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটাতে পারে। আল্লাহ তাআলা কোনো বস্তুকে সৃষ্টিকরতে চাইলে কেবল 'হও' বললেই সাথে সাথে তা সৃষ্টির রূপ পরিগ্রহ করে। এতে বোঝা যায় যে, আল্লাহ ইচ্ছাপূর্বক মানুষের সৃষ্টিশক্তি বৃদ্ধির জন্য জগত প্রকৃতিতে কিছুটা অবশিষ্ঠ রেখেছেন। আল্লাহর ইচ্ছা পূরণের তাগিদই ইকবালের মনে গভীরভাবে রেখাপাত করে এবং তিনি সৃষ্টির প্রেরণায় অনুপ্রাণিত হয়ে ওঠেন। তিনি আল্লাহর দেয়া এ পৃথিবীতে অধিকতর সুন্দর করে গড়ে তোলার প্রেরণা দেন। (তারেক-৫৩, পৃ. ১১৯)

একটা প্রগতিশীল জাতির পক্ষে এটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ যে, তার কল্পনা ও চিন্তাকে সব সময়ই প্রাণবন্ত ও অভিনব, শান্ত ও বহু বিচিত্র, সৃষ্টিধমী ও প্রেরণা উদ্দীপক হতে হবে। ইসলাম বৈচিত্র ও পরিবর্তনের উপর গুরুত্ব আরোপ করে। 'সাংস্কৃতি আন্দোলন হিসাবে ইসলাম বিশ্বসম্পর্কিত পুরাতন নিশ্চল ধারণাকে বাতিল কের দেয় এবং গতিশীল ধারণায় উপনীত হয়। ইসলাম-পরিকল্পিত সকল জীবনের চূড়ান্ত ও আধ্যাত্মিক ভিত্তি হচ্ছে চিরন্তন এবং তা বৈচিত্র ও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে নিজকে অভিব্যক্ত করে। বাস্তবের এরূপ ধারণার উপরে যে সমাজের ভিত্তি, তাঁকে তাঁর জীবনের স্থায়িত্ব ও পরিবর্তনের পৃথক পরিমণ্ডলের মধ্যে সমন্বয় সাধন করতেই হবে। সমষ্টিগত জীবনকে সুনিয়ন্ত্রিত করার জন্য চিরন্তন নীতি থাকতেই হবে, কারণ চিরন্তনই আমাদের অনন্ত পরিবর্তনের জগতে দাঁড়াবার ঠাঁই কের দেয়। কুরআনের কথায় যে অনন্ত পরিবর্তন আল্লাহর মহত্তম নিদর্শনসমূহের অন্যতম।" (রহমান-৫৪, পৃ .১৪৮)

فتبارك الله احسن الخلقين

[আল্লাহ পুণ্যময় এবং সৃষ্টিকারীদের মধ্যে সর্বোকৃষ্ট।] (আল কুরআন:৪০:১৪

এতে প্রতীয়মান হয় যে, মানুষ সৃষ্টি-কার্যে আল্লাহর সাথে শরিক রয়েছে। মানুষ সৃষ্টিকারী, তবে আল্লাহ সর্বোচ্চ ও সর্বোত্তম স্রষ্টা।

নবীজী বলেন: تخلقوا باخلاق الله

অর্থাৎ আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হও। সুতরাং মানুষ সৃষ্টিকার্যে আল্লাহর সৃষ্টি-গুণে গুণান্বিত হবে-এটাই আল্লাহ-রাসুলের কাম্য। কুরআনের ভাষ্যমতে বিশ্ব এখনো অসম্পূর্ণ। তা ক্ষণে ক্ষণে পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত হচ্ছে। এই পরিবর্তন ও পরিবর্ধনে মানুষ যত বেশী ভূমিকা পালন করবে, ততবেশী সে আল্লাহর সৃষ্টিকার্যে তাঁর সাথে শরীক হবে। আল্লাহর গুণে গুণানিত্ব হবে এবং এমনি করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ করবে। সৃষ্টির মাধ্যমে সে নিজেকে ধন্য করবে। পৃথিবীকে উপহার দিবে নতুনরূপে।

জাবীদনামা-য় ইকবাল বলেছেন, তাঁর আকাশ সফরের শেষ লগ্নে তাঁর কাছে পরম সৌন্দযের তথা আল্লাহর এই ডাক এলো:

Dhaka University Institutional Repository

کلک حق از نقشهای خوب وزشت   هرچه ما را سازگارآمد نوشت

چیست بودن دانی اے مرد نجیب؟   از جمال ذات حق بردن نصیب
آفریں؟ جستجوي دلبري   وا نمودن خویش را بر
دیگري   این همه ہنگامه های هست و بود   بی جمال
مانیاید در وجود
زنده مشتاق شو خلاق شو   ہمچو ماگیرنده افاق شو!
درشکن آنرا که نیاید ساز گار   از ضمیر خود دگر عالم بیار
بنده آزاد را آید گران   زیستن اندر جهان دیگران
ہر که او را قوت تخلیق نیست   پیش ما جزکافر وزندیق نیست
از جمال ما نصیب خود نبرد   از نخیل زندگانی بر نخورد
مرد حق برنده چوں شمشیر باش   خود جهان خویش را تقدیر باش

অনুবাদ:

সৌন্দর্যের ডাক

আল্লাহর কলমে ভাল-মন্দের বিচিত্র নকশা হতে,
লিখে দিয়েছেন তিনি তাই, যা খাপ খায় আমাদের সাথে
হে সম্মানিত মানুষ! তুমি কি জান জীবন কী?
জীবন মানে আল্লাহর গুণে গুণান্বিত হওয়া।
সৃজনশীলতা ? সে তো পুরাতনকে সন্ধান করার নাম
অন্যের উপর নিজের প্রাধান্য বিস্তার করা।
জীবনের এসব কর্মতৎপরতার উৎস কি?
আল্লাহর সৌন্দর্য গুণ ছাড়া হবে না এসবের অস্তিত্বে
তুমি কি জীবিত? তবে হও উদ্যমী, সৃষ্টিকারী,
লাভ কর আমার (খোদার) মত বিশ্বব্যাপকতা।
তোমার পছন্দ নয় যা ভেঙ্গে কর চুরমার
সৃষ্টি কর আর একটি জাহান.তোমার নিজের মন মত।
হবে না মন:পুত স্বাধীন বান্দার বেঁচে থাকা অন্যের জাহানে,
সৃষ্টিশক্তি নেই যার, কাফের বই কিছু নয় সে আমার চোখে।
যে নেইনি অংশ আমার সৌন্দর্য থেকে,
পারবেনা সে খেতে, জীবন-খেজুর বাগানের ফল।
হে সত্য পথের পথিক ! তরবারির মত হও কর্তনকারী,
গড়ে না, নিজ জাহান সৃষ্টির তক্দির। (ইকবাল- ৫, পৃ.-২৭৫)
অনুবাদক: (আবদুস সাত্তার)

অন্যত্র ইকবাল বলেন: খোদা করুন! প্রত্যেক মুহূর্তেই যেন আমাদের মধ্যে নতুন তুর পাহাড় এবং নতুন গৌরবের চমক বিদ্যমান থাকে এবং সৃষ্টির উৎসাহের সফর কখনো শেষ হয় না। ইকবাল ছিলেন এক মহৎ দার্শনিক ও চিন্তানায়ক কবি। নব নব সৃষ্টির প্রেরণায় তিনি ছিলেন উদ্বুদ্ধ। তাঁর চিন্তা বিলাসজনিত ছিল না। তা ছিল সৃজনমূলক ও বিপ্লবধর্মী। তিনি ছিলেন সৃষ্টির নেশায় বিভোর। তাঁর শিরায় শিরায় ছিল নতুনত্ব স্বাতন্ত্র্যও প্রবাহ। তিনি যে পৃথিবীতে চোখ খুলেছেন, তা তাঁকে তৃপ্ত করতে পারেনি। প্রাকৃতিক জগত ও মানব-সৃষ্ট জগত - কোনটাতেই তিনি তুষ্ট ছিলেন না। তিনি যেমন প্রাকৃতিক দুনিয়ায় পরিবর্তন ও পরিবর্ধন সাধন করে নতুন জাহান

Dhaka University Institutional Repository

সৃষ্টি করতে চেয়েছেন, তেমনি অবিচার অত্যাচার ভারাক্রান্ত পুরনো দুনিয়ার নকশা মুছে ফেলে এক নতুন আদর্শ সমাজ গড়ে তোলার সংকল্প ব্যক্ত করেছেন।

এই আকাঙ্ক্ষাকে সামনে রেখে শাহ্ ওয়ালীউল্লাহ মুহাদ্দেশে দেহলভীর পুত্র শাহ রাফীউদ্দীন দেহলাভী তাঁর তাকমীলুল আযহান গ্রন্থে মানুষের সংজ্ঞা দিয়েছেন নিম্নরূপ ভাষায়।

من يتفكر و يصنع بالالات هو الانسان

অর্থাৎ[যে চিন্তা করে ও যন্তপাতি ব্যবহার পুর্বক দ্রব্যাদি সৃষ্ট করে, সে-ই মানুষ।]

এই বাক্য দ্বারা বোঝা যায় যে, সৃষ্টি করা হলো মানুষের প্রকৃতি। অন্য কথায় সৃষ্টি না করে কেউ মানুষ হতে পারে না। তাই বলা যায়, শিল্প এবং কলাকৌশলও মানুষেরই সৃষ্টি। (আ. রহীম-৩১ পৃ. ৫৯)

জার্মান দার্শনিক নিটশের (১৮৪৪-১৯০০খ্রি.) মতে পৃথিবী তার ঊষালগ্নে থেকেই পরিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং সদাসর্বদা এর রূপের পুনরাবৃত্তি ঘটছে। এই প্রক্রিয়ার শেষ নেই। ইকবাল তা মনে করেন না, কেননা পবিত্র কুরআনের ভাষ্য মতে এ জগত অসম্পুর্ণ ও গতিশীল এবং তা নতুন নতুন রূপ পরিগ্রহ করছে। যেমন পবিত্র কুরআনে এরশাদ হয়েছে-

اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكن

যখন আল্লাহ কোনো সৃষ্টি করার ইচ্ছা পোষণ করেন, তখন বলেন, হয়ে যাও 'অমনি তা হয়ে যায়। (আল-কুরআন: ৩:৪৭)

ভাঙ্গা ও গড়ার মাধ্যমে এ পৃথিবীকে পরিপূর্ণতা দানের দায়িত্ব মানুষের| মানুষ সৃষ্টির সেরা জীব হিসেবে বিশেষ প্রেরণায় উজ্জীবিত হয়ে নব নব সৃষ্টির মাধ্যমে তাকে পূর্ণতা দান করবে এটাই দুনিয়ার রীতি। ইকবাল বলেন :

যদি চাও স্থান করতে জীবিতদের মাঝে, গড়ে নাও তবে নিজের পৃথিবী নিজেই,
রয়েছে এখানেই মানব জীবনের গুঢ়তত্ব। হও'তাই হয়ে গেল''
রয়েছে এখানেই নিহিত জীবন রহস্য| (ইকবাল -৫, পৃ. ২৯৪)

মানুষের সৃষ্টিকর্মের পথে নানা রকম প্রাকৃতিক বাধা বিপত্তি থাকাটা স্বাভাবিক। কিন্তু মরদে মুমিন ও বাধা-বিপত্তি তোয়াক্কা করে না। আল্লাহ তার মধ্যে অসীম ক্ষমতা সুপ্ত রেখেছেন। সে বৈজ্ঞানিক উপায় অবলম্বন করে প্রকৃতির বিরূপ শক্তিগুলোকে বশে নিয়ে আসে। এবং উদ্দেশ্য হাসিলের পথে যে সব বাধা আসে, তা সরিয়ে প্রকৃতির বিরূপ শক্তির উপর বিজয় অর্জন করে, নিজের মনমত নতুন জাহান সৃষ্টি করে, আল্লাহর সাথে সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করে এবং এমনি করে তাঁর গুণে-গুণান্বিত হয়ে তাঁর নৈকট্য লাভ করে।

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
سر آدم ہے ضمیر کن فکان ہے زندگی

অনুবাদ:

হও যদি জীবিত, নিজের দুনিয়া নিজেই সৃষ্টি কর,
আদম-সৃষ্টি রহস্য এখানেই, জীবন রহস্য
লুকানো আছে সৃষ্টির মাঝে। (ইকবাল -১১, পৃ. ২৯৩)

حدیث ہے خبراں ہے، تو با زمانہ بساز

Dhaka University Institutional Repository

زمانه با تو نسازد، تو با زمانه ستیز

বোকা লোকেরা বলে:‘‘চল কালের সাথে সন্ধি করে
চলবে না কাল, তাল মিলিয়ে তোমার সাথে
চল তুমি কালের সাথে লড়াই করে। (ইকবাল-৫, পৃ. ২৬)

ইকবালের গতিবাদ বিশ্লেষণ করেত যেয়ে ড. মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ বলেন: গতিবাদ ইসলামের শিক্ষা আল্লামা ইকবাল এই গতিবাদের কবি। পাশ্চাত্য মুনীষীদের গতিবাদ হতে ইসলামের গতিবাদের পার্থক্য আছে। তাঁদের গতিবাদ নাস্তিক্যবাদের সহিত জড়িত। ইকবালের গতিবাদ ইসলামের শিক্ষাসম্মত। তিনি বলেন

গতি হতে জগতের জীবন,
ইহাই তাঁর প্রাচীন রীতি।
এই পথে অবস্থিতি অসঙ্গত,
স্থিতিতে মৃত্যু লুকায়িত ।
চলনশীল রক্ষা পেয়েছে,
যে একটু থামিয়েছে বিধ্বস্ত হয়েছে। (শহিদুল্লাহ -১২, পৃ. ১৮১)

নব নব জগৎ যা মাটির পৃথিবীর মত নশ্বর এবং ক্ষণস্থায়ী নয়,তা সময়ই অভিনব চিন্তার দ্বারাই সৃষ্টি। প্রাণবন্ত, ফলপ্রসূ এবং মহৎ হওয়ার জন্য আকাঙক্ষাকে অবশ্যই পরিবর্তনশীল ও বহু বিচিত্র হতে হবে। প্রাচীন ও জীর্ণ আকাঙ্ক্ষা হতাশার কাছে আত্মসমর্পণ করে অথবা কাতরতায় পর্যবসিত হয়ে ইকবাল বলেন:

প্রাচীন সৌন্দর্য এবং জীর্ণ আকাংখা থেকে দূরে সরে যাও !
হীন উত্তারাধিকারকে পরিহার কর
লালন কর একটি নবীন বাসনাকে। (’ইকবাল যবুর-ই আযম)

সৃষ্টি সুখের উল্লাসে মাতোয়ারা হয়েই ইকবাল নিজের সৃষ্টিকে আল্লাহর সৃষ্টির উপর এক বিশেষ সংযোজন বলে আখ্যায়িত করেছেন এবং এজন্য আত্মতৃপ্তিও অনুভব করেছেন। এক জায়গায় ইকবাল আরো বলেছেন, আমাকে মুফত্ বেহেশত দান করা হলে তা আমি নেব না। আমি আমার বুকের রক্তে গড়া বেহেশতই নিতে চাই। ইকবালের ভাষায়:

দান করা বেহেশত ভাল লাগে না আমার নযরে
তোমার বেহেশত গোপন রয়েছে তোমারই বুকের রক্তে। (ইকবাল -৫৫, পৃ. ১৭)

প্রকৃতি যদিও বিশ্বের সৌন্দর্য সাধনে সদা নিয়োজিত রয়েছে, তবুও তাতে কিছুটা শূন্যতা রয়েই যাচ্ছে। এবং এই শূন্যতা আল্লাহ তাআলা উদ্দেশ্যমৌলকভাবে রেখেছেন। যাতে তুমি তোমার খুদী প্রয়োগ করে ঐ ত্রুটি পূরণ করতে পারো। এবং এমনি করে তুমি তোমার খুদীকে অদিকতর উন্নত করতে পারো। এ কবিতায় ইকবাল সেই প্রকৃতিকে পূর্ণতা দানের শিক্ষাই দিয়েছেন। প্রকৃতি মানুষকে পাখির ন্যায় শূন্যলোকে উড়তে শেখায়নি। এ জন্য মানুষের কর্তব্য হলো, এমন বস্র আবিস্কার করা যাতে সে-ও শূন্যলোকে পাখির মত উড়তে পারে। বিজ্ঞানের

Dhaka University Institutional Repository

সবচাইতে লাভজনক দিকতো এটিই যে, মানুষ নব নব প্রযুক্তি প্রয়োগ করে প্রকৃতির রহস্য তথা শক্তি উদযাপন করবে এবং ঐ শক্তিকে মানব জাতি এবং বিশ্বের উন্নতি সাধনে ব্যবহর করবে। (চিশতি -৫৬, পৃ. ২৯৪)

সাধারনত মানুষ আল্লাহর সাথে সৃষ্টির কাজে অংশগ্রহণ করে সমাজ ও পৃথিবীর উন্নতি করবে-এ ব্যাপারে আল্লাহই কুরআনে এরশাদ করেছেন:

لتركبن طبقا عن طبق

[আবশ্যই তোমরা এক স্তর হতে অন্য স্তরে অতিক্রম করতে থাকবে। ।] (আল কুরআন:৮৪:১৯)

রাসুল (সা:)বলেন:

من استوي يوماه فهو مغبون

[যে ব্যক্তি তার দুই দিন একই অবস্থায় কাটিয়ে দিয়েছে, অথচ কোন উন্নতি করেনি, সে ক্ষতির মধ্যে রয়েছে] (আজলানী, ২য় খন্ড পৃ. ৩২৩)[৩১]

মানুষ পরিবেশ ও প্রকৃতির সাথে মোকাবিলা করে সৃষ্টি ক্ষেত্রে কতটুকু নতুনত্ব আনতে পারে, তা ইকবালের ভাষায় দেখা যাক:

تو شب آفریدی چراغ آفریدم   سفال آفریدی ایال آفریدم
بیا بان وکهسار و راغ آفریدی   خیابان وگلزار و باغ آفریدم
من آنم که از سنگ آئینه سازم   من آنم که از زهر نوشته سازم

অনুবাদ:

তুমি সৃষ্টি করেছ রাত, আমি সৃষ্টি করেছি প্রদীপ,
তুমি সৃষ্টি করেছ মাটির পাত্র,আর সৃষ্টি করেছি পেয়ালা।
তুমিতো সৃষ্টি করেছ মরু, পাহাড়ী অঞ্চল আর জঙ্গল,
সৃষ্টি করেছি আমি তরু- বীথি আর ফুল বাগান।
আমিই তো সে যে পাথর দিয়ে আয়না বানাই,
আমিই তো বিষ থেকে বানাই পানীয়। (জাভেদ-৫৭, পৃ. ২২৯)

ইকবাল মানুষের অন্তর্নিহিত শক্তি-সামর্থ্যকে কাজে লাগিয়ে এক নতুন বলয়, নতুন পৃথিবীতথা এক আলোয় উদভাসিত জগত সৃষ্টি করার আহ্বান জানিয়েছেন।

ড.অমিয় চক্রবর্তী বলেন: আমার মনে হয়, কবি ইকবালের বাণী নব্য ভারতের কানে পৌঁছানো দেশের পক্ষে এক মহান সৌভাগ্য। যে হৃদয়বেগের প্রাচুর্য ও অন্তর্মুখী ভাবসমাধিকে আধ্যাত্মিক জীবনের মর্মকথা বলে মেনে নিতে আমরা অনেকেই অভ্যস্ত, কবি ইকবালের আত্মবিকাশের দর্শন সেই মতবাদের বিরূদ্ধে প্রত্যক্ষ বিদ্রোহের ভঙ্গিতে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে। ইকবাল তাঁর একটি কবিতায় বলেছেন, ছড়িয়ে দিয়ো না মাটিতে তোমার হাতের ধুলিমুঠো। এই পঙক্তিটি চিরস্বরণীয় হয়ে থাকবার মতো। শক্তিকে আত্মকেন্দ্রিক করা এবং তার সঙ্গে জীবনযাত্রার প্রচণ্ড উত্তাপের সন্মূখীন হবাব দুর্বার সংকল্প, নিজের কল্যাণের জন্য বস্তুজগকে আয়ত্তাধীন করতে আত্মাকে নিয়োজিত করা-কবি ইকবালের এখানেই বিশেষত্ব। (অমিয়- ৫৮, পৃ. ৫০)

এমনিভাবে কবি তার জাবিদনামায় ও'নেদায়ে জামাল' মানবতার প্রতি সত্য ও সুন্দরের পথে আল্লাহর আহ্বানকে মধুর করে তুলেছেন-যেখানে তাকে জীবনের মূল্যবোধ অর্জনের পাশাপাশি তা যেমন তাঁকে করতে হয় তেমনি তাঁকে নিয়োজিত হতে হয় মানবতার সেবায়-ইকবাল বলেন:

অতিক্রম করে যাও প্রাচ্যের সীমানা,
প্রতিরোধ্য কর পাশ্চাত্যের যাদু
এই সব প্রাচীন ও নবীন
রাখেনা একটি শস্যকণারও মূল্য!
যে রত্ন বিনিময় করেছো তুমি
অন্ধকারের মানুষদের সাথে
এত দামী-যা আমানত রাখা যায় না
জিবরাইলের কাছেও।
জীবন আত্মপ্রত্যয়শীল
আর সে সৃষ্ট করে তার আপন মজলিস:
ওগো কাফেলার সঙ্গী
চলো সবার সাথে,
স্বাধীন থাক সকলের থেকে।
দীপ্তিমান চন্দ্র অপেক্ষা
থাক জীবন্ত হয়ে,
যেনেও প্রতি পরমাণু লাভ করে তোমার দীপ্তি। (ফাহমিদ-৪১, পৃ. ৬২)
(অনুবাদ -সৈয়দ আব্দুল মান্নান তালিব)

জীবন হলো উৎসর্গ আর সৃষ্টির অপর নাম। জীবন রাত-দিনের বিবর্তনের চেয়ে উর্ধ্বে এক চলমান বস্তু। জীবন হচ্ছে চলার নাম, যা বিলীন ও হয় না এবং নিশ্চল ও হয় না। ইকবাল উল্লেখ করেন:

ساحل افتاده گفت گر چه بسی زیستم هیچ به معلوم شود آه که من چیستم
موج ز خوق رفته تیز خرا مید و گفت هستم اگر میروم گر نروم نیستم

সমুদ্রর পতিত বেলাভুমি বললো: যদিও বেঁচে আছি অনেক দিন
যদিও দীর্ঘ জীবন লাভ করেছি
আফসোস তবুও জানতে পারলাম না যে আমি কে,
আত্মহারা এক তরঙ্গ তীব্র মোচড় দিয়ে বলল:
চলার মধ্যেই আমার জীবন যদি থেমে যাই তা হলে আমি আর নাই।
(ইকবাল - ৫, পৃ. ২৩৬)

সময়ের সাথে নতুন জীবন গড়ার যে সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে ওপরের পংক্তিগুলোতে তার প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। ইকবাল বলেন:

میری صراحی سے قطرہ قطرہ نئے حودث ٹپک رہے ہیں
میں اپنی تسبیح روز و شب کا شمار کرتا ہوں دانہ دانہ

আমার সুরাহী থেকে ধীরে ধীরে নতুন নতুন ঘটনা সংঘটিত হয়,
আর আমি দিবা-রাত্রি আমার তসবিহর প্রতিটি দানা জপে চলেছি। (ইকবাল ১১, পৃ. ৪৫৮)

ইকবাল সৃষ্টির আনন্দ আর জীবন রহস্য উদঘাটন করতে গিয়ে বলতে চেয়েছেন যে, জীবনের প্রকৃত স্বরূপ হলো মৃত্যু ও জীবন ও জীবন থেকে ভিন্ন একটি আবস্থা।কেবল প্রাণ থাকলেই তাকে আমরা জীবন বলে অভিহিত করবো না, মূলত সৃষ্টি আর কর্ম সম্পাদনের মধ্যেই রয়েছে প্রকৃত জীবনের রূপ। যে সৃষ্টিতে যত বেশি

Dhaka University Institutional Repository

মেতে উঠবে, সে ততোটাই খুঁজে পাবে জীবনের স্পন্দন। সেখানে জীবন রহস্য বিমূর্ত থাকবে না, বরং তা ধরা দেবে মূর্ত হয়ে। পৃথিবীতে এমন বহু লোক আছে যারা বেঁচে থেকেও মৃত্যুপ্রায়। আবার এর বিপরীতে বহু লোক রয়েছে যারা মরেও জীবন্ত রয়েছে। তাই যে যত সৃষ্টি করবে তাঁর জীবন ততোটাই স্থায়ী হবে। এ প্রসংগে মিসরীয় কবি আহমাদ মাওকীর কবিতায় একটি উদ্ধৃতি প্রণিধানযোগ্য:

الناس صنفان موتي في حياتهم　　　　واخيون ببطن الارض احياء

খোদার সৃষ্ট মানুষ দু'রকম হয়ে থাকে
এক ধরনের লোক আছে যারা জীবিত হয়েও
পৃথিবীতে মৃত বলেই পরিগণিত; আর এক ধরনের লোক আছে যারা মৃত্তিকার গহ্বরে (কবরে) অবস্থান করেও জীবিত।

এ প্রসংগে প্রফেসর মুহাম্মদ মুনাওয়ার তাঁর Iqbal and Quranic Wisdom শীর্ষক গ্রন্থে বলেন:

No doubt, every moment is a creative moment.Things are coming to life. Things are dying out.Every moment the universe is a new universe. Hence no human being can afford to be inert, neither physically nor mentally one has constantly to be alertup and doingTime gives no special consideration and makes no concession to any individual or society. Tfose who capture the spirit of creation and change know what to do , how to do and when to do . They subjugate time. Theose who are otherwise subjugated by Time. There are people who learn and conquer. There are people who do not learn and are trampled upon by others (Munawwar-59, p. 48-49)

নি:সন্দেহে প্রতিটি মুহূর্তই হচ্ছে সৃজনশীল মুহূর্ত। মানুষের জীবনে অনেক জিনিসের আগমন ঘটে, তদ্রূপ অনেক কিছুই মানুষের জীবন থেকে অদৃশ্যও হয়ে যায়। প্রতি মুহূর্তে এ বিশ্ব পরিবর্তিত হচ্ছে একটি নতুন বিশ্বে সুতরাং কোন মানুষই শারীরিকভাবে অথবা মানসিকভাবে জড় বা নিষ্ক্রিয় হয়ে বসে থাকতে পারে না। প্রত্যেককেই অবনত ও সতর্ক ও সক্রিয় থাকতে হয়। সময় ব্যক্তি বিশেষ বা সমাজের প্রতি কোন বিশেষ বিবেচনা করে না। যেসব লোক সৃষ্টির অনুপ্ররণাকে আয়ত্ব করতে পারে এবং তা পরিবর্তন করতে সক্ষম, তারা জানে কী করতে হবে। কীভাবে করতে হবে এবং কখন করতে হবে। তারা সময়কে নিয়ন্ত্রন করতে পারে। আর যারা এর বিপরীত তারা তো সময় কর্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে।

হ্যাঁ, পৃথিবীতে এমন লোকও রয়েছেন যাঁরা শিক্ষা গ্রহন করেন এবং জয়ও করেন।
আবার পৃথিবীতে এমন লোকও আছেন যারা শিক্ষা গ্রহন করেন না এবং অন্যের দ্বারা পদদলিত হয়ে থাকেন।

Dhaka University Institutional Repository

তৃতীয় অধ্যায়

ইকবাল সাহিত্যের স্বরূপ এবং মানুষ ও মনুষত্বের বিশ্লেষণ:

তৃতীয় অধ্যায়

(ইকবাল সাহিত্যের স্বরূপ এবং মানুষ ও মনুষত্বের বিশ্লেষণ)

ইকবাল সাহিত্যের বিষয়বস্তু:

সূর্য কী, এটা বুঝতে হলে চক্ষুস্মান হওয়া অপরিহার্য একটি শর্ত। অর্থাৎ অন্য গুণপনা যা-ই থাক এবং বুদ্ধি-বিবেচনা যতই প্রখর হোক, কোনো অন্ধজনের পক্ষে সূর্যকে সঠিকভাবে অনুধাবন করা অসম্ভাব। ইকবালকে বুঝতে হলেও এ রকম একটি অপরিহার্য শর্ত আছে। শর্তটি হল আগ্রহীজনকে অবশ্যই ইসলাম কী, মুসলমানিত্ব কী বস্তু, এটা ভালভাবে বুঝতে হবে। অন্যথায় ইকবালের মর্মমূলে প্রবেশ করা আদৌ সম্ভাব হবে না।

উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, যে ব্যক্তি গণিত জানে না, তার পক্ষে যেমন পদার্থবিজ্ঞান কি উচ্চতর-অর্থনীতি বোঝা সম্ভাব নয়; ঠিক একই রকম,যিনি সঠিক ইসলামি দর্শন, তাওহীদ, রেসালাত ও আখিরাত সম্পর্কে সম্যক বিশ্বাস ও ধারণা থেকে মাহরূম, তাঁর জন্য গুণপনা যাই থাক, তিনি ইসলামকে বুঝতে সক্ষম হবেন না। অতএব কবি হিসাবে ইকবাল কী রকম, কী মহীমায় তাঁর কবিতা, কোন অর্থে ও শক্তিতে কী তাৎপর্যে তার কাব্যপ্রতিভা গরীয়ান, এটা বুঝতে হরে আমাদের মধ্যে যথোচিত ইসলামি বোধ ও ইসলামি সবক থাকা অত্যাবশ্যক।

ইকবাল নি:সন্দেহে অমিত কাব্য প্রতিভার অধিকারী ছিলেন। কিন্তু এই প্রতিভা যদি কেবল শব্দ ও ছন্দ -ব্যবহারের নৈপুর্ণ,বাক্য নির্মাণের কুশলতা,সুক্ষ ও হৃদয়গ্রাহী নান্দনিক ব্যঞ্জনা সৃষ্টির দক্ষতা,আবেগ ওঅনুরাগের সহজ প্রকাশ শৈলী ইত্যাদি কিছু গুণের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে দেখা হয়, তা হলে ইকবালকে ঠিক তার আসল পরিচয়ে অনুভব ও অনুধাবন করা অসম্ভাব হবে। পৃথিবীতে বহু ধরনের কবি আছে। কারো কাছে ছন্দের মিঠা মিঠা আওয়াজই বড়, যেমন আমাদের সত্যেন্দনাথ; যেমন রবীন্দ্রনাথ। আবার এক ধরনের কবি আছে, যাঁরা দুঃখ বিষন্নতা ও অন্তরের নিভুত হাহাকারকেই ব্যাঙময় করে তোলেন; এই জাতীয় কবির মধ্যে বোদলানোর পড়ে, গালিব ও পড়ে, সঠিকভাবে বিবেচনা করলে আমাদের জীবনান্দও হয়ে পড়ে। অন্যদিকে খুব সেব ও উচ্চকন্ঠ এক ধরনের মানবতাবাদী বিপ্লবী কবিও আছেন,যাঁদের কবিতার নান্দনিক গুণমান যে পর্যায়ের হোক, শোষিতের পক্ষাবলম্বনে তাঁদের কবিতা হয়ে ওঠে বঞ্চিত, উপেক্ষিত, নির্যাতীত অসহায় মানুষের কন্ঠস্বর। নজরুলের অনেক কবিতা এবং সুকান্ত এই্ জাতীয় কাব্যকীর্তির প্রকৃষ্ট নমুনা। আবার এক ধরনের কবি আছেন, যাঁদের কাজ হলো অশ্লীল-যৌনতা রিরাংসা ও দেহসর্বস্বতার সঙ্গে কি এক চতুর আধ্যাত্মিকতা মিশিয়ে অথবা না মিশিয়ে একটা কামপ্রবণ কাব্যরূপ নির্মাণ করা। সাবা মুয়াল্লাকা খ্যাত ইমরাউল কায়েস, চণ্ডিদাস, জ্ঞানদাস, গোবিন্দদাস প্রমুখ মধ্যযুগের অধিকাংশ গীতিকবি অবশ্যই আমাদের অতিপরিচিত লালন ফকির এই্ শ্রেণিভুক্ত কবিদের উল্লেখযোগ্য উদাহরণ।

যা-ই হোক প্রসঙ্গক্রমে নানারকম কবির কথাই উল্লেখ করা হলো, ইকবালকে বুঝবার সুবিধার্থে উল্লেখ করার বিশেষ আবশ্যকতা ও ছিলো। এবং এতদসংঘে অপর যে কথাটি প্রথমেই বলে নেয়া জরুরী তাহলো, এই সকল কবির মধ্যে ফেনিল উচ্ছাস ও উদ্দাম-অনাবশ্যক প্রবল ভাবাবেগ যতটা আছে, যতটা আছে নিরর্থক আত্মপ্রেম ও বায়বীয় হাহাকার, তার এক সহস্রাংশ ও প্রকৃত সত্য ও মানবিক দায়িত্ববোধ নেই। কাব্য রসিকেরা রুষ্টহতে পারেন, তবু কথাটা সাহস করে বলতে পারছি এই জন্য যে, আল্লাহ পাক নিজে ঘোষণা করেছেন, নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা ও সর্বজ্ঞ। বলুন, আমি কি বলবো শয়তান কাদের উপর প্রভাব বিস্তার করে? শয়তান আসে অসৎ ও মিথ্যাবাদীদের কাছে এবং এসে আজগবী মিথ্যা পৌছে দেয়, তারা অধিকাংশই ডাহা মিথ্যাবাদী। আর পথভ্রষ্ট ব্যক্তিরাই কবিদের অনুসরণ করে তোমরা কি দেখছনা তারা আনা উপত্যকায় দিকভ্রান্তের মত ঘুরে বেড়ায়; এবং তাদের কথার সাথে কাজের কোন সংগতি নেই। (সুরা শুয়ারা)

অতএব, আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণানুযায়ী শয়তানের দাসত্ব শৃঙ্খলে আবদ্ধ অবরুদ্ধ এমন বহু কবি এই পৃথিবীতে বর্তমান, যারা শুধু বেলোয়ারি চুড়ির মিঠে মিঠে মনির আওয়াজে সর্বদা বিভোর নানাবর্ণ আবেগের ঘনঘটা নিয়ে যারা উদভ্রান্ত আত্মহারা, নারী ও প্রকৃতির নিরবচ্ছিন্ন উপাসনাই যাদের জীবনের সর্বোচ্চ লক্ষ্য এরাই তারা, আল্লাহ পাক যাদের আখ্যায়িতক করেন ডাহা মিথ্যাবাদী। বিখ্যাত বিখ্যাত পংক্তির উদ্ধৃতি সংযোগে এই

সকল কবির অসৎ ভাবাবেগ ও বেপরোয়া বালখিল্যতার স্বরূপ তুলে ধরা যায়, কিন্তু বর্তমান প্রবন্ধের অবয়ব অনেকটা দীর্ঘকায় হবে এবং মূল প্রতিপাদ্যে ফিরে আসতে বিলম্ব ও ঘটবে। শুধু এইটুকু বলাই যথেষ্ট যে পার্থিব ও পরলৌকিক এক বিশাল অন্তহীন প্রেক্ষাপট সামনে রেখে, ইসলাম যে নির্ভুল জীবনদর্শন পেশ করে, তার সঙ্গে এই সকল কবির কোন যোগ নেই। তাদের দৃষ্টি এই নশ্বর পৃথিবীর ছোট্ট সীমারেখার মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র আনন্দ - উল্লাসের জলতরঙ্গ, তারই নিরর্থক নিগড়ে বন্দী। কবিতায় বিবৃত কথা ও তাদের জীবন সম্পূর্ণরূপে ইসলামি জীবনদর্শনের বিরোধী ও বিপরীত ; যে কারণে এই ধরনের কবিদের সম্পর্কে রাসুল (সা.) বলেন, কারো অভ্যন্তরে পুঁজে পরিপূর্ণ হয়ে পচে যাক, সেটাও কবিতায় পূর্ণ হওয়ার চেয়ে উত্তম, (হাদীস, বুখারী)

কিন্তু খুবই সুখের বিষয়, ইকবাল এই শ্রেণিভুক্ত নন এবং তার কবিতা নয় ব্যয়বীয় নান্দনিকতার অসার অভিব্যক্তি। তিনি তাঁর কবিতা নির্মাণ করেছেন সুস্পষ্ট বক্তব্য ও সুস্পষ্ট জীবনদর্শনের অঙ্গিকার নিয়ে। আর সেই বক্তব্য ও দর্শন পূর্ণরূপে ও একান্তভাবে ইসলাম, আল কুরআন ও রাসুল (সা.) এর জীবনাদর্শকে কেন্দ্র করে অনুগত উপগৃহের মত সর্বদা আবর্তিত। কবিতা অন্য কিছু নয়, কবিতা হলো কবির বিশ্বাস , স্বপ্ন ও অন্তর্জগতের অভিব্যক্তি। উৎকৃষ্ট কবিতায় এই অভিব্যক্তির মধ্যে কোনো কপটতা থাকে না। অতএব, আবেগের ঘনত্ব দিয়ে নয়, শিল্প ও শৈলীর পরাকাষ্ঠা বিচারে নয়, কবিতার শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণীত হয় ও হওয়া উচিত এই নিরিখে যে, সেখানে কবিকে কতটা নির্ভুলভাবে চেনা সম্ভব হলো। এবং সেই নির্ভুল চেনা শোনার মানদণ্ডে কবি মানুষ হিসাবে কী মাপের ; এটাই কাব্য বিচারের সঠিক মানদণ্ড।

অবশ্য এমন অনেক সমালোচক আছেন যারা কবিতাকে কবি বিচ্ছিন্ন করে দেখতে চান। তাঁরা মনে করেন, শিল্পের স্বার্থে কবিকে তাঁর কাব্যকর্ম থেকে যথাসম্ভব নিজে আলাদা হয়ে থাকাই ভালো। এবং পাঠক কবিকে যত কম বুঝবেন ততই উত্তম। কারণ, কবি শুধু নিজেকে প্রকাশ করতে চান না, আড়াল ও করতে চান না, যা আধুনিকতার একটি শর্ত ও বটে। আসলে এ এক ভাররন্ত ধরনের কাব্যবোধ; কারণ শিল্পবিচারের এই মাপকাঠি কবিকে কহুক ও কপটতাকে প্রিয় ভাবতে শেখায়, জীবনের প্রকৃত তাৎপর্য ও মানবিক দায়িত্ববোধ থেকে মুখ ফিরিয়ে চতুর বাকসর্বস্ব হতে শেখায়। রাসুল (সা.) এই দুর্ভাগা অক্ষরজীবীদের কথা ভেবেই বলেন যে ব্যক্তি মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য বাক্যাংকার শিক্ষা করে আল্লাহর কাছে তার তোবা গ্রহণযোগ্য নয়, (আবু দাউদ) আল্লাহ পাকের কাছে লাখো শুকরিয়া যে, আমাদের আলোচ্য ইকবাল ছিলেন কবি হিসেব এই ধরনের কুহক ও নিরর্থক বাকসর্বস্বতা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত। এবং তিনি শুধু মুক্তই ছিলেন না, মুক্ত থাকতে হলে যে চূড়ান্ত বিশ্বাস ও সত্য ও শ্বাশত সৌন্দর্যকে গভীর প্রেমে,গভীর আবেগে অনুরাগে সর্বক্ষণ আঁকড়ে থাকতে হয়, সেই শ্বাশত ইসলাম ছিল ইকবালের সার্বক্ষণিক প্রেরণা ও অবলম্বন।

ইকবাল জন্মবধিই সত্যানুসন্ধানী। এইজন্য কখনোই তিনি শব্দ বাক্যের টুংটাং আওয়াজ ও তথাকথিত নান্দনিকভাবে বড় করে দেখেননি, বেশী প্রশ্রয়ও দেননি। তিনি তার সবটুকু কাব্যশক্তি ব্যবহার করেছেন মানবিক মহতে উদ্ভাসিত, মনুষ্যত্বের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন একটি নতুন পৃথিবী রচনার স্বপ্ন নিয়ে। এবং এই স্বপ্নের বাস্তবায়ন যে ইসলাম ছাড়া দ্বিতীয় কোনভাবে সম্ভাব নয়, এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে তিনি কখনোই পদস্খলিত হননি, অন্যমনস্ক ও হননি। সজেতন পাঠক দেখতে পাবেন, এই বিশ্বাসই ছিল তার কবিতা , জীবন ও স্বপ্নের মূল মুক্তিকেন্দ্র। অবশ্য একেবারে গোড়ার দিকে প্রস্তুতিপর্বে তিনি হিন্দু মুসলমানের মিলিত সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদে আস্থাবান ছিলেন, যে আস্থা থেকে তিনি লিখেছিলেন, ''জিস খেত সে আচ্ছা হিন্দুস্তা হারাম 'এবং তিনি এরকম ও লিখেছিলেন, জিস খেত সে দহকান কো ময়সসর নহো রোযী, উস খেত কে হর খোসা এ গন্দম কো জালা দো'। অর্থাৎ যে মাঠ থেকে কৃষকের জীবিকা জোটেনা, সেই ক্ষেতের গম জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দাও। সর্বহারাদের প্রতি এই অতি বৈপ্লবিক একাত্মতা অথবা হিন্দুস্থানের প্রতি মমত্ববোধ ইসলামে কোন অসমর্থিত বস্তু নয়; তবু এই জাতীয়

Dhaka University Institutional Repository

কবিতায় সমসাময়ীক সময়ে নবোত্থিত প্রবল সমাজতন্ত্রবাদ ও প্রবল জাতীয়তাবাদের তাৎক্ষনিক গন্ধ অনেকটা অনুভূত হয়, যাঠিক ইসলামের মৌল দাবি ও স্বভাবের সঙ্গে মিলে না। কিন্তু অতীব আনন্দের কথা, ইকবাল এই জাতীয় কাব্যবোধের কুঠরিতে খুব অল্প সময়ই অবস্থান করেছেন। সত্তা কথার লোকপ্রিয় মাহফিল তিনি পরিত্যাগ করেছেন এবং অচিরেই তিনি পূর্ণরূপে স্থিত হয়েছেন তাঁর আসল জায়গায়। অপ্রয়োজনীয় সকল কৃত্তিম পালক ঝরে পড়েছে তাঁর কবিতার শরীর থেকে তিনি তার সমসাময়িক সকল অসারতা ও অন্ত : সারশূন্যতাকে অনুধাবন করতে সক্ষম হলেন। লিখলেন, তাদের কল্পনা, প্রেম ও আবেগের মৃত্যুশয্যা; তাঁদের সুউচ্চ বিভাহীন, মানবজাতির সমাধি গহবর স্বরূপ। অর্থাৎআধুনিক বিশ্বের সকল আত্মঘাতী চিন্তা ও দর্শনকে ইকবাল শুধু বর্জনই করলেন না, তিনি তাকে আখ্যায়িত করলেন পুজাভবনে ঝুলন্ত ছায়া এবং লিখলেন:

> তাদের শিল্পকর্মে পুরোহিতের আত্মার মত জীবনের অসুস্থতা;
> নশ্বর চক্ষ থেকে তারা আকাশের উচ্চ স্থানসমূহ আড়াল করে রাখে,
> তাদের প্রতিভা হচ্ছে চন্দ্রাচ্ছন্ন মানস ও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত মাংস। (জাফর-৬০, পৃ. ৪৬)

মৃত্যু হতাশা ও নৈরাশ্যের ভারে নুযজ্য নিপীড়িত এই দুঃখ রোগাক্রান্ত পৃথিবীর সামনে একটিই মাত্র নিরাময়ের পথ, সেটা হলো ইসলাম। নিজ ধর্মের প্রতি পক্ষপাতবশত এটা কোন ধর্মীয় অন্ধত্ব নয়, এটা ইকবালের চূড়ান্ত প্রজ্ঞার স্থায়ী বৈভব। শোনিতে স্নায়ুতে ছড়িয়ে পড়া এই বৈভব নিয়েই ইকবাল হয়ে উঠেছেন তাঁর কবিতায় একজন পুরোপুরি আল্লাহ ও তার রাসুল (সা.) এর বাধ্য বিনীত অনুগত একজন ইসলামের বিশ্বস্ত খাদেম। সমসাময়িক একজন কবি তাঁর এই আমূল রূপান্তর দেখে বলেছিলেন:

> গতকাল পর্যন্ত যার গর্ব ছিল ভারতীয় অভিজ্ঞান   তিনি হয়ে গেলেন আরবী:
> আপন মাহফিলেন পুরনো পাপী   আজ ফিরে এলেন জায়নামাজে।

যা-ই হোক, ইকবালের কবিতায় দুটি বিষয় খুব স্পষ্ট। একটি হলো, মুসলিম উম্মাহর বিজয় ও হৃতগৌরব পুনরোদ্ধারের স্বপ্ন; এবং অপরটি, মনুষ্য জীবনের সন্মুখ থেকে সকল কুহক অপসরিত করে এক পরম ও চূড়ান্ত সত্যের দিকে ধাবমানতা। আর এই দুটি বিষয়ই যে কুরআনুল কারীম ও রাসুল (সা.) এর নির্ভূল জীবনাদর্শনের মুখাপেক্ষী, এই উপলদ্ধিই ইকবালের কবিতার মূল প্রেরণা ও মূল সম্পদ। তাঁর কবিতার দুটি পুংক্তি দৃঢ় বিশ্বাস, অনবরত প্রচেষ্টা এবং বিশ্বজয়ী প্রেম, জীবনযুদ্ধে এই জয়ীই হলো মানুষের হাতিয়ার। কিন্তু যতবড় অসম সাহসী যোদ্ধাই হোক, সিজর কি আলেকজাণ্ডার, তাকে একটা শক্ত ভূমির উপর দাঁড়াতে হয়। ইকবালের জীবনব্যাপী যুদ্ধের যে চিত্র তাঁর কবিতায় ফুটে উঠেছে, সেখানে তার এই ভূমি ও একমাত্র যে অবলম্বন, সেটা হলো ইসলামের প্রতি অখণ্ড অবিভাজ্য বিশ্বাস, তাঁর ঈমানের সোগাত। ইকবালের একটি কবিতা পংক্তির কথা মনে পড়েছে, যার সরল বঙ্গানুবাদ: একটি প্রদীপ বসন্তের হাওয়ায় দীপ্তমান হয়ে উঠেছে। বলাই বাহুল্য, দীপ্ত জাগানো এই হাওয়া প্রবাহমান ইসলামের মলয় সমীরণ। নিজের সম্পর্কে বলতে গিয়ে ইকবাল বলেছেন:

> তোমার অগ্নি নিঃশ্বাসে গোলাপের শিখা জ্বলছে হে বাগানের পাখি
> এটাই হলো তোমার গানের পুরস্কার। অথবা আমি বসন্তের টিউলিপ নকীব
> আমার মনের চারধারে প্রেমের শিখা জ্বলছে, আজ আমি একা বলে উপেক্ষা করো
> পেছনে আমার ফুলের কাফেলা আসছে।

আমরা এখন দ্বিতীয় প্রসঙ্গে আসতে চাই। (জাফর-৬০, পৃ. ৫১)

এই পর্যায়ে আমাদের প্রসঙ্গ হলো আধুনিক বিশ্বে মুসলিম উম্মাহর হৃতগৌরব পুনরূদ্ধার ও পুনর্জাগরণে কবি হিসাবে ইকবালের অবিসংবাদিত ভূমিকা। নানাভাবে নানা উপমায় তিনি তার কবিতার একটি অংশকে জীবন্মৃত ও আত্মাবিস্মৃত মুসলিম মিল্লাতের ধমনীতে নতুন করে শক্তি সাহস ও বিশ্ব নেতৃত্বের অধিকার পুনরূদ্ধারের দুর্বার স্বপ্ন জাগিয়ে তোলার উদ্দীপনা সঞ্চারে বাঙময় করে তুলেছেন। অবশ্য তার কবিতার এই রূপটি আমাদের পূর্বালোচিত কুরআনী প্রভাব থেকে বিচ্ছিন্ন কিছু নয়; বরং বলা উচিত, আল কুরআনের সঙ্গে খুবই

অন্তরঙ্গভাবে সম্পৃক্ত। কারণ ইকবাল বার বার বলতে চেয়েছেন, সাফল্য লাভের দ্বিতীয় আর কোন পথ নেই; মুসলিম উম্মাহর বিজয়, কামিয়াবি ও মর্যাদা আল কুরআন এবং রাসুল (সা.) এর জীবনাদর্শের নি:শর্ত অনুসরণের মধ্যেই সর্বাংশে নিহিত। এর একেবারেই কোন বিকল্প নেই। এই জন্যই ইকবাল যেখানে যা বলেছেন ও বলতে চেয়েছেন,তা কখনোই কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। তবু কেবল বুঝবার সুবিধার্থে এবং তার কবিতার প্রকৃত অভিজ্ঞানকে আরো একটু দৃশ্যমান ও স্পষ্ট করে উপাস্থাপনের জন্যই আমরা এই লঘু বিভক্তি করণের আশ্যয় গ্রহণ করেছি। পৃথিবীতে এমন কবির সংখ্যাই অধিক, যারা ফুল পাখি আরণ্য এবং কিছুটা সৌখিন মানবপ্রেম নিয়েই খ্যাতি অর্জন করেছেন;কিন্তু ইকবাল এই ধরনের দায়িত্বহীন সৌখিন শব্দবিলাসী নন। তিনি তার কবিতাকে বাঙময় করে তুলেছেন মুসলিম উম্সহর সগৌরব পুনরূত্থানের হিম্মত জাগানো শক্তি কেন্দ্ররূপে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ,তিনি যখন বলেন, তাওহীদ কি আমানত সিনো মেঁ হ্যায় হামরে, আসা নেহী মিটানো নাম ও নিশানা মিটিয়ে দেয়া। এই একটিমাত্র কথাই ঘন নৈরাশ্যের মধ্যে মুসলমান তার নিজস্ব অভিজ্ঞানেরই শুধু সন্ধান পায় না, সকল মুশরিকী শক্তির মোকাবেলায় তার এক অমিতবিক্রম সংগ্রামী তামান্না ও দুর্বার এবং অপ্রতিহত হয়ে ওঠে।

ফারসি ও উর্দুভাষী ইসলামের কৃতী সন্তান দার্শনিক, সাধক , চিন্তাবিদ ও মহাকবি আল্লামা ইকবাল ফারসি ও উর্দু সাহিত্যের এক উজ্বল নক্ষত্র। ইকবাল তার ক্ষুরদার সাহিত্য লিখনীর মাধ্যমে জাতির জন্য যে শিক্ষা তিনি রেখেগেছেন, এতে সমগ্র জাতি তার কথাও ইকবাল কাব্যের আহ্বান, ও প্রতিশ্রুতিশীলতা ও সুন্দর বিষয়বস্তুর জন্যে।

সুদূর অতীত থেকে এক গুরত্বপূর্ণ আলোচ্য বিষয় যে, শিল্প ও কবিতা কি নৈতিক চরিত্রের খেদমতে নিয়োজিত থাকবে, নাকি কেবল সৌন্দর্য চর্চায় ব্যস্ত থাকবে? অন্যকথায়, কবিতার শৈল্পিক মূল্যায়নে কি মানদন্প হিসেবে কেবল এর সৌন্দর্য ও যাদুময় প্রভাবকেই বিচার করা হবে, নাকি এর কার্যকারিতা,বিষয়বস্তু ও নৈতিক আবেদনকে বিবেচনায় নেয়া হবে? কবিরা সমাজের বিভ্রান্তি ও বিপর্যয়ের কারণ এবং মানুষকে সত্য থেকে দূরে সরিয়ে নেয় এই অজুহাতে প্লেটো ও সক্রেটিস কবিকে তার মদীনায়ে ফাযেলা, বা আদর্শ নগর রাষ্ট্রে কেবল তাদের ছাত্র এরিষ্টোটলই তার কাব্যশিল্প পুস্তকে কবি ও কবিতার পক্ষ সমর্থন করে লিখেছেন যে, ভাল কবিতা সুক্ষ অনুভূতিকে জাগ্রত করে এবং অন্তরকে কলুষতা অপবিত্রতা থেকে শুদ্ধ করে।

(সুলায়মান-৬১, পৃ. ১১৪)

আমাদের পবিত্র ইসলাম ও দায়িত্বহীন ও তাকওয়া বর্জিত কবির স্থান তাঁর কাঙ্খিত সভ্যতায় রাখেনি। তবে কবিতা যদি নৈতিকতার শিক্ষা, কল্যাণ ও সৎকর্মের দিকে আহ্বানো উৎসাহ দানকারী হয়, তাহলে সমাদৃত হবে।তবে এটাও বিচিত্র নয় যে, কোনো কোনো কবির বক্তব্যের দ্বারা সমাজের অনেকেই পথভ্রষ্ট হয়েছে। এর কারণ হচ্ছে এই যে, যে কবি নিজেই পথভ্রষ্ট এবং যার মধ্যে স্বর্গীয় বাণী-বাহকের চরিত্র নেই, সেতো অন্যকে পথ দেখাতে পারে না। এ কতাটিরই প্রতিধ্বনি হয়েছে আল কুরআনে এভাবে :

الشعراء يتبعهم الغاؤن الم ترانهم في كل واى يهيمون- واثهم يقولون الا الذين امنوا و عملوا الصالحات وذكرو الله كثيرا وانتصروا من ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب يقلبون

অনুবাদ: এবং কবিদেরকে অনুসরণ করে তারা যারা বিভ্রান্ত। তুমি কি দেখনা তারা উদভ্রান্ত হয়ে প্রত্যেক উপত্যকায় ঘুরে বেড়ায়? এবং যা করে না তা-ই বলে। কিন্তু তারা ব্যতীত যারা ঈমান আনে ও সৎকর্ম করে এবং আল্লঅহকে বার বার স্বরণ করে ও অত্যাচারিত হবাব পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারিত হবার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। অত্যাচারীরা শ্রীঘ্রই জানবে ওদের গন্তব্যস্থল কোথায়। (কুরআন শুয়ারা ২২৪-২২৭)

আলোচ্য আয়াতে ‘প্রতিশোধ’ কথাটি বলা হয়েছে, এর অর্থ হচ্ছে বিপক্ষের সমালোচনার উত্তর কবিতার মাধ্যমে প্রদান করা। যেমন, ইসলামের প্রথম যুগে কবি হাসসান ইবনে সাবেত (রা.) করেছিলেন। আলোচ্য আয়াতটি অবতীর্ণ হওয়ার পর হযরত আব্দুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা, হাসসান ইবনে সাবেত, কা’ব ইবনে মালেক প্রমুখ সাহাবী কবি ক্রন্দনরত অবস্থায় মহানবী (সা.) এর কেদমতে উপস্থিত হয়ে এই বলে নিবেদন করেন যে, হে আল্লাহর রাসুল! আল্লাহতো এই আয়াতটি নাযিল করেছেন অথচ আমরাও তো কাব্য রচনা করে থাকি। তাহলে

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের কী উপায় হবে? অত:পর তিনি বলেন, আমাদের কবিতা যেন অনর্থক ও ভ্রান্ত উদ্দেশ্যপ্রণদিত না হয়। কাজেই তোমরা আয়াতের শেষাংশে উল্লিখিত ব্যতিক্রমীদেরই অন্তর্ভূক্ত।

এ কথার পরিপ্রেক্ষিতে কুরআনের ব্যাখ্যাদাতাগণ বলেছেন যে, আয়াতের প্রথমাংশে পৌত্তলিক (মুশরিক) কবিদেরকেই বুঝানো হয়েছে। কেননা, পথভ্রষ্ট মানুষ, অবাধ্য শয়তান ও উদ্ধত্ত জ্বিন জাতি তাদেরই কবিতার অনুসরণ করতো এবং তা জনসন্মুখে বর্ণনা করতো। (শাফী -৬২, পৃ. ৯৮৬)

কুরআনের আলোকে বিচার কররে আল্লামা ইকবাল হচ্ছেন এ আয়াতেরই যথার্থ দৃউষ্টান্ত বা উপমা
ইকবাল কবিদের প্রসঙ্গে বলেছেন

شعر را مقصود اگر آدم گری است　　　　شاعری هم وارث پیغمبری

কবিদের উদ্দেশ্য যদি হয় মানবতার পরিচর্যা
তাহলে কাব্য চর্চা নবীদেরই উত্তারাধিকার　　(ইকবাল-৫, পৃ. ২৯৪)

ইকবাল অন্যত্র বলেন:

مشو منکر که در اشعار این قوم　　　　ورانی شاعری چیزی دگر هست

এ কথা অবজ্ঞা করো না- যে, এ জাতির কাব্যে
কবিতা ছাড়াও অন্য মহৎউদ্দেশ্য রয়েছে। (রসুল-৬৩, পৃ. ৭৮-৭৯)

''অষ্টাদশ শতাব্দিতে বিষয়টি নতুনভাবে উত্থাপিত হয়। ভিক্টর হুগো শিল্পের জন্য শিল্প বা পারনাস এর মতবাদ পেশ করে বলেন, ভাল কবিতার জন্য তার সৌন্দর্যই যথেষ্ট। তার উপকারিতা বিচার্য নয়। কবিতা শিক্ষা, উপদেশ ও নৈতিকতা চর্চায় রূপান্তরিত হওয়ার কোন প্রয়োজন নেই। কিন্তু আমরা যদি বিশ্বের সাহিত্য ও কাব্যশিল্পের অবদানসমূহের মূল বিষয়বস্তুকে সামনে রাখি তাহলে এর অন্তর্নিহিত রূপময়তা ও যাদুময় প্রতিক্রিয়ার বিষয়টি ছিদিও দেখবযে, কবিতা কখনো মানব জাতির জন্য কোন না কোন আবেদন ও চিন্তা দর্শনকে নূরুন আলা নূর আলোর উপর আলো বলে আখ্যায়িত করা যায়। স্যার ইকবাল তার কাব্যের বিষয়বস্তুতে এমন এক কবি, যিনি পুরোপুরি প্রতিশ্রুতিশীল এবং নৈতিক ও আল্লাহ প্রদত্ত গুণগরিমা, বৈশিষ্ট্য ও সতর্কশীলতার দিকে আহ্বানকারীও পথপ্রদর্শক| তার বরঊ নির্ঘোষ বর্ণনা ঘুমন্ত ও সাম্রাজ্যবাদের অক্টোপাশে বন্দী, পূর্ব পশ্চিমের জুলুমের শিকার মুসলিম জাতিকে জাগরণী মন্ত্রে উবুদ্ধ করে। আমরা জানি,ফার্সী কাব্য তার শুরূতে ইরান ও পরে ভারতে আধ্যাত্মিক বিষয়গুলো বাদ দিলে কেবল মিথ্যা স্তুতিগানে মুখরিত ছিল এবং রূটি রূজি কামাই করার মাধ্যম হিসেবে কবিতাকে কাজে লাগানো হত| এসব কারণে আমাদের বড় বড় কবিরা কবিত্বকে নিজেদের ব্যক্তি মর্যাদার পরিপন্থি বলে গণ্য করতেন। তাদের কবিতার ছন্দে কেবল সমাজের উপরতলার লোকদের জৌলসপূর্ণ জীবন ও নৈতিক অনাচারে বর্ণনা থাকত। তাতে সাধারণ মানুষ, মানুষের আশা আকাঙ্খা ও মনোবেদনার কোন প্রতিফলন ছিলনা।

কিন্তু পরবর্তীকালে আধুনিক বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সাথে প্রাচ্যদেশীয়,বিশেষত: মুসলমানদের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ এবং মীর্জা শিরাজী ও সৈয়দ জামাল উদ্দিন আসাদাবাদী বা আফগানীর মতো চিন্তানায়কদের দিক নির্দেশনার সংস্পর্শে আসার পর বাহার, ইকবাল, আরেফ ও এশকীর মত দূরদর্শী ও গণমুখী কবির আর্বিভাব ঘটে। কুফর, নাস্তিকতা, শিরক ও সাম্রাজ্যবাদের বিরূদ্ধে সংগ্রাম আপোষহীনতা ও বলিষ্ঠ উচ্চারণ ধ্বনিত হয় মালেকুশ শোয়ারা বাহার ও ইকবালের কবিতায়। উভয়েই ছিলেন প্রাচ্যের মন ও মানসিক চিকিৎসক এবং তারা দারিদ্র ও হতভাগা জীবনের মূলভূত কারণকে সঠিকভাবে চিহ্নিত করেন। এই ব্যথা বেদনা সৃষ্টির পেছনে কার্যকর অনৈক্যের সুত্রগুলো নির্ণয় করেন। উভয় কবির মধ্যে একটি বিষয় পার্থক্য রয়েছে তা হলো, বাহার জাতীয়তাবাদের সংকীর্ণ চিন্তার গণ্ডিতে জড়িয়ে পড়েন আর ইকবালের লক্ষ্য ছিল শেখ শাদীর মত গোটা মানবতা,

Dhaka University Institutional Repository

বিশেষত; ইসলামি জাহান। তিনি আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সা.) কে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করেন। তবে মুসলিম জাতীসমূহ বিজাতীয় জুলুম ও শোষণ থেকে রেহাই পাবার জন্য ইউরোপীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিগ্রহণ করুক, তাদের অস্ত্রে সজ্জিত হোক এ দৃষ্টিভঙ্গিতে উভয়ে একমত ছিলেন। ইকবাল কাব্যে যে জিনিসটি বিশেষ গুরুত্বের দাবীদার তা হলো ইসলামি উম্মাহর ঐক্য, ইসলামের মহান শিক্ষার অনুসরণ ও জাতীয়তাবাদের বিরোধীতা। তার মতে ইসলামি উম্মাহর মধ্যে অনৈক্য, বিদ্বেষ ও শত্রুতা সৃষ্টির জন্য সাম্রাজ্যবাদীরাই সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদী চিন্তাধারা আগুন জ্বালিয়েছে। উপমহাদেশের সাম্প্রদায়িক সহিংসতাসহ বিশ্বের নানা স্থানে র ঘটনাবলী পর্যালোচনা করলে ইকবালের এ উক্তির সততা পাওয়া যায়। (সুলায়মান-৬১, পৃ. ৭৮) ইকবাল বলেন:

پس آنکه هندی و ایرانیم من　　　　من اول آدم بی رنگ و بویم

مرزو بوم بجز اسلام نیست　　　　قلب ما از هند و روم و شام نیست
گم مشو اندر جهان چون و چند　　　　مسلم استی دل به باقلیمی مبند

در دل او به گردد شام و روم　　　　می نگنجم مسلم اندر مرز و بوم

অনুবাদ:

আমি প্রথম বর্ণ গন্ধহীন মানুষ　　　　তারপরে ভারতীয় অথবা ইরানী।
ভারত রোম ও শামের গড়া নয় আমাদের হৃদয়　　　　আমাদের দেশ ইসলাম ছাড়া অন্য কিছুনয়।
তুমি মুসলিম এক মহাদেশে অন্তর বেধে রেখোনা।　　　　আকার আকৃতি এ বিশ্বের মাঝে হারিয়ে যেওনা।
ধারণ করতে পারে না কোন মুসলিমকে দেশের সীমানা। তার অন্তর শাম ও রোমের অস্তিত্ব বাতুলতা।

(ইকবাল-৫, পৃ. ৭৬)

ইকবাল তার অস্তিত্বের অণু পরমাণু দিয়ে আল্লাহর দরবারে ফরিয়াদ জানান, যাতে দুনিয়ার মুসলমানই এক হয়। জাতীয়তাবাদের দেয়ালগুলো যাতে ভেঙ্গে চুরমার হয়। হ্যাঁ, দুনিয়ার সমস্ত মুসলমানই এক জাতি এক আল্লাহর আনুগত্য অভিন্ন উম্মত। তবে সন্দেহ নেই যে, কুরআন মজিদের শিক্ষার পরে সমকালীন মহান ইসলামি চিন্তানায়ক জামাল উদ্দীন আসাদাবাদীর দ্বারা ও তিনি অনুপ্রাণিত হয়েছেন। ইকবালের দৃষ্টিতে একাত্মতা, সমচিন্তা ও অভিন্ন লক্ষ্যের অভিসারী হওয়াই গুরূত্বপূর্ণ । ভৌগলিক সীমারেখা গুরূত্বপূর্ণ। মাওলানা জালাল উদ্দীন রূমীর চিন্তাধারো তাই।

مرد با نا محر مان چون بند یست　　　　همزبانی خویشی وپیوند یست
ای بسا دو ترک چون بیگنگان　　　　ای بسا هندو ترک همزبان
همدای از همزبانی بهتر است　　　　پس زبان محرمی خود دیگرست

মনের মিলাই আত্মীয়তার আসল বন্ধন।　　　　অনাত্মীয়ের সাথে মানুষ বন্দীর মতন।
অনেক হিন্দী ও তুর্কী পরস্পরে মনের মানুষ　　　　অথচ দুজন তুর্কী পরস্পর অনাত্মীয়
সুতরাং মনের ভাষা সে ভিন্ন জিনিস।　　　　মনে মিল ভাষার মিলের চেয়ে উত্তম।

(রুমী-৬৪,পৃ.২৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

আত্মসচেতনতার শিক্ষা

ইকবাল স্বদেশবাসী তথা মুসলমানদেরকে আত্মসচেতন হবার আহ্বান জানান এবং বিজাতীয়দের অন্ধ অনুসরণথেকে নিষেধ করেন। ইকবাল মনে করেন মুসলমানেরা নিজেই একটি স্বয়ং সম্পূর্ণ জাতি তাদের কৃষ্টি কালচার, শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্য, পোষাক পরিচ্ছেদ এসকল কিছুই সতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অদীকারী। কাজেই এসব বিষয়ে তাদেরকে আত্মউপলব্ধি করতে হবে। নিজস্বতা বজায় রেখে চলার মধ্যেই নিজেদের কৃতিত্বের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ পায়। এবং পাশাপাশি অন্যদেরকে অন্ধ অনুকরণ ও অনুসরণ করার মধ্যেও তেমনিকরে নিজেদের স্বক্রিয়তা পদমর্যাদা বুলন্ঠিত করা হয়। স্যার ইকবাল জাতিকে এই সুক্ষ অনুভূতির শিক্ষাই দিতে চেয়েছেন তার কাব্য লিখনিতে ।তিনি বলেন:

قیمت شمشاد خود نشناختی   سرو دیگر را بلند انداختی
در نوای دیگران دل می نهی   مثل نی خود را از خود کردی تهی
جنس خودمی جویی از دکان غیر   ای گدای ریزه خوار خوان غیر
مسجد او از شرار دیر سوخت   یزم مسلم از چراغ غیر سوخ

তোমার চিরহরিৎবৃক্ষের মূল্য বুঝনি   অথচ অন্যের দেবদারূকে ভেবেছ দীর্ঘ
বাঁশরীর মত নিজেকে করেছ অন্ত:সার শূন্য   আর অন্যের সুরের ছন্দে গান ধরেছ।
হে ভিক্ষুক অন্যের দস্তরখানের উচ্ছিষ্টভোগী   নিজের জিনিস খুঁজিয়া বেড়াও অন্যের দোকানে
মুসলমানের মাহফিল পুড়ে পরের প্রদীপ অনলে   সন্নাসীর আস্তানার আগুনে তার মসজিদ জ্বলে।
কবার হেরম ছেড়ে লাফিয়ে গেল হরিণ যখন   শিকারীর গুলি ছেদিল তার পার্শ্বপাঁজর।

(ইকবাল ৫, - পৃ. ২৩৫)

তিনি একজন মুসলমানের জীবন কেমন হওয়া উচিত এবং তার করণীয় বিষয়াবলী সম্পর্কেও ইকবাল পরিস্কার করে উল্লেখ করেছেন তার *জরবে কলীম* কাব্য গ্রন্থের اسلام و مسلمان। ('ইসলাম ও মুসলমান') শীর্ষক অধ্যায়ের 'اسلام و مذهب ' ইসলাম ও মাযহাব'কবিতায়। কবি বলেন:

بتاؤں تجھ کو مسلمان کی زندگی کیا ہے   رب ہے نہایت اندشہ وکمال جنون
طلوع ہے صفت آفتاب اس کا غروب   یگانہ اور مثال زمانہ گوناگون
نہ میں عصر روان کی حیاتی بیزاری   نہ اس میں کھن کی غسانہ وافسون

মুসলমানের জীবন কি একথা জানাবো তোমায়?   ভাবনার চূড়ান্ত আর উন্মাদনার পূর্ণতা,
উদয় সূর্যের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে, অস্ত তার   অনন্ত ও বৈচিত্রময় জামানার মত,
চলতি যুগের লজ্জায় সে নয় আড়ষ্ট   প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী ও যাদুও নেই তাতে।
ভিত তার চিরন্তন জীবন সত্যের ওপর,   জীবন সত্য এটি প্লেটোর, তেলেসমাতি নয়,
উপাদান তার জিব্রীলের সৌন্দর্যবোধ   আজমের শুভ্র মনন আর আরবের হৃদয় উত্তাপ।

(ইকবাল-১১, পৃ. ২৫৫)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল কাব্যের প্রধান বিষয়বস্তু স্বাধীনতা, মুক্তির জয়গান ও উন্নত শির হওয়ার দীক্ষা। তিনি বলেন:

آدم از بی بصری بندگی آد م کرد　　گو هری داشت ولی نذر قبد وجم کرد
یعنی از خوی غلامی زسگـان خوار تراست　　من ندیدم که سگی پیش سگی سر خم کرد

দৃষ্টির অভাবে মানুষ করেছে মানুষের দাসত্ব
রত্ন ছিল হাতে উজার করেছে কুবাদ ও জামের পায়
অর্থাৎ দাসত্বের স্বভাবে কুকুরের চেয়ে ওনিকৃষ্ট সে,
আমি দেখিনি কোন কুকুর অপর কুকুরের সামনে মাথা নত করেছে। (ইকবাল-৫, পৃ. ৩০৪)

ইকবালের দৃষ্টিতে স্বাধীনতা ও মুক্তি একমাত্র তরবারীর ছায়াতলেই সম্ভব। তরবারী ছাড়া অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়না। কাজেই মুসলমানদের হতে হবে শক্তিশালী, মজবুত। এক হাতে কুরআন, অন্যহাতে তলোয়ার। প্রথমে উপদেশ আল্লাহর বাণী শুনতে হবে। যদি সোজা না হয় তরবারীর আঘাতে ফিৎনার শিকর উৎপাটিত করতে হবে। পরিশেষে আমরা ইকবাল কাব্যের, প্রগতি ঐক্য ভ্রাতৃত্ব এবং ইসলাম ও মুসলমানদের সৌভাগ্য ও কল্যাণ। ইকবালের ফার্সি সঙ্গীতের কয়েকটি উল্লেখ করা যেতে পারে:

ای غنچه خوابیده چون نرگس نگران خیز　　کاشانه ما رفت به تاراج گمان خیز
از ناله مرغ چمن از بانگ اذان خیز　　از گرمی هنگامه آتش فشان خیز
از خوب گران خواب گران خیز　　از خوب گران خیز

ওহে ঘুমন্ত উদ্বিগ্ন নার্গিসের মত জাগো　　দুখের ডাকাত পড়েছে তোমরা জাগো
বাগানের পার্থিব আর্তনাদে আজানের পাকে জাগো　　অগ্নিগর্ভা মহাপুর উষদের দিলের উষ্ণতায় জাগো
ঘুমঘোর হতে ঘুমঘোর হতে জাগো　　ঘুমঘোর হতে জাগো। (যারীন-৬৫, পৃ. ২৪৫)

সমাজ জীবন থেকে ব্যক্তির শক্তি ও উদ্দেশ্য কিভাবে প্রেরণা ও স্বভাব রূপ লাভ করে, তার ব্যাখ্যা করে নির্দেশ দিচ্ছেন:

چون گهر در آوسته شو　　ورنه مانند غبار آشفته شو

হয় তুমি গেথে ফেলো আপনাকে　　এর শৃংখলে মুক্তার মতো,
নয়তো বিঘুর্ণিত হো লক্ষ্যহীনভাবে　　ধুলিমুষ্টির ন্যায়। (যারীন-৫৯, পৃ.২৪৭)

یک ناله خاموش و اثر باخته آهی　　خاور همه مانند غبار سر راهی است
از هند و سمر قند و عراق و هندان　　هر ذره این خاک گره خسرده نگاهی است

পুরো প্রাচ্য পথের দুয়ারের ধুলার মত　　নিস্তব্ধ আর্তনাত প্রভাব বিহীন প্রশ্বাস যত
এ মাটির প্রতি বালিকণা শূন্য দৃষ্টির শিকার আহত।　　ঘুমঘোর হতে.....।　যারীন-৬৫, পৃ. ২৪৭)

تن خاکی و دین روح و روانست　　این نکته گشاینده اسرار نهانست ملک است
باخرقه و سجاده و شمشیر وسنا　　تن زنده و جان زنده ربط تن و جاتمست
خیزاز خواب

এই তত্ব তোমার সকল রস্যের খুলবে জট　　মাটির দেহ রাজ্য ধর্ম তার রূহ ও প্রাণ।

Dhaka University Institutional Repository

যিন্দা দেহ যিন্দা প্রাণ দেহ ও প্রাণের সংযোগে   আলখল্লা, জায়নামায ও তীর তরবারী হস্তে জাগো
ঘুমঘোরহতে....| (যারীন-৬৫ ২৪৮)

داری جهان را تویساری تویمینی   تا درس ازل راتو امینی تو امینی
صهبای یقین در کش و از دیر گمان   ای بنده خاکی تو زمانی تو زمینی

সেই আদি শিকার যতদিন সন্মানদার তুমি   এ বিশ্বের ডান,বাম সব কর্ণধার তুমি
হে মাটির বান্দা, তুমি মহাকাল, তুমি বিশালভূমি   প্রত্যয়ের সে শরাব গিয়ে কল্পনার তপ ভেঙ্গে জাগো।
ঘোমঘোর হতে.......| যারীন-৬৫,পৃ. ২৪৮)

فریاد ز شیرینی و پیویزی افرنگ   فرید ز افرنگ و دلاویزی افرنگ
معمار حرم بازبه تعمیر جهان خیز   عالم همه و یرانه چنگیزی افرنگ

বাঁচতে চাই ফিরিঙ্গি ও তার চালবাজি হতে ফিরিঙ্গির মিষ্টি মাধুরীর বিচিত্র বাহার হতে
ফিরিঙ্গীর চেঙ্গিজী ধ্বংসলীলায় বিরান এই জগৎহেরেমের স্থপতি, জগৎনির্মাণে পুণ: ঘুম ছেড়ে জাগো
ঘুমঘোর হতে......| (যারীন -৬৫, পৃ. ২৪৮)

ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ

بیا این خاکدان را گلستان ساز   جهان پیو را دیگر جوان ساز
بیا یك ذره از درد دلم گیر   ته گردون بهشت جاودان ساز

''এসো এই মাটির পাত্রখানি ফুলবন বানাও জরাজীর্ণ এ বিশ্ব পুন: তারুণ্যে সাজাও।
এসো আমা র দিলের ব্যথার স্ফুলিঙ্গ নাও আকাশের তলে চিরন্তন বেহেশত বানাও। (ইকবাল-৫, পৃ. ২৫৫)

''কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে তাদের যুগের মন মানসের সঠিক চিত্রায়ণ করতে পারেন অথবা তাদের সময়কার সব মানুষের মনের সব কথা শিল্পের মহিমায় ফুটিয়ে তুলতে পারেন, আর অনাগত ভবিষ্যতের সকল স্তরের মানুষের মনের খোরাক যোগাতে পারেন তারা যুগের কবি বা যুগ শ্রেষ্ঠ কবি। ইরানে এ বুলবুল হাফেজ শিরাজী ও বাংলার বুলবুল কাজী নজরুল ইসলাম ছিলেন তাদেরই অন্যতম| আরো এক ধাপ এগিয়ে যে সব কবি সাহিত্যিক নিজের চিন্তা, দর্শন, শিল্পের মহিমা ও আবেদনের গভীরতা দিয়ে নিজের জাতিকে ও গোটা মানব সমাজকে জীবনের সঠিক দিক নির্দেশনা দিতে পারেন তারা শুধু যুগশ্রেষ্ঠ নন, যুগ স্রষ্টাও| ইরানের সাধক কবি মাওলানা রুমী ও উপমহাদেশের দিশারী কবি আল্লামা ইকবাল তাদের অন্যতম| ইকবালের ব্যক্তিত্ব এতই বিশাল যে, তআকে নিয়ে যারা গবেষণা করেছেন, তারা এখনো স্থির করতে পারেন নি, ইকবাল কবি হিসেবে বড় ছিলেন, না দার্শনিক হিসেবে?

কারণ মানুষের মন, জীবন, জগতের অনন্ত সৌন্দর্য ও রহস্য কবিতায় শিল্পে চিত্রায়ণের দক্ষতায় ইকবালের প্রতিভা বিষ্ময়কর। তেমনি জীবন, জগৎ স্রষ্টা সৃষ্টির রহস্যের অতলান্ত থেকে মুক্তা সেঁচে পশ্চিমের দিকহারা দর্শন ও পূর্বের আত্মভোলা সুফিবাদের মধ্যখানে খুদীর সৌধমালা নির্মাণে তার সৌকর্য ও অতুলনীয়। সমাজ, সভ্যতা ও রাজনীতির নিয়ামক শক্তি উল্লাসের নির্ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে পাশ্চাত্যের সংশয়বাদী দর্শনের বেলাভূমিতে প্রেমের ডানায় ভর করে পরম সত্যে উপনীত হোয়ার যে আলোকবর্তিকা তিনি জ্বালিয়েছেন, তাতে কালোত্তীর্ণ চিন্তানায়ক হিসেবে তিনি আরো মহান। তবে একটি কথায় গবেষকদের সবাই একমত, তা হচ্ছে দর্শনকে

Dhaka University Institutional Repository

কবিতার শিল্প সৌন্দর্যে সাজিয়ে সাধারণ মানুষের বোধগম্য ভাষায় উপস্থাপনের যে দক্ষতা ইকবাল দেখিয়েছেন, পৃথিবীতে তার দৃষ্টান্ত বিরল।

ইকবালের শ্রেষ্ঠত্বের আর একটি নমুনা পাকিস্তান ও পরবর্তীতে বাংলাদেশের অভ্যুদয়। আল্লামা ইকবাল ছাড়া পৃথিবীতে অন্য কোনো কবির কথা আমার জানা নেই, যার চিন্তা দর্শনের আলোকে কোনো স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের জন্ম হয়েছে কাজেই এ দেশীয় গবেষকরা যথার্থই বলেছেন যে, ইকবাল কাব্যে পাক ভারত বাংলার মুসলিম মনীষার মহত্তম বিকাশ। (মনিরউদ্দীন-৬৬, পৃ, ৩৯)

১৯৩০ সারের ২৯ শে ডিসেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম লীগের অধিবেশনে এবং ১৯৩২ সালের ২১ শে মার্চ লাহোরে নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনের বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত সভাপতির ভাষণে, কায়েদে আজম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর কাছে লেখা (১৯৩৬ -১৯৩৭ সালে) বিভিন্ন পত্র ও মাওলানা হোসেইন আহম্মদ মাদানীর মতবাদের জবাবে সংবাদপত্রে দেয়া বিবৃতি (৯ই মার্চ ১৯৩৮) পর্যালোচনা করলে বলতে হবে যে, আল্লামা ইকবালের বেলায় উপরোক্ত মূল্যায়ন যথার্থ। কিন্তু আমরা যখন ইকবালকে সমগ্র কাব্য ও ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন বইটি সামনে রাখি তখন ইকবালকে দেখি গোটা মুসলিম উম্মাহর বিবেকের কন্ঠস্বর রূপে। গোটা মানব জাতির দরদী বন্ধু এবং মানুষ ও বিশ্ব প্রকৃতির রহস্যজ্ঞানী ভাষ্যকর রূপে।

কবি ও মানুষ হিসেবে ইকবাল কত বড় ছিলেন তার মূল্যায়ন আমাদেরকে ইকবাল সাহিত্যের আদর্শ হৃদয়ঙ্গম ও অনুসরণ করতে অনুপ্রাণিত করবে। বিশেষত: সাহিত্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার লালনভূমি ইরান তাকে কিভাবে মূল্যায়ন করেছে তা উপমহাদেশবাসীর জন্য উৎসাহব্যঞ্জক। ইকবালের অধিকাংশ রচনা তার মাতৃভাষায় নয়; বরং ইরানের ভাষায় ফারসিতে । একটি বিদেশী ভাষায় এত বড় কৃতিত্বে ও ইকবাল শ্রেষ্ঠত্বের দাবিদার। ইরান ও ফারসি সাহিত্যের চর্চা হয়েছে, কিন্তু আমীর খসরু দেহলভী ছাড়া অন্য কোনো বিদেশী ফারসি কবি ইরানের ফারসি সাহিত্যের রাজ দরবারে সাথান পাননি। আর এ শতাব্দিতে সেই গৌরবময় আসনে আরোহিত হয়েছেন আল্লামা ইকবাল। ইরানীদের ভাষায় মাওলানা ইকবাল লাহোরী। কাজেই ইকবাল সম্পর্কে পারস্যের মূল্যায়ন বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

ইরানের প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক সৈয়দ গোলাম রেযা সায়ীদী বলেন:

اقبال هم فلسوف است و هم شاعر ممزوج و تلفيق گرديده كه بندرت در ساير متفكرين فلسفه و
شعر بشكل تفكيك ناپذير بنحوي در نهادوي بايكديگر ديده ميشود

ইকবাল যেমন দার্শনিক তেমনি কবি, তার ব্যক্তিসত্তায় দর্শন কাব্য এমন অবিচ্ছেদ্যভাবে পরস্পর সংমিশ্রিত ও মিশে গেছে যে, তার দৃউষ্টান্ত চিন্তাবিদদের মধ্যে খুব কমই দেখাযায়। (ইকবাল-৫, পৃ. ১)

ফারসি কুল্লিয়াতে ইকবালের প্রথম প্রকাশনার ভূমিকায় দাউদ শিরাজী বলেন:

اقبال شاعري در رديف قهر مانان جاويد شعر فارسي از قبيل مو لانا جلال الدين وحافظ
است

ইকবাল ফারসি কাব্যে মাওলানা জালালউদ্দীন ও হাফিজের মত অমর প্রতিভারধরদের কাতারে শাসিল।

তিনি আরো বলেন:

اقبال سبك ومكتب جديدى در شعر فارسي تأسيس كرده كه حقا بايد سبك او را سبك اقبال ناميد
و قران ادبي حاضر را بايد بنام نامي او مزين ساخت

’ইকবাল ফরসি কাব্যে নতুন মতাদর্শ ও কাব্যরীতি প্রচলন করেছেন। কাব্যরীতিকে সঙ্গত কারণেই ইকবাল রীতি হিসেবে নামকরণ করতে হবে আর বর্তমান সাহিত্য শতাব্দীকে তার মহান নামের অলংকরণে সাজাতে হবে। (ইকবাল-৫, পৃ. ১)
ইরানের প্রখ্যাত সাহিত্য গবেষক আহমদ সুরূশ বলেন:

آنچه میدانیم این است که پس از حافظ ما اگر دنبال شعر و اقعی باشیم بعد از حافظ آثار جامی و شیخ بها ئی بلا فاصله به اقبال میرسیم لا غیر هنوز خیلم زور است نه شعر اقبال چنانکه شایسته پایگاه بلند اوست شناخته گرد.

‘আমি যতটুকু জানি তা হলো, হাফেজের পরে আমরা যদি প্রকৃত কবিতার সন্ধান করি তবে জামী ও শেখ বাহায়ীর রচনাবলী অনুসন্ধানের পর সরাসরি যেখানে গিয়ে উপনীত হই তিনি ইকবাল,অন্য কেউ নন।...ইকবালের কবিতা যে সুউচ্চ আসনে সমাসীন তা নিরূপণের সঠিক সময় এখনো আসেনি।

ইকবাল সম্পর্কে ইরানী মুনীষী, সাহিত্য বিশারদ, শিক্ষাবিদ ও নেতৃবৃন্দের এভাবে উদ্ধৃতি দিতে গেলে আলাদা দীর্ঘ নিবন্ধের প্রয়োজন। মূলত ইকবাল ছিলেন ইরান ও ফারসির গৌরব। সবচেয়ে বড় কথা, বিগত হাজার বছরে ইসলামের চিন্তা জগতের গৌরব।

আমরা খুঁজে দেখবো, ইকবাল ও তার সাহিত্যের এই গৌরবের পেছনে কি কি উপাদান বিদ্যমান। অন্য কথায় ইকবাল সাহিত্যে এমন কি অমূল্য রতন লুকায়িত যার জন্য প্রাচ্য, পাশ্চাত্য, আরব আজম আজ তার গুণগানে মুখরিত।

গবেষকগণ একটি বিষয়ে একমত যে, ইকবাল সাহিত্যের মৌল আদর্শ তার ‘খুদী দর্শন এই খুদী দর্শনের শাখা প্রশাখায় রয়েছে ইনসানে কামিল বা পুর্ণ মানব, প্রেম নবীপ্রেম , পাচ্যের জাগরণ, আদর্শ ভিত্তিক জাতীয়তার ধারণা প্রভৃতি। ফারসিতে আসরারে খুদী ও রোমুযে বেখুদী কাব্য খুদী দর্শনের ব্যাখ্যাতেই নিবেদিত । অন্যান্য রচনার মধ্যেও তিনি উপস্থাপন করেছেন এই দর্শন। ইসলামি জাহানে সুফীবাদের সাধনা তত্ত্বে এতকাল কেবল নিজেকে বিলিয়ে দেয়ার, মধ্যে আত্মার মুক্তিক্রম সাফল্যের দিক্ষা চলছিল। পাশ্চাত্য দর্শনে যুক্তির মারপ্যাঁচে বস্তুতান্ত্রিক ব্যাখ্যায় জীবনের রহস্য সন্ধান করতে গিয়ে সংশয়বাদের সীমাহীন জঞ্জাল সৃষ্টি হয়ে রয়েছিল। এর মাঝে ইকবালের আবির্ভাব কুধীর আলোকবর্তিকা নিয়ে। ভারতের ব্রাহ্মণের ঘরে জন্ম নেয়া, ইসলামি সুফি তত্ত্বের কোলে লালিত ইকবাল ইউরোপীয় শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে আত্মস্থ করার পরই ‘যুগের অবতার’ এনেছেন এই দর্শন নিয়ে। ইকববাল মুসলমানদের হাজার বছরের বুদ্ধিবৃত্তিক তৎপরতার নির্যাস ও সারবস্তু, উর্ধ্বগামী অশ্বারোহী এবং প্রাচ্যের প্রভাত আনয়নকারী সূর্য। (ইকবাল -৫, ভূমিকা পৃ. ১)

Dhaka University Institutional Repository

খিলাফত ও সার্বভৌমত্ব:

ইসলামের রাষ্ট্রীয় মতাদর্শের মূল কথা এই যে,-প্রভুত্ব, কর্তৃত্ব, আধিপত্য ও সার্বভৌমত্বের মালিক একমাত্র আল্লাহ ত'য়ালা। নিখিল জড়জগতের তিনিই সৃষ্টিকর্তা, পরিচালক ও প্রকৃত শাসনকর্তা তবে দুনিয়ার মানব সমাজের শৃংখলা বিধান, সমাজবদ্ধ মানুষকে উত্তরোত্তর প্রগতি ও উন্নতির দিকে পরিচালিত করিবার জন্যে তাদের মধ্য হতে একদল মানুষকে তিনি নেতৃত্ব দান করে থাকেন। তারা আল্লাহরই শ্বাশত ও চিরন্তন বিধান অনুযায়ী মানব জাতিকে মনযিলে মকসুদের দিকে পরিচালিত করে। পৃথিবীতে আল্লাহ তা'য়ালা হুকুমত কায়েম করিবার জন্যে মানুষ তার প্রতিনিধি। আল্লাহ তা'আলার প্রদত্ত এই প্রতিনিধিত্বের অধিকার লাভ করে মানুষ সমগ্র জীব-জগতের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্বের আসন অধিকার করেছে। ঠিক এই মূলে দর্শনের উপর ভিত্তি করেই ইকবালের হুকমত ও খিলাফত সংক্রান্ত যাবতীয় মতবাদ গড়িয়া উঠছে এবং তা তাঁর কাব্যের পাতায় পাতায় মধুক্ষরা ভাষা ও ছন্দে গুঞ্জরিত হয়ে উঠছে।

ইকবালের মতে সমস্ত রাষ্ট্রীয় ক্ষমতার একমাত্র উৎস স্বয়ং আল্লাহ তা'আলা। সমাজবদ্ধ মানবসমষ্টির কোন ব্যক্তি বা সংখ্যাগুরু দলই সার্বভৌম কর্তৃত্ব ও প্রভুত্বের অধিকারী হতে পারে না। (আ. রহীম-২০, পৃ.৬৮)

سروری زیبا فقط اس ذات ہے ہمتا کو ہے

حکمران ہے ہس وہی باقی ہتان آزری

সার্বভৌমত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকার
একমাত্র শাহানশাহ তিনি
লা-শরীক আল্লাহ
আর সব কিছুই আযরের প্রতিমা। (ইকবাল -১১, পৃ. ২৩১)

ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব খোদার । খোদাই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি। জনসাধারণ বা ব্যক্তিসাধারণ এই শক্তির অধিকারী নয়। জনগণ রাষ্ট্রের নাগরিকমাত্র-মালিক নয়। বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর মত রাষ্ট্রের মালিকানাও খোদার। ইসলামি রাজনীতি বলতে বুঝায়-ঐরূপ রাজনীতি যার লক্ষ্য কুরআন সুন্নাহর আদর্শে দেশের শাসন ব্যবস্থা, অর্থ ব্যবস্থা,সমাজব্যবস্থা, বিচার ব্যবস্থা, শিক্ষাব্যবস্থা প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই পরিবর্তন আনয়ন ও কার্যকর করে তাদের রাজনীতি প্রকৃত অর্থে ইসলামিকে রাজনীতি বলে অভিহিত হয়। ইসলামি রাষ্ট্রে যারা শাসনকর্তা নিযুক্ত হন-তারা সালাত ব্যবস্থা কায়েম করে। যাকাত আদায় ও বন্টন ব্যবস্থা কার্যকর করে।

Dhaka University Institutional Repository

কেবলমাত্র ভালো ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করে এবং যাবতীয় অকল্যাণকর ও ক্ষতিকর কাজ করতে নিষেধ করে।

ইসলামিক রাজনৈতিক দলের নেতা-যিনি রাষ্ট্র শাসনের দায়িত্ব গ্রহণ করবেন-তাকে অবশ্যম্ভাবীরূপে কতকগুলো বিশেষ গুণের অধিকারী হতে হবে। যেমন তাক্ওয়া, পরহেজগারী, যা তাকে আল্লাহর নাফরমানী থেকে বিরত রাখবে। এমন ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা, যা তার অন্তস্থ ক্রোধ ও রোষ, অসন্তোষকে দমন ও নিয়ন্ত্রণ করবে। এমন নেতৃত্বের গুণ, যা তাকে সাধারণ মানুষের জন্য পিতৃতুল্য স্নেহ বাৎসল্যে সদ্য আগুত করে রাখবে।

একমাত্র যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তিই তার যোগ্যতা ও দক্ষতার ভিত্তিতে কর্তৃত্ব ও নেতৃত্ব গ্রহণ করবে। এটাই ইসলামে সর্বোত্তম কাজ। আর অত্যন্ত খারাপ জিনিস হচ্ছে যোগ্যতা ও অধিকার ছাড়া রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব গ্রহন করা। কিয়ামতের দিন তা তার লজ্জা ও অনুতাপের বিষয় হয়েই দাঁড়াবে। কিয়ামতে সেই ব্যক্তি সবচাইতে বেশি সম্মানীয় হবে যে রাষ্ট্রের দায়িত্ব গ্রহণ করে তা পূর্ণ যোগ্যতার সাথে একনিষ্টভাবে পালন করবে।'একজন ন্যায়বাদী সুবিচারক রাষ্ট্রনেতার সাধারণ মানুষের কল্যাণে একদিন কাজ করা একজন ইবাদতকারীর একশ'বছর ইবাদত করার সমান।

ইসলামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা ইসলামি প্রশাসকের গুণ বর্ণনা করতে গিয়ে হজরত আলী (রা.) বলেছেন, জনগণের ওপর শাসকের অধিকার এবং শাসকের ওপর জনগণের অধিকারসমূহ মহান আল্লাহতায়ালা নিজেই ধার্য ও চিহ্নিত করে দিয়েছেন। প্রত্যেকেরই কর্তব্য রয়েছে অপরের জন্য সুষ্ঠ ব্যবস্থা হিসেবে তা কার্যকর করা। তাদের কল্যাণের লক্ষ্যে, তাদের দ্বীনের সম্মান ও শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে উভয়ের দায়িত্ব পালন করা। বস্তুত জনগণের কল্যাণ হতে পারে না শাসকদের কল্যাণ ব্যতীত, শাসকদের কল্যাণ হতে পারে না জনগণের ভিত্তি ব্যতীত। জনগণ যদি শাসকের প্রতি তাদের কর্তব্য পালন করে, শাসকগণ যদি জনগণের অধিকার যথাযথভাবে রক্ষা করে, তাহলে সকলেরই অধিকার পারস্পরিকভাবে আদায় হয়ে যায়। দ্বীনের পথ ও পদ্ধতিসমূহ যথাযথ কার্যকর হয়। সুবিচার ও ন্যায়পরায়ণতার দণ্ড যথাযর্থভাবে প্রতিষ্ঠিত ও প্রকট হতে পারে। তার ওপর ভিত্তি করে সুষ্ঠ নিয়মনীতিসমুহ সুচারুরূপে চালু হতে পারে। তার ফলে সম্পূর্ণ সময়টাই কল্যাণময় হয়ে উঠবে। রাষ্ট্র ও সরকারের স্থিতি জনগণের কাম্য হবে। শত্রূদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ হয়ে যাবে। জনগণের নিকট শাসক যদি পরাজিত হয়ে পড়ে কিংবা শাসক যদি জনগণের ব্যাপারে ভুল নীতি গ্রহণ করে থাকে তাহলে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট হবে। অত্যাচার ও নির্যাতনের কারণসমূহ প্রকট হয়ে পড়বে, দ্বীন পালনে চরম দুনীতি ও নীতি লঙ্গনমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পেয়ে যাবে। চিরকল্যাণময় আদর্শ পদদলিত হবে। তখন মানুষ নফসের খায়েশ অনুযায়ী কাজ করতে শুরু করবে। আল্লাহর আদেশ-নিষেধ হুকুম-আহকাম অকার্যকর হয়ে পড়বে। তখন মানুষের মধ্যে অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। তখন কোনো পরম সত্য বাতিল হয়ে গেলেও লোকে খারাপ মনে করবে না। কোনো বড় বাতিল কাজ হতে দেখেও মানুষ সতর্ক সক্রিয় হয়ে উঠবে না। এরূপ অবস্থায় নীতিপরায়ণ ব্যক্তিরা অপদস্থ ও অসন্মানিত হবে। সমাজের চরিত্রহীন দুস্কৃতিপরায়ণ ব্যক্তিরা সন্মান ও শক্তির অধিকারী হয়ে বসবে। তখন আল্লার বান্দাগণের পক্ষে আল্লার আদেশ পালন দুষ্কর হয়ে পড়বে। ইসলাম ও ইসলামি জীবনদর্শ এক বিশ্বজনীন জিবন ব্যবস্থা বিধায় এর কোনো সীমান্ত নেই গোটা বিশ্বই ইসলামের আওতাভুক্ত। ইকবাল বলেন:

تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار   لا کہیں سے ڈھونڈ کر اسلاف کا قلب، جگر

খেলাফতের ভিত্তি যাতে পুনরায় পৃথিবীতে মজবুত ও দৃঢ় হয়
খুঁজে নিয়ে আস কোথাও থেকে পূর্বসূরীদের অন্তর-আত্মা। | (ইকবাল - ১১, পৃ. ২৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

হজরত আলী (রা.) তাঁর অপর এক ভাষণে শাসক ও শাসিতের মধ্যকার মিলিত অধিকারসমূহের কথা বলেছেন-তোমাদের শাসনভার আমার ওপর অর্পিত হওয়ার কারণে তোমাদের ওপর আমার একটা অধিকার রয়েছে এবং আমার ওপরও তোমাদের জন্য অনুরূপ একটা অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

এ দৃষ্টিতে অধিকারের দিক দিয়ে শাসক ও শাসিতের মধ্যে পার্থক্য থাকে না। রবং ইসলামের দৃষ্টিতে আইনের সন্মুখে সকলেই সমান ও সম্পূর্ণভাবে অভিন্ন। সামাজিক ও প্রতিফলমূলক সমস্ত কাজের দায়িত্ব পালনে সকলেই সমানভাবে দায়ী, শাসক ও রাষ্ট্র প্রধানের যেমন দায়িত্ব জনগণের অধিকারসমূহ যথাযথভাবে আদায় করা, তেমনি জনগণের দায়িত্ব রয়েছে তাদের জন্য নির্ধারিত কার্যাবলি সুষ্ঠভাবে সম্পন্ন করা।

ইসলামের রাজনৈতিক নেতৃত্ব তথা প্রশাসকের গুণ বর্ণনা করতে অত:পর তিনি মানুষের খিলাফত বা প্রতিনিধিত্বের গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম পদ্ধতিগুলি তাঁর কবিতার ভিতর দিয়া সুস্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। ইকবাল একটি শক্তিশালী সুবিচারপ্রবণ ও ন্যায়নিষ্ঠ হুকমত কায়েম করবার জন্যে দৃঢ় ঈমান ও 'প্রেম' অপরিহার্য বলে ঘোষণা করেছেন।

ولایت پادشاہی علم اشیاکی جہانگیری
یہ سب کیا ہے فقط اک نقطہ ایمان کی تفسیریں

কতিৃত্ব, রাজশক্তি আর বস্তু বিজ্ঞানের বাহাদুরী
ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি মাত্র। (আ. রহীম, ২০ পৃ. ৫৭)

হুকমত ও নেতৃত্ব ইকবালের মতে খিদমতগূজারী অর্থাৎ মানব সেবারই দ্বিতীয় নাম। কিন্তু জীবনের সকল প্রকার কাজের বুনিয়াদ 'প্রেমের উপর প্রতিষ্ঠিত না করলে মানুষের মধ্যে প্রকৃত ও নিঃস্বার্থ জনসেবা ভাবধারা জাগিয়ে তোলা আদৌ সম্ভব নয়। অন্যকথায় বৈরাগ্য ও রাজত্ব, দরবেশী ও বাদশাহীর পরস্পর সমন্বয় বিধান একান্তই আবশ্যক। এখানে ইকবাল তাঁর ইনসানে কামিল (Perfect man) কে ভুলতে পারেননি এবং হুকমাতে ইলাহীয়া' কায়েম করবার জন্যে 'ইশকে মুস্তাফা' বা নবী প্রেম একান্ত অপরিহার্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন। কারণ এই প্রেমই জাতীর প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে এক অভিন্ন উদ্দেশ্যে প্রণোদিত ও উদ্বুদ্ধ করে একই লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করে এবং জাতির অভ্যন্তরিণ বিরোধ ও বিশৃংখলা দূরীভূত করে এটাকে অটুট শৃংখলা সূত্রে গ্রথিত করে দেয়। 'পায়াম-ই-মাশরিক' গ্রন্থে তিনি বলেন:

سروري در دين ما خدمت گري است　　عدل فاروقي و فقر حيدري است
آن مسلمانان كه ميري كرده اند　　در شهنشاهي فقيري كرده اند
هر كه عشق مصطفي سامان اوست　　بحر و بر در گوشه ي دامان اوست

আমাদের জীবন বিধানে নেতৃত্ব
শুধু মাত্র মারব সেবা,
ফারুকের সুবিচার আর
আলী হায়দরের অনাড়ম্বর জীবন।

নেতৃত্ব করেছে যে মুসলমান,
শাহান শাহীর সাথে করেছে তারা
ফকরী জীবন যাপন।

জীবন পাথেয় যার মুস্তাফার প্রেম,

Dhaka University Institutional Repository

পূর্ণ আধিপত্য বিরাজিত তার
জলস্থলের উপর। (ইকবাল -৫, পৃ. ১৬৮)

আরমগানের হিজাজ' গ্রন্থে বলেন:

خلافت بر مقام ما گواهی است　　حرام است نچه برما پادشاهی است
ملوکیت همه مکراست ونیرنگ　　خلافت فقط ناموس اهی الهی است

খিলাফত আমাদের দৃষ্টিতে সত্যের প্রতিভু
হারাম আমাদের কাছে মানব প্রভুত্ব।
সাম্রাজ্যবাদ প্রতারণা সর্বস্ব ও বহুরূপী,
খিলাফতই হচ্ছে একমাত্র প্রতীক
খোদায়ী মর্যাদার। (ইকবাল -৫, পৃ. ৩২১)

ইকবাল রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদকে সম্পূর্ণ হারাম মনে করেন। ইউরোপ রাজতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদের যে পদ্ধতি উপস্থাপন করেছেন তা সোদাগরী, নরহত্যা, রক্ত শোষণ ও স্বার্থপরতা ভিন্ন আর কিছুই না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে শাসনতন্ত্রের দাসত্বের কাজে নিয়োজিত, তার পরিণাম ইকবালের দৃষ্টিতে 'বিনাযুদ্ধে নর হত্যা ফিরিঙ্গী সভ্যতার চরম উদ্দেশ্য ও তাই:

از ضعیفان نان ربودن حکمت است　　ازتن شان جان ربودن حکمت است
شیوه تهذیب تو ادم دوی است　　پرده ادم دری سوداگری است

আজকের বিজ্ঞান হচ্ছে
দুর্বলের মুখের অন্ন ছিনিয়ে নেয়া
নরহত্যা ও আজ বিজ্ঞানে শামিল।
মানবদেহকে ছিন্নভিন্ন করাই আজ
নরসভ্যতার বৈশিষ্ট্য,
এই নরহত্যার আড়ালে রয়েছে
সোদাগরীর চক্রান্তজাল। (ইকবাল -৫,পৃ. ১৭৬)

'আরমগানে হিজায' গ্রন্থের রুবায়ীতে তিনি ইসলাম ও পাশ্চাত্য শাসনতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য পরিষ্কার করে বলেছেন:

مسلمان فقر وسلطانی بهم کرد　　ضمیرش باقی وفانی بهم کرد
ولیکن الا مان ازعصر حاضر　　که سلطانی و شیطانی بهم کرد

মুসলমানদের কাছে রাজশক্তি ও ফকীরী
পরস্পর সংযুক্ত,
আত্মা তার স্থায়ী, অথচ ধ্বংসশীল।
পরিত্রাণ চাই আধুনিক কালের প্রভাব থেকে,
রাজশক্তির পশ্চাতে রয়েছে আজ
শয়তানী ষড়যন্ত্র। (ইকবাল -৫, পৃ. ৩১৪)

ইকবাল যেমন মানব জীবনের অন্যান্য সমস্ত কাজ কারবারের ভিত্তি নিছক মানববুদ্ধির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সম্পূর্ণ বিরোধী এবং বুদ্ধিবাদকে (Intellecuallism) মানব জগতের জন্যে মারাত্মক ও ক্ষতিকারক বলে মনে করেন, তেমনি রাষ্ট্রনীতি ও শাসন পদ্ধতিতে ও তিনি নিছক মানব বুদ্ধির উপর বুনিয়াদ স্থাপন করতে মোটেই রাজী নন| কারণ যে আইন-কানুন শুধুমাত্র মানুষের বিকৃত বুদ্ধিসমন্বিত মস্তিস্ক দ্বারা রচিত হবে। তাতে

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের নিষ্ঠুর স্বার্থপরতা ও স্বেচ্ছাচারিতার পূর্ণ ছাপ সুস্পষ্ট হয়ে থাকবেই। বুদ্ধিবাদী মানুষ কোন সমাজব্যবস্থা ও সামাজিক কাজকর্মে সেই সমাজের মধ্যে প্রবেশ করলে তার ব্যক্তিগত স্বার্থ অনায়াসেই সংরক্ষিত হতে পারবে। কেবল এই দিকেই তার লক্ষ্য নিবন্ধ হয়ে থাকে। এই কারণেই বুদ্ধিবাদের ভিত্তিতে রচিত আইন কানুন সমাজের সকল শ্রেণীর মানুষকে সন্তুষ্ট, নিশ্চিন্ত ও বিপদমুক্ত করতে এবং ন্যায়ের শাসন দান করতে পারে না। বরং সংখ্যালঘু দল সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের রচিত আইনের সন্তুষ্ট হতে পারে তাদের বিরুদ্ধে ঘোষণা করতে বাধ্য হয়। গণতন্ত্র যেহেতু একটি সংখ্যালঘু দলকে অন্যায়ভাবে অন্য একটি সংখ্যাগুরু দলের অধীন করা হয় এবং তাদের দয়া ও অনুগ্রহের উপর নির্ভরশীল করে দিয়া হয়, ইকবালের মতে তাই এই আইন রচনা পদ্ধতি বাতিল করে বুদ্ধিবাদের পরিবর্তে 'অহীর' সাহায্যে অবতীর্ণ খোদায়ী কানুনের আনুগত্য ও অনুসরণ করা-অন্য কথায় পূর্ণরূপে ইসলামি হুকমত কায়েম করা সকল মানুষের পক্ষে অপরিহার্য কর্তব্য। কারণ আল্লাহর নিকট সংখ্যালঘু সংখ্যাগুরু বলতে কিছুই নেই। সকল মানুষই তার দৃষ্টিতে সমশ্রেণির্ভূক্ত ও সমমর্যাদার দাবিদার। (আ. রহীম-২০, পৃ. ৭২)

'জাবীদনামায়' ইকবাল বলেন:

بندۂ حق نیاز از هس مقام　　نی غلام او نه او کس را غلام
وحی حق بینندت سود همه　　نگاهش سود وبیود همه
بندۂ حق مرد ازاد است ویس　　ملک وائینش خدا داد است ویس
رسم وراه و دین وائینش زحق　　زشت وخوب وتلخ نو شینش زحق

'বান্দায়ে হক' কভু স্থানগণ্ডিতে সীমাবদ্ধ,
কেহ নয় তার গোলাম,
আর গোলাম নয় সে অপরের।
আল্লাহর অহী মঙ্গলময়
তার দৃষ্টিতে,
সব কিছুই তার চোখে কল্যাণ অভিসারী।
'বান্দায়ে হক 'হচ্ছে আযাদ-স্বাধীন,
রাজ্য ও আইন সবই আল্লাহর দান।
রীতি ও পন্থা, জীবন বিধান ও আইন-
সব কিছুরই উৎস এক আল্লাহ।
ভালো ও মন্দ, তিক্ত ও মধুর-
সব কিছুই আগত আল্লাহর কাছ থেকে। (ইকবাল -৫, পৃ. ২৩০)

'বালে জিবরীল'ও 'জরবে কলীম' গ্রন্থে আল্লামা ইকবাল প্রাচ্যের মুসলিম রাষ্ট্রসমূহের প্রতি এইজন্যে নৈরাশ্যের ভাব প্রকাশ করেছেন যে, তাদের নেতৃবৃন্দ প্রাচ্য সভ্যতার মূল ভাবধারার সন্ধান লইতেই আদৌ সক্ষম হননি। 'জরবে কলীম' এ কবি বলেন:

میری نواسے گریباں لالہ چاک ہوا　　نسیم صبح چمن کی تلاش میں ہے ابھی
میری خودی بھی سزا کی ہے مستحق لیکن　　زمانہ دار و رسن کی تلاش میں ہے ابھی

আমার বলিষ্ঠ সুরঝংকার
ফুটিয়ে তুলেছে লালা'র ফুলদল,
ভোরের মৃদু হাওয়া এখনো ব্যাকুল
বাগিচার সন্ধানে।
খুদী আমার দণ্ডের যোগ্য বটে,
কিন্তু যুগ এখনো খুঁজে ফিরছে ফাঁসিকাষ্ঠ। (ইকবাল-১১, পৃ. ৪১০)

এই প্রসংঙ্গে একথা স্বরণ রাখা দরকার যে, আল্লামা ইকবাল তাঁর বক্তৃতাবলীতে খিলাফত সম্পর্কে তুর্কীদের ‘ইজতিহাদ’ কে সত্য বলে ঘোষণা করেছেন। যদিও এটা হতে একথা প্রমাণিত হয় যে, তুর্কীদের এই ইজতিহাদের মূলে ইসলামি ভাবধারাই আসল পথপ্রদর্শক ছিল কিংবা ইসলামি অনুভূতি লোপ পেয়ে যাওয়ায় তুর্কীদের মধ্যে যে পারিবারিক ও গোত্রভিত্তিক আভিজাত্য জাগ্রত হয়েছে, তাই তাদেরকে এ পথে টেনে নিয়েছে। আরমগানে হিজায’ গ্রন্থে তুর্কীদের সম্পর্কে কবি লিখেছেন:

یه ملک خویش عثمانی امیراست دلش آگاه و چشم او را بصیر است
نه پنداری که رست ازبند افرنگ هنوز اندرطلسم او اسیر است

তুর্কী জাতি অর্জন করেছে স্বাধিকার তাদের অন্তর হয়েছে সচেতন
আর দৃষ্টি সুদুরপ্রসারী, কিন্তু ভেবনা তাদেরকে
পশ্চিমা দাসত্ব থেকে মুক্ত এখনো তারা বন্দী তার যাদুজালে। (ইকবাল ৫, পৃ. ৩৫১)

আগেকার মুসলমান ও এখনকার মুসলমান:

দার্শনিক কবি ইকবাল আগেকার আর বর্তমান মুসলমানদের মধ্যে তুলনা করে বলেন, আগেকার মুসলমানের মধ্যে ছিল হযরত আবু বকর (রা.) এর সত্যবাদিতা, হযরত উমর (রা.) ন্যায়পরায়ণতা, হযরত উসমান (রা.) এর শালীনতা এবং হযরত আলী (রা.) বীরত্ব । তাঁরা ছিলেন প্রত্যেকে পরের তরে । আগেকার ,মুসলমানরা ভয় করতেন খোদাকে এখনকার মুসলমানরা ভয় করে মৃত্যুকে, ভালবাসে ভোগ-বিলাস। ওঁরা ছিলেন সর্বত্র শ্রদ্ধার পাত্র, আর এঁরা কুরআন ছেড়ে হয়েছে লাঞ্ছিত। ইকবালের ভাষায় :

মুসলিম ছিলেন কথার সময় নির্ভীক- সত্যবাদী,
ন্যায়নীতি ছিল তাঁদের দৃঢ়, ছিল না পক্ষপাতিত্বের লেশ,
স্বভাব -তরু ছিল তাঁদের হায়া রসে সতেজ -সজীব;
ছিল বীরত্ব তাঁদের ধারণাতীত।
পর ব্যথায় বিগলিত হওয়া ছিল তাঁদের স্বভাব,
স্বার্থত্যাগ ছিল তাঁদের চিন্তা -চেতনার ধাত।
মুসলিম ছিলেন অন্যায় -রগের রক্ত ঝরাণোর ছুরিকা স্বরূপ,
কর্ম ছিল তাঁদের জীবন-মুকুলের তাম্রমল। বাহু বলের উপর ছিল তাঁদের ভরসা,
ছিল তাঁদের খোদার ভয়, তোমাদের ভয় হলো-মৃত্যুর ,
জানে না যে সন্তান পিতার জ্ঞান গৌরব,
কিসে পাবে তার উত্তরাধিকার!
তোমরা সবাই মত্ত ভোগ -বিলাসের নেশায়,
তোমরা কি মুসলিম ? এ কি ধরনের মুসলমানী?
নাই হৃদয়ের বে পরোয়াপনা, নাই উসমানের ধন -দৌলত
আছে কি পুর্বপুরুষের সাথে তোমাদের আত্মিক কোন সম্পর্ক?
ছিলেন তাঁরা যুগের মানিত পূজিত মুসলমান,
হয়েছ তোমরা লাঞ্ছিত, ছেড়ে দিয়ে কুরআন। (ইকবাল -১১, পৃ. ১৫৪-৫)

মুসলমান জাতির দৈন্য দশাও হীনমন্যতা লক্ষ্য করে বাংলার কবি নজরুল ব্যথিত হন এবং বলেন, মুসলমানরা তাদের পূর্বপুরুষদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ও গুণাবলী হারিয়ে সর্বহায়ায় পরিণত হয়েছে যাদের ভয়ে একদিন জিন -পরী-ইনসান ছিল কম্পমান, আজ তারা জেহাদী প্রেরণা হারিয়ে ভোগ-বিলাসে মশগুল, সারা

Dhaka University Institutional Repository

দুনিয়ায় তারা আজ ভীরু পরাভূত। নজরুল বলেন:
আল্লাহতে যার পূর্ণ ঈসমান, কোথা সে মুসলমান!
কোথা সে আরিফ, অভেদ যাঁর জীবন -মৃত্যু-জ্ঞান।
যাঁর মুখে শুনি 'তোহীদের কালাম
ভয়ে মৃত্যুও করিত সালাম;
যার দ্বীন্ দ্বীন্ রবে কাঁপিত দুনিয়া স্বীন পরী ইনসান||
কোথা সে শিক্ষা আল্লাহ ছাড়া
ত্রিভুবনে ভয় করিত না যারা,
আজাদ করিতে এসেছিল যারা সাথে ল'য়ে কুরআন।।
খোদায় পাইয়া বিশ্ববিজয়ী হ'ল একদিন যারা।
খোদায় ভুলিয়া ভীত পরাজিত আজ দুনিয়ায় তারা। (নজরুল-৬৭, পৃ. ১৪৮-৯০)

মুসলিম ঐতিহ্যবাহী স্থান:

আল্লামা ইকবাল মুসলিম ঐতিহ্যবাহী স্থান ও দেশ যেমন সিসিলী দ্বীপ, মক্কা, মদীনা, বাগদাদ, দিল্লী, কর্ডোভা, স্পেন, মিসর, ইথিওপিয়া (আবিসিনিয়া), সিরিয়া (মাম), ফিলিস্তীন ইত্যাদি সম্পর্কে কবিতা লিখে সামনে সেগুলোর ইতিহাস ও মুসলিম ঐতিহ্য তুলে ধরেন।

অনুরূপভাবে তিনি ইসলামের ইতিহাসে-খ্যাত বেশ কয়েকজন ব্যক্তি যেমন হযরত বেলাল (রা.) হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) আব্দুর রহমান, ১ .তারেক, নাদির শাহ, টিপু সুলতান, হারূনর -রশীদ, খাকানী, মাওলানা রুমী প্রমুখ সম্পর্কে কবিতা রচনা করে পৃথিবীর সামনে তাঁদের চরিত্র ও মহত্ব বিধৃত করেন। জানা কথা, মুসলমানের অতীত ছিল তাদের বর্তমানের চাইতে অধিকতর উজ্জ্বল। তাই ইকবাল এই সব স্থান ও ব্যক্তিত্বের স্মৃতিচারণ করে মুসলিম জাতির মধ্যে আত্মবিশ্বাস জাগ্রত করতে চেয়েছেন এবং সেগুলো থেকে শিক্ষা গ্রহণ করার জন্য তাদের উৎসাহিত করেছেন। (আব্দুল্লাহ -৬৮, পৃ. ১০৯)
উল্লেখিত স্থানসমূহের মধ্যে সিসিলী দ্বীপ ও কর্ডোভা শহর সম্পর্কে ইকবালের তুলে ধরা দিকগুলো এখানে উপস্থাপন করা হলো:

সিসিলী:

সিসিলী দ্বীপটি আরবরা ৮৭৮ খ্রিষ্টাব্দে অধিকার করে| মুসলিম শাসনকর্তারাই এর গৌরব ও সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেন। কিন্তু কালচক্রে তা মুসলমানদের হাতছাড়া হয়ে যায় (১০৭২) ইউরোপে অবস্থানকালেই ইকবালকে স্বজাতির দুর্গতি মর্মপীড়া দিকে থাকে | তাঁর বক্ষ পরিণত হয় বারূদের গোলায় | দেশে ফেরার পথে ইকবালের জাহাজটি যখন সিসিলী দ্বীপ অতিক্রম করছিল, তখন এর মুসলিম কীর্তি দেশে তাঁর মনের দাবানল দাই দাই করে জ্বলে উঠে| তিনি 'সিসিলী' কবিতায় মুসলমানদের অতীত গৌরবের কথা স্বরণ করে দুঃখ স্বরে বলে উঠছিল:

হে রক্তাক্ত নয়ন যুগল!
প্রাণ খুলে কেঁদে নাও শতবার,
ঐ যে দেখা যায় সাগর কুলে
আরব সভ্যতার মাযার!
কর্মমুখর করেছিল তাকে একদিন
সেই আরব বেদিয়ার দল;
সুদূর পারে ছিল তাদের আনাগোনা,

গহীন সাগর ছিল তাদের খেলাঘর।
হে সিসিলী।
এঁকে দাও এক নবীন রূপ রেখা
তোমার প্রাচীন চিত্রপটে।
কাঁদাও আমায়, কাঁদো
পূর্বসূরীদের গৌরব মহিমায়
নিয়ে যাবো ভারতে এ ক্রন্দন-সোগাত।
হেথা কাঁদছি একা,
তথা কাঁদবো সবায়। (ইকবাল -১১, পৃ. ১৪২)

সিসিলী কবিতা থেকে নিম্নে সর্বশেষ শেরটি উদ্ধৃতি করা হলো:

মায় তেরা তোহাফা সূয়ে হিন্দুস্তান লে -জাউঙ্গা
খোদ ইহা রোতাহোঁ, আওরো-কো ওঁরা রোলওয়াইজা

কর্দোভা:

কর্দোভা ছিল স্পেনের রাজধানী। উমাইয়া বংশের আবদুর রহমান কর্তৃক স্পেনে স্থায়ীভাবে শাসন প্রতিষ্ঠার (৭৫৬খ্রিঃ) পর থেকেই কর্দোভার উন্নতি শুরূ হয়। ১২৩৬ খ্রি: পর্যন্ত তা দামেশক ও বাগদাদের সমকক্ষ ছিল। এর পুরনো কীর্তিসমূহের মধ্যে এখন কেবল জামে মসজিদ বিদ্যমান আছে, যাকে গির্জায় পরিণত করা হয়। পরবর্তী সময় তা জাদুঘরে রূপান্তরিত হয়।

বিলাদে ইসলামিয়া' (ইসলামি শহর) কবিতায় ইকবাল দিল্লী, বাগদাদ, কর্ডোভা, কনস্টন্টিনোপল ও মদীনা-এই পাঁচটি শহরের প্রাচীন কীর্তি বর্ণনা করেন। কর্ডোভা শহরের ঐতিহ্য বর্ণনা করে ইকবাল বলেন:

কর্দোভার মাটিও হলো মুসলমানের চোখের নূর,
ইউরোপের অন্ধকার যুগে এটি ছিল তুর-প্রদীপের মত উজ্জ্বল।
এ প্রদীপ নিভে যাওয়ায় মিল্লাত ইসলামিয়ার মাহফিলও উজাড় হয়ে যায়।
নিভে না যেতেই তা জ্বলিয়ে গেল বর্তমান সভ্যতার প্রদীপ
কর্ডভার পাকভূমি হলো ঐ ইসলামি সভ্যতার বছর,
যার ফলে ইউরোপের বাগানে আঙ্গুর-লতা হয়ে উঠেছিল তে-তাজা। (ইকবাল -১১, পৃ. ১৫৬)

উল্লেখিত কয়েকটি ব্যক্তিত্বের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.) ও হযরত বেলাল (রা.) সম্পর্কে ইকবালের পেশকৃত চরিত্র, তঁদের বিশেষ বিশেষ কর্ম এবং আল্লাহ রাসুলের প্রতি তাঁদের অপার আনুগত্যের কথা বিবৃত করা হলো:

হযরত আবুবকর সিদ্দীক (রা.)

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) সাহাবা কিরাম (রা.) দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান। এ আহ্বানে তাঁদের প্রত্যেকেই সাধ্যমতো সাড়া দেন। তবে এ ক্ষেত্রে উছমান (রা.) সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ যুদ্ধে সব মিলে উছমান (রা.) এর দানের পরিমাণ ছিল নয়শ সুসজ্জিত উট এবং একশ সুসজ্জিত ঘোড়া,দুশ উকিয়া (প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো রৌপ্য) ও এক হাজার দীনার (প্রায় সাড়ে পাঁচ কিলো স্বর্ণ) ।কিন্তু এতদসত্বেও আবু বকর (রা.) দানের ক্ষেত্রে যে মর্যাদা অর্জন করেন, তা অন্য কারো ভাগ্যে জুটেনি। (সালিহী-৬৯, পৃ. ৪৩৫)

Dhaka University Institutional Repository

''উমার (রা.) বর্ননা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আমাদের অর্থদানের আহ্বান জানালেন, তখন আমার নিকট প্রচুর অর্থ- সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে ভাবতে থাকি, যদি আমি কোনো দিন আবু বকর (রা.) কে প্রতিযোগিতায় হারাতে পারি, তবে আজই পারবো। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে উপস্থিত হই। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ما ابقيت لاهلك তোমার পরিবারের জন্য ঘরে কী পরিমাণ রেখে এসেছো? আমি বললাম مثله এর সমপরিমাণ সম্পদ পরিবারের লোকদের জন্য রেখে এসেছি। কিন্তু আবু বকর (রা.) ঐ দিন তাঁর ঘরে যা কিছু ছিল তা সবই নিয়ে রাসুল (সা.) দরবারে হাযির হন। রাসুল (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন , ما ابقيت لاهلك তোমার পরিবারের জন্য ঘরে কী রেখে এসেছো? আবু বকর (রা.) আরয করলেন, ابقيت لهم الله ورسوله আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলকে রেখে এসেছি।'' উমার (রা.) বলেন, لا اسابقك الي شيء ابدا সে দিন থেকে আমার বিশ্বাস জন্মালো যে, আমি কখনোই আবু বকর (রা.) থেকে অগ্রগামী হতে পারবো না। হাদীস (আবু দাউদ, আস সুনান, (কিতাবুয যাকাত), হা. নং. ১৪২৯ তিরমিযী, আস সুনান, (কিতাবুল মানকিব), হা. নং. ৩৬০৮।

আবু বকর (রা.) এর দানের পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। তিনিই সর্বপ্রথম দান নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বলাই বাহুল্য যে, সে দিন 'উমার (রা.) যা করেছেন, তাতে তাঁর মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব কাজ করছিল অবশ্যই এ প্রতিযোগিতা ভালো কাজে প্রশংসনীয়। তবে আবু বকর (রা.) এর দান তাঁর চেয়ে অনেক মহৎ ছিল। তিনি সে দিন যা করেছেন, তাতে কারো সাথে প্রতিযোগিতার কোনো মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না, তিনি কারো প্রতি না তাকিয়েই এ দান করেছিলেন, যা সত্যিই মহত্তম। (আহমদ-৭০, পৃ. ১৮২)

হযরত আবু বকরের এই উদারতা ও আত্মোৎসর্গ বর্ণনা করে ইকবাল বলেন:

پروانے کو چراغ نے بلبل کو پھول بس

صدیق (رض) کے لئے ہے خدا کا رسول (ص) بس

অনুবাদ:

পতঙ্গের জন্য প্রদীপ আর বুলবুলের জন্য ফুলই যথেষ্ট,
সিদ্দীকের (রা) জন্য আল্লাহর রসুলই যথেষ্ট। (ইকবাল- ১১, পৃ. ২৫০)

হযরত বেলাল (রা.):

'বেলাল' কবিতায় ইকবাল নবীজীর প্রতি হযরত বেলাল (রা.)-এর গভীর ইশ্ক তথা ভালবাসার চিত্র অংকন করেন।

হাবশী গোলাম হযরত বেলাল (রা.) মক্কায় পয়দা হন। তিনি ছিলেন প্রথম ৭ জন মুসলমানের অন্যতম । ইসলামে দীক্ষিত হওয়ার কাফিররা তাঁর উপর অকথ্য নির্যাতন চালায়। আবু জাহেল তাঁর বুকের উপর পাথর চাপা দিয়ে তাঁকে সূর্যতপ্ত বালির উপর শুইয়ে রাখতো। ঐ অবস্থায় ও তিনি বলতেন; আল্লাহ আহাদ, আল্লাহ আহাদ আল্লাহ এক আল্লাহ এক।

হযরত বেলাল (রা.) এর উপর এই নির্যাতন দেখে হযরত আবু বকর (রা.) অনেক টাকা মূল্যে তাঁকে খরিদ করে আজাদ করে দেন। হিজরতের পর যখন আযানের রীতি প্রবর্তিত হলো, তখন সুকণ্ঠে হযরত বেলাল

Dhaka University Institutional Repository

(রা.)-কে প্রথম মোয়াজজিন নিযুক্ত করা হয়। হযরত উমর (রা.) এর সময় জেহাদ উপলক্ষ্যে তিনি সিরিয়ায় যান। তিনি দামিশকে ওফাতপ্রাপ্ত হন। তিনি আশেকে রাসুল ছিলেন ইকবাল তাঁর রাসুল প্রেম বর্ণনা করে বলেন: (আব্দুল্লাহ-৬৮, পৃ. ১১২)

চমকে উঠেছিল তোমার ভাগ্যের সেতারা,
তাই তা হাবশ থেকে নিয়ে এলো তোমায় হেজায-ভূমিতে।
তোমার চিন্তাভরা ঘর হলো-আবাদ,
হাজার আযাদী হোক কুরআন তোমার এই দাসত্বের উপর।
ইশ্‌ক-এর কারণে যে জুলুম হয়, তা জুলুমই নয়!
জুলুম না হলে মজাই নেই ভালবাসায়। (ইকবাল- ১১, পৃ. ৭৮)

সাধক কবিদের অবদান:

সাদক কবিদের অবদান হুজ্জাতুল ইসলাম ‘ইমাম গাজ্জালীর জ্ঞানগর্ব দার্শনিক বিশ্লেষণের ফলে ইসলামে সুফি পন্থার স্বীকৃতির পর এ বিশেষ সাধন পদ্ধতির ক্রমবিকাশের ধারা স্বভাবতই স্তব্ধ হয়ে যায় বলে মনে করার কারণ নেই। এরপরও শিহাবুদ্দীন ইয়াহিয়া সোহরওরর্দীর মতো কোন কোন প্রখ্যাতনামা সাধক পূর্বতন বিশ্বাস রীতিনীতির পর অনুসরণ করেই চলার প্রয়াস পান এবং ফলে শরিয়তপন্থী আলেম সমাজের সঙ্গে তাঁদের বিরোধ ও নতুনতর রূপেই দেখা দেয়। প্রকৃতপক্ষে এরুপ বিরোধিতারই ফলে সুলতান সালাউদ্দীনের পুত্র মালিক জাহিরের আদেশে ১১৯১ সালে আলেপ্পো নগরে শিহাবুদ্দীন সোহরাওয়াদ্দীকে প্রাণদণ্ডে পর্যন্ত দণ্ডিত করা হয়েছিল। অবশ্য ইসলামি বিশ্বাস ও আকিধার গভীর ভেতরে সীমায়িত নব নব ব্যাখ্যার মাধ্যমে বহু সাধক ও জ্ঞানী নানাভাবে এ সাধন পদ্ধতির দিগন্তকে ক্রমেই প্রসারিত করে তুলেন, একথাও সত্য। ফারসি সাহিত্যের ম রমি কবিদের অবদান এ ক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতকে পারস্যে তিন জন অসাধারণ শক্তিধর মরমী কবির আবির্ভাব ঘটে। এঁরা হলেন ফরিদুদ্দীন আত্তার, জালালউদ্দীন রূমীও শেখ সাদি। নিজেদের রচনার মাধ্যমে সুফি তত্ত্বের যে ব্যাখ্যা এঁরা প্রদান করেছেন এবং সাধকের অন্তরের অনন্ত অন্বেষা ও আকুতির যে সার্থক আলেখ্য এঁদের লেখনীতে ফুটে উঠেছে তা শুধু অনবদ্যই নয়, অতুলনীয় ওবটে। এ তিন জন সাধক কবির পরে চতুর্দশ ও পঞ্চদশ শতকে আরো তিন জন অসাধারণ প্রতিভাশালী কবি সুফি পন্থার বিশ্লেষণে এগিয়ে আসসসেন। পারস্যের বুলবুল কবি হাফিজ, মরমিবাদের দার্শনিক ব্যাখ্যাদাতা জামী ও গুলশানে রাজ’ এর রচয়িতা মাহমুদ শাবিস্তারি হচ্ছেন পরবর্তী পর্যায়ের এ তিন জন দিকপাল কবি ও দার্শনিক ইকবাল তাদের মধ্যে অন্যতম।

মরমীবাদের প্রবক্তা পারস্যের উপরোক্ত ছয় জন কবির রচনা এবং সুফি তত্ত্বের বিকাশে তাঁদের অসামান্য অবদানের কথাই এ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা হচ্ছে। (রহমান-৭১, পৃ. ৪০)

ফরিদুদ্দীন আত্তার:

যেসব সুফি সাধক কবি হিসেবেও খ্যাতি অর্জন করেছেন, ফরিদুদ্দীন আত্তার নিঃসন্দেহে তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ব্যক্তি। একজন কামেল দরবেশ রূপে সমগ্র মুসলিসম জগতে যেমন ব্যাপক স্বীকৃতি লাভ করেছেন, মরমী কবি হিসেবেও ফারসি সাহিত্যে তাঁর স্থান তেমনি অতি উচ্চে । সাধক কবিদের মধ্যে সর্বাগ্রে তারই আবির্ভাব ঘটে এবং এ জন্যেই তাঁকে এ শ্রেণির কবিদের সকলের পথ প্রদর্শক বলা যেতে পারে।

ইমাম গাজ্জালীর মৃত্যুর আট বছর পরে ১১১৯ সালে নিশাপুর এ ফরিদুদ্দীনের জন্ম হয়। তাঁর উপাধি বিশেষণ আত্তার শব্দ থেকে স্বভাবতই ধারণা করা যেতে পারে যে, তিনি সম্ভাবত আতর ও অন্যান্য সুগন্ধী দ্রব্যের ব্যবসায়ী ছিলেন। কিন্তু এরূপ ধারণাকে সার্বিক সত্য বলে মনে করা যায় না। প্রকৃতপক্ষে ,তিনি একটি হেকিমী ঔষধের দোকান পরিচালনা করতেন এবং দোকানে আগত রুগীদের পরীক্ষা করে প্রয়োজন মতো ঔষুধ সঙ্গে সঙ্গে উক্ত দোকানে আতর ও অন্যান্য গন্ধদ্রব্য ও রাখা হতো বলেই সম্ভাবত সমসাময়িক জনগণ তাঁকে ‘ আত্তার ‘বিশেষণে অভিহিত করতে থাকে। ফরসি ভাষায় কবিদের স্মৃতি কথার কবি লেখক দৌলত শাহ তাঁর গ্রন্থে ফরিদুদ্দীন সম্পর্কে চমৎকার একটি গল্পের অবতারণা করেছেন। গল্পে বলা হয়েছে যে, একদিন স্বীয় দোকানে কর্মচারীদের সহায়তায় ফরিদুদ্দীন যখন ঔষধের কতিপয় বস্তা সাজিয়ে রাখছিলেন, ঠিক সে সময়েই দোকানের দ্বারে এসে উপস্থিত হয় উন্মদসদৃশ এক ব্যক্তি। বিস্ফরিত নেত্রে লোকটি ফরিদুদ্দীনের মুখের দিকে স্বীয় দৃষ্টি নিবব্ধ করেই দাঁড়িয়েছিল এবং তার চোখ দিয়ে অবিরল ধারায় অশ্রু গড়িয়ে পড়ছিল। ফরিদুদ্দীন নিজের কাজ নিয়ে এত ব্যস্ত ছিলেন যে, দ্বারে দণ্ডায়মান লোকটির প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করার অবসর তাঁর ছিল না। কিন্তু তবু উন্মাদের অস্বাভাবিক কৌতুহল দৃষ্টে তাঁকে ভর্ৎসনাকরে দোকানের সামনে থেকে সরে যেতে নির্দেশ দিলেন। আশ্চার্যের বিষয় লোকটি সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, আমি অতি সহজেই চলে যেতে পারি। সামান্য জীর্ণ বস্ত্র ব্যতীত অপর কোন বোঝা আমায় বহন করে নিতে হবে না। কিন্তু তুমি !যখন তোমার চলে যাওয়ার ডাক আসবে,তখন অতএব মালমাত্তা ও মূল্যবান দ্রব্য সামগ্রীর বোঝা নিয়ে তুমি যাবে কেমন করে। সে অবধারিত মূহর্ত আসার আগেই এসব সম্পদের গাঁঠরি বোঁচকা বেঁধে তোমার তৈরি হওয়া উচিত। এরূপ উক্তির পরই মাজ্জুব উন্মাদ দোকানের সন্মুখ থেকে চলে গেল। তার কথাগুলো কিন্তু ফরিদুদ্দীনের মনে তীব্র প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করল, দোকান পশার সবকিছু ত্যাগ করে তিনি আল্লাহর পথের পথিক সাজলেন।

ফরিদুদ্দীন আত্তার তাঁর সুদীর্ঘ জীবনের বিরাট একটা অংশই সাহিত্য সাধনায় অতিবাহিত করেছিলেন বলে মনে করা যেতে পারে। কথিত হয় যে, পবিত্র কুরআনে মোট যতটি সুরাহ রয়েছে,আত্তারের গ্রন্থ সংখ্যাতার সমান। তাঁর কাব্যগুলির মধ্যে ‘ পান্দনামা’ অন্যতম বহুল সমাদৃত কিতাব। মূলত: একখানা উপদেশমূলক তত্বকথার বই হলেও আত্তারের রচনাশৈলীর গুণে তা সকল মুসলিম সমাজে ব্যাপক সমাদর লাভ করেছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বিশ্বজগতের স্রষ্টা আল্লাহ পাকের ঐক্য সম্পর্কে লিখিত তাঁর একটি কবিতার উদ্ধৃতি এখানে প্রদান করা হলো:

বিশ্বব্যাপী তোমার অস্তিত্ব,
কিন্তু তুমি বিশ্বের মধ্যে নও
কিন্তু তুমি এদের মধ্যে নও।

তোমার বাণী থেকেই এসেছে নৈঃশব্দ,
তোমার প্রকাশের মধ্যেই রয়েছে তুমি লুকিয়ে।

ক্ষুদ্রতম পরমাণু আমায় দেখায় তোমার পথ,
এরপর দেখি আল্লাহর মুখাবয়ব সদৃশ দুটি জগৎ।

সুবক্তা একজন লোক ‘মৌলিক-সত্তা সম্পর্কে সত্যি বলেছেন-
সকল উপসর্গ বাদ দিলেই মিলে তৌহিদের সন্ধান।
যা আমি বল্লাম তার অর্থে কোন সন্দেহ নেই।

তোমার কোন চোখ নেই-
আর একজন ব্যতীত অপর কোন আলিম ও নেই। (রহমান -৭১)

Dhaka University Institutional Repository

জালালুদ্দীন রুমী:

পারস্য সাহিত্যের অমর কবি ও সাধক জালালুদ্দীন রুমী মুসলিম জাহানে এমন একটা বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে রয়েছেন যে, তাঁর নামের পূর্বে 'মাওলানা' বিশেষণ প্রয়োগ করেই তৎপ্রতি সন্মান প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। জীবনের এক বৃহত্তর অংশ তিনি এশিয়া-মাইনর অঞ্চল অতিবাহিত করেন বলেই তাঁর নামের শেষে 'রুমী' পদবী যুক্ত হয়েছে। পারস্যের মরমি কবিদের মধ্যে তিনি যে শীর্ষস্থানীয়, এ বিষয়ে কোন দ্বিমত নেই।

আধ্যাত্ববাদ সম্পর্কে লিখিত বিখ্যাত কাব্য মসনবী তাঁরই অমর কীর্তি। মুসলিম সমাজে এ কাব্যকে এত উচ্চ সন্মানের আসন দেওয়া হয়েছে যে, মসনবী শরীফ নামেই কুরআন ' সদৃশ বলে বর্ণনা করেছেন। বস্তুত, আধ্যাত্ববাদ সম্পর্কে রচিত অপর কোন গ্রন্থই রুমীর এ মসনবীর 'মতো ব্যাপকভাবে পঠিত ও আলোচিত হওয়ার গৌরব অর্জন করতে পারেনি।

১২০৭ সালে বলখ নগরে জালালুদ্দীনের জন্ম হয়। তাঁর পিতা বাহাউদ্দীন তৎকালীন স্থানীয় শাসক খোয়ারিজম শাহের আত্মীয় ছিলেন। ইসলামের প্রথম খলিফা হযরত আবু বকর (রা.) ছিলেন তার বংশের উর্ধতন পূর্বপুরুষ। সে সময়ের বিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ফখরুদ্দীন রাজী ও বলখের অধিবাসী এবং খোয়ারিজম শাহের ঘনিষ্ট বন্ধু ছিলেন। জালালুদ্দীনের পিতা বাহাউদ্দীন কিন্তু রাজীর দার্শনিক মতামতের বিরোধী ছিলেন এবং তাঁদের এ মতবিরোধের পক্ষে বিপজ্জনক হয়ে দাঁড়ায়। সুতরাং বাধ্য হয়েই তাঁকে জন্মভূমির মায়া ত্যাগ করে অন্যত্র গিয়ে আশ্রয় নিতে হয়। জালালুদ্দীনের বয়স তখন মাত্র পাঁচ বছর। বলখ ত্যাগ করে বাহাউদ্দীন প্রথমে গেলেন নিশাপুরে। কথিত হয় যে, ফরিদুদ্দীন আত্তারের সঙ্গে সেসময়ে বাহাউদ্দীনের সাক্ষাৎ হয় এবং বৃদ্ধ সাধক কবি তখন শিশু জালালুদ্দীনকে আর্শীবাদ করেছিলেন।

জালালুদ্দীনের জীবনের পরবর্তী কয়েক বছরের ঘটনাবলী সম্পর্কে বিভিন্ন মুত্যুর পর সামান্য কয়েক দিনের স্বল্পস্থায়ী সফর ব্যতীত জালালুদ্দীন কখনো কুনিয়া ত্যাগ করেন নি। কবির অন্যতম প্রিয় শিষ্য সিপাহসালার বর্ণনা করেছেন যে, আটাশি বছর বয়সের সময় কুনিয়ায় শামসুদ্দীন তাব্রিজীর সঙ্গে জালালুদ্দীনের সাক্ষাৎকার ঘটে। শামসুদ্দীন আহমদ আফলাকীর মুনকিবুল-আরিফিন' গ্রন্থে বলা হয়েছে যে, চল্লিশ বছর বয়স পর্যন্ত জালালুদ্দীন দামেস্কে ছিলেন।' পরস্পর সঙ্গতিহীন এসব বিবরণ সত্বেও সাধারণভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, ১২৪০ সাল বা তার সামান্য কিছু দিন পুর্ব পর্যন্ত সময়ে তিনি আলেপ্পো ও দামেস্কের বিখ্যাত বিদ্যালয়গুলোতে অধ্যায়ন করেন। এ উক্তি সঠিক হলে অনুমান করা যেতে পারে যে,বিখ্যাত ইবনে আরাবী সম্ভাবত দামেস্কে জালালুদ্দীনের সহপাঠী ছিলেন।

বিখ্যাত 'মসনবী' এবং 'কুল্লিয়াতে শামস-ই তাব্রিজ ' এ উভয় গ্রন্থেরই ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন অধ্যাপক নিকলসন। সুফি মতবাদের যে চমৎকার বিশ্লেষণ রূমীর এ উভয় কাব্যে বাস্তবায়িত হয়ে উঠেছে, তা দেখে বিস্মিত হতে হয়। সুফি সাধনার মর্মকথা ও সাধকদের চিন্তাধারার গভীরতাই উভয় কাব্যের ছত্রে ছত্রে কিভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, তার নমুনা স্বরূপ দিওয়ান থেকে কয়েকটি কবিতার অনুবাদ নিম্নে প্রকাশ করা গেল। ডক্টর জে ডব্লু, সুইটম্যান এর ইংরেজি অনুবাদ অবলম্বন করেই এ বাংলা তর্জমা তৈরি করা হয়েছে। খোদা- প্রেমিক মানুষের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে রুমী বলেছেন:

আল্লাহর মানুষ হলো মাতাল-
মদ্যপান না করেই মাতাল,
আল্লাহ মানুষ পরিতৃপ্ত-
মাংসাহার ব্যতিরেকেই পরিপূর্ণ তৃপ্ত।
আল্লাহর মানুষ চরম বিস্ময়ে অভিভুত;
আল্লাহর মানুষের নিদ্রা নেই, আহার নেই।

মাটি বা বাতাস থেকে উঠেনি আল্লাহর মানুষ-
তার জন্ম এভাবে নয়;
পানি বা আগুন থেকে তার উৎপত্তি হয়নি।
আল্লাহর মানুষ ভিখেরীর পোশাকেও বাদশাহ;
ধ্বংসস্তুপের মধ্যে লুকানো মণি স্বরূপ আল্লাহর মানুষ।
ইবাদতের আত্মা হলো সে , আল্লাহর মানুষ এমনি হয়।
আল্লাহর মানুষ তবু প্রত্যাশা করে না কোন পুরস্কারের
বিশ্বাসের মধ্যেও যেন অবিশ্বাস-
এই হলো আল্লাহর মানুষ;
সুতরাং আল্লাহর মানুষের জন্যে পাপ বা পুণ্য কি?
সৃজনশীল সত্য কর্তৃক শিক্ষাপ্রাপ্ত আল্লাহর মানুষ-
পুঁথিগত বিদ্যার পণ্ডিত সে হয় তো নয়।
সৃষ্টির আদিতে অনন্ত শূন্যতার উপরে
সমাসীন ছিল আল্লাহর মানুষ;
কিন্তু এখানে নিজের বাহনের জন্যে সে লজ্জা পাচ্ছে। (রহমান-৭১, পৃ. ৪৭)

এ কবিতায় সাধক রুমী খোদাপ্রেমিক মানুষের এমন একটা রূপই ফুটিয়ে তুলেছেন, যাতে পরিষ্কার প্রতিপন্ন হচ্ছে যে, আল্লাহর সত্যিকার প্রেমে আত্মহারা যিনি, এ অনিত্য সংসারে হতবুদ্ধির মতোই তাঁকে বাস করতে হয় এবং আহার-নিদ্রার কোন চাহিদা তাঁর থাকে না। মূলত আধ্যাত্মিকতা থেকেই খোদাপ্রেমিকের জন্ম, চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও তিনি সমৃদ্ধ এবং কোন প্রত্যাশাই তাঁর নেই । বিশ্বাস - অবিশ্বাস ও পাপ - পুণ্যের মাপকাঠি দিয়ে খোদাপ্রেমিককে বিচার করা চলে না; কিতাবী বিদ্যার অধিকারী না হয়েও তত্ত্বজ্ঞানের ভাণ্ডারী হতে পারেন তিনি। দেহ পিঞ্জরে আবদ্ধ আত্মসত্তার অবনমিত অবস্থার জন্যে খোদাপ্রেমিক যে লজ্জিত, এ চরম কথা উচ্চারণ করেই কবি তাঁর বক্তব্য শেষ করেছেন। সুফি তত্ত্বের অন্তর্নিহিত রহস্য সম্পর্কে সাধক রুমী আর একটি কবিতায় বলেছেন:

পণ্যপাত্রের পথে অন্তর আমাদের হারিয়ে গেছে;
বিশ্বে মতানৈক্যের সৃষ্টি করেছি আমরা।
মানুষের অন্তরে আমরা আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছি,
আর প্রেমিকদের নিক্ষেপ করেছি অস্থৈর্যের মধ্যে
সকল বিষয় সম্পদ আমি পরিহার করেছি;
বাড়ি-ঘরে আগুন লাগিয়ে দিয়েছি ।
আমার পিঠে একটা ভারী বোঝা ছিল,
আল্লাহকে ধন্যবাদ, সে বোঝা আমি ছুড়ে ফেলেছি।
বিশ্বের সম্পদ মৃতদেহেরই মতো,
এ মৃতদেহকে আমরা কুকুরের সামনে ফেলে দিয়েছি।
কুরআনের সারবস্তু আমরা বের করে নিয়েছি,
আর বাইরের খোলসটা দিয়েছি কুকুরদের ।
মাটি থেকে আকাশ পর্যন্ত সকল জায়গায়
আমরা ছড়িয়ে দিয়েছি শ্বাশত উল্লাস ও আনন্দের বীজ।
তালি-দেওয়া জোব্বা, জায়নামাজ ও তসবিহ,
আমরা পরিত্যাগ করেছি আত্মার সরাইখানায়।
ধার্মিকতার পোশাক, পাগড়ি ও জ্ঞানের গরিমা
নিক্ষেপ করেছি আমরা প্রবহমান নদীতে।
আকাঙ্ক্ষার ধনুকে দিব্যজ্ঞানের তীর সংযোজিত করে

Dhaka University Institutional Repository

স্থিরভাবে লক্ষ্যবেধ করেছি আমরা ।
শামস-তাব্রিজ,তুমি সত্যিবলেছ-আমরা নিক্ষেপ করেছি প্রেমের দৃষ্টি
আত্মার প্রভুর উদ্দেশ্যে।’’

এরূপ রহস্যময় ভাষায়ই জালালুদ্দীন রুমী সুফি তত্ত্বের মর্মকথা ব্যক্ত করেছেন তাঁর অমর কাব্যের মাধ্যমে।

চতুর্থ অধ্যায়

Dhaka University Institutional Repository

কাব্যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি:

চতুর্থ অধ্যায়

কাব্যে দৈনন্দিন জীবনের বিভিন্ন বিষয়ে ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি:

যে জন সৃষ্টিকুলের উপকার করে, সে-ই আল্লাহর নেক বান্দা:

و احسن كما احسن الله اليك

[তুমি পরের উপকার কর যেমন আল্লাহ তোমার উপকার করেছেন।] (২৮:৭৭)

বিশ্বজগতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহ পাকের সৃষ্টি। আর এই বিশাল সৃষ্টি পরিবারের মধ্যে মানুষই সেরা সৃষ্টি আশরাফুল মাখলুকাত। পরিবারের প্রধানের যেমন পরিবারের প্রতি অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে, তেমনি সৃষ্টিকুলের প্রতি মানুষের ও অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। আর এই কর্তব্য পালন করাকে বলে খিদমাতে খাল্‌ক বা সৃষ্টির সেবা। সৃষ্টির প্রতি মানুষের কর্তব্য অপরিসীম। অসহায় ও দুস্থ মানুষকে সাহায্য –সহায়তা করা যেমন মানুষের কর্তব্য তেমনি পশুপাখি, গাছপালা, বৃক্ষলতা এবং পরিবেশের প্রতিও মানুষের অনেক দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে। এদের লালন পালন ও রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্বো মানুষের। সৃষ্টির প্রতি সদয় ব্যবহার করলে আল্লাহ পাক খুশি হন, আর সৃষ্টির প্রতি অবহেলা বা নিষ্ঠুর আচরণ করলে তিনি অসন্তুষ্ট হন। এ মর্মে মহানবী (স) বলেন:

الخلق عيال الله فاحب الخلق الي الله من احسن الي عياله

[মানবকুল আল্লাহর পরিবারভুক্ত, তাঁদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর অধিকতর প্রিয়, যে তাঁর পরিবারের উপকার করে।] (মিশকাত- ৭২ -পৃ. ৪২৫)

মহানবী(সা.) আর বলেছেন:

ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء

Dhaka University Institutional Repository

অর্থ: তোমরা পৃথিবীবাসীদের প্রতি দয়া কর, তা হলে যিনি আসমানে আছেন তিনি তোমাদের প্রতি দয়া করবেন। হাদীস-

''আবু ইব্‌ন আদম (র) ফেরেশতা কর্তৃক লিখিত আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের তালিকায় নিজের নাম প্রথম দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তাঁকে জানান হল, ''যাঁরা আল্লাহর সৃষ্টিকে বেশি ভালবাসেন, তাদের সেবায় নিজেদের বিলিয়ে দেন, মহান আল্লাহ তাঁদেরই সবচেয়ে বেশি ভালবাসেন। আপনি আল্লাহর সৃষ্টিকে ভালবাসেন এবং তাদের সেবায় নিজেকে নিয়োজিত রেখেছেন, তাই আপনার নাম সবার আগে লেখা হয়েছে।''

শুধু মানুষের সেবার মধ্যেই কর্তব্য সীমাবদ্ধ নয়। পশুপাখি, গাছপালা, কীটপতঙ্গ ইত্যাদির প্রতি সেবার হাত প্রসারিত করা একান্ত কর্তব্য। পরিবেশ সংরক্ষণেও মানুষের দায়িত্ব অপরিসীম। ইকবাল বলেন, আল্লাহ ঐ বান্দাই আমার ভালবাসার পাত্র, যে আল্লাহর বান্দাকে ভালবাসে: (শফিকুল্লাহ-৭৩, পৃ. ৭১)

خدا کے عاشق تو ہیں ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں مارے مارے

میں اس کا بندہ بنوں جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا

অনুবাদ:

আল্লাহর হাজার বান্দা ঘুরে বেড়ায় বনে বনে ;
অনুগত হবো আমি তার-ই, যে ভালবাসে আল্লাহর বান্দাকে। (ইকবাল -১১, পৃ. ১৫১)

نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں

کوئی برا نہیں قدرت کے کارخانے میں

ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے

آتے ہیں جو کام دوسروں کے

نہ رہ اپنوں سے بے پروا، اسی میں خیر ہے تیری

اگر منظور ہے دنیا میں او بیگانہ خو رہنا

অনুবাদ:

পৃথিবীতে কোন বস্তুই হীন নয়,
প্রকৃতির কারখানায় কোন বস্তুই খারাপ নয়।
ঐ লোকেরাই দুনিয়াতে ভাল, যারা পরের কাজে আসে
তোমার যদি দুনিয়াতে বেগানা হয়ে থাকতে ভাল লাগে,।
(সীরাতে ইকবাল-৭৪,পৃ. ১৫৭)

তবে নিতান্ত আপন লোকদের ভুলে যেয়োনা,
এতেই রয়েছে তোমার মঙ্গল। (সীরাতে ইকবাল-৭৪, পৃ. ১৫৯)

"হাদীস শরীফে আরও আছে, এক মুসলমান অন্য মুসলমানকে কাপড় দান করলে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের পোশাক দান করবেন। ক্ষুধার সময় খাদ্য দান করলে আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের সুস্বাদু ফল দান

করবেন। কোন মুসলমানকে পিপাসার সময় পানি পান করলে, আল্লাহ পাক তাকে জান্নাতের সীলমোহরকৃত পাত্র থেকে পবিত্র পানীয় পান করাবেনভ।”

বিশ্ব জগতের সৃষ্টির মধ্যে মানুষই প্রধান। তাই মানুষের সেবা করাই মানুষের প্রধান কাজ। বিশেষ করে অসহায় ও দুস্থ মানুষের সেবা করা একান্ত কর্তব্য। যে ব্যক্তি অসহায় লোকদের সাহায্য করে, আল্লাহ পাক তাকে ভালবাসেন ও সাহায্য করেন।

ইসলামে বংশ নয় প্রকৃত মর্যাদা সংযম সাধনায় ও খোদাভীতিতে:

وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا

[পারস্পরিক পরিচিতির জন্য আমি তোমাদেরকে বংশ ও গোত্র বিভক্ত করেছি] (৪৯:১৩)

ان اكرمكم عند الله اتقكم

[আল্লাহর কাছে তোমাদের মধ্যে অধিকতর আল্লাহভীরুই অধিকতর সন্মানিত।] (কুরআন হুজরাত ৪৯:১৩)

তাক্ওয়া শব্দের অর্থ আল্লাহ ভীতি, পরহেজগারী, আত্মশুদ্ধি, বিরত থাকা এবং নিজেকে বিপদ থেকে রক্ষা করা। ইসলামি শরীয়তের পরিভাষায় আল্লাহর ভয়ে সবরকম অন্যায়-অনাচার, পাপচার বর্জন করে কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশমত জীবনজাপন করাকে তাকওয়া বলে। আল্লাহকে ভয় করার অর্থ আল্লাহর নির্দেশ মেনে চলা। আল্লাহ আমাদের সৃষ্টিকর্তা ও পালনকর্তা। তিনি আমাদের ভালমন্দ বুঝবার ও কাজ করার ক্ষমতা দান করেছেন। তিনি সব কিছু দেখেন তিনি আমাদের অন্তরের খবর ও জানেন। শেষ বিচারের দিনে তাঁর কাছে ভালমন্দ কাজের জবাবদিহি করতে হবে। ভালকাজের পুরস্কার ও মন্দ কাজের শাস্তি দেওয়া হবে। যার মধ্যে এ অনুভূতি আছে সে আল্লাহর ভয়ে পাপকর্ম থেকে দূরে থাকে। (মালেক-৭৫, পৃ. ৬৩)

এ প্রসঙ্গে আল্লাহ পাক বলেন-

واما من خاف مقام ربه و نهي النفس عن الهوا فان الجنة هي المأوي

অর্থ: যে ব্যক্তি আল্লাহর সামনে দণ্ডায়মান হওয়ার ভয় করে নিজেকে যাতীয় পাপ থেকে বিরত রাখে , তার স্থান জান্নাত।‘’ (সুরা আন্‌নাযিয়াত: ৪০-৪১)

Dhaka University Institutional Repository

জাতি, বর্ণ, গোত্র নির্বিশেষে এ সকল কিছুর মধ্যে প্রকৃত মর্যাদা নিহিত নয় বরং প্রকৃত মর্যাদা হলো তার আল্লাহ ভীতিতে। এই শিক্ষাই পবিত্র কুরআনে আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। একজন তাক্ওয়াবান মানুষই শ্রেষ্ঠ মানুষ। ইকবাল বলেন, মানবতার সবচাইতে বড় শত্রু বংশবাদ ও বর্ণবাদ। যারা মানুষকে ভালবাসে, তাঁদের কর্তব্য হলো ইবলিসের সৃষ্টি করা বংশবাদ ও বর্ণবাদের বিরুদ্ধে জেহাদ করা:

بتانِ رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا
نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

অনুবাদ:

একাত্ম হয়ে যাও মিল্লাতে. বর্ণ ও বংশের মূর্তি ভেঙ্গে,
না থাকে যেন কিছুই, তুর্কী, ইরানী বা আফগানী বলে। (ইকবাল -১১, পৃ. ৩০৮)

غبار آلودہ رنگ و نسب ہیں بال و پر تیرے
تو اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا

অনুবাদ:

জড়ানো তোমার পালক বর্ণ ও বংশের ধূলায়.
হে হরমের পাখি ! ঝেড়ে নাও তোমার পালক, উড়ার আগে। (ইকবাল -৭৪, পৃ. ৩১২)

অর্থাৎ হে হারাম শরীফের মুসলমান! তুমি বর্ণ ও বংশবাদের উর্ধ্বে উঠতে পারনি। উন্নতি করতে হলে এসব অনৈসলামিক ভাবধারা ত্যাগ কর।

ইসলাম বংশ ও গোত্রের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে না, তা মানুষের কর্মের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করে। ইসলামের চোখে আদর্শই হলো কুফর আর ঈমানের মধ্যে পার্থক্যের মাপকাঠি। যুদ্ধ ক্ষেত্রে যে আল্লাহর উপর ভরসা না করে তলোয়ারের উপর ভরসা করে, সেই মুসলমান কাফের। যে মুসলমান তক্দিরের অধীন হয়, সে কাফের। মুমিন নিজেই খোদার তক্দির। মুমিনের বৈশিষ্ট্য রয়েছে তার বিশ্বাস ও কর্মে । তাই কুরআন বলে, আল্লাহর কাছে সম্মানিত ঐ ব্যক্তি, যে অধিকতর খোদাভীরূ। বংশ বা গোত্রের যে কোন শ্রেষ্ঠতের কারণে অপর কোন বংশ বা গোত্রের উপর তার শ্রেষ্ঠত্ব হবে না। শুধু পরিচিতির জন্য বংশ ও গোত্রে মানুষকে বিভক্ত করা হয়েছে।

হযরত সালমান ফারসী (রা) ছিলেন ইরানের অগ্নিপূঁজক। তিনি স্বদেশ ত্যাগ করে সিরিয়ায় গিয়ে খ্রীষ্টান ধর্মে দীক্ষীত হন। শেষ পর্যন্ত নবীজীর কাছে মদীনায় গিয়ে ইসলাম কবুল করেন। লোকেরা যখন তাঁর বংশের পরিচয় জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি উত্তরে বললেন: ‘‘আমি সলমান ইবনে ইসলাম’’ অর্থাৎ আমি ইসলামের পুত্র সালমান । (আব্দুল্লাহ-৩৬, পৃ. ৮৩)

এ সম্পর্কে ইকবাল বলেন:

فارغ از باب وام واعمام باش
ہمچو مسلمان زاده اسلام باش

অনুবাদ:

উঠ উর্ধ্বে বাপ, মা ও চাচার আত্মীয়তার,
হও সন্তান ইসলামের, সলমানের, সলমানের মত। (ইকবাল -৫, ১৮৮)

ইসলামে যদি খান্দানের মর্যাদা থাকতো, তবে নবীর সন্তানদেরকে অসৎকর্মের জন্য শাস্তি দেয়া হতো না। হযরত নুহের পুত্র সাম-কে তো আল্লাহ অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিলেন। হযরত নুহের বিরুদ্ধে তাঁর কওমের অবাধ্যতা যখন চরমে উঠেছিল এবং তাঁদের হেদায়াত প্রাপ্তির আশা তিনি ছেড়ে দিয়েছিলেন, তখন আল্লাহর কাছে তিনি আবেদন করলেন, হে আল্লাহ! আপনি অবাধ্য জাতির নাম নিশান পৃথিবীর বুক থেকে মুছে দিন। আল্লাহ হুকুম মত তিনি একটা নৌকা প্রস্তুত করলেন এবং প্রত্যেক প্রকার প্রাণীর দুই জোড়া করে নৌকায় উঠলেন। লোকদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল, তাদেরকে ও নৌকায় উঠালেন। আল্লাহর ক্রোধ পানির আকার ধারণ করে আকাশ থেকে ভীষণভাবে বর্ষিত হলো এবং জমিনের অভ্যন্তর থেকে ও পানির ঝড়না বেরিয়ে এলো। দিকে দিকে পানি ছড়িয়ে গেল। অবাধ্য কওমের মধ্যে যারা অত্যাচার অবিচার করে গর্ব অনুভব করতো, তারা খড়কুটার মত ভেসে যেতে লাগলো।

হযরত নুহের পুত্র সাম কাফেরদের সাথেই ছিল। ঐ সময় সে সামনে এলো। হযরত নুহ্ তাতে ডেকে বললেন, কাফেরদের দল থেকে আলাদা হয়ে যাও এবং নৌকায় উঠ। উত্তরে সে বললো, ‘‘আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেবো; পানি আমাকে ছুতে পারবে না।’’ হযরত নুহ পুত্রের নির্বুদ্ধিতার জন্য দুঃখ করলেন। তিনি আল্লাহর কাছে বললেন, হে আল্লাহ! আমার সন্মান তো আমারই বংশের; আপনার ওয়াদা সত্য, তবে আপনার চেয়ে অধিকতর ভাল সিদ্ধান্ত নেবার আর কেউ নেই। ইকবাল বলেন:

পূর্ব পুরুষের দোহাইতে তোমার কোন সার্থকতা নেই,
মন্দ হলে আদর্শ তোমার জীবনের কোন মুল্য নেই।
বিলীন করে দিয়েছি পেয়েছিলাম যা পূর্বসুরীদের থেকে
আসমান মোদের করল নিক্ষেপ যমীনে মঙ্গল গ্রহ হতে। (শরিফ ৩৮, পৃ. ১৮৪)

আল্লাহ বললেন,‘হে নুহ্!সাম আপনার বংশের নয়,বরং ঈমানী প্রেরণার মধ্য দিয়ে ইসলামের পারস্পরিক সম্পর্কেও সুত্র তৈরী হয়। এই নীতির ভিত্তিতেই নবীজী (সা.) মানব জাতিকে বিভক্ত করেছেন। তওহীদের ভিত্তিতে বর্ণ, ভাষা, দেশ ও খান্দান নির্বিশেষে সকল মুমিন ভাই ভাই। সকল মুসলিম এক জাতি । পক্ষান্তরে সকল অবিশ্বাসী ভিন্ন জাতি। নবীজী বলেছেন:

الكفر ملة واحدة সকল কাফির ভিন্ন একটি জাতি ।

ইকবাল বলেন:

ملت متا شان ابراهیمی است — شهد ما ایمان ابراهیمی است
گر بست را جزو ملت کرده — رخته در کار اخوت کرده
در زمین ما نگیرد ریشه ات — بست نامسلم بنور اندیشه

অনুবাদ:

আমাদের মিল্লাত ইব্রাহিমের তৈরী একটি মৌচাক,
আমাদের মধু ইব্রাহিম প্রচারিত ঈমান।
মনে কর যদি বংশকে মিল্লাতের অংশ,
ফাটল ধরবে তোমার ভ্রাতৃত্ব।
পারেনা গজাতে জড় তোমার অঙ্কুর, আমাদের জমিনে
রয়েছে অমুসলিম এখনো, তোমার মা। (ইকবাল -৫, পৃ. ১৮৯)

কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করবে না:

لا تشرك به شيئا

[তুমি কোনো কিছু তার সাথে শরিক করো না], (৩: ৬৪)

শির্‌ক অর্থ অংশীবাদ অর্থাৎ একাধিক স্রষ্টা, একাধিক উপাস্যে বিশ্বাস করা। মহান আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা বা কাউকে তাঁর সমগুণসম্পন্ন ও সমতুল্য মনে করাকে শির্‌ক বলে। যে ব্যক্তি শির্‌ক করে, তাঁকে বলে মুশরিক আল্লাহর ইবাদতে অন্য কোন শক্তি বা বস্তু শামিল করাও শির্‌ক।

এখানে আল্লাহ বলেন, তওহীদ মানলেই পূর্ণ তওহীদবাদী হবে না

যদি বাস্তব ক্ষেত্রে অন্য কারো দাসত্ব স্বীকার করা হয়। 'আরবাবাম মিন দুনিল্লাহ' বলে আল্লাহ তায়ালা মানুষকে সর্বপ্রকার গোলামী থেকে বিরত থাকার আদেশ দিয়েছেন। আল্লাহর এক সেজদা মানুষকে গয়রুল্লাহর সেজদা থেকে নিস্তার দেয়। ইকবাল বলেন:

یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے

ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات

অনুবাদ:

মনে করছ কঠিন তুমি যে এক সেজদাকে,

দেবে তা নিস্তার তোমায়, হাজার সেজদা থেকে। (ইকবাল ১১, পৃ. ৩২)

وہ ی سجدہ ہے لائق اہتمام
کہ ہو جس سے ہر سجدہ تجھ پر حرام

অনুবাদ:

ঐ সেজদাই কেবল শুরুত্বের অধিকারী,
করে দেয় যা হারাম,সকল সেজদা তথা মিনতিকে। (ইকবাল – ১১, পৃ. ১৭৩)
আল্লামা ইকবাল একাত্ববাদ এর শিক্ষা দিতে গিয়ে আরো বলেন,
একাত্ববাদের ফলে ব্যক্তি লৌহমানব,
একাত্ববাদ গুণে ধর্ম শ্রেষ্ঠতের অধিকারী হয়।
যে জাতি তাওহীদের ডাকে সাড়া দেয়
বিশ্বের কোন শক্তি কখনো না তাকে নাড়া দেয়। (ইকবাল ১১, পৃ. ৩৪)

আল্লাহ তাঁর সাথে কোন কিছুর শরীক সাব্যস্ত করাকে অপছন্দ করেন। শরীক করার অপরাধকে ও কবীরা গুনাহ বলা হয়। এ অপরাধ আল্লাহ ক্ষমা করবেন না। এতব্যতীত অন্য যে কোন অপরাধ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা মাফ করবেন বলে পবিত্র কুরআনে ঘোষণা দিয়েছেন। পবিত্র কুরআনের সুরা লুকমানে হযরত লুকমান (আ:) যখন তার ছেলেকে আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করতে নিষেধ করেছিলেন আল্লাহর নিকট হযরত লুকমান (আ:) এর এই উপদেশটির স্বীকৃতিস্বরূপ পুত্রকে পিতা মাতার খেদমত করার আদেশ দিয়েছেন। কথায় কাজে আচার আচরণে কোন অবস্থায়ই কোন কিছুকে আল্লাহর সাথে শরীক করা যাবে না। এটা ইসলাম ধর্মের বুনিয়াদি শিক্ষা।

শির্কের অপরাধ যে কত জগন্য সে সন্মন্ধে আল্লাহ পাক বলেন-

ان الله لايغفر ان يشرك به و يغفر ماىون ذالك لمن يشاء

অর্থ: নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শির্ক করার গুনাহ ক্ষমা করেন না, তাছাড়া অন্য যে কোন গুনাহ যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন।'' (কুরআন: ৩: ৪৮)

শির্ক যে অমার্জনীয় অপরাধ শুধু তাই নয় বরং এতে আল্লাহর সেরা সৃষ্টি মানুষের অমর্যাদাও করা হয়। মানুষকে আল্লাহ পাক তাঁর ইবাদতের জন্য সৃষ্টি করেছেন। আর অন্য সবকিছু সৃষ্টি করেছেন মানুষের উপকারের জন্য। মানুষকে এমন সব গুণ দেওয়া হয়েছে, যা দ্বারা সে অন্য সব সৃষ্টিকে বশে এনে নিজের কাজে ব্যবহার করতে সক্ষম। কিন্তু শুশরিক ঐসবের সামনে মাথা নত করে। এভাবে নিজের মর্যাদাহানির জন্য সে নিজেই দায়ী। শিরকের মাধ্যমে মানব সমাজে বিবাদ ও বাভেদ সৃষ্টি হয়। বড় ছোট এর পার্থক্য সৃষ্টি হয়। মুশরিক নানারকম জড় পদার্থ, দেবদেবী, প্রতিমা, প্রাকৃতিক শক্তির সামনে ও মাথা নত করে। এহচ্ছে মানবতার চরম অবমাননা।

فلا تجعلوا لله اندادا

[আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন শক্তির দাসত্ব করো না। (১: ২২)

শুধু আল্লাহ ও ইবাদত করলেই তওহীদ কায়েম হয়না বরং আল্লাহ ছাড়া অন্য সব শক্তির বন্ধন থেকে মুক্ত থাকতে হবে।ইকবাল বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

تا نه رمز لا اله أيد بدست
بند غير الله را نتوان شكست

অনুবাদ:

পারবেনা বুঝতে যতক্ষণ লা- ইলাহার মর্মবাণী,
পারবে না ভাংগতে ততক্ষণ গয়রুল্লাহ-ও বন্ধন। (ইকবাল ৪৭, পৃ. ১৯)

একত্ববাদের বিশ্বাসের ফলাফল এই দাঁড়ায়, কোন ব্যক্তির এই অধিকার নেই যে, সে অন্যকে অধীনস্ত বানাবে বা তাকে অপদস্ত করবে। সারকথা একত্ববাদ পরস্পর মানুষের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব, সাম্য, সম্ভমের চেতনা সৃষ্টি করে। আল্লামা ইকবাল এর ব্যাপক ফায়দার কথা নিজের প্রেরণাদায়ক শব্দে এভাবে বলেছেন।

'ব্যক্তি একত্ববাদের বদৌলতে উত্তম আদর্শের রূপকার হয়। আর একত্ববাদ দ্বারা ধর্ম শক্তিশালী হয়। লা-ইলাহার মর্মকথা অনুধাবন না করা পর্যন্ত গায়ের খোদার গোলামী থেকে মুক্তি নেই। প্রায় চল্লিশ বার আল কুরআনে এ ঘোষণা দেওয়া হয়েছে যে,

'তোমরা আল্লাহ্ তা'য়ালাকে এক বিশ্বাস করে তাঁর ইবাদত করতে থাক। তবে কখনো কোন কিছুকে তার অংশীদার ধারণা কর না।

শিরক ক্ষমার অযোগ্য অপরাধ। তবে আন্তরিকভাবে তওবা করে ক্ষমা প্রার্থনা করলে ও ঈমানের বিপরীত আর কিছু না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে এবং ঈমানের দাবী অননুসারে কাজ করলে আল্লাহ পাক দয়া করে এ অপরাধ ক্ষমা করে দিতে পারেন।

তক্দির গড়ার দায়িত্ব ব্যক্তি নিজের:

ووفيت كل نفس ما كسسبت

[প্রত্যেককে তার অর্জিত কর্মের প্রতিদান পুরোপুরি দেওয়া হবে।] (০৩:২৫)

তাক্দির শব্দতটি আরবী 'কাদারুন' থেকে বিপন্ন। এর অর্থ নির্ধারণ করা, ব্যবস্থাপনা ইত্যাদি। পরিভাষায় তাক্দিরের সংজ্ঞা হল:

সৃষ্টির যাবতীয় বিষয় তথ্য ভালমন্দ, উপকার ইত্যাদির স্থান-কাল এবং এসবের শুভ ও অশুভ পরিণাম পূর্ব হতে নির্ধারিত হওয়া। (কাওয়াইদুল ফিকহ-৭৭ পৃ. ৪২৪)

এর ব্যাখ্যা হল, জগতের যাবতীয় বস্তু তথা মানুষ ও জিনসহ যত সৃষ্টি রয়েছে সবকিছুর উৎপত্তি ও বিকাশ, ভাল ও মন্দ , উপকার ও অপকার ইত্যাদি কখন কোথায় ঘটবে এবং এর পরিণাম কি হবে, প্রভৃতি মাখলুক সৃষ্টির পূর্বেই আল্লাহ তা'আলা নির্ধারণ করে রেখেছেন। জগতে যা কিছু ঘটছে এবং ঘটবে সবই তক্দিরে লিপিবদ্ধ আছে। তক্দিরের বাইরে কিছুই নেই। রাসুলুল্লাহ (সা.) ইরশাদ করেন:

كل شيئ يقدر حتي العجز و الكيس

প্রত্যেক জিনিসই তক্দির অনুসারে সংঘটিত হয়ে থাকে। এমনকি অক্ষমতা এবং বুদ্ধিমত্তা। (মিশকাত, পৃ. ১৯)

Dhaka University Institutional Repository

কাদার শব্দের সাথে সাধারণত আরেকটি শব্দ ব্যবহার হয়, তা হল কাযা' | কাযা শব্দের আভিধানিক অর্থ পায়সালা করা, হুকম দেওয়া ইত্যাদি। পরিভাষায় কাযা বলা হয়।:

الارادة الازلمة المتعلقة بالموجودات الكائنة فيما لا يزال

অনন্তকাল ধরে সৃষ্টবস্তু সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার অনাদি ইচ্ছা বা পরিকল্পনাকে 'কাযা' বলা হয় | আর কাদার হচ্ছে ঐ সংক্ষপ্ত পরিকল্পনার বিস্তারিত ও বাস্তব রুপ। (কাওয়াইদুল ফিকহ-৭৭, পৃ. ৪৩১)

মোটকথা, কোন জিনিসই তক্‌দিরের বাইরে নয়। তবে তক্‌দির মানুষের কাজের কারণ নয় এবং তক্‌দির লিপিবদ্ধ আছে বলেই মানুষ ভালমন্দ ইত্যাদি করছে বিষয়টি এমনো নয়। বরং মানুষ ভবিষ্যতে যা করবে আল্লাহ তা'আলা যেহেতু তা আদিতেই জানেন তাই তিনি তা পূর্বেই লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। অর্থাৎ মানুষ যা করবে আল্লাহ তা'আলা তা লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। আল্লাহ লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন বলে মানুষ করছে, এ কথা ঠিক নয়। বিষয়টি এমন বোধগম্য করার জন্য একটি উদাহরণ পেশ করা যেতে পারে | ধরা যাক, একজন অভিজ্ঞ ডাক্তার তার রোগীর অবস্থা জানেন বলে তার ডায়রীতে লিখে রাখলেন যে, এ রোগী অমুখ সময় অমুক অবস্থায় মারা যাবে। অবশেষেও যদি তাই হয়, এক্ষেত্রে ডাক্তারের লিখন তার মৃত্যুর কারণ নয়। ঠিক তদ্রুপ আল্লাহ তা'আলা মানুষের অবস্থা জানেন বলে সব লিপিবদ্ধ করে রেখেছেন। তবে এ লিপিবদ্ধকরণ মানুষের কার্যের কারণ নয়। মানুষের কার্যের কারণ মানুষের ইচ্ছা বা সংকল্প | কাজেই ভালমন্দ কাজের জন্য মানুষ নিজেই দায়ী হবে। (মিশকাত-৭৮, পৃ, ৬৭)

কারো কারো মতে তক্‌দির দুই প্রকার মুবরাম (مبرم) ও মু'আল্লাক (معلق) | যে তক্‌দিরে কোন পরিবর্তন হয় না তাকে তক্‌দিরে মুবরাম বলে। আর যে তক্‌দিরে পরিবর্তন হয় তাকে তক্‌দিরে মু'আল্লাক বলে। যেমন: ঔষধ ও দু'আর দ্বারাই তকদির পরিবর্তন হওয়া প্রকৃতপক্ষে তক্‌দির সবই মুবরাম- অপরিবর্তনশীল |(বুখারী ১ম খণ্ড, পৃ. ৩)।

তক্‌দিরের বিষয়টি কখন লিপিবদ্ধ করা হয়েছে এ সম্বন্ধে হাদীসে বর্ণিত আছে, রাসুলুল্লাহ (সা) ইরশাদ করেন., আসমান-যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর পূর্বে আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টির তক্‌দির লিপিবদ্ধ করেছেন। তখন আরস ছিল পানির উপর। (বুখারী ও মুসলিম, পৃ. ৫১৮)

ইকবাল বলেন, বিশ্ব গতিশীল, স্থবির নয়। এর মধ্যে পরিবর্তন-পরিবর্ধনের চেতনা ও আকংখা রয়েছে। কিন্তু অনেক সময় মানুষের হস্তক্ষেপ সহায়তা ছাড়া প্রকৃতি তার মনোবাঞ্চা পূর্ণ করতে পারেনা। তা মানুষের হস্তক্ষেপ ও সহায়তা কামনা করে। তাই মানুষের উচিত, প্রকৃতির এই সুপ্ত বাসনার সাথে একাত্ম হয়ে নিজের বিশ্বের তক্‌দির গড়ে তোলা।

ইকবাল ' পায়ামে মাশরিক' গ্রন্থে' تسخير فطرت (প্রকৃতির বশীকরণ) শীর্ষক কবিতায়-মাটির মানুষের মধ্যে কত যে সুপ্ত ক্ষমতা ও চেতনা ও প্রেরণা রয়েছে, তা হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বর্ণনা করেন। আদম সৃষ্টি করে আল্লাহ তার, মধ্যে অনেক প্রচ্ছন্ন ক্ষমতা আমানত রেখেছেন। ওই সব ক্ষমতা ও চেতনা আদম সৃষ্টির পূর্বে কারো মধ্যে এমনকি ফেরেশতাদের মধ্যেও ছিলনা। এ জন্য মানুষ সৃষ্টির সাথে সাথে বিশ্বে একটা আলোড়নের সৃষ্টি

Dhaka University Institutional Repository

হলো, ধরার স্তব্ধতা ভেদ করে তথায় স্থানলাভ করলো ইশ্‌ক ও প্রেরণা। মানুষের স্পৃহা জীবনের -কোলে চোখ খুলে অন্য এক পৃথিবী সাথে পরিচিত হলো।

نعره زد عشق کہ خونیں جگری پیدا شُد　　حسن لرزید کہ صاحبِ نظری پیدا شُد
فطرت آشفت کہ از خاکِ جہانِ مجبور شُد　　خود گری، خود شکنی، خود نگری پیدا
خبری رفت ز گردوں بہ شبستانِ ازل　　حذر ای پردگیاں، پرده دری پیدا شُد
آرزو بے خبر از خویش بآغوش حیات　　چشم وا کردد جہانِ دگری پیدا شُد

ভাবনুবাদ:

আদম সৃষ্টি

ইশ্‌ক উচ্চস্বরে বলে উঠলো: আশিক পয়দা হয়েছে,
সৌন্দর্য কম্পিত হয়ে বললো: বুদ্ধিমান পয়দা হয়েছে।
প্রকৃতি ভয় করলো: এই অক্ষম জাহানের মাটি থেকে
এক ব্যক্তি পয়দা হয়েছে
যে নিজেকে গড়বে, ভাংবে এবং চিনবে।
*আকাশ থেকে আলম মালাকুতে খবর এলো:
সাবধান সুপ্ত রহস্য উপলদ্ধিকারী পয়দা হয়েছে।
*ছিলনা জীবনে কোন কামনা -বাসনা,
চোখ খুললো মানুষ, সৃষ্টি হলো অন্য জাহান।
*জীবন বললো: ছিলাম আগে তো জড়বাদী,
সৃষ্টি হলো এখন রুহানিয়ত প্রাচীর আকাশ থেকে। (ইকবাল -৭৯, পৃ. ৯৭)

প্রাকৃতিক শক্তির উপর আদমের আধিপত্য বিস্ময়ের কথা তাঁকে বেহেস্ত থেকে বিদায় দেয়ার সময় ফেরেশতাগণ এভাবেই বলেছিলেন:

ইকবাল তক্‌দিরের যে ব্যাখ্যা দেন, তা মানবত্মার জাগরণে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে। তিনি দেখলেন, মানব সমাজে অনেকের মধ্যে এ ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে যে, তক্‌দির পূর্ব থেকেই আল্লাহ-কর্তৃক নির্ধারিতও নিয়ন্ত্রিত। এ ছুঁতো নিয়ে দুর্বলমতি লোকেরা পরিশ্রম, কষ্ট এবং বিপদ আপদের ঝুঁকি থেকে রেহাই পেতে চায়। এ ধারণা পরিবর্তন করার জন্য তিনি তক্‌দিরের স্বরূপ বোঝাতে শুরু করেন। তিনি বলেন, মানুষের কাছে যদি কোন তক্‌দির পছন্দসই না হয়, তবে সে আল্লাহর নিকট থেকে অন্য তক্‌দির চেয়ে নিতে পারে। কারণ আল্লাহর কাছে রয়েছে অসংখ্য তক্‌দির। মানুষ নিজেই তার তক্‌দিরের স্রষ্টা। মুমিন কোন সময় তক্‌দিরের অধীন নয়। গাছপালা এবং জড় জগতই বশবর্তী হয়। মুমিনের ইচ্ছানুসারেই আল্লাহ তার তক্‌দির রচনা করেন।

خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے
خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے

বাড়াও বাড়াও আত্মার শক্তি,
শুদিবেন খোদা তোমার দ্বারে;
শুদিবেন তক্‌দির লেখার আগে
বল! কি তোমার সাধ? (ইকবাল- ১১, পৃ. ৮১)

Dhaka University Institutional Repository

عطا ہوئی ہے تجھے روز و شب کی بیتابی
خبر نہیں کہ تو خاکی ہے یا کہ سیمابی!
سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے، لیکن
تری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی!
جمال اپنا اگر خواب میں بھی تو دیکھے
ہزار ہوش سے خوشتر تری شکر خوابی
گراں بہا ہے ترا گریۂ سحر گاہی!
اسی سے ہے ترے نخلِ کہن کی شادابی!
تری نوا سے ہے بے پردہ زندگی کا ضمیر
کہ تیرے ساز کی فطرت نے کی ہے مضرابی!

অনুবাদ:

দেয়া হয়েছে তোমাকে নিত্য প্রেরণা,
জানিনা, তুমি কি মাটির তৈরী, না-কি পারদের
*শুনেছি, মাটি হতে আবির্ভাব তোমার,
রয়েছে কিন্তু তোমার স্বভাবে চাঁদ- তারা চাকচিক্য।
*দেখ যদি স্বপ্নেও নিজের সৌন্দর্য, তবে করবে মন
হাজার জাগর থেকে অধিক ভাল তোমার কুসুম নিদ্রা।
*তোমার ভোরের কান্না অধিক মুল্যবান
এতে হবে তোমার জীবনের পুরনো বৃক্ষের সজীবতা।
*হয়েছে উন্মোচিত তোমার গানে জীবন রহস্য,
করেছে প্রকৃতি তোমার বীণা বাজানোর কাজ। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৭৭)

মানুষের, মধ্যে প্রকৃতির বিরূপ শক্তিকে বশ করার ক্ষমতা বিদ্যমান আছে। এই ক্ষতিকর দিককেও সে হার মানায়। মানুষ যদি ন্যায় পথ থেকে প্রাকৃতিক শক্তিকে কব্জায় আনতে পারে, তবে বলতে হবে-তাঁর সুপ্ত শক্তিরই বিকাশ ঘটলো। যে মানুষ তার সুপ্ত ক্ষমতার বিকাশ ঘটাতে পারে, সে তার তক্‌দির ও গড়তে পারে। তক্‌দির খোদা গড়েন নাকি মানুষ-এ জটিল প্রশ্ন পূর্বে ও ছিল, আর এখনো রয়েছে। মানুষ তার ইচ্ছা ও কর্মে সক্ষম,না অক্ষম-এটা যেমন ধর্মের সমস্যা, তেমনি দর্শনের ও সমস্যা।

কুরআনে আছে:

انا كل شئ خلقه بقدر

[আমি প্রত্যেক বস্তুকে একটা নির্ধারিত পরিমাপে সৃষ্টি করেছি।] (৫৪: ৪৯)

হাদিসে আছে:

Dhaka University Institutional Repository

جف القلم بما هو كائن

[যা হবার আছে, তা লেখার পর তক্দিরের কলম শুকিয়ে গেছে।] (তাবরানী একাদশ খণ্ড, পৃ.২২৩)

কুরআন ও হাদিসের উপরিউক্ত বাণীর আলোকে 'জাবরিয়া' সম্প্রদায় বলেন যে, মানুষ অক্ষম, তার চেষ্টার কোন ফল হবে না। ইকবালের মানুষ পীর মাওলানা রুমীকে কিছু কথা বলা যাক। রুমী তাঁর মস্নবী-তে তক্দিরের বিষয়টি কয়েকটি সহজ ও বোধগম্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়েছেন। তিনি এক অগ্নিপুঁজকের কথা উল্লেখ করেন। তাঁকে কেউ মুসলমান হতে বলেছিল। অগ্নিপুঁজক উত্তরে বললো: আল্লাহ সর্বশক্তিমান, যদি তাঁর ইচ্ছা হতো, তবে আমি মুসলমান হয়ে যেতাম। তিনি যেহেতু চাননি, তাই আমি মুসলমান হতে পারিনি। মাওলানা রুমী কয়েকটি উদাহরণের মধ্য দিয়ে তার উত্তর এভাবে দিলেন-যে, কেই কোন অন্ধকে কখনো বলেনি যে, মি পথ দেখার চেষ্টা কর। কোন ব্যক্তি পাথরকে বলেনি যে, তুমি গৌণে আসলে কেন? যদি ছাদ থেকে কোন কাষ্ঠখণ্ড ভেঙ্গে কারো মাথার উপর পড়ে, তবে সে ঐ কাষ্ঠখণ্ডের কখনো দুশমন হয় না। বাতাস এসে যদি কারো মাথায় পাগরি উড়িয়ে নিয়ে যায়, তবে সে ক্ষমতা ও স্বাধীনতার অধিকারী বলে মনে করে। ''যা আল্লাহ চান, তাই হয়'-এ বাক্য দ্বারা এটা বোঝায় না যে, মানুষ হাত পা গুটিয়ে বসে থাকুক। যদি বলা হয় যে, এই মন্ত্রী যা চান তাই হয়, তবে সব মানুষই চেষ্টা করবে যে, মন্ত্রীকে খুশী করে তার কাজের পুরস্কার পাক। এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যায়,আল্লাহ যখন সবকিছুরই মালিক এবং তার হুকুম সব সময় কার্যকর, সে অবস্থায় সদা তার আদেশ পালন করাও চাওয়া-পাওয়া আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য হবে না কেন? (আব্দুল্লাহ-৩৬, পৃ. ৪৬)

এভাবে جف القلم এই হাদিস দ্বারাও আমরা আল্লাহর হুকুমের উপর আমল করার আহ্বান পাই। বস্তুত আল্লাহর কলম এ কথা লেখার পর তার কলমের কালি শুকিয়ে গেছে যে, মানুষ যদি বিপথে চলে, তবে এর ফল খারাপ হবে। যদি ঠিক পথে চলে, তবে তার ফল ভালই হবে। আল্লাহর কলম এ কথা লেখার পর শুকিয়ে গেছে যে, যদি তুমি চুরি কর তবে তোমার হাত কাটা যাবে। যদি তুমি মদ পান কর, তবে এর ফল খারাপই হবে। যদি কেউ ভাবে যে, যা হবার আছে, তা লিখে খোদা বেকার হয়ে বসে পড়েছেন, তবে এটা হবে তার নিতান্ত ভুল। এর অর্থ এই যে, অন্যায়ের শাস্তি, আর ন্যায়ের ফল হবে جف القلم পুরস্কার-একথা লেখার পর আল্লাহর কলম শুকিয়ে গেছে। আল্লাহ কুরআনে অন্যত্র বলেন:

ويرزقه من حيث

[এবং আল্লাহ তাকে তার ধারণাতীত উৎসথেকে রিযিক দান করবেন। (৬৫: ৩)

কতক লোক ঐ আয়াতের আলোকে এই অর্থে উপনীত হন যে, আমাদের চেষ্টা আবশ্যক, কারণ আল্লাহ তো এমনভাবে রিযিক দেন, যা আমাদের কল্পনাতীত। এ সম্পর্কে মওলানা রুমী লিখেছেন: আমাদেরকে অবশ্যই রুজির চেষ্টা করতে হবে। মনে করুন, কোন দর্জি যদি দর্জিগিরি করে স্বচ্ছন্দ রিযিক না পায়, তবে সে জহুরীর কাজে লেগে যাবে এবং ভালভাবেই রিযিক পাবে। অথচ এই পেশা ইতিপূর্বে তাঁর কাছে ছিল অপ্রত্যাশিত। দর্জিগিরিতেও সে পরিশ্রম করেছিল, অথচ সেই পরিশ্রমে আশানুরূপ রিযিক সে পায়নি।

মাওলানা রুমি আরো বলেন,আমরা খারাপ কাজ করে লজ্জিত হই। এটাই মানুষের ক্ষমতার প্রমাণ। আমাদের জন্য যদি কেবল একটি পথই খোলা থাকতো, অর্থাৎ আমরা অক্ষম হতাম। তবে লজ্জার কি প্রয়োজন ছিল? আদ্যোপান্ত কুরআন আদেশ-নিষেধ এবং শাস্তিও পুরুস্কারের আয়াত ভরপুর। মানুষ যদি ক্ষমতা ও স্বাধীন ইচ্ছার অধিকারী না হতো, তবে এসব আদেশ নিষেধ এবং শাস্তি পুরুস্কারের ওয়াদা কোন মূল্যই থাকতো না। প্রত্যেকেই তার কর্মের শাস্তি ও পুরুস্কার পুরোপুরি পাবে এ কথা কুরআনে বারবার বলা হয়েছে । (যরীফ-৮০, পৃ. ২৪২-২৪৮)

The Religious Reconstruction of Islam'গ্রন্থে তক্‌দির সম্পর্কে ইকবাল বলেন, তক্‌দির প্রশ্নে মুসলমান-মুসলমান উভয় সম্প্রদায়ই ভুল বুঝেছে। কুরআন কারীমের ভাষায় তক্‌দির শব্দে একমাত্র ঐ যামানা' কে-ই বোঝানো হয়েছে যা বর্তমানে সম্ভাব্য এবং যা এখনো বাস্তব রূপ লাভ করেনি। আমরা যদি যামানার ঐ অবস্তার প্রতি দৃষ্টিপাত করি, যখন তার সম্ভাবনাগুলোর পুরোপুরো প্রকাশ ঘটেনি, তবে সেই অবস্থাকেই বলা হবে তক্‌দির। অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

وخلق كل شيئ فقدره تقديرا

[তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, এবং প্রত্যেককে পরিমিত করেছেন যথাযথভাবে] (:২৫: ০২)

এর অর্থ হলো আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর স্বভাবে এমনসব সম্ভাবনা রেখে দিয়েছেন,যা বহিস্থ কোন চাপ ছাড়াই বাস্তবে রূপায়িত হয়ে থাকে। অন্যত্র ইকবাল লিখেছেন, ''আমরা যদি তক্‌দিরের প্রচলিত ধারণা অনুযায়ী এ কথা মেনে নেই যে, মনুষ্য-জীবন ও বিশ্বের সব কিছুরই তক্‌দির পূর্ব নির্ধারিত, তবে শুধু মানুষের আযাদী-ই নয়,আল্লাহর আযাদী ও বিপন্ন হবে। এ পরিস্থিতিতে আমাদের পৃথিবীটা আযাদ, দায়িত্বশীল ও নীতিবান মানুষের উপযোগী হবে না, তা শুধু হবে কাঠপুতুলের খেলাঘর'(যরীফ-৮০ পৃ.২৪৯)

ইসলামি তমুদ্দনে ব্যক্তিগত দায়িত্বের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এতে আমাদের কর্মশক্তি জাগ্রত হয়; কর্মেও নব নব ক্ষেত্র ও উৎস সৃষ্টি হয়; মানুষ নতুন নতুন সত্য উদঘাটন করে। মানুষের এই ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা রক্ষার ভার আল্লাহ তার উপরই ন্যস্ত করেছেন। আল্লাহ সত্য অসত্য পরখ করার বিবেক-বুদ্ধি মানুষের স্বভাবেই নিহিত রেখেছেন।

মানুষের স্বাধীন ইচ্ছার কথা কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে:

فالهمها فجورها و تقوها

[অত:পর আল্লাহ তাকে তার অসৎকর্মও সৎকর্মের জ্ঞান দান করেছেন।] (৯১: ০৮)

আল্লাহ মানুষের প্রকৃতির মধ্যে নেক-বদের জ্ঞান দান করেছেন; ভাল মন্দ পরখ করার ক্ষমতা তথা বিবেক বুদ্ধি অর্পণ করেছেন। যামানার স্বরূপ উদঘাটনের উপর ইকবাল বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন এবং বিষয়টি পরিষ্কার করার জন্য তিনি কুরআন থেকে কয়েকটি আয়াত পেশ করেছেন। এ গুলোর অন্যতম হলো:

يقلب الله الليل والنهار

[আল্লাহ দিবস রাত্রির পরিবর্তন ঘটান।] (২৪:৪৪)

আল্লাহ এ সম্পর্কে আরো বলেন:

وهو الذى جعل الليل والنهار خلفة

[তিনি সর্বশক্তিমান, যিনি রাত দিনকে বানিয়েছেন, এগুলো একের পর এক আসা-যাওয়া করে।] (২৫ : ০৬)

কুরআন করীমের এসব আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, দিন রাতের পরিবর্তনের মধ্যে আল্লাহর ক্ষমতার সর্বাদিক গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন রয়েছে। যামানার নীরব ও রহস্যময় প্রবাহের মধ্যে আল্লাহর শক্তিমত্তার জবরদস্ত নিদর্শন রয়েছে। আমরা এ শক্তিমত্তা রাত দিনের পরিবর্তনের মধ্যে লক্ষ্য করে থাকি। যামানার শক্তিমত্তা এজন্যই বুঝতে হবে যে, এর সাথে তক্‌দিরের সরাসরি সম্পর্ক রয়েছে। এ যামানাই মানুষের সুপ্ত সম্ভাবনাগুলোকে বাস্তবরূপে রূপায়িত করে।

এ জন্য নবীজী বলেছেন:

لا تسبوا الدهر فان الدهر هو الله

[যামানাকে মন্দ বলোনা। নিঃসন্দেহে যামানা হলো আল্লাহ।] (ফাতহুল বারী-৮১, পৃ. ৫৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

(যেহেতু সব ঘটনা কাল প্রবাহে ঘটে থাকে এবং আল্লাহ-ই ঘটিয়ে থাকেন, সেই অর্থে আল্লাহ ও কাল সমার্থক। তাই হাদীসে বলা হয় হয়েছে: 'কালকে মন্দ বলো না। কারণ কালই আল্লাহ।)''

যামানার রেখা পূর্ব থেকে অংকিত থাকে না। এই রেখার প্রয়োজন সব সময়ই বিদ্যমান থাকে এবং এতদ্বারাই জীবনের সম্ভাবনাগুলো বাস্তবে পরিণত হয়। এই রেখা কাল প্রবাহের সাথে সাথে অংকিত হতে থাকে| ভবিষ্যত পূর্ব থেকে নির্ধারিত থাকে না, বরং সম্ভাবনার আকারে বিদ্যমান থাকে এবং কার্য-কারণের সাথে সাথেই তা সৃষ্টি হয়। যামানা পৃথক পৃথক মুহূর্ত দ্বারা গঠিত হয় না। কাল একটানা প্রবাহমান; এর মধ্যে ফাঁক ও বিরতি নেই কুরআনে তক্‌দির শব্দ দ্বারা এই যামানাকেই বোঝানো হয়েছে। যামানার সম্ভাবনাগুলোর বাস্তবরূপ লাভ করার পূর্বাবস্থার নাম তক্‌দির। আজ ও কালের পার্থক্য আমরাই সৃষ্টি করেছি এবং নিজ হাতে নিজের কারাগার তৈরী করেছি। (যরীফ-৮০ পৃ. ২৫২-৫৩)

وقت را مثل مکان گسترده امتیاز دوش وفردا کرده
ای چو بورم کرده از بستان خویش ساختی از دست خود زندان خویش
زندگی از دہر و دہر از زندگی است لا تسبوا الدهر فرمان نبی صلی الله علیه السلم است

তুমি সময়কে স্থানের মত ছড়ানো বস্তু মনে করেছ ;
গতকাল ও আগামী কালের মধ্যে পার্থক্য করেছ
রে বোকা নিজ বাগান থেকে খোশবু হয়ে উড়ে গেছ;
নিজ হাতে নিজের জন্য কারাগার গড়েছ।
জীবন বলতে কালকে বোঝায়, কাল বলতে জীবনকে বোঝায়।
নবীজীর (স;) ফরমান হলো:
যামানাকে মন্দ বলো না। (ইকবাল -৫, পৃ. ৮২)

মানুষ সময়ের এই পার্থক্যের উর্ধ্বে উঠতে পারলেই তার হাতে তা তলোয়ারে পরিণত হয়। ইমাম শাফেই বলেন: আল ওয়াকতু সাইফুন তথা সময় তরবারিস্বরূপ। মোটকথা কোন মানুষের তক্‌দির অটল ও নির্ধারিত এমন কিছু নয়, যা বাহির থেকে বাধ্যতামূলকভাবে তার উপর চাপানো রয়েছে। বরং তা হলো সেই অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সম্ভাবনার নাম, যা মানুষের স্বভাবের গভীরে সুপ্ত থাকে এবং অভ্যন্তরীণ অবস্থা ও সম্ভাবনার নাম, যা মানুষের যদি কোন বাস্তবতা থাকে এবং তা কেবল মুহূর্তসমূহের পুনরাবৃত্তি না হয়, তবে বাস্তবের মতই এর ক্ষণে ক্ষণে কিছুনা কিছু মানুষকে সৃষ্টি করতে হবে| মানুষ নিজের তক্‌দির নিজেই সৃষ্টি করে- এ সম্পর্কে ইকবাল আরো বলেন:

যামানার প্রতি অভিযোগ ঐ ব্যক্তিই দাঁড় করায়, যে শক্তি ও আমল থেকে বঞ্চিত:

مردے حوصلہ کرتا ہے زمانے کا گلہ
بندہ حر کے لئے نشتر تقدیر ہے نوش!

অপছন্দের তক্‌দিরকে মানুষ বদলে নিতে পারে এর জন্য তার নিজের মধ্যে উপযুক্ত পরিবর্তন আনতে হবে।
অনুবাদ:

কালের অভিযোগ করে সাহসহীন লোক,

Dhaka University Institutional Repository

মেনে নেয় আযাদ বান্দা তক্‌দিরের ঘাতকে পানীয়রূপে। (ইকবাল –১১, পৃ. ১৭৫)

এরূপ সাহসহীন লোকই তারার আবর্তনের মধ্যে নিজের ভাগ্য সন্ধান করে।জ্যোতিষীর কর্মকাণ্ড নাকচ করে ইকবাল বলেন:

ستارہ کیا مری تقدیر کی خبر دے گا

وہ خود فراخیِ افلاک میں ہے خوار وزبوں!

কি খবর দেবে নক্ষত্র আমার তক্‌দিরের
নিজেই অসহায় তারা বিস্তীর্ণ গগনে
(মানুষ জ্যোতির্বিদের কাছে নিজের তকদির
জানতে চায়। ইকবাল বলেন, নক্ষত্র কি খবর
দেবে মানুষের তক্‌দিরের? তারা নিজেরাই বিস্তীর্ণ
আকাশে অসহায় বেড়ায়। (ইকবাল -১১, পৃ. ৪৩)

তা করতে পারলে মানুষ ঐ স্থানে উপনীত হতে পারবে, যেখানে হাততো তার নিজেরই থাকে, কিন্তু তাতে আল্লাহর শক্তি কাজ করে থাকে। বদরের যুদ্ধে মুসলমানের বিজয় কিভাবে সুচিত হলো, সে সম্পর্কে আল্লাহ নবীজীকে বলেন, কঙ্কর তো তুমি নিক্ষেপ করনি, বস্তুত কঙ্কর ছুঁড়েছিলেন আল্লাহ।
কুরআন বলেন:

وما رميت اذ رميت ولكن الله رمي

[তুমি যখন কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলে, তখন তুমি নিক্ষেপ করনি,
আল্লাহ-ই নিক্ষেপ করেছিলেন। (০৮: ১৭)

ইকবাল বলেন:

ہاتھ ہے اللہ کا بندہ مومن کا ہاتھ

غالب و کار آفریں کارکشا کارساز

অনুবাদ:

মুমিন বান্দার হাত, আসলে আল্লাহর-ই হাত,
এই হাতবিজয়ী, কর্মসৃষ্টিকারী, সমস্যা সমাধানকারী,
কর্ম নিয়ন্ত্রনকারী। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৩২)

ইকবাল অন্যত্র বলেন:

تری خودی میں اگر انقلاب ہو پیدا

عجب نہیں ہے کوئی چار سو بدل جائے

অনুবাদ:

সৃষ্টি হয় যদি বিপ্লব তোমার খুদীতে,
বিচিত্র নয় যদি তাতে বদলে যায় চারদিক। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৬৭)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষ নিজের ভাগ্য নিজে পরিবর্তন করলে আল্লাহর হুকুম সীমাবদ্ধ হয় না। কারণ এ পরিবর্তন আল্লাহর নির্দেশেই সংঘটিত হয়, আর এ কাজটি আল্লাহর জ্ঞানে পূর্ব থেকেই মওজুদ থাকে। এরূপ পরিবর্তন আনতে হলে মানুষকে সেরূপ প্রস্তুতি নিয়ে অগ্রসর হতে হবে। একবার কেউ নবীজীকে জিজ্ঞেস করলেন, আমরা যে রোগমুক্তির জন্য ঔষধ সেবন করি, তা কি আল্লাহর তক্দিরকে পরিবর্তন করতে পারে? উত্তরে তিনি বললেন, এটাও আল্লাহর নির্ধারিত তক্দির অনুযায়ী হয়।

তক্দিরের পরিবর্তন কেবল ব্যক্তিগত পর্যায়ে নয়, জাতীয় পর্যায়ে ও এই পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। কুরআন মজীদে আছে:

ان الله لا يغير ما بقوم حتي يغيروا بانفسهم

[আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থার পরিবর্তন করেন না,।
যতক্ষণ না তারা নিজের অবস্থা নিজেই পরিবর্তন করে। (১৩:১১)

মানুষ তার চারপাশের বিশ্বের সুপ্ত আকাঙ্খায় শরীক হয়ে নিজের ও বিশ্বের তক্দির প্রস্তুত করবে এটাই আল্লাহর কাম্য। সে কখনো বা নিজেকে বিশ্ব মোতাবেক করে গড়ে তুলবে, আবার কখনো বা বিশ্বকে নিজ মন মত করে প্রস্তুত করে নেবে। তবে শর্ত হলো-নিজের সুপ্ত শক্তিগুলোকে প্রকৃতির সাথে লড়াই করে বাস্তবে আনতে হবে। ইকবাল বলেন:

اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے
سر آدم ہے ضمیر کن فکاں ہے زندگی

অনুবাদ:

নিজের দুনিয়া নিজেই সৃষ্টি কর,যদি তুমি জীবন্ত হও,
এখানেই রয়েছে মানব জীবন রহস্য, সৃষ্টির মধ্যেই রয়েছে জীবন। (ইকবাল -১১, পৃ.২৯৩)

তকদির সম্পর্কে ইকবালের ধ্যান ধারণার সারকথা হলো তক্দির নির্ধারিত হওয়ার মানে- প্রকৃতির আইনুকানুন নির্ধারিত হওয়া, যার কখনো ব্যত্যয় ঘটে না। সুতরাং প্রকৃতির আইন কানুনের অনুসারী হয়ে মানুষ নিজেই তার তক্দির গড়বে অথবা ভাংবে।

ইসলামে সমাজ ও ধর্মনীতি পরস্পর সম্পৃক্ত:

ربنا اتنا في الدنيا حسنه و في الاخره حسنه

[হে প্রতিপালক আমাদের দুনিয়াতে মঙ্গল দান কর এবং পরকালেও।] (১:২০১)

আল্লাহ মুমিনের এই দোয়া শিক্ষা দিয়েছেন যে, তোমরা আমার কাছে দুই জাহানের মঙ্গল প্রার্থনা কর।

Dhaka University Institutional Repository

فاتهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الاخره

[আল্লাহ তাদেরকে রাহে জান কুরবান করার জন্য প্রস্তুত, আল্লাহ তাদের দুনিয়া ও আখিরাত উভয় জাহানের পুরস্কার দিয়ে থাকেন।] (৩ : ১৪৮)

وما ارسلنك الا رحممة للعلمين

আমি আপনাকে বিশ্ববাসীর জন্য পরিপুর্ণ রহমত স্বরুপ প্রেরণ করেছি। (২১: ১০৭)

من كان يريد حرث الاخره نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا
نوتيه منها وما له في الاخرة من نصيب

[যে কেউ আখিরাতের ফসল কামনা করে, তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দেই এবং যে কেউ দুনিয়ার ফসল কামনা করে, আমি তাকে ওর কিছু দেই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবে না।] (২৬:২০)

নবীজী বলেন:

الدين والدنيا توامان

[দ্বীন ও দুনিয়া হলো যমজ সন্তানের ন্যায়।]

দ্বীন এবং রাজনীতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দিকে আল্লামা ইকবাল ইঙ্গিত করে বলেন,

‘In Islam God and universe, spirit and mastter, churgh and state are organic to each other. (ইলাহাবাদের ভাষণ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০ ঈঃ)

আল্লামা ইকবাল ইসলামি সংগ্রামের রূপরেখা চিত্র তুলে ধরেছেন এভাবে,]

It has been said that Islam is a religion which implies a state of war and can thrive only in a state of war. Now,there can be no denying that war is an expression of the energy of nation; a nation which cannot fight cannot hold its won sword in the strain and strees of selective competition, which constitutes an indispensable condition of all human progress: Defensive war against unbelievers is wholly unauthorized by the Holy book of islam. Here are the words of the Quran.

Summon them to the words of the lord with wisdom and kindly warning,dispute them in the kindest manner.say to those who have been given the book and to the ignorant: Do you accept Islam? Then,if they accept Islam they are guided a right:but if they turn away then the duty is only preaching ;and Good’s eye is His servants.’’(ইসলাম -৮২, পৃ. ১৩)

All the wars undertaken during the life-timeof the Prophetwere defensive.’’

অর্থাৎ দীন ও দুনিয়া পরস্পর অঙ্গাঅঙ্গিভাবে সম্পৃক্ত। একটা ছাড়া অপরটা মেলে না। দ্বীন ছাড়া দুনিয়া লাভ করা যায় না। পক্ষান্তরে দুনিয়া ছাড়া ধর্ম টিকিয়ে রাখা যাবে না। কুরআনের উপরিউক্ত আয়াত ও হাদীসের বাণীতে প্রতীয়মান হয় যে, দুনিয়া ও আখিরাত পরস্পর সম্পৃক্ত। আল্লাহ মানুষকে দুজাহানের কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। তিনি দুনিয়ার সব কাজের সাথে দ্বীনের সম্পর্ক রেখেছেন যে ব্যক্তি শুধু দুনিয়া চায়, সে নিজেই নিজের ক্ষতি সাধন করে। সুতরাং এটা বোঝা যায় যে, দুনিয়া ও আখিরাতের সম্পর্কের ন্যায় রাজনীতি ও ধর্মনীতি হবে পরস্পর সম্বন্ধ বিশিষ্ট। একটা অপরটার হেফাযত করবে। ধর্মনীতি দ্বারা রাজনীতি সঠিক পথে

পরিচালিত হবে। এতে শাসক শ্রেণী জোরজুলুম এবং ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত থাকবে। আইন রচয়িতাগণ ধর্মবিরোধী আইন রচনা থেকে বিরত থাকবে। অন্যদিকে রাজনীতি দ্বারা ধর্ম বলীয়ান হবে| ধর্মীয় আদেশ-নিষেধের বাস্তবায়নে ধর্মসম্মত রাজনীতি সহায়কের ভূমিকা পালন করবে। নবীজীকে আল্লাহ তায়ালা ধর্মনীতি ও রাজনীতি উভয়ের সমন্বয় সাধনকারীরূপে পাঠিয়েছেন। তিনি একাধারে ধর্ম প্রধান ও ছিলেন, আবার ইসলামি রাষ্ট্রপ্রধানও ছিলেন। খুলাফায়ে রাশিদীনও তদ্রুপ ছিলেন। নবীজী একাধারে ধর্মপ্রধান ও রাষ্ট্রপ্রধান এবং ধর্মনীতি ও রাজনীতির সমন্বয় সাধনকারী ছিলেন|

ইকবালের মতে ধর্ম ও রাজনীতি দুটি শক্তি একটি অপরটির সম্পূরক। তার ভাষায়-

آن دو قوت حافظ یک دیگراند   کائنات زندگی را محورا ند

ধর্ম ও রাজনীতি-দুটি শক্তি, একটি অপরটির পরিপূরক
জীবন-বিশ্বের জন্য এ দুটি হলো মেরূরেখা স্বরূপ। (ইকবাল—৫, পৃ. ১৮২)

যরবে কলীম গ্রন্থের একটি কবিতায় ধর্মহীন রাজনীতিকে ইকবাল ভুতের কন্যা ও পংকিল মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন এবং রাজনীতির কাণ্ডারীদিগকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলাম ধর্ম ওরাষ্ট্রের এই দ্বৈতবাদকে চূর্ণ করে মানব জীবনের স্বাভাবিক একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং রাষ্ট্রশক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধকে পরস্পরের সহিত ওতপোতভাবে জড়িত করে দিয়েছে।

یہ اعجاز ہے ایک صحرا نشیں کا   بشیری ہے آئینہ دار نذیری
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی   کہ ہوں ایک جنیدی و اردشیری

এ হচ্ছে এক মরূবাসীর কৃতিত্ব
মানবরূপেই তিনি হয়েছেন
মানবতার পথ প্রদর্শক|
তারই আদর্শ হচ্ছে মানবতার রক্ষাকবচ
একই ব্যক্তির মধ্যে হয় শাহী ও দরবেশীর সংমিশ্রণ| (ইকবাল–১১, .পৃ . ১৫৪)

ইকবাল বলেন:

جلال پادشاہی ہو کہ جمہوری تماشا ہو   جدا ہو دیں سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

প্রতাপশালী রাজতান্ত্রিক সরকার হোক বা গণতান্ত্রিক সরকারই হোক,
রাজতান্ত্রিক থেকে ধর্মকে বাদ দিলে তা পরিণত হবে চেঙ্গিসখানিতে। (ইকবাল -১১, পৃ. ৬২)

এর পিছনে ইকবালের যুক্তি হলো-ধর্মনীতি রাজনীতিকদেরকে ক্ষমতার অপব্যবহার থেকে বিরত রাখবে, সঠিক পথনির্দেশ দিবে, অবিচার-অত্যাচার থেকে তাদের দূরে সরিয়ে রাখবে| ধর্মীয় স্প্রীরিট তথা সুস্থ বিবেক মানুষের মাঝে অতন্দ্র প্রহরীর কাজ করে| যখনই মানুষ অন্যায় পথে পা বাড়াবার ইচ্ছা করে, তখনি তা সামনে এসে দাঁড়ায়, তাঁকে অন্যায় পথ থেকে বারণ করে। রাজনীতিকদের বেলায়ও নৈতিকতা ও ধর্ম অনুরূপ কাজই করে থাকে।

ইকবাল লক্ষ্য করলেন, ইউরোপের রাজনীতি হলো জড়োবাদধর্মীও নীতি বিবর্জিত এ জন্য তাঁর কাছে এ রাজনীতি ছিল অপছন্দনীয়। তিনি স্বচক্ষে দেখলেন, রাজনীতির পাশে ধর্ম না থাকায় তথায় হানাহানিও

Dhaka University Institutional Repository

সম্প্রসারণবাদ চলছে। তিনি মনে করেন, জড়বাদধর্মী রাজনীতি হোক বা আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত সংস্কৃতিই হোক, তা জাতির ধ্বংস ডেকে আনে।

ইসলামের জীবন দর্শন হলো-মুমিনের জীবনে বস্তুবাদ ও অধ্যাত্মবাদের সমন্বয় থাকবে; ব্যক্তি জীবনেও এই সমন্বয় সক্রিয় ও কার্যকর থাকবে। সুতরাং রাজনীতিকদের রাজনীতি কিভাবে ধর্মনীতি বিবর্জিত হতে পারে? আমরা বর্তমান ইউরোপ ও আমেরিকায় দেখতে পাচ্ছি যে, সেখানকার রাজনীতি ধর্ম-বিবর্জিত হওয়ায় তা মানবতার জন্য হুমকি হয়ে দাঁড়িয়েছে। (আব্দুল্লাহ-৮৩, পৃ. ৬৬)

ইসলাম নিছক বস্তুবাদকে স্বীকৃতি দেয় না; স্তুবাদের সাথে অধ্যাত্মবাদ অবশ্যই থাকবে ; এই দুইয়ের সমন্বয়ে গড়ে উঠবে ইসলামি জীবন। সর্বত্র ও সবসময় শিক্ষা ও কর্মের সাথে নীতির সংযোগ থাকবে। সুতরাং রাজনীতি ও ধর্মের সম্পর্ক হবে তদ্রুপ। ধর্মছাড়া রাজনীতি করলে তা বিপদগামী হবে। ধর্মের অস্তিত্ব আদম (আ:) এর কাল থেকেই বিদ্যমান আছে; রাজনীতির জন্ম হয়েছে ধর্ম ও সমাজের যথাযথ পরিচালনা এবং ধর্মনীতির ন্যায়ানুগ প্রয়োগের জন্যই পরবর্তী সময় রাজনীতি গড়ে উঠেছে। উপরে লিখিত ইকবালের শে'র এর মর্মও তাই। অল্প কথায় সত্যপরায়ণ রাজনীতির জন্য ধর্ম অবশ্যই রাজনীতির পাশাপাশি চলবে।

একই ব্যক্তি হবে জুনায়েদ বাগদাদী ও সাসানী শাসক আরদাশীর।
ইকবালের মতে ধর্ম ও রাজনীতি -দুটি শক্তি: একটি অপরটির পরিপূরক ।

তাঁর ভাষায় বলতে গেলে:

ইকবাল অন্যত্র বলেন: আল্লাহর ইচ্ছা হলো দিশারীগণ ধর্ম ও রাজনীতি উভয়টারই সমন্বয় করুক, উভয়টার জন্যই চেষ্টা করুক। দেশ ও শাসন ক্ষমতাকে যদি একটা দেহ ধরে নেয়া হয়, তবে ধর্ম হবে তার জন্য রুহ তথা আত্মাস্বরূপ। রুহ না থাকলে যেমন কায়া প্রাণহীন হয়ে পড়ে, তেমনি ধর্ম ছাড়া রাজনীতি হবে অর্থহীন, নীতি বিবর্জিত ও কলুসিত। এজন্য উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক থাকা জরুরী।

ইকবাল কলেন:

ایں نکته کشائندہ اسرار نهان است
ملک است تن خاکی و دین روح روان است

অনুবাদ:

কথাটি গোপন রহস্য প্রকাশের মতই
দেশ মাটির কায়া, আর ধর্ম কার্যকর প্রাণ। (ইকবাল-৫, পৃ. ১১৭)

রাজনীতির পাশাপাশি ধর্ম না থাকলে, অন্য কথায় একটি অপরটি হতে বিচ্ছিন্ন হলে যে ক্ষতি সাধিত হয়। তা বলতে গিয়ে ইকবাল বলেন,মজদুর পরিচারিত গর্ভণমেন্ট হোক বা পুঁজিবাদী সরকার হোক বা গণতান্ত্রিক হুকমতই হোক কিংবা এক নায়কত্ব শাসনই হোক সর্বাবস্থায় তা চেঙ্গিসখানি শাসনে পর্যবেসিত হবে, যদি রাজনীতির পাশে ধর্ম না থাকে। ধর্ম না থাকলে তা হবে অবিচার অত্যাচারের আখড়া; ক্ষমতাসীন দল বিরোধী দলের উপর চড়াও হবে :মানসিক স্বাধীনতা, ব্যক্তিগত আযাদী সবই লোপ পাবে ।

অতীতে রাজনীতি ধর্ম-বিবর্জিত ছিল না,বরং দেশ শাসনের সামগ্রিক চরিত্র ছিল ধর্মীয়। জার্মান সংস্কারক মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৫৬) ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করেন। রাজনীতির উপর ধর্মীয় নেতা তথা পাদ্রীদের যে, প্রভাব ছিল, তার বিলোপ সাধন করাই ছিল লুথারের উদ্দেশ্য। এ পথ ধরেই মুসলমানের মধ্যে কতক আলিম বলে থাকেন, আলিমদের রাজনীতি না করাই উচিৎ; তাঁরা ধর্ম চর্চা নিয়েই মশগুল থাকবেন।

পক্ষান্তরে মার্টিন লুথারের বিপরিত ইটালীর রাজনীতিক মেকিয়াভেলী (১৪৬৯- ১৫২৭) বলে উঠলেন, রাজনীতিকে ধর্ম থেকে বিচ্ছিন্ন রাখা হোক। তিনিই দেশভিত্তিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তার মতে ,

রাজনীতির স্বার্থে ও দেশের খাতিরে বৈধ অবৈধ যে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে অসমীচীন হবে না| ধীরে ধীরে ইউরোপীয় রাজনীতিকগণ মেকিয়াভেলীর এই নীতি বিবর্জিত দর্শনের অনুসরণ করলেন। ফলে শাসন ক্ষেত্রে দেখা দিল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যায় অবিচার| বিবর্জিত তথা নীতি বিচ্যুতি শাসনই প্রচলিত রয়েছে। ড. ইকবাল ইসলাম বিরোধী এই ধর্মনিরপেক্ষ ও লোকায়ত শাসন পদ্ধতির বিরূদ্ধে দৃঢ় হস্তে লেখনী পরিচালনা করেন।

ইসলাম ধর্মের পয়গম্বর একই সাথে ধর্মপ্রচারক 'এবং রাষ্ট্রপ্রধান ছিলেন। এ কারণে তাৎপর্যপূর্ণ রাজনৈতিক অগ্রগতি তাঁরই বদৌলতে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকে| বশ্যতা স্বীকার কারী বিভিন্ন গোত্রের দূতদেরকে তিনি নিজেই সংবর্ধনা জানাতেন। এছাড়া রাজস্ব আদায়ের বিভিন্ন পদে তিনিই নিয়োগ দিতেন। সেনাবাহিনী গঠন ও সেনা প্রেরণ বিষয়ে তিনি সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী এবং বাস্তবায়নকারী ছিলেন। এছাড়া তিনি আইন রচনাকারী আইন বাস্তবায়নকারী এবং সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন। ফলে তাঁর ফয়সালার বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ বা আবেদন কবুল হতো না| রাষ্ট্রপ্রধান, সেনাপ্রধান এবং বিচারপ্রধান হিসেবে তিনি প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক দায়িত্ব পালন করতেন। ওহী প্রাপ্ত রাসুল হওয়ার ফলে সবাই সর্বাবস্থায় তাঁকে মর্যাদার সিংহাসনে রাখতেন। তিনি যে সমস্ত ধর্মীয় নিয়ম নীতি বর্ণনা করতেন তাঁর অনুসারীগণ তা আল্লাহর আদেশ মনে করতেন। রাসুল (সা.) একাধারে প্রশাসক, বিচারক, নিয়ন্ত্রক, ধর্ম প্রচারক এবং নামাজ প্রতিষ্ঠাকারী হিসেবে ইমাম ছিলেন। তাঁর প্রত্যেকটি কাজ ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে খুবই উন্নত হত। (খিলাফত-৮৪, পৃ. ৩০)

নবী-রাসুল আবির্ভূত হওয়ার পর তারা যেখানেই অবস্থান করেন না কেন ধর্ম প্রচারের ঐশী দায়িত্বে কখনো বিন্দুমাত্র শিথিলতা আসতে দেননি| বিশ্বনবী হযরত মুহম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম হিদায়েত এবং ধর্ম প্রচারের কাজ শুধু মক্কাতেই জারি রাখেননি বরং মদীনায় আগমনের পর এই গুরুদায়িত্ব আরো সচেতন হয়ে যান। তাঁর পরে তাঁর অনুসারীদের উপর এ দায়িত্ব অর্পিত হয়েছে যাতে তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত ব্যক্তিদেরকে যুগে যুগে আলোর দিশা দিতে থাকে। কবি বলেন 'সততা, ন্যায়পরায়ণতা এবং বীরত্বের পাঠ অধ্যয়ণে মগ্ন হয়ে যাও, তোমার দ্বারা বিশ্ব নেতৃত্বের দায়িত্ব পূর্ণ করা হবে।

রাজনীতি ও ধর্মনীতির প্রাচীন বিতর্কে ইকবাল ধর্মহীন রাষ্ট্রের) Secular state) প্রবল বিরোধীতা করেছেন| তাঁর মতে মার্টিন লুথার খৃষ্টবাদের ভয়ানক শত্রু, কেননা তিনিই ধর্ম ও রাষ্ট্রকে দুইটি বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী বস্তু বলে ঘোষণা করেছিলেন|

ইউরোপে যে জীবন-দর্শনের প্রভাবে ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে, তার মূলে রয়েছে জড় ও আত্মার (Matter and Spirit) দ্বৈতবাদ (এই ভ্রান্ত দর্শনই মানবতার কাফেলাকে বস্তুবাদের (Materialism) ঊষার মরুতে বিভ্রান্ত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরে মরতে বাধ্য করেছে| ইকবালের দৃষ্টান্তে ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য-এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর এদের পারস্পরিক বিরোধ বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস: ইকবালের রাষ্ট্র দর্শনের দেহ ও প্রাণ-জড় ও আত্মা দুইটি অবিচ্ছিন্ন মৌলিক উপাদান| গুলশানে রাযই জাদীদ' গ্রন্থে তিনি বলেছেন:

تن وجان را د و تا گفتن کلام است   تن وجان را د وتا دیدن حرام است
کلیسا سبجه بطرس شمارد   کہ با او حاکمی کارے نہ دارد
بدن را تا فرنگ ازجان حدا دید   نگاهش کلک ودین راهم دوتا دید
بہ تقلید فرنک از خود را میدند   میان ملک و دین ربطے ندیدند

বস্তু ও আত্মার দ্বিধাবিভক্তি আপত্তিকর;
বস্তু ও আত্মাকে ভাগ করা হারাম।

গীর্জা শুধু জপমালা নিয়ে থাকলো বিব্রত,
রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক সে করলো অস্বীকার।
পশ্চিমা দর্শন গড়ে উঠলো
বস্তু ও আত্মার দ্বৈতবাদের উপর।
দৃষ্টিতে তার
রাষ্ট্র ও ধর্ম হলো স্বতন্ত্র।
পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে
এই জাতি হলো বিভ্রান্ত
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সে হলো বিস্মৃত। (আ. রহীম-২০, পৃ .৩৫)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত। আর ইউরোপে এই ধর্ম বিবর্জিত রাজনীতির প্রবর্তক হয়েছেন মেকিয়াভেলী। মেকিয়াভেলী স্পষ্ট বলেছেন: নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে চলতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রকে এর উর্ধ্বে থাকতে হবে। এজন্যে একে যে কোন পন্থা ও উপায় অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হওয়া চলবে না। অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছুমাত্র উপকারী হয়, তবে তা করতেও কোন বাধা থাকতে পারে না। বস্তুত এই ধোঁকাবাজী, প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী কর্মপন্থাকেই ইকবাল 'মেকিয়াভেলী রাষ্ট্রনীতি' বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামি নীতি অন্যান্য রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে আদর্শ বিষয়ক দিক প্রধান্য পায়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার একমাত্র অধিকার আল্লাহ তা'য়ালার। মুসলিম শাসক এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ইলাহী শাসন বাস্তবায়নের মোক্ষম উপায়। (শরীফ- ৩৮ পৃ. ৫৪)

আল্লাহর ঘোষণা হল-'আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধান দেবার কোনো অধিকার নেই।' (কুরআন-৪০, ৬৭)

দ্বীন এবং রাজনীতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে ইকবাল বলেন:

ইকবালের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়া রাষ্ট্র ও নৈতিকতার পূর্ণ সমন্বয়ে, শক্তি ও পরাক্রম এবং ফকীরী ও বাদশাহীর সামঞ্জস্য সাধনেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হযরত জুনাইদের দুনিয়া বিমুখতা ও আর্দশিরের রাষ্ট্র দখল একত্র সমন্বিত হলে চিন্তা ও কর্মের এমন এক জীবন্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠা সম্ভব, যার দরূণ মানুষ তাঁর নিয়তিকে পরিপূর্ণতা দান করতে পারে। অন্যথায় মানবতার উত্থান চরমভাবে বার্থ হতে বাধ্য। ইকবালের দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতা যে রাষ্ট্রনীতি উপাস্থাপিত করেছে তা একটি বল্গাহীন দ্বৈত্য ছাড়া কিছু নয়। যারই উপর করাল দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাই জ্বলে পুড়ে ছাঁড়খার হয়ে যায়। (আ. রহীম-২০, পৃ. ৩৬)

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لا دین کنیز اہر من و دون نہاد و مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترک کلیسا سے حاکمی آزاد فرنگیوں کی سیاست ہے دیو بے زنجیر

আমার দৃষ্টিতে বর্তমান রাষ্ট্রনীতি
ধর্মের প্রভাবমুক্ত,
শয়তানের ক্রীতদাসী নীচ প্রকৃতি,
আত্মা তার মৃত।
গীর্জার প্রভাব যখন হল বিবর্জিত
শাসন-ক্ষমতা হল মুক্ত, স্বেচ্ছাচারী
পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতি হল

Dhaka University Institutional Repository

বল্গাহীন দৈত্যের মতো। (ইকবাল -১১ পৃ. ৩২১)

রোমুযে বে খুদী ,গ্রন্থে ইকবাল লিখেছেন:

تا حکومت مسند مذهب گرفت　　ابن شجر در گاشن مغرب گرفت
قصه ئ دین مسیحائی فسرد　　شعله و شمع کلیسائی فسرد

রাষ্ট্র যেদিন দখল করলো ধর্মের মর্যাদা,
ঈসায়ী ধর্মের সেদিন হলো অবসান,
নিভে গেল গীর্জার শেষ স্ফুলিঙ্গ।
পাশ্চাত্যের বাগিচার জন্ম নিল এ বিষবৃক্ষ। (ইকবাল) -৫ পৃ. ৫১)

নবীজী বলেন:

الدین و الدنیا تومان

[দীন ও দুনিয়া হলো যমজ সন্তানের ন্যায়।]

অর্থাৎ দীন ও দুনিয়া পরস্পর সম্পৃক্ত। একটা ছাড়া অপরটা মেলে না। দীন ছাড়া দুনিয়া লাভ করা যাবে না পক্ষান্তরে দুনিয়া ছাড়া ধর্ম টিকিয়ে রাখা যাবে না। আল্লাহ মানুষকে দু'জাহানের কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (আব্দুল্লাহ-৩৬, পৃ. ৬২)

'বালে জিব্রিল' গ্রন্থে 'দুনিয়া 'ও সিয়াসত' শীর্ষক যে কবিতা তিনি লিখেছেন, তাকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সূক্ষ্ম ও জরূরী সম্পর্কের প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরূত্ব আরোপ করেছেন:

ہوئی دین ودولت میں جس دم جدائی　　ہوس کی امیری ہوس کی وزیری
دوئی ملک ودین کے لئے نامرادی　　دوئی چشم تہذیب کی نابصیری

ধর্ম ও রাষ্ট্র যেদিন হলো স্বতন্ত্র
সর্বত্র কায়েম হলো লালসার আধিপত্য।
রাষ্ট্র ধর্ম উভয়েরই হলো ব্যর্থতার সূচনা,
এই স্বাতন্ত্রই হলো সভ্যতার অদূরদর্শিতার প্রমাণ। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৬০)

The Reconstruction of Religious thought in Islam গ্রন্থে ইকবাল বলেন:

Islam as a polity is only a practical means of making this principle (of tawhid)a factor in the intellectual and emotional life mankind. It demands loyalty to God and not to thrones .And since God is the ultimate spiritual basis of all life . loyalty to God actually amounts to man's loyalty to his own ideal nature.

এই তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব (নীতিকে মানুষের চিন্তাজগতে ও ভাবজগতে জীবন্ত রূপ দেয়াই কার্যত ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রবিধানের সবচেয়ে বড় কাজ। ইসলাম দাবি করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য কোন , সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। আর যেহেতু আল্লাহই সমগ্র জীবজগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল বিদান, আল্লাহর প্রতি বস্তুত মানুষের আপন আদর্শ প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যের নামান্তর। (ইসলাম ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন)

ইকবাল কোন রাষ্ট্রকেই নৈতিক নিয়ম-বিধান হতে মুক্ত দেখতে প্রস্তুত নন। তাঁর মতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নৈতিক বিধানের অধীন ওঅনুগত হতে হবে। অন্যথায় মানবতার চরম বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ইকবালের মতে মানবতাকে এই ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা। মহাকবি ইকবাল ইসলাম-বিরোধী এই ধর্ম নিরপেক্ষ ও লোকায়ত শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে লেখনী পরিচালনা করেন।

ইকবাল দর্শনে ইসলামের ন্যায়পরায়ণতা ও অনুকম্পা:

ان الله يامركم بالعدل والاحسان

(নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে ন্যায়পরায়ণ ও সুন্দর আচরণের নির্দেশ দিচ্ছেন।) (আন্ নাহ্ল : ৯০)

Dhaka University Institutional Repository

আদ্‌ল আরবি শব্দ এর আভিধানিক অর্থ ভারসাম্য রক্ষা করা। ইনসাফ বা ন্যায়বিচার করা। আদ্‌ল বা ন্যায় বিচাকের মধ্যে তক্ওয়া থাকে। তিনি আল্লাহকে ভয় করেন, মনে করেন তার বিচারকার্যের জন্য তাঁকে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে। সুতরাং তিনি সুবিচার করে থাকেন এ সম্পর্কে আল্লাহ বলেন-

اعدلوا (قفه) هو اقرب للتقوي

[তোমরা আদল কায়েম কর এটি তাক্ওয়ার অতি নিকটবর্তী।] (কুরআন: ৫:৮)

হাদীসে আছে-কিয়ামতের দিন যখন আল্লাহর আরশের ছায়া ব্যতীত অন্য কোন ছায়া থাকবে না, তখন ন্যায়পরায়ণ ব্যক্তিকে আল্লাহর আরশের ছায়ায় আশ্রয় দেওয়া হবে।

তুরস্কের সুলতান মুরাদ ও এক রাজমিস্ত্রি ছিলেন। সেখানকার খাজারাদ শহরের সুলতান মুরাদের আদেশে তিনি একটি মসজিদ নির্মান করেছিলেন। মসজিদটি সুলতানের পছন্দসই হয়নি। তিনি রুষ্ট হয়ে আদেশ দিলেন যে, ঐ রাজমিস্ত্রি কাজীর কাছে বিচার চেয়ে বললেন, আমি তো কারো দাস নই। আমি আপনার আদালতে এসেছি। আপনি কুরআন মজীদের আদেশ অনুসারে আমার মোকাদ্দমার বিচার করুন। কাজী সাহেব সুলতানকে তলব করলেন। কুরআনের বিচারের ভয়ে সুলতানের চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল। তিনি নিজ অপরাধ স্বীকার করলেন এবং বললেন, আমি আমার কৃতকর্মের জন্য লজ্জিত। কাজী সাহেব বললেন, ব্যাপারটা বুঝলাম, কিন্তু কুরআন তো 'কিসাস' (প্রতিশোধ, হত্যার শাস্তি) এর আদেশ দেয়। সুলতান কুরআনের আয়াত শুনামাত্র নিজ হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন: ''বদলা নিন।''

এ কথা শুনে বাদী আর সইতে পারলেন না। তিনি চিৎকার করে বলে উঠলেন 'আল্লাহ ও রসুলের দিকে চেয়ে আমি সুলতানকে ক্ষমা করলাম।''

ইকবাল তাঁর ''আসরার ও রুমুয'' গ্রন্থে ''সুলতান ও রাজমিস্ত্রিও কর্মকাণ্ডে ইসলামি সাম্য' শীর্ষক এক গল্পে ঘটনাটি তুলে ধরেন। গল্পটির শেষ কয়েকটি ছত্র উদ্ধৃত করলাম:

چو مراد این آیه محکم شنید   دست خویش از آستین بیروں کشید
مدعی را تاب خاموشی نماند   آیه بالعدل و الاحسان خواند
گفت از بهر خدا بخشیدمش   از برائے مصطفی بخشیدمش

অনুবাদ:

মুরাদ যখন এই অকাট্য আয়াত শুনলেন ,
তখন তিনি অস্তিন থেকে নিজ হাত বের করে দিলেন।
বাদী আর চুপ থাকতে পারলেন না,
তিনি 'বিল আদল ওয়াল ইহসান' সম্বলিত আয়াতটি পাঠ করলেন।
বললেন, খোদার দিকে চেয়ে আমি ক্ষমা করলাম;
মুস্তাফার (সা.) খাতিরে আমি তাঁকে ক্ষমা করলাম (ইকবাল-৫,পৃ. ১২৪)

ইসলামি ন্যায়বিচারের বৈশিষ্ট্য:

ন্যায়বিচার হবে কুরআন সুন্নাহভিত্তিক। এতে মাতাপিতা, পুত্র-কন্যা,আত্মীয়-অনত্মীয়, আপন-পর, উঁচু-নিচু, ইতর-ভদ্র, ধনী-ধরিদ্র, সবল-দুর্বলের ভেদাভেদ নেই, সবাই সমান। কাউকে অনুগ্রহ করতে গিয়েও কারো প্রতি নিগ্রহ করা যাবে না। এমর্মে আল্লাহ বলেন-

فاحكم بما انزل الله ولا تتبع اهوائهم عما جائك من الحق

অর্থ: ''আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন, সে অনুসারেই তাঁদের মধ্যে বিচার করবে, তোমর কাছে যে সত্য এসেছে তা পরিহার করে তুমি তাদের প্রবৃত্তি অনুসরণ করবে না। (কুরআন: ৫:৪৮)

Dhaka University Institutional Repository

বিচারাধীন ব্যক্তি নিকটাত্মীয় হলেও ন্যায় কথা বলতে হবে। এ মর্মে আল্লাহ পাক বলেন:

واذا قلتم فاعدلوا ولوكان ذا قربي

অর্থ: 'যখন তোমরা (বিচারের) কথা বল, তখন ন্যায় কথা বলবে,যদিএ (বিচারাধীন ব্যক্তি) নিকটাত্মীয় হয় I''

মহানবী (স.) ছিলেন ন্যায়বিচারের মূর্ত প্রতীক। তাঁর কাছে আপন-পর, :ধনী-দরিদ্রের পার্থক্য ছিল না, কুরাইশ বংশের এক মহিলা চুরির অপরাধে ধরা পড়েছিল I রাসুল (স) তার হাত কাটার নির্দেশ দিলেন। মহিলাটি সম্ভ্রান্ত বংশের বিধায় কেউ কেউ তার শাস্তি লাঘব করার সুপারিশ করেছিলেন। মহানবী (স) রাগান্বিত হয়ে বললেন-''আমার কন্যা ফাতিমাও যদি চুরি করত, তাহলে তারও হাত আমি কেটে দিতাম I তিনি আরো বলেন যে, ''পূর্ববর্তী জাতিগুলো ন্যায়বিচারের অভাবেই ধ্বংস হয়ে গেছে। (রহমান-৮৫, পৃ. ৬৮)

ন্যায়পরায়নতা ও নিরপেক্ষ সুবিচার পাওয়া ইসলামের একটি গুরত্বপূর্ণ দিক। মানুষের মৌলিক ভ্রাতৃত্ব ও পূর্ণ সমতার ভিত্তিতেই এই অধিকার স্বীকৃতব্য। এই অধিকারের অস্বীকৃতি মৌলিক মানবীয় ঐক্য ও সমতারই অস্বীকৃতি। সকল দিক থেকে ন্যায়পরায়ণতা ও নিরঙ্কুশ সুবিচার পাওয়ার অধিকার ইসলামে মৌলিক মানবাধিকার পর্যায়ে স্বীকৃত ও গুরুত্বপ্রাপ্ত। (ফিরোজা-৩১, পৃ.৬৯)

সামাজিক ন্যায়বিচার:

ইসলামের বিচার নীতিতে বিচারালয়ে বিচারকের সন্মুখে বাদী বিবাদী যেই হোক, সমান আচরণ পাবার অধিকারী I আদর্শবাদী রাষ্ট্রব্যবস্থায় তা রয়েছে চিরকাল। ইসলামে মানবাধিকারের ভিত্তিতে তত্ব হিসেবে সর্বপ্রথম উল্লেখ্য, আল্লাহর একত্ব ও অনন্যতা। বিশ্বলোকের স্রষ্টা ও বিশ্বমানবের স্রষ্টা এক ও অভিন্ন এবং তিনি এক আল্লাতায়ালা। মানুষ আল্লাহর বিশেষ সৃষ্টি I তিনি তার অন্যান্য সমুদয় সৃষ্টির ওপর মানুষকে অত্যধিক মর্যাদায় অভিযুক্ত করেছেন। মানুষ হলো আশরাফুল মাখলুকাত। এই দুনিয়ায় মানুষকে একটি বিশেষ দায়িত্ব দিয়ে পাঠানো হয়েছে। সে দায়িত্ব সুষ্ঠুভাবে পালনের জন্য মানুষকে দেয়া হয়েছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। সে বিধানের মূল কথা হচ্ছে, সার্বভৌম হিসেবে একমাত্র আল্লাহর আনুগত্য পাবার অধিকার মৌলিকভাবে একমাত্র আল্লাহর I কেননা তিনিই তাদের একমাত্র সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা ও রক্ষাকর্তা।

ইসলামের এই তাত্বিক ঘোষণা দ্বারা বিশ্বমানবতাকে সর্বপ্রকার অখোদায়ী কর্তৃত্বের দায়িত্ব থেকে মুক্তিদান করা হয়েছে। মানুষ কেবলমাত্র এক আল্লাহরই অধীনতা ও আনুগত্য করবে। আল্লাহ ছাড়া আর কারোরই অধীনতা ও আনুগত্য করবে না- এভাবেই চলবে তার বাস্তব ও বৈষয়িক জীবন, এটাই মানবাধিকারের মৌলিক কথা।

ইসলাম একটি বিশ্বজনীন ধর্ম এবং যেখানে দেশ-জাতি, বর্ণ পদমর্যাদা নির্বিশেষে সকল মুসলমান পরস্পর ভাই ভাই। ইসলামের ভ্রাতৃত্বের বাণীও বিশ্বজনীন I এ ভ্রাতৃত্ববোধ বিশ্বের মুসলিম অমুসলিমদের দ্বিধাবিভক্ত করে না। যতক্ষণ পর্যন্ত কোনো অমুসলিম মুসলিমের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখে এবং তাঁদের ওপর হামলা না করে, ততক্ষণ মুসলিমদের অমুসলিমদের সাথে বন্ধুত্ব বজায় রাখতে হবে। প্রাচীনকালে ইসলাম আরব, গ্রিস, রোম ও ইরানের বিভিন্ন তমুদ্দুনের মধ্যে এবং পরবর্তী সময়ে আফ্রিকা, মিশর, তুরস্ক, মধ্য এশিয়া, ভারত চীন ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন তমুদ্দুনের মধ্যে তাঁর ঐক্য ও বিশ্বজনীন প্রকৃতি কায়েম করেছে।

ইসলামি নীতি অনুসারে মানবজাতির ভ্রাতৃত্বের এই আদর্শই হচ্ছে সমাজ কায়েমের ভিত্তিস্বরূপ। ভ্রাতৃত্বের এ আদর্শ-বর্ণ, জাতি, শ্রেণি, ভাষা ও পারিবারের সংকীর্ণ গণ্ডি অতিক্রম করে গেছে। ইসলামি ভ্রাতৃত্বের ভিত্তি হচ্ছে এই মানবতাবাদ। শরিয়তের মহাকবি ড. মো. শহিদুল্লাহ বলেছেন:

'মানব সন্তান অঙ্গ প্রতঙ্গ সমান,
একই বস্তু তাদের হয় উপাদান।
কালক্রমে এক অঙ্গে যদি হয় ব্যথা,
সকল অঙ্গেতে হয় ঘোর অহিরতা,
তুমি যদি পর দু:খে না হও দু:খিত,
মানব তোমার নাম না হয় উচিত।'

এ ভ্রাতৃত্বের ছোট-বড় নেই, রাজা প্রজা নেই। নবীজি বলেছেন: 'যাকে সবাই রাজার রাজা বলে অভিহিত করত, শেষ বিচারের দিন সেই হবে আল্লাহর সর্বাদিক ক্রোধের পাত্র। আল্লাহর কাছে সেই হবে সর্বাদিক দুষ্টব্যক্তি' (হাদিস- মুসলিম)

বসওয়ার্থ স্মিথ তাঁর ''life of Mohammed'' গ্রন্থে বলেছেন, ''মুহাম্মদ (সা.) এমন এক ভাগ্য নিয়ে জন্মগ্রহণ করেছেন, যা ইতিহাস অপূর্ব। একাধারে তিনি ত্রিগুণ বিশিষ্ট প্রতিষ্ঠাতা। আর তা হলো একটি জাতির, একটি সম্রাজ্যের ও একটি ধর্মের ।

এ কথা সত্য যে, রাসুল (স) প্রকৃতপক্ষে জাতীয়তা প্রতিষ্ঠা করেননি, প্রতিষ্টা করেছেন, ভ্রাতৃত্ব। আর সে ভ্রাতৃত্বের মধ্যে রয়েছে পুর্ণাঙ্গ মানবতা। তৌহিদ, আল্লাহর রবুবিয়াত এবংসাধারণ মানবীয় উৎপত্তিগত প্রকৃতির বুনিয়াদেই গড়ে উঠেছে এ আদর্শ। আল্লাহর রবুবিয়াত বলতে তাঁর তিনটি বৈশিষ্ট্যের কথা বুঝায়: তিনি স্রষ্টা, তিনি প্রতিপালক, তিনি বিবর্তক। অনেকে মনে করেন রবুবিয়াত অর্থ প্রভুত্ব। আসলে তা ঠিক নয়। নবীজী বিদায় হজে যে ভাষণদান করেন, তাতে সমগ্র মানবজাতির উদ্দেশ্যে এ মর্মেই ইঙ্গিত দিয়েছেন।

হে মানবজাতি! নিশ্চয় তোমাদের রব এক এবং তোমাদের পিতা এক। তোমাদের প্রত্যেক আদম সন্তান এবং আদম হচ্ছেন মৃত্তিকা হতে সৃষ্ট। তোমাদের মধ্যে আল্লাহকে যে সর্বাদিক ভয় করে নিশ্চয়ই আল্লাহর কাছে সে সর্বাদিক সন্মানিত। অনারবগণের ওপর আরবগণের শ্রেষ্ঠত্ব নেই, আরবগণের ওপর ও অনারবগণের কোনো শ্রেষ্ঠত্ব নেই; কেবলমাত্র ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিই শ্রেষ্ঠ।''

পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ধর্মগুলোর মধ্যে একমাত্র ইসলামেই পৌরহিত্যবাদ নেই। প্রাচীন বিশ্বে ক্রীতদাস প্রথা ছিল, দাস শ্রমিক প্রথা ছিল। ইসলামের গণতান্ত্রিক নীতি এসব কুপ্রথার বিরুদ্ধে সোচ্চার প্রতিবাদ জানিয়েছে । ইসলামের অভুত্থাননের যুগে অপর দেশে প্রচলিত গোলাম প্রথাকে ইসলাম বিলোপ সাধনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে। নবীজি বলেছেন, ''শেষ বিচারের দিনে তিন প্রকার লোকের প্রতি আমি বৈরিভাব পোষণ করব। তা হচ্ছে, যে ব্যক্তি আমার নাম নিয়ে মিথ্যা হলফ করে., যে ব্যক্তি একজন স্বাধীন মানুষকে অন্যের কাছে বিক্রি কে বিক্রির টাকা খায়, আর যে শ্রমিক নিযুক্ত করে কাজ করিয়ে নিয়ে তাকে মজুরি দেয় না। (হাদিস বুখারী)

যেদিন নবীজি বলেছিলেন, আমার ক্রীতদাস অথবা আমার ক্রীতদাসী'' এ কথা কারও বলা উচিত নয়-বরং বলা উচিত যে, আমার যুবক'বা আমার যুবতী-প্রকৃতপক্ষে সেদিন থেকেই ইসলাম ক্রীতদাস প্রথা উঠে গেছে। (হাদীস বুখারী) পবিত্র কুরআনে ক্রীতদাসের মুক্তি অর্জনের জন্য টাকা দিয়ে সাহায্য করার নির্দেশ রয়েছে। পবিত্র কুরআনে বর্ণিত আছে তোমাদের দক্ষিণহস্তে যাদের অধিকারী, তারা মুক্তিপত্র চাইলে তোমরা তা লিখে দাও, যদি তোমরা এতে তাঁদের ভালো বোঝ, এবং আল্লাহ তোমাদের যে সম্পদ দিয়েছেন, তা থেকে তাঁদেরকে দাও। (কুরআন-২৪:৩৩)

প্রকৃতগতভাবে নর ও নারীর দৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। এ কারণে পুরুষ নারীর তুলনায় বলশালী ও শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী হলেও ইসলামে মেয়েদেরকেও তাঁদের প্রাপ্য ন্যায় সঙ্গতভাবে লাভ করার অধিকার দেওয়া

Dhaka University Institutional Repository

হয়েছে । এ কথা সর্বজন স্বীকার্য যে বিশ্বের শ্রেষ্ট ধর্মগুলোর মধ্যে ইসলামই মেয়েদেরকে সম্পত্তি ও পরিবারগত অধিকার স্বীকৃত হয়নি। ইতিহাস পাঠে জানা যায় মানুষ, মুসা এমনকি ঈসা নবী পর্যন্ত কেউই বহুবিবাহ নিষিদ্ধ করেননি। কিন্তু পবিত্র কুরআনে বহুবিবাহকে সীমিত করা হয়েছে এবং এক বিবাহের আনুকূল্য দেখানো হয়েছে। মুসলিম আইনে বিশেষ বিশেষ কারণে নারীর স্বামী ত্যাগের অধিকার স্বীকার করা হয়েছে এবং একবিবাহ কার্যকর করা হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে এপ্রসঙ্গে কাবিননামার কথা উল্লেখ করা যেতে পারে, বেশ্যাবৃত্তি অপেক্ষা বহুবিবাহে অনিষ্ট নি:সন্দেহে অনেক কম। পশ্চিমা দেশগুলোতে প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে হোক এগুলো চালু রয়েছে। ইসলামে খোদার পরেই নারীকে মর্যাদা দেয়া হয়েছে। রুমীর কবিতায় বলা হয়েছে:

নহে সে তো সৃষ্টি,তার স্রষ্টা অনুমানি
নারী বিধাতার ছায়া, নহে সে কাহিনী।

নীতির দিক থেকে ইসলামে নারীকে পুরুষের সমান অধিকার দেওয়া হয়েছে। আল কুরআনে বলা হয়েছে, 'যে সৎকর্ম সম্পাদনা করে নারী অথবা পুরূষদের ভিতর থেকে এবং যারা মোমেন তারা জান্নাতে দাখিল হবে এবং তাঁদের প্রতি বিন্দুমাত্র জুলুমকরা হবে না। '

সাধারণ মানুষের ওপর শোষন ও সুযোগ শিকার বন্ধ করবার জন্য কুরআনে সকল প্রকার সুদ গ্রহণ ও জুয়া খেলা নিষিদ্ধ করা হয়েছে।

ইসলাম বাধ্যতামূলক দান (যাকাত) ও স্বেচ্ছামূলক দানের (সাদাকাত) বিধান ও দিয়েছে। এসব বিধানের মাধ্যমে সম্পদের ন্যায়ানুগ বর্ধনের সাথে মিতব্যয়িতাও গড়ে ওঠে।

প্রকৃতপক্ষে ইসলাম হলো এমন একটি জীবন বিধান যেখানে রয়েছে একটি গণতান্ত্রিক শ্রেণিহীন সমাজ প্রতিষ্ঠার মহান চেতনা। এরূপ ন্যায়ভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠা হবে যেখানে সকল ব্যক্তি সুযোগ, সুবিধা ও সম্পদের ক্ষেত্রে তার ন্যায্য অংশ লাভ করবে। ইসলামি দৃষ্টিকোণ থেকে সমগ্র সৃষ্টি হচ্ছে আল্লাহর পরিবার, আর এই পারিবারের সর্বাপেক্ষা হিতকারী ব্যক্তিই হচ্ছে সৃষ্টির মধ্যে তার সর্বাপেক্ষা প্রিয়। (হাদিস)

ইসলামের সর্বশেষ নবি রাসুল করীম (স) দ্বীনদার ও ন্যায় ইনসাফ ভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা করলেন।ইসলামি মূল্যবোধের প্রেরণা সামাজিক জীবনে পারস্পরিক সাহায্য, সহানুভূতি ও দায়িত্ববোধের যে শিক্ষা দেয় তা কেবল শুধু ব্যক্তিগত ও সামাজিক চেতনাবোধের দয়াদাক্ষিণ্যের ওপর ছেড়ে দেয় না। বরং রাষ্ট্র ওতা জারিকরণের এবং বাস্তব ক্ষেত্রে তার প্রয়োগ করণের আয়োজন করে।বস্তুত এজন্যই হজরত ওমর (রা.) তাঁর খেলাফতকালে শিশু ও অকর্মণ্য বৃদ্ধ এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তিদের জন্য বায়তুল মাল থেকে নিয়মিত ভাতা যাকাতের নির্দিষ্ট খাতের বহির্ভূত ছিল। এর গতি প্রকৃতি অনুযায়ী তৎকালীন যুগে এটাকে একটি সামাজিক নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা বলা যেতে পারে। প্রচণ্ড দুর্ভিক্ষের বছর মানুষ চরম ক্ষুধার শিকার হবার সময় হজরত ওমর (রা.) চুরির শাস্তি বিধান মওকুপ করে দিয়েছিলেন। কারণ, প্রচণ্ড ক্ষুধার কারণে মানুষ চুরি করতে বাধ্য হয়েছে। এ রূপ চুরির বিষয়ে সন্দেহ নিহিত ছিল। আর ইসলামের মতে সন্দেহের কারণে দণ্ড বিধান রহিত হয়।

ইসলামি ইতিহাসের সামাজিক জীবনে পারস্পরিক দায়িত্ববোধ ও সাহায্য সহানুভূতির মহত্ব যে বস্তুটি দ্বিগুণ করে বাড়ায় তা হলো ইসলামের গণ্ডি সীমারেখা থেকে বহির্ভূত হয়ে সাধারণরূপে জাতি –ধর্ম নির্বিশেষে সমগ্র মানুষের জন্য উন্মুক্ত করে দেয়।

সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণাকে অনেকে সমকালীন পাশ্চাত্য দেশের উপলদ্ধি বলে মনে করেন। এ উপলদ্ধি থেকেই পাশ্চাত্য দেশে কল্যাণকর রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং সেখানে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার

আদায়ের ব্যবস্থা হয়েছে। ইতিহাস বিশ্লেষণে দেখা যায়, পাশ্চাত্যে সামাজিক ন্যায়বিচারের ধরণ বিকাশলাভ করার বহু পূর্ব থেকেই ইসলাম সামাজিক ন্যায়বিচারের ধারণা দিয়েছে। কেবল তাই নয় বরং বাস্তবেই প্রকৃত ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করেছে। আদল বা ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যই ইসলাম এই বিশ্বে অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষ সৃষ্ট সকল প্রকার অন্যায় অবিচার ও মানুষকে নির্যাতন ও শোষণ করার মতবাদের পংকিল আবর্ত থেকে মানুষকে শান্তি নিরাপত্তা আর অধিকার আদায়ের মাধ্যমে বেঁচে থাকার সুযোগ সৃষ্টির লক্ষ্যেই আদল বা ইনসাফের বাণী প্রচারিত হয়েছে। ইনসাফের প্রতিষ্ঠার জন্য ইসলামি বিধান এসেছে আল্লাহ পাকের দরবার থেকে এবং এজন্যই নবী রসুলকে পৃথিবীতে পাঠানো হয়েছে ।

প্রাচীন গ্রিক দার্শনিক মহামতি প্লেটো (খ্রিস্টপূর্ব ৪২৭-৩৪৭) তার আদর্শ রাষ্ট্রে ন্যায়বিচারকে একমাত্র আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। আধুনিককালে বহু রাষ্ট্রে সংবিধান প্রণেতাগণ সংবিধানের শুরুতে রাষ্ট্র পরিচালনায় নীতিমালায়' 'সামাজিক ন্যায়বিচারকে গুরুত্বের সাথে লিপিবদ্ধ করেছেন। কিন্তু ইসলামে ন্যায়বিচার কার্যটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি। ইসলামি বিধানের আলোকে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে নাগরিকদের করণীয় সম্পর্কে আল্লাহ বলেছেন,'আমি রাসুলদের প্রেরণ করেছি সুস্পষ্ট নির্দেশনাসহ এবং তাঁদের সাথে আবতীর্ণ করেছি কিতাব ও ন্যায় নীতি, যাতে মানুষ ইনসাফ ন্যায় বিচার প্রতিষ্টা করে।'

ইসলাম কেবলমাত্র একটি ধর্ম নয়, একটি পূর্ণাঙ্গজীবন বিধান এবং ইসলামের দাবি ও পরিমণ্ডল অনেক বেশি বিস্তৃত। বিভিন্ন মতাদর্শে ন্যায়বিচার সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যবখ্যা প্রদানসহ এর ওপর বিশেষ গুরুত্ব ও অর্পণ করা হয়েছে। কিন্তু ন্যায়বিচার সম্পর্কিত ইসলামি বক্তব্যের মতামত বা ব্যাখ্যার পার্থক্য সুস্পষ্ট । বিভিন্ন অর্থে সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থায় ন্যায়বিচারকে বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে ন্যায়বিচার অর্থে ধনীদের নিকট থেকে অর্থ সম্পদ গ্রহণ করে গরিবদের মাঝে বন্টন করাকে বুঝানো হয়েছে। কোনো কোনো ন্যায়বিচার কেবল রাজনৈতিক অধিকার লাভের অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। আমেরিকার সংবিধান প্রণেতাগণ মানুষের যে সাম্যতার কথা বলেছেন, সেখানে কেবলমাত্র শ্বেতাঙ্গ আমেরিকানদের কথাই উল্লেখ করা হয়েছে। নাগরিক অধিকার থেকে কালো আমেরিকানদের বাদ দেওয়া হয়েছে। সুতরাং মানুষে মানুষে প্রকট বৈষম্য যেখানে বিদ্যমান সেখানে ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠার প্রশ্নই আসে না। কিন্তু ইসলাম প্রকৃত সুবিচার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সামাজিক জীবনে সমতার ভিত্তিতে মানুষের অধিকার ও কর্তব্য নির্ধারণ করে।

ইকবাল বলেন ইসলামে সামাজিক ন্যায়বিচার হচ্ছে একটি ব্যাপক ও সমন্বিত কর্মসূচী। সুবিচারের কুরানিক ভাষা হলো আদল'। দুটি স্বতন্ত্র সত্যের সমন্বয়ে 'আদল'বা ভারসাম্য ও সামঞ্জস্য বিধান- সমবন্টন নয়। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আদল বা ন্যায়বিচার অর্থে সমাজের মানুষের মধ্যে সমতা দাবি করে, যেমন নাগরিক অধিকার। এখানে শ্বেতাঙ্গ, কৃষ্ণাঙ্গ, ধনী, দরিদ্র, স্ত্রী-পুরুষ নির্বিশেষে সকলেই রাষ্ট্রের আইনের চোখে সমতা দাবি করতে পারে।

ইসলামে সামাজিক সুবিচার বলতে সমাজের প্রতিটি মানুষের স্বাভাবিক চাহিদাসমূহ পাওয়ার সমান অধিকারকে বুঝায়। সামাজিক সুবিচার হলো সমাজে ব্যক্তি, পরিবার, গোষ্ঠী ও জাতির প্রত্যেকেরই নিজ নিজ চাহিদা ন্যায়সঙ্গতভাবে পুরণের অধিকারে স্বাধিনতা থাকবে। যে কোনো ধর্ম,বর্ণ বা গোষ্ঠীর সদস্য হোক না কেন সমাজের প্রতিটি মানুষের জানমাল ইজ্জতের নিরাপত্তা লাভ, শিক্ষা ও কর্মলাভের অধিকার রয়েছে। স্বাধীনভাবে লোকেরা মতামত প্রকাশ ও ধর্মপালনসহ যাবতীয় ন্যায্য অধিকার প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমান হবে। আইনের চোখে প্রতিটি মানুষ হবে সমান। সকলেরই ন্যায়বিচার লাভ করার সমান অধিকার থাকবে। আর মুসলমানদের জন্য তাদের আইন ও সামাজিক শৃঙ্খলা কুরআন থেকেই উৎসারিত হয়। ইকবাল বলেন:

نقش قرآن چونکه بر عالم نشسست　　نقشه های پاپ و کاهن راشکست
چونکه درجان رفت جان دیگر شود　　جان چو دیگر شد جهان دیگر شود

اندر او تدبیر های غرب و شرق   قدرت اندیشه پیدا کن چو برق

কুরআনের নক্‌শা যখন জগতে হলো প্রতিষ্ঠিত
পোপ ও রাব্বীর নকশাগুলো হলো ছিন্নভিন্ন।
যখন তা প্রাণে প্রবেশ করে হয় অন্য প্রাণ
প্রাণ যখন অন্য হয় তখন হয়ে যায় অন্য এক জগত
তার মাঝেই প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল কর্ম কুশলতা
চিন্তার শক্তির অধিকারী হ ও বিদুযৎসম। (ইকবাল -৫, পৃ. ৩১৭)

সামাজিক ন্যায়বিচারের কতকগুলো বৈশিষ্ট্য নির্দেশ করে:

১. সামাজিক আইন ও নীতি প্রণয়নের তথা সমাজ কর্তৃত্ব করার ক্ষেত্রে সকল মানুষের অধিকার সমান।

২. আশরাফ, আতরাফ, ধনী-দরিদ্র, শাসক-শাসিত সকলেই আইনের অন্তর্ভুক্ত- এবং সকলের ক্ষেত্রেই আইন সমভাবে প্রযোজ্য।

৩. রাষ্ট্রে বসবাসকারী সকলের সেবা ও সরবরাহ গ্রহণের ক্ষেত্রে সমান অধিকার রাখে।

৪. মানুষের মৌলিক চাহিদা যেমন, আকিদা, নফ্‌স,অন্ন, বস্ত্র,বাসস্থান, চিকিৎসা লাভের অধিকার সকলেরই সমান।

৫. দারিদ্র্য বিমোচনের জন্য কর্মসংস্থান করা এবং জনগণের নিরাপত্তা বাধান করা।

৬. সমাজে ধনী ও দারিদ্রের ব্যবধান হ্রাস করার লক্ষ্যে সম্পদের বন্টন ও পুনবন্টনের ব্যবস্থা গ্রহণ।

৭. উৎপাদনের উপকরণসমূহকে সমাজেরর স্বার্থে সর্বাধিক ব্যবহার করা এবং অতিরিক্ত সম্পদ সৃষ্টি করা।

৮. ন্যায়বিচার কর্মসূচীকে অব্যাহত রাখার স্বার্থে সামাজিক শান্তি বিঘ্নিত না করা।

ইসলামে শাসকবর্গ কর্তৃক ন্যায়বিচার বা ইনসাফ কায়েম হওয়া সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ইরশাদ হচ্ছে ‘’আল্লাহতায়ালা তোমাদেরকে ইনসাফের আচরণ গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছেন (সূরা-নহল: ৯)

‘’যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচার ফয়সালা করবে, তখন তা ‘আদল’ ইনসাফের সাথে করো’’(আল কুরআন : ৩ :৮)
কোনো জাতি বা সম্প্রদায়ের প্রতি বিদ্বেষ, শত্রুতা পোষণ তোমাদের যেন এমন না করে যে, তোমরা ইনসাফের কথা ভুলে যাও। বরং সেক্ষেত্রে ইনসাফকে কায়েম রাখার প্রাণপণ চেষ্টা করবে। কারণ, এটা তাকওয়া ও আল্লাহ ভীরূতার বেশি নিকটবর্তী (আল কুরআন –৪:-৮)

কিয়ামতের দিন আল্লাতায়ালার সবচেয়ে প্রিয়তম নিকটতম হবেন সেই ব্যক্তি যিনি হলেন, ইনসাফকারী-শাসক বা ইমাম| আর সবচেয়ে বেশি শত্রু ও কঠিনতম শাস্তির উপযোগী হবে সেই শাসকরা যারা জনগণের ওপর জুলুম, শোষণ ও অত্যাচার করে’’ (বুখারী মুসলিম তিরমিযি)

ইনসাফ বা ন্যায়বিচার হলো বিশেষ নিদানিক মানদণ্ড। যে মানদণ্ডকে ভালোবাসা ও শত্রুতা কখন ও তার অবনমিত করতে পারে না। পারে না তার আইনকানুন ও নিয়মনীতিকে পরিবর্তন করতে। এটা হলো সেই ইনসাফের প্রতীক যা সমাজের নাগরিকদের পারস্পরিক সম্পর্ক বা জাতি ও সম্প্রদায় সমূহের পারস্পরিক সম্পর্ক বা জাতি ও সম্প্রদায় সমূহের পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ ও শত্রুতার কোনো একটি উপকরণ দ্বারা প্রভাবিত হয়ে পড়ে না। বরং তা দ্বারা মুসলিম জাতির সমগ্র ব্যক্তি সমভাবে উপকৃত হয়| বংশীয় কৌলিন্য ও আভিজাত্যের পার্থক্য যেমন তার ভিতর কোনো বিশেষত্ব ও পার্থক্য আনয়ন করতে পারে ন আ। পারে না তদ্রুপ ধন-সম্পদ বা ইজ্জত সন্মানের কোনোরূপ পরিবর্তন আনয়ন করতে।এমনিভাবে তার দ্বারা অন্যান্য জাতিও উপকৃত হয়, এ ক্ষেত্রে তাদের এবং মুসলমানদের মধ্যে যতই শত্রুতা থাকুক না কেন তাতে কিছুই আসে যায় না।

Dhaka University Institutional Repository

এটা আদল ইনসাফের ও ন্যায়বিচারের এমন একটা মহান উচ্চ স্তর, যার সমকক্ষ মর্যাদা আজ পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কোনো আইন লাভ করতে পারেনি- পারেনি কোনো আইন তার আসনে সমাসীন হতে।

ইসলামি আদল ইনসাফের ব্যাপারে একটি বিশেষ কথা হচ্ছে তা হলো, কোনো দর্শন ও নীতির মধ্যেই আদল সীমাবদ্ধ থাকেনি, বরং ইসলাম তাকে বাস্তব জীবনে প্রয়োগ করে দেখায়।ইসলাম মানবজাতির কাছে এমন একটি পূর্ণাঙ্গ সাম্যবাদী পয়গাম নিয়ে উপস্থিত হয়।

মিতব্যয়ীতা হল খাঁটি মুমিনের শ্রেষ্ঠত্ব:

ان المبذرين كانوا اخوان شياطين

[নিশ্চয়ই অপচয়কারী শয়তানের ভাই]

হযরত মুহাম্মদ (স.) তাঁর পরিবার অধিক মিতব্যয়ী ছিলেন। তার দৈনন্দিনের পানাহার শুধু যবের রুটি আর পানি থাকত। কখনো কখনো তার চুলায় কয়েক মাস পর্যন্ত আগুন জ্বলতো না । তার জীবনীকারগণ অত্যন্ত গর্বের সাথে বর্ণনা করেন যে, নিজের জুতো তিনি নিজেই মেরামত করতেন। নিজের পোষাকে নিজেই তালি লাগাতেন। হযরত মুহাম্মদ (সা.) গরীব তবে পরিশ্রমী এবং সম্বলহীন এক ব্যক্তি ছিলেন। আমার দৃষ্টিতে তিনি যদি উত্তম আদর্শের মালিক না হতেন তাহলে দুর্ধর্ষ আরব জাতি যারা দীর্ঘ তেইশ বছর গৃহযুদ্ধে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষে মেতে ছিল, তারা কখনো তার এত অধিক সন্মান করতো না। --------- এমন জাতিকে নিজের অসাধারণ প্রতিভা এবং বীরত্ব ছাড়া সীমাহীন আনুগত্যশীল জাতিতে পরিণত করা সম্ভাব ছিল না যা সম্ভাব হয়েছিল তালিযুক্ত পোশাকের এই জুববাধারী ব্যক্তির পক্ষে। বিপদাপদ এবং দুঃখ-কষ্টে ঘেরা তার দীর্ঘ তেইশ বছরের দিকে দৃষ্টিপাত করলে খাঁটি বীর পুরূষের সব বৈশিষ্ট্যই আমি তার মধ্যে দেখতে পাই। (দি হিরোইক হিস্ট্রি ইন (ইসলাম - ৮৬, পৃ. ৬১)

টমাস কারলাইন এখানে রাসুলুল্লাহর দরিদ্রতার প্রতি সংক্ষিপ্ত ইঙ্গিত করেছেন। এ বিষয়ে কিছু আলোকপাত করা প্রয়োজন বলে মনে হচ্ছে। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের অধিকাংশ জীবনীকার তার কষ্টে ভরা জীবনকে তুলে ধরেছেন। তবে এ কথা সত্য যে, যাঁর থেকে সব চাইতে বেশী আদর পাবেন,বেশী ছায়া পাবেন সেই মা আমিনার আদর ও ছায়া থেকে শৈশবেই তিনি বঞ্চিত হয়ে যান। শ্রদ্ধেয় দাদা আব্দুল মুত্তালিব লালন পালনের দায়িত্ব নিলে কিছুদিন পর তার ছায়া থেকেও তিনি বঞ্চিত হয়ে যান। তার শ্রদ্ধেয় চাচা এরপর লালন পালনের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। সাংসারিক দিক থেকে তেমন স্বচ্ছল ছিলেন না। এছাড়া তার পরিবার ছিল অনেক বড়। এর ফলে তাকে যে খুব কষ্টে দিন যাপন করতে হত তা নয়। শৈশবে আমাদের প্রিয় নবী এই চাচার ছাগল চড়াতেন। পরে চাচার ব্যবসায়ী মাল সামগ্রী নিয়ে তার সাথে সিরিয়া এবং অন্যান্য দেশে বাণিজ্যের জন্য সফর করেছেন। এর দ্বারা প্রমাণ হয় যে, তিনি চাচা আবু তালিবের অধীনে থাকাকালীন মধ্যম মানের জীবন যাপন করতেন। যখন মক্কার শ্রেষ্ঠ ধনবতী গুণবতী মহিলা হযরত খাদিজা রাদিয়াল্লাহু তায়ালা আনহার সাথে প্রিয় নবীর বিবাহ সুসম্পন্ন হয় তখন তার চতুষ্পার্শ্বে সম্পদের ঢেউ বইতে থাকে। এ সময়কে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের দরিদ্রতার সময় বলা যায় না। আল্লাহ তায়ালা তার এই সুখী দাম্পত্যের দিকে ইঙ্গিত করে বলেন,। (শরীফ-৩৮, পৃ. ৯৯)

ووجدك عائلا فاغني

[''এক সময় আপনি অভাবী ছিলেন তিনি আপনাকে অভাবমুক্ত করেছেন। (৯৩:০৮)

প্রসংগত এখানে বিশেষভাবে লক্ষ্যনীয় বিষয় হল, আল্লাহর শ্রেষ্ঠ রসুল যখন মাতৃভূমি মক্কা থেকে ঠাঁই হীন হয়ে মদীনায় হিজরত করেন তখনকার ঐ সময়টা মুসলমানের জন্য অত্যন্ত কষ্টের দিন ছিল। তবে মদীনাবাসী আনসারদের উদারমনা সহযোগিতার ফলে তারা স্বচ্ছল হতে সক্ষম হন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের যাতে কখনো কোন বিষয়ে বিন্দুমাত্র কষ্ট বা ভাবনা না হয়, এর জন্য প্রত্যেক আনসার ও মুহাজির সতর্ক থাকা নিজ নিজ দায়িত্ব মনে করতেন। চাইলে তিনি এসময় রাশি রাশি সম্পদ গোছাতে পারতেন। কিন্তু তা তিনি করেননি । এরপর ইসলামি বিজয় ধারার স্রোত চতুর্দিকে বইতে শুরু করলে সম্পদের উথলে ওঠা জোয়ারের ঢেউ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পায়ে আছড়ে পড়তে থাকে। এই সময়ে তিনি চাইলে বিশ্বের বড় সম্পাদসালী হতে পারতেন। কিন্তু তিনি তা করেননি। তিনি স্বেচ্ছায় সাদাসিধে ,অনাড়ম্বড় জীবন যাপন করা এবং মুখাপেক্ষীহীন থাকাকে প্রাধান্য দিয়েছেন। তিনি বলেন, ''দারিদ্রতা আমার গর্বিত বস্তু।'' ফিদাক বাগান থেকে পাওয়া স্বল্প পরিমান যমিন দ্বারা নবীর পরিবারের সবাই কালাতিপাক করতেন। যখন কোন ব্যক্তি কিছু চাইতো তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম এবং পরিবারর কেউই তাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিতেন না যদিও নিজেরা অত্যন্ত ক্ষুধার্ত থাকতেন। এভাবেই দিনের পর দিন পার হয়ে যেত। চুলার আগুন জ্বালানোর মত পরিস্থিতি হত না। তিনি শাহী মেজাযের মধ্যে দরিদ্রভাব গ্রহণ করেছেন। ফলে তার মধ্যে আমীরি এবং ফকীরি দুটোই বিদ্যমান ছিল।

আল্লামা ইকবাল বলেন:

শাহীমন আর দরিদ্রভাব মুস্তফার বৈশিষ্ট্য,
এই দুই মহাগুণ দেখি শুধু মুস্তাফার বৈশিষ্ট্য।
সেই নবীর প্রতি লাখো সালাম যিনি অসহায়ের সহায় ছিলেন,
সেই নবীর প্রতি লাখো সালাম যিনি শাহীমনেও দরিদ্রভাব দেখিয়েছেন।
(ইকবাল -৫, পৃ.৫৮)

তিনি শুধু নিজেই আল্লাহ ভীরূ ও আল্লাহ প্রিয় ছিলেন না বরং মানবজাতিকে আল্লাহ ভীরূ ও আল্লাহ প্রিয় বানানোর জন্য তিনি আর্বিভূত হয়েছিলেন যাতে সবাই সর্ববিষয়ে সর্বাবস্থায় আল্লাহকে এক মেনে নেয়।

জীবনের সর্বাবস্থায় মিতব্যয়ি হওয়ার শিক্ষা দিয়েছেন একখণ্ড যমীনের যদি কেউ মালিক হয় আর তা যদি কেউ অনাবাদি রেখে দেয় আর ওই যমীনটা যদি চাষাবাদের উপযোগী হয় তাহলে রোযকিয়ামত দিবসে এই

Dhaka University Institutional Repository

যমীনকে অনাবাদি রেখে দেওয়ার জন্য তাকে জবাবদিহি করতে হবে কেন সে যমীনটাকে বেকার ফেলে রেখেছে ? অন্যত্র আর একজায়গায় বলা হয়েছে তোমার সামনে যদি একটি মৃত বাঘকে দেখতে পাও তাহলে ওই বাঘের চামরাটা নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগেই যেন তা হেফাজত করা ওই ব্যক্তির জন্য একান্ত দায়িত্ব। এটা রাসুলের শিক্ষা এ ঘটনার থেকে অনুমীয় হয় যে, একজন মানুষকে বাস্তব জীবনে কতটুকু মিতব্যয়ি হওয়া উচিত সে শিক্ষা দেওয়া হয়েছে।

স্বাধীনতা মেধা ও প্রতিভা বিকাশের সহায়ক শক্তি:

كنتم خير امه اخرحت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر

তোমরা (মুসলমান) সর্বোৎকৃষ্ট জাতি, মানুষের কল্যণ সাধনের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে; তোমরা ভাল কাজের প্রতি আদেশ দেবে এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখবে।] (৩ :১১০)

মুসলিম উম্মার নেতৃত্ব অবশ্যই এমন ব্যক্তি বা ব্যক্তি বর্গের ওপর অর্পিত থাকবে, যারা হবেন মুক্ত ও স্বাধীন। কোন গ্রীবা দাসত্ব বা শৃঙ্খলে তারা বন্দী থাকবে না। এরূপ নেতৃত্বই মানুষকে দাসত্বের লাঞ্ছিত শৃঙ্খলে দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করতে সম্ভব হবে। পৃথিবীর বহু ব্যক্তি, গোষ্ঠি ও জাতির স্বাধীনতাকে আদর্শ ও মূল্যবোধ-এই উভয় অর্থেই অস্বীকার করা হয়েছে।

মানুষের মনকে কুসংস্কার ও অনিশ্চয়তা থেকে, তার আত্মাকে পাপাচার ও দুর্নীতি থেকে, তার বিবেককে নিপীড়ন ও ভয়-ভীতি থেকে, এমনকি তার দেহকে বিশৃঙ্খলা ও অধ:পতনের কবল থেকে মুক্ত করা ইসলামের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য। মানুষের এ সকল মহৎলক্ষ্য অর্জনের উদ্দেশ্য ইসলাম যে কর্মধারা নির্দেশ করেছে, তার মধ্যে রয়েছে প্রগাঢ় বুদ্ধিবৃত্তিক অনুশীলন। নিয়মিত আধ্যাত্মিক অনুষ্ঠান পালন নৈতিক বিধিমালার বাধ্যবাধকতা এবংএমনকি পানাহারের বিধিনিষেধ পর্যন্ত মানুষ যখন এই কর্মধারা ধর্মীয় দৃষ্টিতে অবলম্বন করে, তখন সে কিছুতেই স্বাধীনতা ও মুক্তির চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জন না করে পারে না।

ইসলামে স্বাধীনতা সংক্রান্ত ধারণা এটা ঈমানের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ এবং মহান স্রষ্টার কাছ থেকে আগত একটি পবিত্র নির্দেশ। কতকগুলো মূলনীতির ওপর ইসলামি স্বাধীনতার ধারণা প্রতিষ্ঠিত। যেমন (ক.) মানুষের বিবেক আল্লাহর অধীন। কারণ, তাঁর কাছেই প্রতিটি মানুষ সরাসরিভাবে দায়ী;(খ.) প্রতিটি মানুষই তার কার্যাবলির জন্য ব্যক্তিগতভাবে দায়ী এবং তার কাজের ফল সে একাই ভোগ করার অধিকারী; (গ.)

Dhaka University Institutional Repository

নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব আল্লাহ মানুষের কাছেই অর্পণ করেছেন। এব্যাপারে তাকে অন্য কার ও মুখাপেক্ষী করা হয়নি;(ঘ) মানুষকে সঠিক, নির্ভুল ও দায়িত্বশীল সিদ্ধান্ত গ্রহণের উপযোগী করে তোলার পর্যাপ্ত পরিমাণ আধ্যাত্মিক পথনির্ধেশ ও বুদ্ধিবৃত্মিক গুনাবলি প্রদান করা হয়েছে। করা। (ফিরোজা-৩১, পৃ.৭৭)

ইসলামের ঘোষণা সমগ্র বিশ্বের মানুষকে এক আমাদের বংশজাত ও এক অভিন্ন পরিবারের মানুষ বলার সাথে সাথে এরূপ ঘোষণাও দিয়েছেন যে, সব মানুষ জন্মগতভাবেই স্বাধীন ও মুক্ত| রাষ্ট্রীয় ও মানবিক আদর্শসমূহের মধ্যে একমাত্র ইসলামই বিশ্বমানবতার মুক্তি সনদ হয়ে এসেছে মহান আল্লাহর নিকট থেকে| ইসলামের মৌলিক ও প্রাথমিক ঘোষণাই হচ্ছে মানুষ মুক্ত ও স্বাধীন। মানুষ তারই মত অন্য মানুষের-এই বিশ্বপ্রকৃতির কোনো কিছুরই দাসত্ব মেনে নিতে পারে না। মানুষ কেবলমাত্র মহান বিশ্ব স্রষ্টা আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের দাসত্ব কবুল করবে এবং তার ফলেই মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে অন্য সকল পার্থিব শক্তির গোলামী থেকে সম্পূর্ণ মুক্তি লাভ

এখানে আল্লাহ মুসলমানদের সম্ভোধন করে বলছেন, বিশ্বমানবের মঙ্গল বিধানের জন্য আমি তোমাদের সৃষ্টি করেছি। তোমারা আদেশ দেবে ভাল কাজের প্রতি এবং বিরত রাখবে অন্যায় কাজ থেকে| আদেশ দেওয়া ও বিরত রাখা হলো স্বাধীন মানুষের নেতৃত্বের কাজ

এতে বুঝা গেল, মুসলমানরা হবে স্বাধীন ও সার্বভৌমত্বের অধিকারী। কারণ পরাধীন জাতি কখনো বিশ্বমানবের উপকার সাধন করতে পারে না; আদেশ-নিষেধ তথা নেতৃত্ব দানের তো প্রশ্নই উঠে না।
হাদীস শরীফে আছে:

ما من مولود الا يولد علي الفطرة

[যে কোন সন্তান ‘ফিতরাত্’ তথা ইসলাম নিয়েই জন্মগ্রহণ করে।] (বুখারী, বাবুল জানায়েয)

এতে প্রতীয়মান হয়, মানুষের জন্মগতভাবেই স্বাধীন নাগরিকরূপে স্বাধীন ধর্ম তথা ইসলাম নিয়ে জন্মগ্রহণ করে। এ স্বাধীনতা হারিয়ে পরাধীনতার জালে আবদ্ধ হলে মানুষের সুপ্ত মেধা ও প্রতিভা প্রকাশ লাভ করে না।
কুরআনের অন্য জায়গায় আছে:

هو الذي ارسل رسوله بالهدى و دين الحق ليظهره
علي الدين كله و لو كره المشركون

[আল্লাহ হলেন এ সত্য, যিনি হযরত মুহাম্মদ (স.)-কে পাঠিয়েছেন রসুলরূপে হেদায়াত ও সত্য ধর্ম নিয়ে, যাতে (শ্রেষ্ঠ ধর্মরূপে) যাবতীয় ধর্মের উপরে প্রত্যেককে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন, যদিও মুশরিকরা তা অপছন্দ করুক।] (৬১: ৯)

স্বাধীন ও শক্তিশালী না হলে মুসলমানের পক্ষে দুনিয়ার বুকে ইসলামকে সকল ধর্মের উপর প্রাধান্য দেওয়া সম্ভব হবে না| তাই বোঝা গেল, দুনিয়ার বুকে স্বাধনীতা ও সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠা করাই ইসলামের লক্ষ্য।
ইকবাল বলেন:

غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں
جو ہو ذوق یقیں پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں

অনুবাদ:

তলোয়ার-তদবীর আসে না কোন কাজে পরাধীনতায়
কেটে যায় সকল শৃঙ্খল যদি থাকে দৃঢ় প্রত্যয়। (ইকবাল -১১, পৃ. ৩০৯)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল আরো বলেন, পরাধীনতার ফলে মানুষের মন ও স্বভাব বদলে যায়:

تھا جو ناخوب بتدریج وہ ی خوب ہوا

کہ غلامی میں بدل جاتا ہے قوموں کا ضمیر

অনুবাদ:

সুন্দরের রূপ নিল ধীরে ধীরে, যা ছিল অসুন্দর,
বদলে যায় জাতির মন পরাধীনতায়। (তাহের-৭৪, পৃ. ৩৮৫)

পরাধীরতার ফলে ব্যক্তি ও জাতি ধর্মীয় ও পার্থিব- উভয় ক্ষেত্রেই অযোগ্য বলে বিবেচিত হয়; তাদের চিন্তা-চেতনা তাদেরকে পথ ভ্রান্তির দিকে পরিচালিত করে; তাদের কাজ-কর্ম পরাধীনতার কবলে পড়ে’ যাবতীয় মূল্যবোধ হারিয়ে ফেলে:

بھروسہ کر نہیں سکتے غلامی کی بصیرت پر

کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا

محکوم کے الہام سے اللہ بچائے

غارت گر اقوام ہے وہ صورت چنگیز

بدن غلام کا سوز عمل کا ہے محروم

کہ ہے مرور غلاموں کے روز و شب پہ حرام

از غلامے لذت ایماں مجو

گرچہ باشد حافظ قرآں مجو

অনুবাদ:

থাকে না কারো আস্থা পরাধীনের বুদ্ধির উপর
দুনিয়াতে কেবল স্বাধীন লোককেই চক্ষুষ্মান ধরা হয়।
বাঁচিয়ে রাখুন খোদা পরাধীনের মনন থেকে
করে দেয় ধ্বংস জাতিকে তা চেঙ্গিস খানের ন্যায় |
পরাধীনের দেহ-প্রাণ, থাকে বঞ্চিত কর্ম-প্রেরণা হতে,

Dhaka University Institutional Repository

পরাধীনের দিন-রাতে প্রগতিশীলতা হারাম।
চেয়োনা ঈমানের স্বাদ পরাধীন হতে,
হয় সে যদিও কুরআনের হাফেয। (তাহের -৭৪, পৃ. ৩৮৬)

'হিন্দী ইসলাম' কবিতায় ইকবাল বলেন:

ملا کو جو ہے ہند میں سجدے کی اجازت　　ناداں یہ سمجھتا ہے کہ اسلام ہے آزاد

অনুবাদ:

অনুমতি পায় যদি সেজদার, কোন মোল্লা ভারতে,
মনে করে সেই বোকা এখানে ইসলাম স্বাধীন। (ইকবাল -১১, পৃ. ৩০)

'আযাদী শীর্ষক কবিতায় ইকবাল বলেন:

ہے کس کی یہ جرآت کہ مسلمان کو تو کہے
حریت افکار کی نعمت ہے خدا داد
ہے مملکت ہند میں اک طرفہ تماشا
اسلام ہے محبوس مسلماں ہے آزار

উক্ত কবিতায় ইকবাল ব্যঙ্গোক্তি করে বলেন:

ইংরেজ রাজত্বে মুসলমানের চিন্তার পরাধীনতা এ পর্যায়ে উপনীত হয়েছে যে, কাউকে কোন বিষয়ে কিছু জিজ্ঞেস করার সাহসই কারো হয় না। তারা চিন্তার এই নিরর্থক স্বাধীনতাকে আল্লাহ প্রদত্ত নেয়ামত বলে মনে করে। দুঃখের বিষয়, ভারত রাজ্যে বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এই যে, এখানে মুসলমান আযাদ, অথচ ইসলাম বন্দী। (ইকবাল-১১, পৃ. ৫৯)

ইকবাল আশেকে রসুল (স.)ছিলেন:

قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله

[হে নবীজী বলুন: তোমরা যদি আল্লাহকে ভালোবাস,
তবে আমার অনুসরণ কর,আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন।] (৩:৩১)

ইকবাল নবীজীর জীবন-চরিত গভীরভাবে অধ্যয়ন করে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, নবীজীর মোবারক সত্তা হলো প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য -সকল পরিপূর্ণতার উৎস।

তিনি বলেন:

بمصطفی برساں خویش را کہ دیں ہمہ اوست
اگر باو نرسیدی تمام ہو لهبی ست

অনুবাদ :

পৌঁছাও নিজেকে নবী মোস্তফা নাগাদ, তিনিই ধর্মের সবকিছু,
পৌঁছাতে না পায় যদি নবী তক, তবে সবই ব্যর্থ। (তাহের-৭৪, পৃ. ৯৫-৯৬)

ইকবালের মনে রসুল- প্রেম এত প্রগাঢ় ছিল যে, কেউ যদি নবীজীর সদগুণাবলীর আলোচনা করতো, তবে তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠতেন এবং অনেকক্ষণ পর্যন্ত রাত কাঁদতেন। কেউ যদি তার সামনে নবীজীর নাম 'মুহাম্মদ সাহেব' বলে উচ্চারণ করতো, তবে তিনি খুবই কষ্ট পেতেন। কেউ যদি ইকবালের আসরে নবীজী সম্পর্কে অসৌজন্যমূলক কথাবার্থা বলতো, তবে তিনি তাকে আসর থেকে বের করে দিতেন।

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল আলতাপ হুসাইন হালী রচিত ‘‘মুসাদ্দাস-এ-হালী’’এর ভক্ত ছিলেন| কেউ যদি ইকবালকে নবীজীর প্রশংসা সম্বলিত ‘‘মুসাদ্দাস’’ এর অংশটি সেতার বাজিয়ে শুনাতেন, তবে কিনি তন্ময় হয়ে তা শুনতেন। বিশেষ করে যেখানে নবীজীর জন্ম ও গুণজ্ঞানের কথা রয়েছে, সে জায়গাটি তিনি বারবার পড়িয়ে শুনতেন। ইকবাল মনে করতেন, নবী প্রেম না হলে দীনধর্মের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করা যাবে না: দুনিয়া-আখিরাত কোনটাই সফল হবে না। ইকবাল বলেন:

بر که از سو نبی (ص) گیرد نصیب   ہم یہ جبریل امیں گردد قریب
در دل مسلم مقام مصطفی است   ابروئے مازںام مصطفی ص
است

می ندائی عشق و مستی از کجاست   این شعاع آفتاب مصطفی است
زنده تا سوز او در جاں تست   ایں نگہ دارنده ایمان تست

অনুবাদ:

বুঝতে পারে যে নবীজীর রহস্য,
হয় সে সক্ষম জিব্রীল আমীনের নৈকট্য লাভের।

বাস করেন নবী মোস্তফা, মুসলমানের অন্তরে,
নবীজীর নামের বরকতেই হয় আমাদের মান সন্মান।

জান না তুমি ইশ্‌ক আর তন্ময়তা আসে ও কোথা হতে,
আসে তা নবী মুস্তফার অরুণ কিরণ থেকে।

জিন্দা থাকবে তুমি ততদিন,যতদিন থাকবে
নবীজীর ইশ্‌ক তোমার অন্তরে,

বহাল থাকবে এই প্রেমে তোমার ঈমান| (তাহের-৭৪, পৃ. ৯৫-৯৬)

দুনিয়ার বাদশাহরা তো মানুষে গোলাম বানানোর চিন্তায় বিভোর থাকে। আর বিশ্বনবী তো গোলামীর শৃঙ্খলকেই নিপাত করতে আবির্ভূত হয়েছিলেন। তিনি মানুষকে মানুষের গোলামী থেকে মুক্ত করে গোলামকে শাহীতখ্‌তে বসিয়েছিলেন। তাই আল্লামা ইকবাল আতায়েন আমদারের শানে বলেন:

হে মুনিব! আপনার চরণ ধুলিতে যমীন ধন্য
আসমান সুউচ্চ হয়েছে আপনার পরশের জন্য।

আপনি পৃথিবীতে আলোতবর্তিকা স্থাপন করেছেন,
আপনি গোলামকে শাহীতখতে বসিয়েছেন। (Mohammedanism -87, p.. 13)

আল্লাহ মুসলমানদের নেতৃত্ব দান করবেন:

وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصلحات ليسخلفنهم في الارض

[যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্মসম্পাদন করেছে, তাদের সাথে
আল্লাহ ওয়াদা করেছেন যে, তাদেরকে তিনি দুনিয়াতে খিলাফত তথা নেতৃত্ব দেবেন। (২৪:৫৫)

এখানে বোঝা যায় যে, আল্লাহন ধর্মানুরাগী মুসলমানকে রাজত্ব ও নেতৃত্ব দান করবেন। খলীফা ওয়ালীদের সময় মুসলমানরা তদানীন্তন পৃথিবীতে সর্ববৃহৎ সাম্রাজ্য গঠন করেছিলেন। যোগ্যতা অর্জন করলে মুসলমানরা সারা দুনিয়াতে এখনো নেতৃত্ব দিতে পারে। কুরআন ও ঘোষণা করছে:

ان الارض برثها عبادي الصالحون

[আমার যোগ্য বান্দারাই পৃথিবীর অধিবাসী হবে নেতৃত্ব দেবে। (২১:১০৫)

ইকবাল বলেন:

سبق پھر پڑھ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا
لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ:

নাও শিক্ষা আমার সত্যতা, ন্যায় বিচার ও বীরত্বের,
নেয়া হবে তোমার দ্বারা ধরার নেতৃত্বের কাজ। (ইকবাল- ১১, পৃ. ৩০৭,)

ইকবাল মুসলমানদেরকে নেতৃত্ব দানের যোগ্য করে তোলার জন্য সত্যতা, ন্যায়বিচার ও বীরত্ব এই তিনটি গুণে গুণান্বিত হওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। এগুলো ছাড়া তারা নেতৃত্বের যোগ্য হতে পারে না। আরো পরিস্কার কথায় মুসলমান সারা পৃথিবীতে সততা ও সভ্যতার ডাক দেবে। বিচার ক্ষেত্রে আপন পর, মুসলমান অমুসলমান নির্বিশেষে সুবিচার করবে এবং দুশমনের সাথে লড়াই করার সময় বড় বড় শক্তির সামনে ও ভীতসন্তস্ত্র না হয়ে বীরত্ব প্রদর্শন করবে।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) নিজের ব্যক্তিত্ব এবং নিজের মাযহাবের বদৌলতেই লক্ষ লক্ষ মানুষের উপর প্রভাব ফেলেছেন। পৃথিবীর প্রত্যেক প্রান্তে এখনো অসংখ্য লোক তার একচ্ছত্র আনুগত্য করে চলেছে। তার আইন অনেক জাতি এবং সুবিশাল পৃথিবীতে ছড়িয়ে থাকা মানবের তরে আল্লাহর আইন বলে ধরা হয়। তাঁর আদর্শ, তাঁর শিক্ষা দীক্ষা এবং তাঁর উন্নত চিন্তাধারা জীবন চলার প্রত্যেক স্তরে, প্রত্যেক মোড়ে মানবের মাঝে উদ্দীপনার এক জোয়ার সৃষ্টি করে। (ইসলামের প্রশস্ততা, ৮৮, পৃ. ১২)

ইসলামে ধর্ম ও রাজনীতি আলাদা আলাদা দেখা হয় না। আমাদের ব্যক্ত ও সামাজিক জীবন ব্যবস্থার জন্য ইসলামই উপযুক্ত ও যথেষ্ট। আল্লাহ তায়ালা একেই আমাদের জীবন ব্যবস্থার জন্য মনোনীত করে বলেছেন,"আমি তোমাদের কল্যাণে তোমাদের পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থাকে আজ পূর্ণ করে দিলাম আমার দান রাশি তোমাদের উপর ঢেলে দিলাম আর পুর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে একমাত্র ইসলামকেই আমি মনোনীত করলাম।' (কুরআন ৫: ৩)

উইলসন মুসলমানদের নেতৃত্বর কথা ব্যক্ত করে বলেন বিশ্বনবী লক্ষ লক্ষ লোকের উপর প্রভাব ফেলেছিলেন। তখনই তো মুসলমানদের সংখ্যা কয়েক কোটি ছিল। তারপর নবী (সা.) আবির্ভাবের পর হতে প্রায় পনের শতাব্দী অতিবাহিত হয়ে যাচ্ছে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মুসলমানদের সংখ্যা দেড় শত কোটিতে পৌঁছে গেছে। এছাড়া অমুসলিমদের একটা বিশেষ সংখ্যা ও রেসালাতে মুহাম্মাদীর দ্বারা প্রভাবিত। ভবিষ্যতেও তারা প্রভাবিত হতে থাকবে। এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল বলেন:

মরু প্রান্তরে পাহাড়ের পাদদেশে, ময়দানে,
সমুদ্রে উত্তাল, ঝড় তুফানে।
চীনের শহরে, মারাকাশের অরণ্যে,
মুসলমানদের গোপন ঈমানে।
সমস্ত জাতি চিরদিন এ দৃশ্য দেখতে থাক,
''আপনার নাম সমুন্নত করেছি ''এই শান ও দেখতে থাক। (শরিফ -৩৮, পৃ. ২১৭)

বিশ্বাসীগণের ভিত্তি দেশ নয়, ধর্মীয় আকিদা:

ইকবাল লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ এর মন্ত্রে বিশ্বাসী একজন খাঁটি মুমিন ছিলেন। তাই মুসলিম জাতিকে তাঁর মুসলিম মানসপ্রসূত এ ভাবনার প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন এভাবে। তাঁর চিন্তাধারা একটি সংযোজক পথ অতিক্রম করেছে, তা হচ্ছে আল্লাহর পথ। তিনি বলেন যে, মানুষের একনিষ্ঠতা চূড়ান্ত পর্যায়ে কেবল আল্লাহ তাআলার জন্যই হওয়া উচিৎ। তিনি বলেন:

لا اله سرمایه اسرار ما رشتهاش شیرازه افکار ما

লা ইলাহা আমাদের রহস্যের পুঁজি

তার সূত্র আমাদের চিন্তার সাথে বাঁধা।

তিনি আরও বলেন:

نقطه ادوار عالم لااله انتهاي كار عالم لااله

زانکه در تکبیر راز بود تواست حفظ و نشر لااله مقصود تواست

পৃথিবীর কালচক্রের উৎস হলো লা-ইলাহা

জগতের সকল কাজের চূড়ান্ত পরিণত হলো লা- ইলাহা

যেহেতু তাকবিরের মাঝেই তোমার অস্তিত্ব নিহিত

অতএব, লা-ইলাহা-এর সংরক্ষণ ও প্রচারই হোক তোমার লক্ষ্য। (রেযা-১৬, পৃ. ৭৮)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল এক অসাধারণ ব্যক্তিত্ব। তাঁর ধর্মীয় বিশ্বাস তথা ইসলামের প্রতি তাঁর আনুগত্য এবং ব্যক্তি ও সমাজ জীবনে ইসলামের বিকাশ প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁর আগ্রহ ও অভিব্যক্তি সংক্ষেপে বর্ণনা করা কঠিন ব্যাপার। কারণ, ইকবালের সমগ্র জীবনসত্তায় ইসলামের যে প্রভাব প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনের অন্তিম সময় পর্যন্ত তা কার্যকরী ছিলো। এছাড়া ইকবাল শুধু ইসলামি দর্শন চর্চাই করেননি, বরং তাঁর ব্যক্তি পারিবারিক জীবনে এবং সামাজিক ক্ষেত্রে এর প্রতিফলনের ছাপ রেখে গেছেন। ইকবালের বাহ্যিক জীবনাচরণে ইসলামের প্রতি তাঁর যে আনুগত্য ও মনোনিবেশ সে ব্যাপারে কেই কেই সন্দিহান ছিলেন। কিন্তু যখনই তাঁর সান্নিধ্য লাভের সুযোগ হয়েছে তখন তাঁরা তাঁদের ভুল বুঝতে পেরে লজ্জিত হয়েছেন, ইকবালের জীবনী আলোচনা করলে এমনটিরই প্রমাণ মেলে। (তারিক- ৫৩, পৃ. ৮১)

كنتم خير امة اخرجت للناس تامعرون بالمعروف و تنهون عن المنكر

[তোমরা (মুসলমানরা) শ্রেষ্ঠ জাতি ;মানব কল্যাণ সাধনের জন্য তোমাদের সৃষ্টি করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে।] (৩: ১১০)

কুরআনে শ্রেষ্ঠ জাতির সংজ্ঞায় কোন দেশের শর্ত আরোপ করা হয়নি। বরং সৎকাজের প্রতি নির্দেশ এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখাকেই মুসলিম জাতির দর্শন ও বৈশিষ্ট্য বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো প্রধানত দেশ ধর্মীয় বিশ্বাস নয়। ইকবাল কুরআনের আলোকে বলেছেন, ইউরোপীয় এ মতবাদ ভ্রান্ত ধর্মীয় বিশ্বাসই মুসলিম জাতীয়তাবাদের মৌলিক উপাদান-দেশ,ভাষা,বর্ণ বা গোত্র নয়। ইকবালের মতে, ইউরোপীয় লোকেরা দেশ মূর্তিও ভাষামূর্তিও ও বর্ণ মূর্তির পূজা করছে। এতে পৃথিবীতে জাতির সংখ্যা বেড়ে যাচ্ছে। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদের ভিত্তি ধর্মীয় বিশ্বাস তথা তাওহীদ হলে জাতির সংখ্যা হ্রাস পাবে এবং বিশ্ববাসী তওহীদ বিশ্বাসী ও অবিশ্বাসী এই দুই জাতির কোঠায় নেমে আসবে। এতে ভিন অঞ্চল, ভিন ভাষা, ভিন বর্ণ ও ভিন গোত্র বা গোষ্ঠীর প্রতিহিংসা বিদ্বেষ ও বিরূপ মনোভাব কমে আসবে এবং মানুষে মানুষের মনের দুরত্ব ও অনেকটা হ্রাস পাবে। ফলে দুনিয়াতে শান্তি শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হবে। ইকবাল বলেন:

فکر انساں بت پرستی بت گری   بر زمان در جستجوی پیکری
باز طرح آذری انداخت است   تازه تر پروردگاری ساخت است
کاید از خون اندر طرب   نام او رنگ است وبم ملک ونست
آدمیت کشته شد چون گوسفنده   پیش پائ ایں بت نا ارجمند

অনুবাদ:

মূর্তি নির্মাণ আর পূজা পার্বণ গোড়া থেকেই মানুষের অভাব
সন্ধান করে তারা কালে কালে নব নব মূর্তির।
ধরেছেন তারা এখন আবার আযবের পথ ,
দাঁড় করেছে আবার নবতর খোদা।
নতুন করছে আনন্দে তারা রক্তপাত করে;
তাদের খোদাসমূহের নাম হলো-বর্ণ দেশ আর বংশ।
বলি দেয়া হচ্ছে মানবতা অশুভ মূর্তির পদতলে
ভেড়া বকরির মত। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৬৩)

ইকবাল বলেন, মুসলমানের কর্তব্য হলো ঐ মূর্তিগুলো ভেঙ্গে ইসলামের সত্যিকার রূপ প্রতিষ্ঠা করা:

Dhaka University Institutional Repository

اس دور میں مے اور ہے جام اور ہے جم اور
ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور
تہذیب کے آذر نے ترشوائے صنم اور
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور
ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے
جوپیرہن اسکا ہے مذہب کا کفن ہے
یہ بت کہ تراشیدۂ تہذیب نوی ہے
غارت گر کاشانہ دین نبوی ہے
بازوں تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام تیرا دیس تو مصطفوی ہے
نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھادے
اے مصطفوی خاک میں اس بت کو ملا دے

ভাবনুবাদ:

বদলে গেছে রাজনীতি আর শাসননীতি এই যামানায়,
বদলে দিয়েছে শাসক, লোকের প্রতি দয়া আর জুলুমের রীতি।
বানিয়েছে অনেক মুসলিম দেশ আর সরকার নব নব পদ্ধতি,
করেছে নির্মান আযব সভ্যতা, অনেক অনেক মূর্তি।
বানিয়েছে পশ্চিমা সভ্যতা যত মাবুদ মানুষের তরে,
দেশ সবার সেরা, সেগুলোর মাঝে।
নব সভ্যতা সৃষ্ট এ মাবুদ
বিনাশক নবী ধর্মের তরে।
তোমার বাহু বলিয়ান তওহীদের শক্তিতে,
তোমার দেশ ইসলাম, তুমি উম্মত নবী মুস্তাফার।
দেখিয়ে দাও যুগকে আবার, পুরনো স্মৃতি
করে দাও ধুলিসাৎএ মূর্তিকে, হে নবীর উম্মত। (ইকবাল-১১, পৃ, ১৭)

ইতিহাস খ্যাত ব্যক্তিত্ব তারিক ইবনে যিয়াদ স্পেন উপকূলে পৌছে নিজেদের সব পোত এ জন্যই জ্বালিয়ে দিয়েছিলেন যেন কারো মনে দেশে ফেরার চিন্তা না জাগে। বস্তুত তিনি এ কাজটি করে দেশ চিন্তা ও দেশ পূঁজার মূলে আঘাত হেনেছিলেন।

ইকবাল ‘আলমূলুক লিল্লাহ’ শীর্ষক কবিতায় বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

طارق چو بر کنارہ اندلس سفینہ سوخت
گفتند کار تو به نگاہ خود خط است
خندید و دست خویش به شمشیر برد و گف
ہر ملک ملک ماست که ملک خدائے ماست

অনুবাদ:

জ্বালিয়ে দিলেন তারিক সবগুলো পোত স্পেন উপকূলে.
বললো লোকের এ কাজ ভ্রান্ত বুদ্ধিমানের চোখ।
হেসে বললেন তরবারি হাতে, আর উঠলেন বলে তিনি।
প্রত্যেক দেশ আমাদের দেশ আমাদের আল্লাহর দেশ। (ইকবাল –৫, পৃ. ১৫০)

অন্যত্র ইকবাল বলেন:

مومنان را گفت ان سلطان دین ص مسجد من این همه روئے زمیں

لامان از کردش نه اسمان مسجد مومن بدست دیگران

অনুবাদ:

মুমিনদের বললেন সেই দীনের সুলতান (স)
'জগত বক্ষ জোড়া আমার মসজিদ' |
রাখতে পারে না ধরে আমাদের, নভোমণ্ডলের আবর্তন,
মুমিনের মসজিদ যখন রয়েছে অন্যদের অধিকার। (ইকবাল-৫, পৃ. ২৫)

মুসলিম জাতীয়তাবাদের ভিত্তি দেশ না হলেও ইকবাল স্বদেশ প্রেম বিরোধী ছিলেন না| তিনি তাঁর পূর্ব পুরুষদের জন্মভুমি কাশমীরের উপর একাধিক কবিতা লিখেছিলেন| দেশপ্রেম একটি স্বভাবজাত বস্তু| তাই মানুষ জন্মভূমিকে ভাল না বেসে পারে না| তবে মনে রাখতে হবে, মুসলমান, দেশের বান্দা নয়,আদর্শে ও বান্দা। আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করাই মুসলমানের আদর্শ। ইসলাম সংস্কৃতি ও কৃষ্টি রক্ষা করে মুসলমানদের বসবাস করার জন্য ইকবাল একটি মুসলিম স্টেট তথা পাকিস্তানের প্রস্তাব করেছিলেন। মুসলমান আদর্শের জন্য স্বদেশ ত্যাগ করতে ও কুন্ঠাবোধ করে না|

আল্লাহর আদেশ রয়েছে:

الم تكن ارض الله واسعة فتهاجروا فيها

দুনিয়া কি এমন প্রশস্ত ছিল না, যেখানে তোমরা হিজরত করতে।] (৪:৯৭)

নবীজী এই আদর্শ পালন এবং একটি মুসলিম স্টেট প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য সামনে রেখেই নিজ জন্মভুমি মক্কা ত্যাগ করে মদীনায় গিয়েছিলেন। এই ত্যাগের উদ্দেশ্য ছিল বৃহত্তর ক্ষেত্রে ইসলাম প্রচার করা।

ইকবাল নবজজীর হিজরতের উদ্দেশ্য বর্ননা করে বলেন:

عقدہ قومیت مسلم کشود از وطن اقاشؤے ما هجرت نمود
حکمتش یک ملت گیتی نورد بر اساس کلمه تعمیر کرد
هجرت آئین حیات مسلم ست ای زاسباب ثبات مسلم است

অনুবাদ:

ত্যাগ করেন দেশ আমাদের মনিব (নবীজী)
করেছেন মুসলিম জাতীয়তাবাদ সমস্যার সমাধান।
ছিল উদ্দেশ্য তাঁর, এক বিশ্বজোড়া মিল্লাত গঠন।

Dhaka University Institutional Repository

রাখেন ভিত্তি এর কলেমায়ে তওহীদের উপর।

হিজরত মুসলিম জীবনের আইন,
এ হলো মুসলিমের প্রতিষ্ঠা লাভের কারণ। (ইকবাল ৫, পৃ. ১৩১)

ইসলামে পরামর্শ করে কাজ করার শিক্ষাদেয়:

পরামর্ম শব্দের আরবী প্রতিশব্দ হল শূরা। আর মজলিশে শূরা অর্থ পরামর্শ সভা। সুষ্টভাবে কাজ পরিচালনার জন্য ইষলামি রাষ্ট্রে খলিফাকে পরামর্শ দেওয়ার নিমিত্তে নির্দিষ্ট সংখ্যক লোকের সমন্বয়ে একটি মজলিশে শূরা গঠন করা অপরিহার্য। কুরআন মজীদে মুসলমানদের গূণাবলী ও কার্য পদ্ধতির আলোচনা প্রসঙ্গে ইরশাদ হয়েছে:

و امرهم شوري بينهم

এবং তারা নিজেদের মধ্যে পরামর্শের মাধ্যমে নিজেদের কর্ম সম্পাদন করে। (কুরআন:৪২: ৩৮)

و شاورهم في الامر فاذا عزمت فتونل علي الله

অন্য আয়াতে রাসুলুল্লাহ (সা.) কে পরামর্শ করার নির্দেশ দিয়ে আল্লাহ তা'য়ালা ইরশাদ করেন:
এবং কাজ কর্মে তুমি তাদের সাথে পরামর্শ করবে। তারপর তুমি কোন সংকল্প করলে আল্লাহর উপর নির্ভর করবে। (কুরআন: ৩:১৫৯)

পরামর্শের শধ্যে আল্লাহ তা'আলা রহমত ও বরকত রেখেছেন। এ কারণেই রাসুলুল্লাহ (মা) তাঁর উপর পরামর্শ গ্রহণ করা অপরিহার্য না হওয়া সত্বেও সাহাবায়ে কিরামের সাথে পরামর্শ করে কাজ করতেন। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলেন:

ما رايت احد انثر مشورة لا صحابه من النبي صلي الله عليه وسلم

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর চেয়ে নিজ সঙ্গী –সাথীদের সাথে অধিক পরামর্শ কারী আমি আর কাউকে দেখিনি। (ফাতহুল করীম-পৃ.২৪)

و ان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله

[যদি তুমি দুনিয়ার অধিকাংশ লোকের কথামত চল,
তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে।] (৬:১১৬)

এই আয়াতে বোঝা যায় যে, সংখ্যাধিক্যের রায়েও পদস্খলন ঘটতে পারে। এ ক্ষেত্রে সত্য থেকে বিচ্যুত হওয়ার আশংকা থাকে। ইসলাম সত্য অনুসরণের কথা বলে, সংখ্যাধিক্যের কথা নয়। পশ্চিমা গণতন্ত্রে ক্ষমতাসীন দল পার্লামেন্টে যা পাস করে, তাই আইনে পরিণত হয়। যদিও বস্তুত তা কোন কোন সময় সত্য বিরোধী হয়। কিন্তু ইসলামের বেলায় তা নয়। ইসলামে কুরআন-হাদিসের যে ভাবধারা আইন আছে, তা পার্লামেন্টের সংখ্যাধিক্যের রায়ে ও পরিবর্তিত হয় না। সে জন্য ইকবাল ও ঢালাওভাবে গণতন্ত্র সমর্থন করেননি। তার মতে পশ্চিমা গণতন্ত্র বস্তুত গণতন্ত্র নয়, তা সাম্রাজ্যবাদেরই নামান্তর।

ইকবাল বলেন:

اس راز کو اک مرد فرنگی نے کیا فاش ہرچند کہ دانا اسے کھ ولا نہیں کرتے
جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جس میں بندوں کو گنا کرتے ے نہیں تولا نہیں
کرتے

অনুবাদ:

ফাঁস করে দিয়েছেন জনৈক ইউরোপীয় লোক এ রহস্য,
খোলাখুলি বলেননি যদি ও তা তথাকার অন্যান্য বুদ্ধিমান
গণতান্ত্রিক সরকার-পদ্ধতিতে গণনাকরা হয় লোকদের,
কিন্তু হয় না তাদের মূল্যায়ন। (ইকবাল ১১, পৃ. ১৫০)

পরামর্শের উপকারিতা ও বৈশিষ্ট্য:

পরামর্শ করে কাজ করার বহু কল্যাণ নিহিত আছে। হযরত ইবন আব্বাস (রা.) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, পরামর্শ সংক্রান্ত আয়াতে নাযিল হওয়ার পর রাসুলুল্লাহ (সা.) বললেন, যদিও আল্লাহ তদীয় রাসুলের পরামর্শের কোন প্রয়োজন নেই তথাপিও আল্লাহ তায়ালা আমাকে পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছেন, এতে বহু রহমত ও বরকত রয়েছে। যারা পরামর্শ করে কাজ করবে তারা কতনো উত্তম দিক-নির্দেশনা থেকে বঞ্চিত থাকবে না। আর যারা পরামর্শ করে কাজ করবে না তারা কখনো ভ্রান্তি থেকে নিস্কৃতি পাবে না। (বায়হাকী-পৃ. ৪২৩)

হযরত কাতাদা (র) বলেন, রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতি ওহী নাযিল হওয়া সত্বেও তাঁকে তাঁর সাহাবীদের সাথে পরামর্শ করার হুকুম প্রদানের মধ্যে রহস্য হচ্ছে এই যে, যাতে তাদের চিত্ত প্রশান্তি লাভ করে অর্থাৎরাসুলুল্লাহ (সা.) এর এই কর্মপদ্ধতির উপর তাঁরা খুশি থাকেন এবং এটা যেন পরবর্তী উম্মতের জন্য আদর্শ হিসেবে বাকী থাকে। (রুহুল মা'আনী-২য় খণ্ড, পৃ. ৩১৮)

Dhaka University Institutional Repository

এ সম্পর্কে তাফসীরে রুহুল মা'আনী ও তাফসীরে বাহরে মুহীত' গ্রন্থদ্বয়ে উল্লেখ রয়েছে যে, এতে বহুবিধ উপকারিতা রয়েছে। যেমন ১. পরামর্শের দ্বারা সিদ্ধান্তটি আর ও দৃঢ় হয় ২. এতে রাষ্ট্রীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাপারে শূরার সদস্যগণ মনের প্রশান্তি লাভ করতে পারেন। ৩. নেতৃত্বের প্রতি ক্ষোভ সৃষ্টি হয়। ৪. উভয় দিক -নির্দেশনার উপর কাজ করা সম্ভব হয়। ৫. আল্লাহর রহমত নসীব হয়। ৬. আলোচনার ফলে জ্ঞান-বুদ্ধি বৃদ্ধি পায় এবং নিজের ভ্রান্তি সম্পর্কে অবহিত হয়ে তা সংশোধন করা যায়। সর্বোপরি পরামর্শ করে কাজ করলে লজ্জিত হওয়া থেকে এবং আত্মাহংকারে লিপ্ত হওয়া থেকে বাঁচা যায়। এ কারণেই বলা যায় যে, যে ব্যক্তি পরামর্শ করে কাজ করে সে লজ্জিত হয় না আর যে নিজের ব্যাপারে আত্মঅহংকারে লিপ্ত হলো সে পথভ্রষ্ট হয়। (আহকামিল কুরআন- ৪র্থ খন্ড, পৃ. ১৬১)

পরামর্শ করে কাজ করলে তাতে অনেক কামিয়াবী রয়েছে। এতে কাজের উদ্দেশ্য ও সফলতা হাসিল হয় সকলের মতামতের মাধ্যমে সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সহজ হয়। হানাহানি ও মনোমালিন্য হিংসা বিদ্বেষ কম হয়, পরস্পরের সম্পর্ক ভাল থাকে। কাজেই পরামর্শ করে কাজ করাই ইসলামের বিধান।

ইকবাল আরো বলেন:

گریز ازطرز جمهوری غلام پخته کارے شو که از مغز دو صد خر فکر انسانے نمی آید

অনুবাদ:

পালাও গণতন্ত্র থেকে, অনুগত হও জনৈক
অভিজ্ঞ ও বুদ্ধিমানের,

আসেনা একজন মানুষের চিন্তা, দু'শ গাধার মস্তিস্ক থেকে। (ইকবাল ৫- পৃ. ১৫৮)

কুরআনে আরো বলা হয়েছে:

قل لا يستوي الخبيث و الطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث

[বল, মন্দ ও ভাল এক নহে যদি মন্দের
আধিক্য তোমাকে চমকৃত করে।] (৫: ১০০)

এখানেও প্রতীয়মান হয় যে, সংখ্যাধিক্যের রায়ে অসত্যও মানুষের কাছে ভাল বলে গণ্য হতে পারে, কিন্তু কুরআনে অন্যত্র এও আছে:

و امرهم شوري بينهم

[তাদের ব্যাপারে তাদের সঙ্গে পরামর্শ করবে।] (২৬: ৩৮)

و شاورهم في الامر

[এবং কাজকর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর।] (৩: ১৫৯)

উক্ত উভয় আয়াতে পরামর্শ করে কাজ করার উপদেশ দেয়া হয়েছে। এতে পরোক্ষভাবে সীমিত গণতন্ত্রেরই সমর্থন মেলে। ইকবাল ছিলেন ইসলামি আদর্শে বিশ্বাসী। তাই বলা যায়, তিনিও অমিশ্র ওবিবেকবান মানুষ- গৃহীত গণতন্ত্রে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্রকে তিনি মোটেও পছন্দ করতেন না।

সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে লিখিত ইকবালের সব সাহিত্য পড়ার পর আমরা এ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে, তাঁর লক্ষ্য ছিল ইসলামি সমাজতন্ত্র প্রতিষ্টা করা। তিনি অমিশ্র ও সীমিত গণতন্ত্র বিরোধী ছিলেন না।

Dhaka University Institutional Repository

বিশ্ব পরিবর্তনশীল, এতে নিয়ত আল্লাহর সৃষ্টির প্রকাশ ঘটছে:

هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ثم استوي الي السماء فسواهن سبع سموات و هو بكل شيئ عليم

তিনি সে সত্তা যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীতে সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। এরপর তিনি আকাশ সৃষ্টির দিকে মনোযোগ দেন এবং সপ্ত আকাশকে পূর্ণতা দান করেন। আর তিনি সর্ববিষয়ে সর্বজ্ঞ। (কুরআন:২:২৯)

এ আয়াতের প্রথম অংশে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক মানুষের জন্য পৃথিবীর সবকিছু সৃষ্টি করেছেন। প্রাণী জগৎ, বস্তুজগৎও উদ্ভিদ জগতের উপর প্রভাব ফেলেছে পৃথিবীর অভিকর্ষ শক্তি। এ অভিকর্ষ বল না হলে এ গ্রহে অর্থাৎপৃথিবী পৃষ্ঠের সবকিছু শূন্যে ভেসে বেড়াতো।

আল্লাহ মানব জাতির জন্য পানি সৃষ্টি করেছেন পানি ব্যতীত মানুষের জীবন সম্পূর্ণ অচল এ কথা এখন আর কাউকে বুঝিয়ে বলতে হয়না। মানুষের জন্য দিন রাত অর্থাৎআলো আঁধার সৃষ্টি করেছেন । আল্লাহ মাটি সৃষ্টি করে তাতে উর্বরতা দান করেছেন। মাটিতে থাকা ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম,নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন, সালফার, আয়রন ফসল তাদের পুষ্টি সাধনের জন্য গ্রহণ করে। মাটিকে নমনীয় করে সৃষ্টি করেছেন যাতে মানুষ বিভিন্নভাবে উপকার লাভ করতে পারে। তাই মাটিকে খনন করা যায়, চাষাবাদ করা যায় । যথাযথভাবে ঘরবাড়ি ও রাস্তাঘাট নির্মাণ করা যায়। এছাড়া বহুবিদ কাজে মাটির ব্যবহার রয়েছে ফলে প্রকৃতি প্রতিনিয়ত:ই পরিবর্তন হচ্ছে। (তালেব- ৮৯, পৃ. ৬০)

يزيد في الخلق ما يشاء

[আল্লাহ যতটুকু চান, তাঁর সৃষ্টিতে তা সংযোজন করেন।] (৩৫:১)

كل يوم هو في شان

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ ক্ষণে ক্ষণে নতুন নতুন কর্ম সৃষ্টি করেন। (৫৫:২৯)

اذا قضي امرا فانما يقول له كن فيكن

[আল্লাহ যখন কোন বস্তুকে সৃষ্টি করার ইচ্ছা করেন, তখন বলেন: ''হয়ে যাও,তখন হয়ে যায়।''] (৩:৪৭)

অর্থাৎ বিশ্ব সৃষ্ট করে আল্লাহ তার সৃষ্টকর্ম থেকে নিবৃত্ত হননি, বরং সৃষ্টি প্রতিনিয়ত চলছে। ইসলাম বলে আল্লাহ তাঁর সৃষ্টিকর্ম থেকে বিরত হননি, তাঁর সৃষ্টিকর্ম সমাপ্ত ও হয়নি। ক্ষণে ক্ষণে তাঁর সৃষ্টি চলছে। সদ্য তিনি নতুন কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন। পুরনো বস্তু ধ্বংশ হয়ে যায় এবং তদস্থলে নতুন নতুন বস্তু সৃষ্টি হয়।

জার্মান দার্শনিক নিটশে (Nietsche) ১৮৪৪-১৯০০)। এর মতে বিশ্ব প্রথম থেকে পরিপূর্ণ অবস্থায় রয়েছে এবং সদা সর্বদা এর পুনরাবৃত্তি ঘটেছে; এ প্রক্রিয়ার শেষ নেই। নিটশের ধারণায়, এখন যা কিছু ঘটছে, তা ইতোপূর্বে অসংখ্য বার ঘটেছে এবং ভবিষ্যৎ অসংখ্য বার ঘটবে। প্রাচীন গ্রীক দার্শনিকদের ধারণা ছিল, বিশ্ব স্থবির, তা গোড়ার দিকে যা ছিল, এখনো সেভাবেই রয়েছে; তাতে কোন পরিবর্তন সাধিত হয় না। কিন্তু কুরআনের ভাষ্য মতে, বিশ্ব গতিশীল, স্থবির নয়।

ইকবাল বলেন:

یہ کائنات اب مے ناتمام مے شاید   کہ آرہی ہے دمادم صدائے کن فیکون

অনুবাদ:

এই বিশ্ব সম্ভবত এখনো রয়েছে অসম্পূর্ণ;
উঠছে বিশ্ব থেকে নিত্য সৃষ্টির আওয়াজ। (ইকবাল-১১, পৃ. ৪৪)

অন্যত্র ইকবাল বলেন:

گمان مبر که بپایان رسید کار مغان   بزار باده ناخورده در رگ تاک است

অনুবাদ

মনে করোনা, শুড়ি পীরের কাজ হয়ে গেছে সম্পন্ন;
আঙ্গুর লতায় এখনো সুপ্ত রয়েছে অসংখ্য ধরনের শরার,
যার স্বাদ তুমি এখনো উপভোগ করনি। (ইকবাল-৫, পৃ. ১০৮)

ইকবাল তাঁর কাব্যে প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, খোদাকে পাবার জন্য তাঁর সৃষ্টিকে গভীরভাবে দেখতে হবে এবং বারবার দেখতে হবে।

দেখো না এ পৃথিবীর বাগানকে আগন্তুকের ন্যায়,
এটি দেখার বস্তু, দেখ এ-কে বারবার । (ইকবাল-১১, পৃ. ৭১)

(খোদাকে উপলব্ধি করার জন্য ইকবাল সৃষ্টিকে বারবার দেখতে বলেছেন)অন্যত্র ইকবাল বলেন:

[দেখা যায় না খোদাকে বাহ্য চোখে , দেখতে হবে সৃষ্টিরাজিকে অন্তর চোখে।
বাধ্য হলাম করতে মহব্বতের অপরাধ,
বন্ধুর (খোদার) সৌন্দর্যের কারণে।
নেই কোন প্রয়োজন নতুন কৈফিয়তের রোজ হাশরে।
থাকে না গোপন কভু, হে সাথী!

Dhaka University Institutional Repository

ভালবাসার এই দৃষ্টিপাত,
এ হয় যদি অপরাধ, বলে দাও
তাকাবো কিভাবে তাঁহার প্রতি।] (ইকবাল-১১, পৃ. ৭৪)

অর্থাৎতোমরা মনে করোনা যে, আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে নিবৃত্ত হয়েছেন। এখনো তোমাদের জীবনের বহু মন্যিল সামনে রয়েছে, যেগুলোর সাথে তোমরা পরিচিত নও। মৃত্যু তোমাদের জীবনের শেষ নয়। আবার জিন্দা হবে। তোমরা চেষ্টা করলে চিরস্থায়ী জীবন লাভ করতে পারবে।

হালাল জীবিকা অর্জন করা সর্বোত্তম কাজ:

يايها الناس كلوا مما في الارض حلالا طيبا و لا تتبعوا خطوت الشيطن انه لكم عدو مبين

হে মানব জাতি ! পৃথিবীতে যা কিছু বৈধ ও পবিত্র খাদ্যবস্তু তা হতে তোমরা আহার কর এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (কুরআন:২:১৬৮)

يايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم

হে মু'মিনগণ! আমি তোমাদেরকে যে হালাল রিযিক দান করেছি তা থেকে আহার কর। (কুরআন:২:১৭২)

طلب كسب الحلال فريضة بعد فريَة

হালাল রুজি সন্ধান করা ফরযের পর একটি ফরজ । (মিশকাত, পৃ. ২০৩)

افضل الاعمال الكسب من الحلال

[হালাল পথে রুজি অর্জন করা সর্বেত্তম কাজ।] (কানযুল উম্মাল, হাদীস নং ৯১৯৪,)

ইকবাল হালাল রুজি সম্পর্কে বলেন:

خلوت و جلوت تماشاے جمال سر دیں صدق مقال اکل حلال

অনুবাদ:

সত্য কথা বলা, হালাল রুজি খাওয়া
এটাই ধর্ম পালনের সারবত্তা,
একাকীত্ব ও লোকালয়-উভয় স্থানে অবলোকন
করা যায় আল্লাহর সৌন্দর্য। (ইকবাল -৫, পৃ. ২৪০)

বৈধ উপায়ে রুজি অর্জন করলে সামাজিক জীবন ঝুঁকি থেকে রক্ষা পায়। এবং মানুষের হৃদ্যতা ও ভালবাসা লাভ করা যায় । আল্লাহর রহমত ও বরকত পাওয়া যায়। মানব জীবনের জীবিকার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী জীবিকার জন্য পরিশ্রম ও চেষ্টা –তদবীর করা প্রতিটি মানুষের কর্তব্য।

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ তা'আলা হলেন রিযিকদাতা | তবে রিযিক অন্বেষণ করার দায়িত্ব তিনি বান্দার উপর অর্পন করেছেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

فاذا قضيت الصلواة فانتشروا في الارض وابتغوا من فضل الله

সালাত সমাপ্ত হলে তোমরা পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়বে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ (রিযিক) সন্ধান করবে। (কুরআন:৬২:১০) ইকবাল আরো বলেন:

بر جماعت زيستن گردد وبال   تا ندائی نکته اکل حلال

অনুবাদ:

বৈধ উপায়ে রুজি করার মধ্যে কি যে হেকমত আছে,
তা না জানলে সামাজিক জীবন যাপন করা হবে ঝুঁকিপূর্ণ। (ইকবাল-৪৭, পৃ. ৩৭)

এ পৃথিবীতে মানুষের জন্য সবচাইতে বড় পরীক্ষা হলো রিযিকের পরীক্ষা; এর জন্য অধিকাংশ লোক তাদের নীতি ত্যাগ করে। যেই রিযিক মানুষকে ন্যায় পথ থেকে বিচ্যুত করে, তা অবলম্বন করার চাইতে মৃত্যুবরণ করাই শ্রেয়। জাতির দুর্ভাগ্য হলো, বলতে গেলে আজ অধিকাংশ ক্ষেত্রে সত্য কথা ও হালাল জীবিকা দৃষ্ট হয়না। নবীজী (স.)সত্য কথা ও হালাল জীবিকা এ দুটি বস্তুর উপরই ইসলামের ভিত্তি রেখেছেন। (আব্দুল্লাহ-৩৬, পৃ. ১১১) ইকবাল বলেন:

اے طائر لاہوتی ہے اس رزق سے موت اچھی
جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کوتاہی

অনুবাদ:

হে ঐশী পাখী (মুসলমান)! ঐ রিযিকের চাইতে মৃত্যু শ্রেয়,
যেই রিযিকের ফলে উড্ডয়নে (মানসিক বিকাশে) আসে সংকীর্ণতা| (ইকবাল-১১, পৃ. ৮৩)

হালাল উপায়ে জীবিকা অন্বেষণ করা ফরজের উপর আর একটি ফরজ। অর্থাৎ ইসলামে হালাল জীবিকা উপার্জনের উপর গুরুত্বারূপ করেছে। হালাল জীবিকা ছাড়া ইবাদত কবুল হয় না বলে ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। পক্ষান্তরে হারাম উপায়ে উপার্জিত অর্থ দ্বারা যে খাদ্য খাওয়া হয় এবংএর দ্বারা যে রক্ত তৈরি হবে রোজ কিয়ামত দিবসে সেই দেহকে আগুনে পুড়ানো হবে বলে বিধান রয়েছে। কাজেই ইসলাম হালাল উপায়ে উপার্জনের নির্দেশ দেয়।

একমাত্র চাষীই জমির ফসল ভোগ করার অধিকারী:

افریتم ما تحرثونه ام نحن الزرعون

[তোমরা যে বীজ বপন কর,সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি?
তোমরা কি তা অঙ্কুরিত কর না আমি অঙ্কুরিত করি?]

ইকবাল ''আল- আরদুলিল্লাহ'' (জমিন আল্লাহর) শীর্ষক এক কবিতায় কুরআনের উক্ত আয়াত থেকে ভাব নিয়ে বলেন, জমিনের মালিক আল্লাহ। তাই চাষী থেকে ফসল বা অর্থ আদায় করার কোন অধিকার জমিদারের নেই।

জমিদার স্বয়ং শ্রম দিয়ে জমি চাষ করে ফসল ভোগ করতে পারে। ইকবাল জমিদার ও জমিদারি এর কোনটাই সমর্থন করেন না। তাঁর মতে সরকার কৃষককে জমির চাষাবাদে সহায়তা করতে পারেন এবং এ কাজের বিনিময়ে চাষী থেকে শরা মোতাবেক সরকার তাঁর প্রাপ্য অংশ নিতে পারেন।

ইকবাল বলেন:

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تارکی میں کون؟
کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب؟
اے خدایا! یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں!
تیرے آبا کی نہیں تیری نہیں میری نہیں!

অনুবাদ:

কে বীজ পালন করে মাটির অন্ধকারে?
কে মেঘ উঠায় দরিয়ার তরঙ্গ থেকে
হে জমিদার! এই জমিন তোমার নয়, তোমার নয়,
তোমার বাপ-দাদার নয়, তোমার নয়, আমারও নয়। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৬১)

অন্যত্র ইকবাল বলেন:

جس کھیت سے دہقان کو میسر نہیں روزی
اس کھیت کے ہر خوشہ گندم کو جلا دو

অনুবাদ:

পায়না কৃষক তার যে ক্ষেত থেকে
জ্বালিয়ে দাও সে ক্ষেতের সকল শস্যকণা। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৪৯)

সাম্রাজ্যবাদ দেশে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে:

ان الملوك اذا دخلوا قربة افسدوها وجعلوا اعزة اهلها اذلة

রাজা - বাদশারা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে, তখন ওটাকে বিপর্যস্ত করে দেয় এবং তথাকার মর্যাদাবান ব্যক্তিদেরকে অপদস্থ করে।] (২৭:৩৪)

ইকবাল হযরত খিযির (আ.) কে কল্পনাকারে জিজ্ঞেস করেছিলেন: সাম্রাজ্যবাদ কী? প্রশ্নটা ছিল মূলত তদানীন্তন যুগের সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে | হযরত খিযির বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বললেন:

آبتاؤں تجھکو رمز آیہ آن آ ئین الملوک
ہے سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری
خواب سے بیدار ہوتا ہے ذرا محکوم اگر
پھر سلا دیتی ہے اسکو حکمراں کی ساحری
جادوں محمود کی تاثیر سے چشم آیاز
دیکھتی ہے حلقہ گردن میں ساز دلبری

ভাবানুবাদ:

এসো আমি তোমাকে বলছি ''ইন্নাল মূলুকা ''-এই আয়াতের মর্মতথা:
কোন জাতি যখন অন্য জাতির উপর বিজয় অর্জন করে,তখন
তারা অবিচার শুরু করে।
মনে রেখো এ হলো বিজয়ী শাসকদের
প্রতারণা বুঝতে পারে, তখন শাসকরা তাৎক্ষণিকভাবে
কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে তাদের ঘুমপাড়িয়ে দেয়।
সুলতান মাহমুদের জাদুর প্রভাবে আয়ায গোলামীকেও
মাহবুব সুলভ আচরণ তথা সুখ শান্তি বলে মনে করেছিল। (ইকবাল -১১, পৃ. ২৯৫)

অন্যত্র ইকবাল বাদশাদের জোর জুলুম বর্ণনা করে বলেন:

اسکندر و چنگیز کے ہاتھوں سے جہاں میں
سو بارہ ہوئی حضرت انساں کی قبا چاک
تاریخ امم کا یہ پیام ازلی ہے

Dhaka University Institutional Repository

صاحب نظراں! نشۂ قوت ہے خطرناک

اس سیل سبک سیر و زمیں گیر کے آگے

عقل و نظر و علم و ہنر ہیں خس و خاشاک

ব্যাখ্যা:

দুনিয়াতে আলেকজাণ্ডার আর চেঙ্গিসের মত জালিম বাদশাদের হাতে।
মানুষের পোষাক-আশাক ছিন্ন-ভিন্ন হয়েছে, মান ইজ্জত লুন্টিত হয়েছে।
শক্তিধর লোকেরা ক্ষমতার মোহে পড়ে বারবার নির্বিচারে মানুষের
রক্ত ঝরিয়েছে, মানুষের সভ্যতা পদদলিত করেছে।
জাতিসমূহের ইতিহাস আমাদেরকে গোড়া থেকেই এ পয়গাম দিয়ে আসছে।
হে বুদ্ধিজীবী! মনে রেখো-শক্তির নেশা বড় ভয়ঙ্কর।
ক্ষমতা কারো হাতে আসলে তার কাছে ভাল মন্দের বিচার থাকে না।
শক্তির প্রবাহ খুবই দ্রুতগামী ও প্রকট, সব জায়গায় ছড়িয়ে যায়।
এর সন্মুখে বুদ্ধি, অভিজ্ঞতা, জ্ঞান- গরিমা তৃণের মত ভেসে যায়। (ইকবাল ১১, পৃ. ২৩)

সৃষ্ট জগতকে আল্লাহর জ্ঞান থেকে খুব সামান্য জ্ঞানই দেয়া হয়েছে:

وما اوتيتم من العلم الا قليلا

এবং তোমাদেরকে সামান্য জ্ঞানই দেওয়া হয়েছে।] (১৭:৮৫)

Dhaka University Institutional Repository

فوجد عبدا من عبادنااتينه رحمة من عندنا و علمنه من لدنا علما

[অতএব তারা (মুসা খিজির ও তার খাদেম) সাক্ষাৎ পেল আমার বান্দাদের মধ্য থেকে একজনের (খিজির) ,যাকে আমি আমার নিকট থেকে অনুগ্রহ দান করেছিলাম এবং আমার নিকট থেকে শিক্ষা দিয়েছিলেন এক বিশেষ জ্ঞান।] (১৮:৬৫)

সুরাহ কাহাফে বর্ণিত আছে: হযরত মুসার (আ.) সাক্ষাৎ হলো আল্লাহর এক বান্দার (খিযিরের)) সাথে, যাঁকে আল্লাহ বিশেষ জ্ঞান দান করেছিলেন। হযরত মুসা তাঁর সহচর্যে ঐ জ্ঞান লাভের ইচ্ছা ব্যক্ত করলেন। খোদার ঐ খাস বান্দা বললেন, ''আপনি ধৈর্য ধারণ করতে পারবেন না।'' যা হোক, মুসা (আ.) এবং আল্লাহর ঐ বান্দা সফরে বেরুলেন। ঐ সফরে তিনটি ঘটনা ঘটলো তাঁরা সমুদ্র উপকুলে পৌছে একটি নৌকায় আরোহন করলেন। আল্লাহর ঐ খাস বান্দা নৌকায় চড়ে তাতে একটি ছিদ্র করে দিলেন। হযরত মুসা তা দেখে বলে উঠলেন: যাত্রীদের ডুবিয়ে মারার জন্যই কি আপনি নৌকায় ছেঁদা করে দিলেন? তাঁরা এগিয়ে চলেন এবং এক বালককে দেখতে পেলেন। আল্লাহর ঐ খাস বান্দা তাকে হত্যা করলেন। হযরত মুসা (আ.) বলে উঠলেন: আপনি একজন নিষ্পাপ লোককে হত্যা করলেন, অথচ সে কাউকে হত্যা করেনি। আপনি কত খারাপ কাজ করলেন।

তাঁরা আরো অগ্রসর হয়ে এক গ্রামের লোকজনকে বললেন, তোমরা আমাদের খাবারের ব্যবস্থা কর। তারা অস্বীকার করলো। ঐ গ্রামে একটি প্রাচীর ভগ্নোন্মুখ ছিল। আল্লাহর ঐ খাস বান্দা তা মেরামত করে দিলেন। হযরত মুসা (আ) বললেন: আপনি চাইলে তো এই পরিশ্রমের কিছু বিনিময় নিতে পারতেন।এখানে এসে হযরত মুসা (আ.) এবং আল্লাহর ঐ খাস বান্দার (খিযিরের) সফর শেষ হয়ে গেল। বিদায় বেলায় ঐ খাস বান্দা তাঁর তিনটি কাজের বিবেক গ্রাহ্য উত্তর দিলেন। উত্তরে তিনি বললেন, নৌকায় তিনি এজন্য ছিদ্র করলেন যে, এক জালিম বাদশা বিনামুল্যে জনসাধারণের নৌকাসমূহ আটক করছিল। ঐ নৌকা আটক করলে কতক মিসকীনের রুজির পথ বন্ধ হয়ে যেতো। (আব্দুল্লাহ-১০, পৃ. ৯৯)

ঐ বালককে তিনি এজন্য হত্যা করেছিলেন যে, সে বড় অবাধ্য আচরণ ও কুফুরী কাজ করে সৎ মাতাপিতাকে কষ্ট দিতো। তিনি আশা ব্যক্ত করেন যে, আল্লাহ তাকে ভাল সন্মান দেবেন।

প্রাচীর এ জন্য মেরামত করে দিলেন যে, ঐ প্রাচীরটি সেই শহরের দুই এতীমের সম্পত্তি ছিল এবং ঐ প্রাচীর তলে তাদের জন্য অর্থ সম্পদ পুঁতে রাখা হয়েছিল। প্রাচীরটি ধ্বসে পড়লে বদ লোকেরা ঐ সম্পদ লুটেপুটে নিয়ে যেতো।

কুরআন মজিদে ঘটনাগুলোর বর্ণনা করার পেছনে এটা বোঝানো উদ্দেশ্য ছিল যে আমরা বাহ্য চোখে যা দেখি, তা কোন কর্মের প্রকৃত কারণ নাও হতে পারে। কতক কাজ বাহ্যত খারাপ বলে মনে হলেও বস্তুত তাতে মঙ্গল নিহিত থাকে। তার মানে-আল্লাহ মানুষকে সামান্য জ্ঞানই দান করেছেন। ইকবাল কল্পনা রাজ্যে খিযির (আ.) এর সাথে দেখা করে তাঁর নিকট কতক প্রশ্নের উত্তর চাইলেন। খিযির তিনি বললেন:

اے تری چشم جہاں بیں پر وہ طوفاں آشکار

جن کے ہنگامے ابھی دریا میں سوئے ہیں خموش

کشتی مسکین و جان پاک و دیوار یتیم

علم موسی علیہ السلام بھی ہے تیرے سامنے حیرت فروش

چھوڑکر آبادیاں رہ تا ہے تو صحرا نورد

Dhaka University Institutional Repository

زندگی تیری ہے روز، شب، فردا و دوش

অনুবাদ:

আপনার জগত দ্রষ্টা চোখে স্মিত রয়েছে ঐ সব ঝড়,
যে সবের সম্ভাবনা এখন চুপচাপ ঘুমিয়ে আছে, দরিয়ার তলদেশ।
মিসকীনের নৌকা ছেদন. নিষ্পাপ বালক হত্যা,
এতীমের দেয়াল মেরামত
যে তত্ব ছিল এসবের পেছনে,
হার মেনেছিল তাতে মুসার জ্ঞান,আপনার সন্মুখে ভারি বিস্ময়ে।
ঘুরে বেড়ান আপনি মরুতে, আবাদী ছেড়ে,
নেই দিন রাত, নেই আজ-কাল আপনার জীবনে। (ইকবাল- ১১, পৃ. ২৮৯)

এরপর ইকবাল হযরত খিযিরের কাছে জীবন, সাম্রাজ্যবাদ, পুঁজিবাদ ও শ্রম সম্পর্কে অনেক কিছু জিজ্ঞাসাবাদ করেন। খিযির সেসব প্রশ্নের উত্তর দেন।

উচ্চাকাঙ্খাই উন্নতির ও সাফল্যের চাবিকাঠি:

ان الله يحب معالي الامور و يبغض سفسافها

[আল্লাহ উচ্চাকাঙ্খা ভালবাসেন আর হীন প্রবৃত্তিকে অপছন্দ করেন।] (কানযুল উম্মাহ হাদীস নং ৪৩০২১)

Dhaka University Institutional Repository

উচ্চাকাঙ্খা ও উচ্চ লক্ষ্য মানুষকে উন্নতির পথে নিয়ে যায়। উচ্চাভিলাষীর স্থায়ী কোন লক্ষ্যবস্তু থাকে না। একটি লক্ষ্যে পৌঁছামাত্রই সে অপর একটি লক্ষ্যবস্তু স্থির করে নেয়। তার লক্ষ্যবস্তু বারবার দূরে সরে যায়। সে নতুন নতুন আইডিয়াল স্থির করে নেয় এবং এমনি করে এক উন্নতির পর অধিকতর উন্নতির পথে ধাবিত হয়।

چہ کنم فطرت من بہ مقام در نسازد
دل ناصبور دارم چو صبا بہ لالہ زارے
چو نظر قرار گیرد بہ نگار خوبیرے
تپد آں زماں دل من پئے خوبتر نگارے

অনুবাদ:

কি করবো আমি! থাকতে চায় না এক জায়গায় আমার মন,
মন আমার অস্থির বাগানের ভোরের বাতাসের মতন
পড়ে দৃষ্টি আমার কোন সুন্দরী প্রেমিকার উপর ক্ষণেকের তরে,
ছুটে যায় তা পরক্ষণে অধিকতর সুন্দরী প্রেমীকার পেছনে। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৪৮)

উচ্চাভিলাষী কাফেলা কোন মন্‌জিলে থামলেও পরক্ষণেই তারা বুঝতে পারে যে, বিরতির চাইতে অনর্গল সফরের মধ্যেই বেশী আনন্দ রয়েছে। ‘সুলতান টিপুর অসিয়ত’ শীর্ষক কবিতায় ইকবাল বলেন:

تو رہ نورد شوق بے منزل نہ کر قبول!
لیلے بھی ہم نشیں ہو تو محمل نہ کر قبول!
اے جوئے آب بڑھ کے ہو دریائے تند و تیز!
ساحل تجھے عطا ہو تو ساحل نہ کر قبول!

অনুবাদ:

ইশ্‌কের পথের পথিক তুমি, থাকবে না কোন মন্‌জিলে,
বসে যদি লায়লীও পাজরে তোমার, নেবেনা কভু তোমার জিনে।
হে ঝরনা! আগে চল, হয়ে যা উতলা নদী,
কুলে নিতে চাইলে কেউ, করবে না তা কবুল। (ইকবাল-১১, পৃ.৭১)

ইকবালের মতে, আল্লাহর পথের পথিকের আকাঙ্খার শেষ নেই। তাই তিনি আল্লাহর কাছে এ দুয়াই করছেন যে, তাঁর আকঙ্খার সফর যেন কোন দিন শেষ না হয়।

মুমিন কাফেরের প্রতি কঠোর, মুমিনের প্রতি দয়ালু:

محمد رسول الله والذين معه اشداء علي الكفر رحماء بين هم

[মুহাম্মদ আল্লাহ-ও রসুল; তাঁহার সহচরগণ কাফেরদের প্রতি কঠোর এবং নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি দয়ালু।] (৪৮:২৯)

Dhaka University Institutional Repository

মুসলমান জাতি কাফেরদের সাথে যুদ্ধ করার সময় তাদের প্রতি কঠোর হয়। যুদ্ধ যখন বেধে যায়, তখন মুসলমানদের জন্য পৃষ্ট প্রদর্শন করা হলো আল্লাহর আযাবকে ডেকে আনা। ইকবাল ছিলেন সত্যের নকীব। তিনি সব সময় অসত্যের সাথে লড়ে যাওয়ার শিক্ষা দেন।

তিনি ছিলেন:

در رہ دیں سخت چوں الماس زی
دل بحق بربند بے وسواس زی

যাপন কর জীবন, ধর্মের পথে হীরার মত কঠোর হয়ে,
বেঁধে রাখ মনকে আল্লাহর সাথে, বেঁচে থাক
শয়তানের কুমন্ত্রণামুক্ত হয়ে। (ইকবাল-১১, পৃ. ২৪০)

আল্লাহ ঐ লোকদের পছন্দ করেন, যারা ধর্মের রক্ষণাবেক্ষণে শিশা গলানো দেয়ালের মত দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান থাকে। ইকবাল বলেন:

بخود خزیده و محکم چو کو هساران زی
چو خس مزی که هوا تیز وشعله بیباک است

অনুবাদ:

বেঁচে থাক পর্বত শ্রেণীর মত শক্ত ও দৃঢ় হয়ে,
বেঁচে থেকো না খড়কুটার মত, হাওয়া তেজ, অগ্নিশিখা লেলিহান।
(দুশমন তোমাকে বিলীন করে দিতে চায়, তাই দৃঢ় হও) (ইকবাল -১১, পৃ. ১০৮)

ইকবাল মনে করেন, ফুলের কাটায় যদি রেশমের বৈশিষ্ট্য থাকে, তবে ফুলকে রক্ষা করা যাবে না;

حفاظت پھول کی ممکن نہیں ہے اگر کانٹے میں بوخوئے حریری

ইকবাল অন্যত্র মুমিনের বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করে বলেন, মুমিন বন্ধুদের মাঝে রেশমের মত কোমল হয়, কিন্তু যুদ্ধের সময় স্টীল লোহার মত শক্ত হয়। মুমিন কখনো শিশির ফোটার মত স্নিগ্ধ হয়, আবার কখনো ঝঞ্ঝা বায়ুর আকার ধারণ করে: (ইকবাল-১১, পৃ.২৫৩)

ہو حلقہ یاراں تو بریشم کی طرح نرم
رزم حق وباطل ہو تو فولاد ہے مومن!

অনুবাদ:

স্নিগ্ধ হয় মুমিন বন্ধু সভায় রেশমের ন্যায়,
পরিণত হয় স্টীল লোহার সত্য অসত্যের রণে। (ইকবাল-১১, পৃ. ৪১)

جس سے جگر لالہ میں ٹھنڈک ہو وہ شبنم
دریاؤں سے دل جس کے دہل جائیں وہ طوفان!

অনুবাদ:

মুমিন শিশির ফোঁটায় মত, যা জুড়ায় লালা ফুলের প্রাণ,
নেয় আবার তা ঝড়ের রূপ, কেঁপে উঠে যাতে দরিয়ার দিল। (ইকবাল-১১, পৃ. ৫৭)

Dhaka University Institutional Repository

মুমিন অসত্যের সামনে তলোয়ার এবং সত্য রক্ষায় ঢালস্বরূপ হয়ে থাকে।মুমিন মাহফিল মন মোহনিয়া সুরে গান গেয়ে সভাস্থ সকলের মনে আনন্দ দেয়,আবার যুদ্ধের ময়দানে লোহা গলানো তলোয়ারের রূপ পরিগ্রহ করে।

اگر ہ و جنگ تو شیران غاب سے ٹبھکر

اگر ہو صلح او رعنا غزال تا تار

پیش باطل تیغ و پیش حق سی

امر و نہی او عیار خیر و شر

ساز او در بزم با خاطر نواز

سوز او در روم با این گداز

در گلستاں با عنادل ہم صفیر

در بیاباں جرہ باز صید گیر

অনুবাদ:

হিংস্র হয় যুদ্ধের সময় বন সিংহের চাইতেও,
কোমল হয় তাতারী হরিণের মত সন্ধির সময়ে।
মুমিন হয় তরবারি অসত্যের সামনে,
সত্যের সামনে হয় ঢাল,
আদেশ-নিষেধ তার ভাল মন্দের প্রতীক।
জুড়ায় মন সভায় তার গানের সুর,
ধারণ করে লোহার গলানো করবারির আকার
তার মনের উত্তাপ, যুদ্ধের সময়ে।
গায় গান মুমিন বাগানে, বুলবুলের সমস্বরে
শিকারীর রূপ নেয়, সে নব বাজ পাখির বনে। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৭৪)

চেষ্টা ও কষ্টসহিষ্ণুতাই হল সৌভাগ্যের প্রসূতি:

ليس للانسان الاماسعي

[চেষ্টা ছাড়া মানুষ কিছুই পায়না ।] (৫৩:৩৯)

চেষ্টা শ্রমসহিষ্ণুতা সন্দুর জীবন তথা ভাগ্য রচনার মূল উৎস। শ্রমই কল্যাণ বয়ে আনে । চেষ্টা ও শ্রম ব্যতীত কোন জাতি উন্নতি লাভ করতে পারে না। কথায় বলে পরিশ্রমে ধন আনে, পুণ্যে আনে সুখ' । এ কথা ধ্রুবসত্য । পরিশ্রম দ্বারা সৌভাগ্যের স্বর্ণশিখরে আরোহণ করা যায়। পরিশ্রমী ব্যক্তি আত্মনির্ভরশীল ও স্বাবলম্বী

Dhaka University Institutional Repository

হয়। শ্রম ছাড়া শ্রী হয় না। বিদ্যা, যশ- মান, প্রতিপত্তি ইত্যাদি সব কিছুর মূলে রয়েছে নিরলস সাধনা। পরিশ্রম ছাড়া ধন-সম্পদ বা ঐশ্বর্য অর্জন করা যায় না। শ্রম দ্বারা ভাগ্যের চাকা এমনভাবে গোরানো সম্ভব যা শ্রমবিমুখ মানুষের কাছে অলৌকিক মনে হবে। পৃথিবীর যে জাতি যত বেশি পরিশ্রমী, সে জাতি তত বেশি উন্নত। ডা. লুৎফর রহমান বলেন, 'যে জাতির মানুষ শ্রমশীল, যারা জ্ঞান সাধনায় আনন্দ অনুভব করে, তারা জগতে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করে।' প্রাণি জগতের সবচেয়ে পরিশ্রমী কীট মৌমাছিও তার নিরলস শ্রম ও আত্মত্যাগের মাধ্যমে মধুপূর্ণ মৌচাক তৈরি করতে সমর্থ হয়। যে কৃষক রোধ বৃষ্টি সহ্য করে কঠোর পরিশ্রম করতে পারে , সে-ই কেবল সোনার ফসল পেতে পারে। শ্রমবিমুখ ব্যক্তি কোনদিনই তাঁর জীবন গড়তে পারে না। (দিলারা-৯০, পৃ. ১২৩)
ইকবাল বলেন:

عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی
یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے

অনুবাদ:

গড়ে উঠে জীবন কর্ম দ্বারাই,
বেহেশত আর দোযখ ও
মাটির মানুষ জন্মসূত্রে নয় নুরের তৈরী ফেরেশতা,
নয় আগুনের তৈরী শয়তান। (ইকবাল-১১, পৃ. ৩১৩)

ইকবাল একটি ঈগল ও একটি শাহীন বাচ্চার কথোপকথনের মাধ্যমে শিক্ষা কষ্ট সহিষ্ণুতার দিয়েছেন।

بچہ شاہیں سے کہتا تھا عقاب سالخورد
اے ترے شہپر پہ آساں رفعت چرخ بریں!
ہے شاباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام
سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگبیں!
جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر
وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں!

ভাবনুবাদ:

বলছিল শাহীন বাচ্চাকে এক বুড়ো ঈগল,
দান করুন খোদা এমন ক্ষমতা তোমার বাজুতে,
সহজ হয় তোমার পক্ষ যাতে উড়ে যাওয়া উর্দ্ধাকাশে।
যৌবন কি ! জ্বলবে মানুষ রক্তের উষ্ণতায়
(সদা চেষ্ঠা ও পরিশ্রম করবে)
তিক্ত জীবন হবে তার মধুর এই কঠিন শ্রমে।
হে বৎস! যে স্বাদ মেলে কবুতরের উপর ঝাপটা মারায়,)
তা মেলেনা বোধ হয় কবুতরের রক্তেও । (ইকবাল -১১, পৃ. ১৬)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহকে চিনার জন্য জগতের সৃষ্টি:

كنت كنزا مخفيا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق وتعرفت اليهم فعرفوني

আল্লাহ বলেন:

[আমি ছিলাম গুপ্ত ধন! আমি পরিচিত হতে চাইলাম! তাই বিশ্ব সৃষ্টি করলাম এবং বিশ্বের সামনে প্রকাশ পেলাম ! তারা আমায় চিনতে পারলো।] (হাদীসে কুদসী, পৃ. ২৭৩)

ইকবাল বলেন:

بضميرت آرميقم تو بجوش خود نمائى
بكفاره بر فگندى در آب دار خود را
هه وانجم از تو دارد گله باشنيده باشمى
كه بخاك تيره ما زده شوار خود را

অনুবাদ:

হে খোদা আরামে ছিলাম আমি তোমার অন্তরে,
ফেলে দিলে ধরায় তোমার চকচকে মুক্তা (মানুষ)-কে আত্ম প্রকাশের জোশে
চিনতে পেয়েছ বোধ হয়-লড়েছে তোমার বিরুদ্ধে
চাঁদ-সেতারার অনেক অভিযোগ: (ইকবাল-৫, পৃ. ৭৫)

''দীপ্ত করেছ তুমি আমাদের অন্ধকার মাটিকে আপন নুর দিয়ে।''

ইকবাল অন্যত্র আল্লাহকে উদ্দেশ্য করে বলেন: আসরা পরস্পর মুখাপেক্ষী। তোমাকে ছাড়া আমরা উন্মচিত হতে পারি না।

میں تجھے بے حجاب کر درکا تو مجھے بے حجاب کر

অনুবাদ: আমি তোমাকে উন্মোচিত করবো, তুমি আমাকে উন্মোচিত কর।

আল্লাহর সৃষ্টিতেই তাঁর পরিচয়

আল্লাহকে চর্মচক্ষে দেখা সম্ভব কি-না, সে সম্পর্কে কুরআন বলে: ''লাতুদ্‌রিক্‌হুল আবসারো ওয়াহুয়া ইয়ুদ্‌রিকুল আবসারা''-মনুষ্য চক্ষু আল্লাহকে দেখতে পায়না। কিন্তু তিনি চক্ষুসমূহকে দেখতে পান।

আল্লাহর অস্তিত্বের ব্যাপকতা ওতার সর্ববিরাজমানতা বর্ণনা করে কুরআনে বলা হয়েছে:''ওয়াসিয়া কুরসিয়্যুহুস-সামাওয়াতে ওয়াল আরদা''-আল্লাহর আসন জুড়ে রয়েছে আকাশ জমীন।ইহ জগতে আল্লাহকে দৈহিকভাবে দেখা সম্ভব নয় বলে কি তাঁকে কোনভাবেই অনুইভব করা বা অবলোকন করা যাবে না-এ বিষয়টির একটি স্বচ্ছ ধারণা কুরআন মজীদেই দেয়া হয়েছে: জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই আল্লাহর অস্তিত্বের নিদর্শন রয়েছে আকাশ জমীনের সৃষ্টিতে, দিবা-রাত্রির পরিবর্তন এবং সাগরের চলমান জলযানে।

নজরুল ইকবাল অবশ্যই জানতেন, খোদার অস্তিত্ব চর্মচক্ষে দৃশ্যমান না হলেও তাঁর সৃষ্টিরাজি এবং তাদের সৌন্দর্যের মধ্য দিয়ে মানুষ তাঁকে অবলোকন করছে, অনুভব করছে। এই তত্বকেই সুফীদের ভাষায় 'ওয়াহদাতুশ শুহূদ' অর্থাৎএক আল্লাহকে বহুরূপে অবলোকন বলা হয়।

নজরুল মনে করেন, আল্লাহ দৈহিকভাবে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তাঁকে তাঁর সৃষ্টিরাজির সৌন্দর্য উপভোগের মধ্য দিয়ে উপলব্ধি করা যায়। তিনি এক বটে, কিন্তু তাঁকে বহুরূপে বহু পাত্রে চেনা যায়, বোঝা যায়, উপভোগ করা যায়, অনুভব করা যায়।

নজরুলের ভাষায়:

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম সত্য, প্রেম পাত্র বহু অগণণ,
-চাই, বুকে পাই, তবু কেন কেঁদে ওঠে মন।
মদ সত্য,পাত্র সত্য নয়,
যে-পাত্রে ঢলিয়ে খাও সেই নেশা হয়!
চির সহচরি!
এতদিনে পরিচয় পেনু, মরি মরি!
আমারি প্রেমের মাঝে রয়েছে গোপন,
বৃথা আমি খুঁজে মরি’ জন্মে করিনু রোদন।
প্রতি রূপে , অপরূপা, ডাকো তুমি,
চিনেছি তোমায়,
যারে বাসবো ভালো –সেই তুমি,
ধরা দেবে তায়!
প্রেম এক, প্রেমিকা সে বহু,
বহু পাত্রে ঢেলে পি’ব সেই প্রেম-
সে শরাব লোহু!
তোমারে করব পানড, অ-নামিকা, শত কামনায়। (নজরুল -৯১, পৃ. ১০২)

ইকবাল তাঁর কাব্যে অনুরূপ ভাব প্রকাশ করেন। তিনি বলেন: খোদাকে পাবার জন্য তাঁর সৃষ্টিকে গভীরভাবে দেখতে হবে এবং বারবার দেখতে হবে:

দেখো না এ পৃথিবীর বাগানকে আগন্তুকের ন্যায়,
এটি দেখার বস্তু, দেখ এ-কে বারবার। (ইকবাল ১১, পৃ. ৭১)

(খোদাকে উপলব্ধি করার জন্য ইকবাল সৃষ্টিকে বারবার দেখতে বলেছেন।

অন্যত্র ইকবাল বলেন:

نہ او را بے نمود ما کشودے
نہ ما را بے کشود او نمودے

অনুবাদ:

আমাদের অস্তিত্ব না হলে খোদা হতো না,
খোদার অস্তিত্ব না হলে আমাদের অস্তিত্ব হতো না। (ইকবাল-১১, পৃ. ২২৩)

ইকবাল আরো বলেন:

گدائے جلوہ رفتی بر سر طور
کہ جان تو ز خود نا محرمے بس
قدم در جستجوئے آدمی زن
خدا ہم در تلاش آدمی ست

অনুবাদ:

Dhaka University Institutional Repository

তার দীদারের জন্য গেলে তুমি তুর পাহাড়ে,
তোমার প্রাণ তোমাকেই চিনেনা বটে।
মানুষের সন্ধানে গ্রহণ কর পদক্ষেপ,
খোদাও রয়েছেন মানুষের তালাশে। (ইকবাল -১১, পৃ. ৩৪)

কায়িক শক্তি ও জ্ঞান-শক্তি, জীবনে উভয়েরই প্রয়োজন রয়েছে:

ان الله اصطفه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

[আল্লাহ-ই তালুতকে তোমাদের জন্য বাদশা মনোনীত করেছেন এবং তিনি তাঁকে জ্ঞানে ও দেহে সমৃদ্ধ করেছেন।] (১:২৪৭)

তালুতকে আল্লাহ জালুতের উপর বিজয়ী করেছেন। কারণ তিনি তালুতকে জ্ঞানশক্তি ও কায়িক শক্তি উভয় শক্তির দিয়ে বলীয়ান করেছিলেন। এতে প্রতীয়মান হয় যে, জীবনযুদ্ধে জ্ঞান- শক্তির পাশাপাশি কায়িক শক্তির ও প্রয়োজন রয়েছে।

ইকবালের মতে শক্তি (জালাল) ও সৌন্দর্যবোধ (জালাল) উভয় গুণের প্রয়োজন রয়েছে। মানুষের ও জাতির জীবনে উভয় গুণের সমাবেশ ঘটলেই তা হবে প্রশংসনীয় । ইকবালের এখানে শক্তি ছাড়া সৌন্দর্য অর্থহীন, আবার সৌন্দর্য ছাড়া নিছক শক্তি সৌন্দর্য অর্থহীন,আবার সৌন্দর্য ছাড়া নিছক শক্তি জুলুমের প্রতীক ও সভ্যতার পরিপন্থী। শক্তির প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা করে ইকবাল বলেন:

ب ے معجزہ دنیا میں ابھرتی نہیں قومیں
جو ضرب کلیمی نہیں رکھتا وہ ہنر کیا

অনুবাদ:

মুজিযা ছাড়া করে না উন্নতি দুনিয়ার কোন জাতি,
আর্টের কি দাম, যদি না থাকে তাতে মুসার মার। (ইকবাল-১১, পৃ. ১১৭)

অন্যত্র ইকবাল বলেন:

رشی کے فاقوں سے ٹوٹا نہ برہمن کا طلسم
عصا نہ ہو تو کلیمی ہے کار بے بنیاد!

অনুবাদ:

ঋষির*অনশনে টুটেনি ব্রাহ্মনের *জাদুমন্ত্র
লাঠি না হলে মুসার নুবুওয়াত হয় অকেজো। (ইকবাল -১১, পৃ. ১০২)

মুসলমানের ইমারাত সমূহের মধ্যে ইকবাল ঐ ইমারতেই বেশী পছন্দ করতেন, যাতে হযরত উমরের 'মসজিদ কুওয়াতুল ইসলাম'এর ন্যায় স্থাপত্য শিল্পের পাশাপাশি শক্তির প্রতীক ও রয়েছে।

শক্তি ছাড়া সৌন্দর্য নিরর্থক এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে ইকবাল বলেন:

مری نظر میں یہی ہے جمال و زیبائی

Dhaka University Institutional Repository

کہ سر بسجدہ ہیں قوت کے سامنے افلاک!

نہ ہو جلال تو حسن و جمال بے تاثیر

نرا نفس ہے اگر نغمہ ہو نہ آتش ناک

অনুবাদ:

মাথা নোয়ায় আকাশ শক্তির সামনে:
রয়েছে সৌন্দর্য আমার কাছে এই দৃশ্য পটে।
না হলে শক্তি, সৌন্দর্য হয় অকেজো।
না থাকে গানে যদি উষ্ণতা, তবে তা হয় নিছক নি:শ্বাস। (ইকবাল-১১, পৃ. ১২২)

দুর্বলতার শক্তি আকস্মিক মৃত্যু এ বিষয়টি বোঝাতে গিয়ে ‘আবুল আ’লা আল মাআররী’ (৯৭৩-১০৫৭ খ্রী.) শীর্ষক কবিতায় ইকবাল বলেন:

کہتے ہیں کبھی گوشت نہ کھاتا تھا معری

پھل پھول پہ کرتا تھا ہمیشہ گزر اوقات

اک دوست نے بھونا ہوا تیتر اسے بھیجا

شائد کہ وہ شاطر اسی ترتیب سے ہو مات

یہ خوانِ تر و تازہ معری نے جو دیکھا

کہنے لگا وہ صاحبِ غفران و لزومات

اے مرغکِ بیچارہ ذرا یہ تو بتا تو

تیرا وہ گناہ کیا تھا یہ ہے جس کی مکافات

افسوس صد افسوس کہ شاہیں نہ بنا تو

دیکھے نہ تیری آنکھ نے فطرت کے اشارات

تقدیر کے قاضی کا یہ فتویٰ ہے ازل سے

ہے جرمِ ضعیفی کی سزا مرگِ مفاجات

অনুবাদ:

লোকে বলে, মাআররী কখনো গোস্ত খেতেন না,
উলমূল খেয়ে তিনি জীবন ধারণ করতেন
এক বন্ধু তাঁর কাছে ভাজা তিতির পাঠালো;
সে ভাবলো, এমনি করে বোধ হয় তাঁকে গোশত খাওয়ানো যাবে।

Dhaka University Institutional Repository

দেহরক্ষী যখন এই টাটকা খাবার দস্তরখানে দেখতে পেলেন
তখন গুফরান'ও' লুযূমাত্' এর গ্রন্থকার বলতে লাগলেন:
'হে হতভাগা ছোট্ট পাখি! একটু বলো তো কি পাপ ছিল তোমার,
যার ফলে এ শাস্তি তোমার!
দুঃখ, শত দুঃখ! তুমি হলে না শাহীন!
(তাহলে নাগালের বাইরে থাকতে তুমি উর্দ্ধাকাশে।)
বোঝেনি তোমার চোখ প্রকৃতির ইঙ্গিত।
তকদির কাজীর ফতোয়া আদি কাল থেকে;
দুর্বলতার শাস্তি আকস্মিক মওত। (ইকবাল-১১, পৃ. ২০৯-২১০)

ইকবাল বলেন, মুসলমান ছোট নদীর স্রোত পছন্দ করে না বরং ফোয়ারার সজোরে উৎক্ষিপ্ত জলরাশির প্রতি রয়েছে তার মনের আকর্ষণ:

یہ آبجو کی روانی یہ ہمکناری خاک
مری نگاہ میں ناخوب ہے یہ نظارہ
ادھر نہ دیکھ ادھر دیکھ اے جوان عزیز
بلند زور دروں سے ہوا ہے فوارہ

অনুবাদ:

নদীর স্রোত থাকে মাটির কাছাকাছি,
ভাল নয় আমার চোখে এই সিনারী।
হে জোয়ান বৎস! দেখোনা এদিকে দেখো ওদিকে,
উত্থিলিত হয়েছে ফোয়ারা ভেতরের শক্তি থেকে। (ইকবাল-১১, পৃ. ১২৫)

ইকবাল শক্তি ও সৌন্দর্য দুটোকেই ভালোবাসেন। তিনি বলেন, জীবন যুদ্ধে হতে হবে ইস্পাত কঠিন। কিন্তু সামনে বাগান পড়লে হবে ঝরনার ন্যায় সুকন্ঠ গায়ক:

مصاف زندگی میں سیرت فولاد پیدا کر
شبستان محبت میں حریر و پرنیاں ہو جا
گذر جا بن کے سیل تند رو کوہ و بیاباں سے
گلستاں راہ میں آئے تو جوئے نغمہ خواں ہو جا

অনুবাদ:

হও জীবন যুদ্ধে ইস্পাত কঠিন,
হও ভালবাসার রেশম ও মুখমণ্ডলের ন্যায় কোমল।
বয়ে যাও বেগবান ঢলের ন্যায়
পাহাড় আর মরূ মাড়িয়ে;
পড়ে যদি বাগান পথমাঝে
রূপ নাও গায়ক সুলভ ঝরনার। (ইকবাল-১১, পৃ. ৩১২)

Dhaka University Institutional Repository

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন সকল প্রাণীর জীবিকার দায়িত্ব নিয়েছেন

وما من ىابة في الارض الا علي الله رزقها ويعلم مستقرها ومستوىعها كل في كتب مبين

পৃথিবীতে এমন কোনো বিচরণশীল (জীবিত) প্রাণী নেই যার জীবিকার দায়িত্ব আল্লাহ পাক নেননি।আর তিনি জানেন তাদের আবাসস্থল এবং সঞ্চয় | সবকিছু রেকর্ডভূক্ত আছে কিতাবে। (-১১ :৬)
আল্লাহ তাআলা তার রেযেক ভাণ্ডার থেকে রিযিক তালাশ করার দায়িত্ব মানুষের উপর অর্পন করেছেন। ইরশাদ হয়েছে:

فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له

সুতরাং তোমরা আল্লাহর নিকট রিযিক অন্বেষণ কর এবং তাঁরই ইবাদত কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর| (২৯: ১৭) আরবি 'দাব্বাতুন' শব্দের অর্থ হলো -বিচরণশীল প্রাণী (Moving creature)

বিচরণশীল প্রাণী বলতে ঐসব প্রাণীকে বুঝায় যাদের জীবন আছে, জীবন চক্রের মাধ্যমে যারা বর্ধিত হয় এবং যারা চলাচল করার ক্ষমতা রাখে। সকল জীবনধারী প্রাণী এবং জীবকোষ এর আওতায় পড়ে। এ আয়াতে ব্যবহৃত আরো দুইটি শব্দ অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ| একটি হলো 'মুস্তাক্বার' যার অর্থ -ভুমণ্ডলে এবং পানির ভেতরে প্রাণীকুলের বাসস্থল। অপর শব্দটি 'মুস্তাওদা' যার অর্থ -পিতার ঔরসে, মায়ের গর্ভে এবং ডিমের ভেতরে জন্মকোষের অবস্থান। প্রত্যেক জীবের এবং জীবকোষের এবং অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট অণুজীবের নিজস্ব বাসস্থান এবং খাদ্য পুষ্টির প্রয়োজনীয়তা আছে। বাসস্থানগুলোর ভুমণ্ডলে, বায়ুমণ্ডলে, জলস্থলে, মাতৃগর্ভে সেখানে হোক না কেন তারা অসংখ্য বিচিত্র ধরনের উৎসথেকে খাদ্য পৃষ্টি সংগ্রহ করে| এখাদ্য পুষ্টি কেবলমাত্র তাদের ক্ষুধা নিবৃত্তই করে না সেই সঙ্গে তাদের বাচ্চাদের ও ক্ষধা নিবৃত্ত করে| আর সবার জন্য সর্বত্র খাদ্যপুষ্টির ব্যবস্থা করে রেখেছেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ পাক।

প্রত্যেক প্রাণী কিভাবে খাদ্যপুষ্টি সংগ্রহ করবে এবং কিভাবে তাদের আবাসস্থল নির্ণয় করবে তা সবই তাদের সহজাত প্রবৃত্তির মধ্যে নিহিত। যখন কোনো এলাকায় খাদ্য ঘাটতি দেখা দেয় এবং পরিবেশ বিরূপ হয়ে ওঠে তখন জীবকুলনতুন এলাকায় স্থানান্তরিত হয়। সেখানকার আবহাওয়া প্রতিকুল নয় এবং খাদ্যের সরবরাহ ও পর্যন্ত| পৃথিবীতে যতো পাখি আছে তাদের মধ্যে দুই -তৃতীয়াংশে পর্যায়ী| এ দুই -তৃতীয়াংশ পাখির সংখ্যা হবে কয়েক কোটি।

এরা হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে প্রতি বছর উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরূতে গিয়ে হাজির হয়। এরূপ অনেক জীব -জন্তু আছে যারা সময় সময় দেশত্যাগ করে খাদ্যের সন্ধানে কিংবা বাসস্থানের খোঁজে| পাখি ও প্রাণীদের মাইগেশনের রহস্যের বিশদ তথ্য সাম্প্রতিক শতাব্দীতে সংগৃহিত হয়েছে।
সুতরাং সকল জীবনধারী প্রাণী ও জীবকোষ যে যেখানেই অবস্থান করূক না কেন সকলের জীবনব্যাপি খাদ্যপুষ্টি অপরিহার্য| এ খাদ্যপুষ্টির ব্যবস্থাকরে থাকেন মহান আল্লাহ পাক যিনি সমগ্র সৃষ্টির প্রতিপালক এবং রক্ষক। (তাহের-৮৯, পৃ. ২০৭) And no moving (living) cre

যাকাত দিলে মাল পবিত্র ও বৃদ্ধি হয় মন দৃঢ় হয় ধন লোভ হ্রাস পায়:

যাকাত ' আরবি শব্দ| এর আভিধানিক অর্থ বৃদ্ধি, পবিত্রতা, পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি। ইসলামি পরিভাষায় ধনী ব্যক্তিদের নিসাব (নির্ধারিত) পরিমাণ সম্পদ থাকলে নির্দিষ্ট অংশ গরিব অভাবী লোকদের মধ্যে বিতরণ করে দেওয়াকে যাকাত বলে| যাকাত প্রদানের মাধ্যমে সম্পদ ব্যক্তিবিশেষের হাতে পুঞ্জীভূত থাকে না। আর

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের হাতে সম্পদ পুঞ্জীভূত থাকুক আল্লাহ তাআলা তা পছন্দ করেন না। তিনি চান এটি মানুষের কল্যাণে ব্যয় হোক, সমাজের সামগ্রিক অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হোক। এ বিবেচনায় যাকাত অর্থ বৃদ্ধি। যাকাত প্রদানে দাতার অন্তর কৃপনতার কুলষতা হতে পবিত্র হয়। বিত্তশালীদের সম্পদে দরিদ্রের অধিকার আছে। কাজেই গরিবের নির্ধারিত অংশ দিয়ে দিলে অবশিষ্ঠ সম্পদ ধনীদের জন্য পবিত্র হয়ে যায়। এদিক বিবেচনায় যাকাত অর্থ পবিত্র। যাকাত দিলে সম্পদে আল্লাহ বরকত দান করেন। ইসলামের পাঁচটি গুরূত্বপূর্ণ রুকনের মধ্যে যাকাত অন্যতম।কুরআন মজিদের বহু জায়গায় সালাতের সাথে যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ বলেন:
.

وفي اموالهم حق للسائل و المحروم

অর্থ: তাদের (ধনীদের) ধন সম্পদে অবশ্যই দরিদ্র ও বঞ্চিতদের অধিকার রয়েছে। ৫১: ১৯)

واقيموا الصلوة واتوا الزكوة واقرضوا الله قرضا حسنا

[এবং নামায কায়েম কর,যাকাত প্রদান কর এবং আল্লাহকে দাও উত্তম ঋণ। (৭৩:২০)

যাকাতের জনকল্যাণ ও ফলশ্রুতির দিক বিবেচনা করলে প্রতিভাত হবে যে, এটি ইসলামের গুরুত্বপূর্ণ বড় একটি রোকন তথা অঙ্গ। এ জন্য আল্লাহ তাআলা কুরআনের প্রায় সর্বত্রই নামায ও যাকাতের ফলে সৃষ্ট সাম্য কম্যুনিজমের সাম্য থেকে অধিকতর কার্যকর ও ফলপ্রসূ। যাকাত দিলে ধনের প্রতি মানুষের মোহ হ্রাস পায়। এতে মনও দৃঢ়তা লাভ করে। ইকবাল বলেন:

حب دوات را فنا سازد زکوۃ
هم مساوات آشنا سازد زکوۃ
دل ز حتی تنفقوا محکم کند
زر فزاید`الفت زرکم کند

অনুবাদ:

বারণ করে যাকাত মানুষের অর্থ লোভ,
যাকাত সাম্যের পরিচায়ক।
‘হাত্তা তুনফিকু’’ এর মর্ম দৃঢ় করে মানুষের মন,
বৃদ্ধি করে ধন, হ্রাস করে অর্থ লোভ। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৪৮)

প্রত্যেক বৎসর যথারীতি যাকাত আদায় করা হলে ধনী দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস পাবে। স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে ক’জন ধনী ব্যক্তি গরীব-মিসকীনের দুঃখ-দৈন্য নিরসন করার চেষ্টা করে? কিন্তু ফরজ যাকাত যথারীতি আদায় করা হলে কাকে যে ধন ভাণ্ডার সৃষ্টি হবে, তদদ্বারা গরীব-মিসকীনের অভাব অনটন বহুলাংশে দুর করা সম্ভব হবে। ইকবাল বলেন:

کس نہ گردد درجہاں محتاج کس   نکت شرع مبیں ایں ست ویس

অনুবাদ:

থাকবে না কেউ মুখাপেক্ষী কারো কাছে এ দুনিয়ায়,
স্বচ্ছ শরা’ তত্ব এটাই, বেশী কিছু বলার নেই। (ইকবাল-১১, পৃ.৪১)

সকলের সাথে সদ্ব্যবহার বড় উপহার:

و قولوا للناس حسنا

(এবং মানুষের সাথে তোমরা সদালাপ করবে।) (১: ৮৩)

ইকবাল বলেন:

مسلمان کے لہو میں ہے سلیقہ دل نوازی کا

مروت حسن عالمگیر ہے مرداں غازی کا

অনুবাদ:

মুসলমানের রক্তে আছে মন জয়ের নৈপুণ্য,
মানবতাবোধ গাযী মুসলমানের একটি
বিশ্বজোড়া সৌন্দর্য। (ইকবাল-১১, পৃ. ৫০)

ইকবাল বলতে চান, ইসলাম মানুষের মধ্যে মানুষের প্রতি দয়া ও সদ্ব্যবহারের মনোভাব সৃষ্টি করে। মুজাহিদ মুসলমানের স্বভাবে মানবতাবোধ থাকে। এই মূল্যবোধের ফলে তাদের মধ্যে ভদ্রতা, দানশীলতা, সহানুভূতি স্বার্থত্যাগ এবং আতিথ্য চারিত্রিক রূপ নেয়। পরস্পরের মধ্যে হৃদ্যতা আন্তরিকতা ও ভালবাসা ঘনিষ্টতা সৃষ্টি হয়। মায়াবী বন্ধনে আবদ্ধ হতে শিখে এতে মানুষের জীবন সুখের ও ঘনিষ্ঠ হয় সার্বিক উন্নতি লাভ করতে সক্ষম হয়।

হযরত মুহাম্মদ (সা.) ও খুলাফায়ে রাশিদিনের যুগে সরকারি ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায় করা হতো। আদায়কৃত মালের বিতরণও সরকারি ব্যবস্থাপনায় হতো। নিসাবের নির্ধারিত পরিমাণ সম্পদের মালিকরা যাকাত দিতে বাধ্য থাকত। অন্যদিকে যারা যাকাত পাওয়ার হকদার (দাবিদার) তারা সবাই যাকাতের অর্থ পেয়ে উপকৃত হতো।

মুমিন মুজাহিদ বিনা অস্ত্রে লড়ে যায়:

ولقد نصركم الله ببدر و انتم اذلة

অবশ্যই আল্লাহ বদরের যুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করেছিলেন আর তোমরা ছিলে দুর্বল।] (৩: ১২৩)

Dhaka University Institutional Repository

উহুদের যুদ্ধে কাফেরের সংখ্যা ছিল মুজাহিদীনের সংখ্যার চেয়ে তিনশগুণ বেশী। মুসলমাদেরা সমরাস্ত্র ও ছিল অনেক কম। তাই কুরআনে বলা হয়েছে ''তোমরা ছিলে দুর্বল।' ভীষণ যুদ্ধ হয়েছিল। আল্লাহ মুসলমানদের বিজয়ী করেন এবং কাফেরদেরকে শোচনীয়ভাবে পরাজিত করেন। সত্তরজন কাফের নিহত হয়। তন্মধ্যে আবু জাহল ও উতবা ছিল অন্যতম। মুসলিম সেনা বাহিনীর মধ্যে মাত্র চৌদ্দজন শহীদ হন। শুধু এই যুদ্ধে নয়, বিভিন্ন যুদ্ধে মুসলমানদের সৈন্য সংখ্যা ছিল অবিশ্বাস্যভাবে কম। বদরের যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য সংখ্যা ছিল ৩১৩, শত্রু সৈন্য সংখ্যা ছিল ১০০০। উহুদের যুদ্ধে মুসলমান ৭০০, কাফের ৩০০০।

খন্দতের যুদ্ধে মুসলমান ৩০০০,কাফের ১০,০০০। খায়বরের যুদ্ধে মুসলমান ১,৪০০,কাফর ৩০,০০০। ইয়ারমুকের যুদ্ধে মুসলমান ৪০,০০০ কাফের ২৪০,০০০। সৈন্য সংখ্যা ও সমরাস্ত্র নিতান্ত কম থাকা সত্বেও ঐসব যুদ্ধে মুসলমানেরা বিজয় অর্জন করে।

কুরআনে আছে:

كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة

[অনেক সময় বেশী সংখ্যক দলের উপর কম সংখ্যক লোকের দল বিজয় লাভ করেছে।]

মুসলমান সৈন্য সংখ্যা ও সমরাস্ত্রেও ন্যূনতার প্রতি লক্ষ্য করে না। ইকবাল বলেন:

کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسا

مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی

অনুবাদ:

ভরসা করে কাফের মনা মুসলমান, তরবারির উপর,
মুমিন হলে তলোয়ার ছাড়াই লড়ে যায় সিপাহী। (ইকবাল- ১১,পৃ. ৫৫)

কেবল একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা পরিস্কার করছি

মুতার যুদ্ধে (৬২৯খ্রিঃ) হযরত যায়েদের (রা) শাহাদাতের পর হযরত জা'ফর তাইয়ার (রা) স্বহস্তে পতাকা ধারন করেন এবং ঘোড়া থেকে নেমে রোমানদের উপর প্রাণপণে হামলা চালায়। জখমের পর জখম খেয়ে তার ডান হাত কেটে গেল। তিনি তখন বাম হতে পতাকা ধারণ করলেন। বাম হাত ও যখন কেটে গেল, তখন পতাকাটি নিজ বাহুর উপর তুলে নিলেন। এমতাবস্থায় একটি তলোয়ার তাঁর মাথার উপর এসে আঘাত হানলো, যাতে তাঁর মাথার খুলি দ্বিখণ্ডিত হয়ে গেল। তখন পতাকাটি মাটিতে পড়ে গেল।

এক আদম সন্তান হিসেবে সবাই সমান:

ليس العربي فضل العجمي كلكم ادم و ادم من التراب

[অনারবের উপর আরবের শ্রেষ্টত্ব নেই। সব মানুষ আদম সন্তান,আর আদম হলো মাটির তৈরী।] (হাদীস তাবরানী, খন্ড ১৮, পৃ. ১৩)

Dhaka University Institutional Repository

নবীজী (স.) বিদায় হজের সময় যে ভাষণ দেন তাতে তিনি বলেন, আরব অনারব সবাই সমান; সব মানুষ আদম সন্তান, আর আদম হলো মাটি থেকে সৃষ্ট। তাই মানুষ জাত সবাই সমান। আল্লাহ মানুষকে সম্মানিত করে সৃষ্টি করেছেন। মানুষরূপে সবাই ভাই ভাই। সকল মানুষের সকল মানুষের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে, অনুগ্রহের সহানুভূতি প্রদর্শন করতে হবে। ইকবাল বলে:

آدمیت احترام آدمی
باخبرشو از مقام آدمی
حرف بد را بر اب آوردن خطا ست
کافر و مومن ہمه خلق خدا ست
بنده حق از خدا گیرد طریق
می شود بر کافر و مومن شفیق
کفر و دیں را گیر در پنہائی دل
دل اگر بگریزد از دل وائی دلی
گرچه دل زکدانی آب و کل است
ایں همه آفاق آفاق دل است

অনুবাদ:

মানবতা কি? মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা!
জেনে নাও মানুষের সঠিক মর্যাদা;
মন্দ কথা মুখে আনা পাপ ,
কাফির মুমিন সবাই আল্লাহর সৃষ্টি,
আল্লাহর বান্দা সবাই নির্দেশ নেয় আল্লাহর থেকেই,
সে হয় সমভাবে দয়ালু কাফির ও মুমিনের প্রতি।
বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী দাও স্থান সবাইকে মনের আঙ্গিনায়,
যায় যদি মন পালিয়ে অন্য মন হতে, তবে ধিক তার প্রতি।
এ মন আকে বন্দী কাদা মাটির কারাগারে
তবে চলে তার রাজত্ব সারা দুনিয়ায়।
(Eminent Scholars,Iqbal as a Thinker, p . 105)

কুরআন বলেন:

هو الذي خلقكم من نفس واحدة

[তিনিই তোমাদেরকে এক ব্যক্তি (আদম আ.) হতে সৃষ্টি করেছেন।]

অন্যত্র আল্লাহ বলেন:

قل يا اهل الكتاب تعالوا الي كلمة سوا ء بيننا وبينكم

[বল, হে কিতাবীগণ! এসো সে কথায়,
যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে একই (৩: ৬৪))

এখানে আল্লাহ তাআলা আহলে কিতাবকে তওহীদের ব্যাপারে ঐকমত্য পোষণ করার জন্য আহবান করেছেন,তা হলে যেন সকল মানুষের মধ্যে বিশ্বমানবতার ঐক্যের যোগসূত্র স্থাপিত হয়। মক্কা আওর জেনেভা' কবিতায় ইকবাল বলেন:

اس دور میں اقوام کی صحبت بھی ہوئی عام

Dhaka University Institutional Repository

پوشیدہ نگاہوں سے رہی وحدت آدم
تفریق ملل حکمت افرنگ کا مقصود
اسلام کا مقصود فقط ملت آدم

অনুবাদ:

হচ্ছে এ যুগে জাতিসমূহের মিলন,
বাদ পড়েছে কিন্তু মানব-ঐক্য তাদের দৃষ্টি হতে।
ইউরোপের মতলব জাতিতে জাতিতে বিভেদ সৃষ্টি করা
ইসলামের উদ্দেশ্য শুধু মানব জাতির ঐক্য বিধান।
এ ছিল জেনেভার প্রতি মক্কার পয়গাম। (ইকবাল ১১, পৃ. ৫৪)

ইকবাল বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বলেছেন:

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی
اخوت کی جہاگیری محبت کی فراوانی

অনুবাদ:

এটাই উদ্দেশ্য প্রকৃতির, এটাই রহস্য মুসলমানীর:
বিশ্বজোড়া ভ্রাতৃত্ব, ভালবাসার প্রাচুর্য। (ইকবাল-১১, পৃ. ৩০৭)

ঈমানদার ব্যক্তি অন্যায় অসত্যের কাছে নত করে না:

كلمة الحق عند السلطاب الجائر اجر مائة شهيد

[জালিম বাদশার সামনে হক কথা বললে একশ’ শহীদের পুণ্য পাওয়া যায়।] (যরীফ-৪৪, পৃ. ৪৫)
অর্থাৎ অত্যাচারী শাসকের মুখের উপর সত্য কথা বলা উত্তম জেহাদ; এতে একশ শহীদের সওয়াব পাওয়া যাবে। মুমিন বান্দাকে জালিম শাসকের শক্তি ও সামর্থ্য প্রভাবিত বা ভীত সন্ত্রস্ত্র করতে পারে না। ইকবাল বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

بندہ مومن کا دل بیم وریا سے پاک ہے
قوت فرمانروا کے سامنے بیباک ہے

অনুবাদ:

মুমিন বান্দার মন ভয় ও প্রদর্শনীয় ভাব মুক্ত,
শাসকের শক্তির সামনে সে নির্ভীক। (ইকবাল- ১১, পৃ. ৪৩)

অন্যত্র ইকবাল বলেন:

آئیں جواں حق گوئی وبیباکی
اللہ کے شیروں کو آتی نہیں روبا ہی !

অনুবাদ:

বীরের স্বভাব হক কথা বলা, নির্ভীক হওয়া,
জানেনা আল্লাহর সিংহরা শিয়ালের প্রতারণা। (ইকবাল- ১১, পৃ. ৮৩)

আল্লাহ চিরঞ্জীব:

হায়্যুন শব্দের অর্থ চিরঞ্জীব। যিনি চিরকাল ধরে জীবিত| আল্লাহ হায়্যুন অর্থ আল্লাহ চিরঞ্জিব। তিনি চিরকাল ধরে আছেন থাকবেন| যখন কোনো কিছুই ছিল ন আ, তখনও তিনি ছিলেন।আবার কিয়ামত যখন সবকিছু ধ্বংস হয়ে যাবে, তখনও তিনিই থাকবেন| তাঁর কোনো ক্ষয় নেই রোগ নেই, রোগ- শোক, দু:খ-জরা, তন্দ্রা-নিন্দ্রা কিছুই নেই। কোনোরূপ ধ্বংস তাঁকে স্পর্শ ও করতে পারে না। তিনি সকল ক্ষয় ও ধ্বংস থেকে মুক্ত। আল্লাহ তায়ালা বলেন:

الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة و لانوم

অর্থ: তিনিই আল্লাহ, তিনি ব্যতীত কোনো ইলাহ নেই। তিনি চিরঞ্জীব ও সর্বসত্তার ধারক। তাঁকে তন্দ্রা অথবা নিন্দ্রা স্পর্শ করে না। (কুরআন-১: ২৫৫)

لااحب الافلين

[আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না] (৬:৭৬)

হযরত ইব্রাহিম (আঃ) আল্লাহর সন্ধান করছিলেন। রাত্রিবেলায় তিনি উজ্জ্বল তারা দেখে বললেন: هذا ربي অর্থাৎ এ আমার রব। তারা যখন অস্তমিত হলো, তখন তিনি বললেন: لااحب الافلين অর্থাৎ আমি অস্তগামীদের ভালবাসি না|আবার যখন উজ্জ্বল চাঁদ উদিত হলো, তখন তিনি বললেন: এ আমার রব। কিন্তু চাঁদ যখন অস্তমিত হলো এবং সূর্য পূর্ণ জ্যোতি নিয়ে উদিত হলো, তখন তিনি বললেন: هذا ربي هذااكبر অর্থাৎ এ আমার রব, এ মহান| কিন্তু সূর্যও যখন অস্তমিত হলো, তখন তিনি বললেন: এতো আল্লাহ হতে পারে না| তখন তিনি ভাবলেন, অস্তগামীরা আল্লাহ হতে পারে না| আল্লাহ হবে চিরবিদ্যমান
এই ঘটনাটি ইকবাল এভাবে বর্ণনা করেন:

وہ سکوت شام صحرا میں غروب آفتاب

جس سے روشن تر ہوئی چشم جہاں بین خلیل

অনুবাদ:

বিকেলের নীরবতায় মরুও অস্তগামী দিবাকর
খলীলের জগত দেখা নয়নকে করে দিল উজ্জ্বলতর। (ইকবাল- ১১, পৃ. ২৯২)

আমরা আল্লাহ, তায়ালার এ গুণ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করব। সকল কাজকর্মে আমরা প্রাণবন্ত থাকব। অলসতা , নির্জীবতা পরিহার করব। ক্লান্তি, শ্রান্তি, তন্দ্রা, নিন্দ্রা ইত্যাদি যেন আমাদের কাজে কোনো প্রভাব ননা ফেলে সে চেষ্টা করব। তাহলে আমরা সফলতা লাভ করব।

খাঁটি মুমিনের কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা নেই:

الا ان اولياء الله لا خوف عليهم ولاهم يحزنون

[মনে রেখো,আল্লাহ-ও প্রিয় বান্দাদের কোন ভয় বা চিন্তা নেই।] (১০:৬২)

নবীজীর মক্কা থেকে মদীনায় হিজরত করার সময় সওর গুহায় অবস্থানকালে তাঁর সাথে ছিলেন আবু বকর সিদ্দীক (রা) দুশমন যখন তাঁর খুব নিকটে এসে গেল, তখন গুহার বন্ধু হযরত আবু বকর খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

Dhaka University Institutional Repository

তখন নবীজী তাঁকে অভয় দিয়ে বললেন:

لا تحزن ان الله معنا

[চিন্তা করোনা, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। (৯:৪০)

ইকবাল মুসলমানদের অভয় ও চিন্তাহীনতার শিক্ষা দিয়ে বলেন:

ای کہ زندان غم باشی اسیر   از نبی ص تعلیم لا تحزن بگیر
این سبق صدیق رض را صدیق کرد   سر خوش از پیمانه تحقیق کرد
گر خدا داری زغم آزاد شو   از خیال بیش وکم آزاد شو

অনুবাদ:

বন্দী আছে যারা চিন্তার কয়েদখানায়,
উচিত তাদের নবী (স) থেকে لا تحزن এর শিক্ষা গ্রহণ।
দিয়েছেন এই শিক্ষা নবীজী হযরত আবু বকরকে
মত্ত করলেন তাঁকে সত্য সন্ধানের শরাব পেলায়ে।
মুক্ত হও চিন্তা থেকে যদি তোমার খোদা থাকে,
মুক্ত হও কম বেশীর চিন্তা থেকে। (ইকবাল- ১১, পৃ. ১০৯)

হযরত মুসা (আ.) যখন ফেরাউনের সাথে মোকাবিলা করতে গেলেন, তখন তার জাদুকরদের রসি ও লাঠিগুলো সর্প হয়ে দৌড়তে লাগলো। হযরত মুসা ভয় অনুভব করলেন। তখন তাঁকে আল্লাহ বললেন ভয় করোনা। তুমিই বিজয়ী হবে।

لاتخف انك انت الاعلى

[ভয় করোনা, তুমিই বিজয়ী হবে।]

এ ভাবটি ব্যক্ত করে ইকবাল বলেন: (২০:৬৮)

چوں کلیمی سوئے فرعونے رود   قلب او از لا تخف محکم شود

অনুবাদ:

কোন মুসা যখন ফিরাউনের দিকে যায়,
তার মন তখন لاتخف এর মর্মে দৃঢ় হয়। (ইকবাল-১১, পৃ. ১০৯)

ইকবাল বলেন:

خوف حق عنوان ایمان است و بس   خوف غیر از شرك پنهان است وبس

খোদাভীতি ঈমানের আলামত বৈ অন্য কিছু নয়,
অন্যের ভীতি গোপন অংশীবাদ বৈ অন্য কিছু নয়। (ইকবাল-৫, ৬৮)

ইকবালের মতে খাঁটি মোমেন আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর ভয় করে না। আর যখন বান্দা আল্লাহর হয়ে যায় তখন জগতের সকল কিছুই তার হয়ে যায়।

আল্লাহই ফসল উৎপাদনের সকল ব্যবস্থা করেন:

و هو الذي انزل من السماء ما فاخرجنا به نبات كل شي
فاخرجنا منه خضرا نخرج منه متاركبا

[তিনিই আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতপর তদদ্বারা আমি সর্বপ্রকার উদ্ভিদের চারা উদগত করি, এর পর তা হতে সবুজ পাতা উৎগত করি, পরে তা হতে ঘন সন্নিবিষ্ট শস্যদানা উৎপাদন করি।] (৭: ৯৯)

Dhaka University Institutional Repository

মানুষের দৈনন্দিন জীবনের প্রয়োজন মেটানোর জন্য আল্লাহ তায়ালা মুফত এমন সব নেয়ামত দিয়ে রেখেছেন, যা কারো জন্য খাস নয়, যেমন বাতস, পানি, জঙ্গল, পাহার, পর্বত, জমিন, সবুজ, লতাপাতা, ফুল ইত্যাদি। কিন্তু অত্যাচারী ও লোভাতুর শক্তি হস্তক্ষেপ করে এগুলো নিজেদের দখলে নিয়ে যায় | অথচ এই বস্তুগুলো কারো পরিশ্রম ও বুদ্ধিতে সৃষ্টি হয়নি। এগুলো প্রকৃতির দান এবং সমভাবে পৃথিবীর সকলের ব্যবহারিক সম্পদ। এগুলো জবর দখল করা কারো জন্য বৈধ নয়। সেজন্য ইকবাল বলেন, কেউ তাঁদের জিজ্ঞেস করূক:

الارض اللہ

پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون؟

کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب ؟

کون لایا کھینچ کر پچھم سے باد ساز گار؟

خاک کس کی ہے ؟ کس کا ہے یہ نور آفتاب؟

کس نے بھر دی موتیوں سے خوشہ گندم کی جیب؟

موسموں کو کس نے سکھلائی خوئے انقلاب؟

ای خدایا! یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں!

تیرے آباء کی نہیں تیری نہیں میری نہیں!

অনুবাদ:

কে লালন করে বীজ মাটির অন্ধকারে?
কে উঠায় মেঘ দরিয়ার তরঙ্গ থেকে?
কে এনেছে অনুকুল বাতাস পশ্চিম থেকে?
এই মাটি কার? সুর্যেও এই আলো কার?
কে ভরে দেয় মুক্তার গমের খোশার জব?
কে শেখাল মৌসুমকে বিপ্লবী চরিত?
তোমার নয় এ জমিন, তোমার নয় হে জমিদার!
ইয় তোমার বাপ দাদার, নয় তোমারও, আমারও নয়। (ইকবাল-১১, পৃ. ১৬১)

মানুষই সর্বোত্তম সৃষ্টি:

ولقد كرمنا بني ادم و حملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم علي كثير ممن خلقنا تفضيلا

[আমি আদম-সন্তানদের সন্মান দিয়েছি এবং স্থলে ও সমুদ্রে তাদেরকে চলাচলের বাহন দিয়েছি, খাবার জন্য উত্তম, রিযিক দিয়েছি এবং আমি যা কিছু সৃষ্টি করেছি, তন্মধ্যে অনেকের উপর তাদেরকে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।] কুরআনে আল্লাহ আরো বলেন: (১৭:৭০)

وهو الذي جعلكم خلئف الارض

[এবং আল্লাহ-ই তোমাদেরকে দুনিয়ার প্রতিনিধি করেছেন।] ৬: ১৬৫)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল পবিত্র কুরআন নিগুঢ়ভাবে অধ্যয়ন করেছেন। আর এ অধ্যয়নের মাধ্যমে তিনি এমন এক সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, একমাত্র মানবীয় দায়িত্বের বিষয়গুলোকে স্পষ্ট ও বিশদভাবে তুলে ধরেছেন। তিনি মানুষকে কুরআনের শিক্ষার আলোকে আলোকিত হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন-যাতে রয়েছে মানুষের জন্য উত্তম মর্যাদা ও আভিজাত্য। ইকবাল ফেরেশতাদের ভাষায় মানুষের মর্যাদা সম্পর্কে বলেন:

سنا ہے خاک سے تیری نمود ہے لیکن
تیری سرشت میں ہے کوکبی و مہتابی
گراں بہا ہے ترا گریہ سحر گاہ
اسی سے ہے تری نخل کہن کی شادابی

শুনেছি তোমার সৃষ্টি হয়েছে কঠিন মৃত্তিকা দ্বারা
কিন্তু তোমার প্রকৃতিতে রয়েছে তারকা ও চন্দালোকের বৈশিষ্ট্য
তোমার প্রত্যুষের কান্না এতোটাই মূল্যবান যে,
এ দ্বারা তোমার পুরাতন খেজর বৃক্ষ সতেজ হয়ে ওঠে। (ইকবাল-১১ পৃ. ৪৬০)

ইকবাল মানব জাতিকে অনেক ক্ষেত্রে ফেরেশতাদের চেয়ে অধিক মর্যাদাবান বলে মনে করেন। এতে সত্তার বা খুদীর যে অনুভূতি রয়েছে তা দ্বারা একজন মানুষকে সমগ্র সৃষ্টিজগতের মধ্যে উত্তম ও মর্যাদাসম্পন্ন করে গড়ে তোলে। কেননা সে মানবীয় সামর্থ্য **ও** তার ব্যক্তিত্বের সম্ভাবনাগুলোকে সীমাহীন মনে করে।

قناعت نہ کر عالم رنگ و بو پ
چمن اور بھی آشیاں اور بھی ہیں
اسی روز و شب میں الجھ کر نہ رہ جا
کہ تیرے زماں و مکان اور بھی ہیں

কেবল পৃথিবীর রঙ ও গন্ধে তুমি পরিতৃপ্ত থেকো না
কেননা দূর্বাদল আচ্ছাদিত মাঠ আরও আছে, নীঢ় আরও আছে।
তুমি এ দিবা –রাত্রির বন্ধনে নিজেকে আটকিয়ে রেখো না
কেননা তোমার সময় ও অবস্থান আর ও অনেক রয়েছে। (ইকবাল-১১, পৃ. ৩৯০)

স্বয়ং স্রষ্টা মানুষকে এই সম্মানের অধিকারী করেছেন আর এ সম্মান মানুষকেই রক্ষা করতে হবে। আল্লাহর সৃষ্টিতত্ত্ব অনুযায়ী পৃথিবীর সকল মানুষই সমান। কাজেই সকল মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সৌহার্দ্য, সহমর্মিতা একান্তই আবশ্যক যার অভাবে মনুষ্য সমাজে সৃষ্টি হয়ে থাকে বিভেদ -বিচ্ছন্নতা ও অনৈক্য। একটি সংহত সমাজ, যা মানুষের কাম্য - ঠিক তখনই গঠিত হতে পারে যখন মানুষের মাঝে কৃত্রিমভাবে সৃষ্ট সকল ভেদরেখা বিলুপ্ত হয়ে যাবে। আল্লামা ইকবাল তাঁর জীবনের সূচনালগ্নেই এই বিষয়গুলো তীব্রভাবে উপলব্ধি করেছিলেন। তবে কিভাবে? সে কথাই আমাদের মুখ্য আলোচনার বিষয়।

انا عرضنا الامانة علي السموات والارَض و الجبال
فابين ان يحملنها و اشفقن منها وحملها الانسان

Dhaka University Institutional Repository

[আমি তো আসমান, জমিন ও পর্বতমালার প্রতি এই আমানত
অর্পন করেছিলাম। ওরা এই আমানত বহন করতে অস্বীকার
করল এবং তাকে শংকিত হল। কিন্তু মানুষ তা বহন করল।] (৩৩:৭২)

আল্লাহ আরো বলেন:

و علم ادم الاسماء كلها

[এবং আল্লাহ আদমকে যাবতীয় বস্তু ও জ্ঞান শিক্ষা দিয়েছেন।] (১: ৩১)

এসব আয়াতে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহ মানুষকে যথেষ্ট ক্ষমতা অর্পন করেছেন এবং অনেক দায়িত্ব তাঁর কাঁধে তুলে দিয়েছেন; তাকে ইহজগতে তার প্রতিনিধি করেছেন। অন্য কোন সৃষ্টি এ দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করেনি। কেবল মানুষই তা গ্রহণ করলো। এতে প্রমানিত হলো যে, এসব দায়িত্ব পালনের জন্য আল্লাহ মানুষকে অনেক ক্ষমতার অধিকারী করেছেন এবং এমনি করে তাকে অনেক সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং কারো কারো বেলায় সর্বসৃষ্টির উপর, এমন কি ফেরেশতাগণের উপরও তাঁদের মর্যদা দিয়েছেন:

আল্লাহ বলেন:

اولئك هم خير البرية .

[তারা সকল সৃষ্টির সেরা] (৯৮: ৭)

ইকবাল মানুষের সুপ্ত ক্ষমতার প্রতি তার দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন:

اے زآداب امانت بے خبر   از دو عالم خویش را بهتر شمر

چراغی در میان سینہ تست   چہ نور است ایں کہ در آینہ تست؟

مشو غافل کہ تو او را بینی   چہ نادانی کہ سوئے خود نہ بینی

অনুবাদ:

হে মানুষ! তোমরা উদাসীন আল্লাহর আমানতের আদব কায়দার প্রতি,
মনে করবে নিজেকে দু'জাহানের সেরা।
বক্ষে আছে তোমার একটি প্রদীপ,
তোমার মনের মুকুর বলে এ প্রদীপের আলো কত উজ্বল!
থেকো না উদাসীন, তুমি আল্লাহর কুরআনের আমানতদার,
তাকাচ্ছনা নিজের প্রতি এ তোমার কত বড় মূর্খতা! (ইকবাল- ১১, পৃ. ৫৭)

মানুষকে আল্লাহ' আশরাফুল মাখলুকাত' তথা সৃষ্টির সেরারূপে সৃষ্টি করেছেন। এর মানে এ নয় যে, জন্মগতভাবেই মানুষ সৃষ্টির সেরা। মানুষকে চেষ্টা, সাধনা, বুদ্ধি বিবেচনার মধ্য দিয়ে আশরাফুল মাখলুকাত' হওয়ার যোগ্যতা অর্জন করতে হবে। মানুষ যদি নিজেকে, আল্লাহকে এবং তাঁর সৃষ্টিকে চিনতে না পারে, তবে সে সৃষ্টির সেরা ও জল স্থলের প্রতিনিধি হওয়ার যোগ্যতা অর্জনে সক্ষম হবে না। ইকবাল এমন সব লোকের ব্যাঙ্গাত্মক সমালোচনা করে বলেন:

یہی آدم ہے سلطاں بحر و بر کا؟
کہوں کیا ماجرا اس بے بصر کا
نہ خود بیں نہ خدا بیں نہ جہاں بیں
یہی شہ کار ہے تیرے ہنر کا!

Dhaka University Institutional Repository

অনুবাদ:

এ না কি সেই, যে জল স্থলের বাদশা?
কি বলবো এ চরুহারা মানুষের ব্যাপার !
চিনেনা নিজেকে, চিনে না খোদাকে, চিনে না দুনিয়াকেও
এ না কি তোমার বুদ্ধিও সেরা অবদান? (ইকবাল- ১১, পৃ. ২২৬)

পৃথিবীতে ধন- সম্পদ উপার্জন করা অবৈধ নয়:

ولا تنس نصيبك من الدنيا

[এবং দুনিয়া হতে তোমার অংশ নিতে ভুলোনা] (২৮: ৭৭)

لا رهبانية في الاسلام

[ইসলামে বৈরাগ্য নেই] (হাদীস কাশফুল খিফা, খ. ২ পৃ. ৫২৮)

বৈরাগ্য তথা সংসার ত্যাগের কোন নীতি ইসলাম অনুমোদন করে না। হিন্দুদের সন্ন্যাসী ও বৈরাগী, বৌদ্ধদের ফুঙ্গি ও ধর্মযাজকদের ন্যায় এবং খ্রিস্টান ইহুদীদের মধ্যে এক শ্রেণির পাদ্রীদের ন্যায় বিয়ে শাদী ঘরবাড়ী, বিষয় সম্পত্তি ত্যাগ করে বনবাসী হওয়া বা ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পুর্বক যেনতেনভাবে জীবন ধারণ করা

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম সমর্থন করে না। একজন মুসলমানের পক্ষে লাখপতি কোটিপতি হওয়ার মধ্যে কোন আপত্তি নেই। তবে তা নিজস্ব ভোগের জন্য নয়, সর্বসাধারণের হিত সাধন ও সেবাব্রত পালনের উদ্দেশ্যে হতে হবে।
ইকবাল ও এই অভিমত পোষণ করেন। তিনি বলেন:

کمال ترک نہیں آب و گل سے مہجوری
کمال ترک ہی تسخیر خاکی و نوری !
میں ایسے فقر سے اے اہل حلقہ باز آیا
تمہارا فقر ہے بے دوائی و رنجوری
نہ فقر کے لئے موزون نہ سلطنت کے لئے
وہ قوم جس نے گنوایا متاع تیموری

অনুবাদ:

প্রকৃত দুনিয়া বিমুখতার মানে - দুনিয়া ত্যাগ নয়;
প্রকৃত সংসার-বিমুখতা হলো মাটির জগত ও
ফেরেশতা জগতকে বশীভূত করা।
তোমাদের দরবেশী থেকে, হে সুফীগন ! ফিরে এসেছি আমি,
তোমাদের দরবেশী হলো অর্থহীনতা ও রুগ্নতা।
দিয়েছি নষ্ট করে যে জাতি তৈমুর প্রতিনিধিদের বাদসাহী
লায়েক নয় তারা ফকিরীরও,বাদশাহীরও। (ইকবাল-১১, পৃ. ৬৪)

আধ্যাত্মিক শক্তির বলে অলৌকিক ঘটনা ঘটতে পারে:

قلنا ينار كوني بردا و سلما علي ابراهيم
[আমি বললাম,‘হে আগুন !তুমি ইব্রাহীমের জন্য ঠাণ্ডা ও নিরাপদ হয়ে যাও।’] (২১: ৬৯)

হযরত ইব্রাহীম (আ.) কে তার সম্প্রদায় কর্তৃক আগুনে নিক্ষেপ করার ঘটনাটি কুরআনে এভাবে বিবৃত হয়েছে:

হযরত ইব্রাহীম (আ.) তখন তার পিতা (আযর) ও তার সম্প্রদায়কে বললেন, এই প্রতিমাগুলো কি, যাদের পূজায় তোমরা লিপ্ত রয়েছে। তোমাদের নিজের হাতে গড়া পাথরের এই মুর্তিগুলো কিভাবে তোমাদের খোদা হতে পারে? হযরত ইব্রাহীম বললেন, ‘তোমরা নিজেরা ও তোমাদের পিতৃপুরুষগণ প্রকাশ্য বিভ্রান্তিতে রয়েছে। বিভ্রান্ত বাপ দাদার অন্ধ অনুকরণ করে তোমরা কেন ধ্বংস হচ্ছো?’

Dhaka University Institutional Repository

তারা বললো,'তুমি আমাদের নিকট সত্য এনেছ, না কি কৌতুক করছ? সত্যই কি এটা তোমার ধারণা, নাকি তুমি আমাদের সাথে রসিকতা করছ? তিনি বললেন, 'না, তোমাদের প্রতিপালক তো উনি, যিনি আকাশ জমিন সৃষ্টি করেছেন এবং এ ব্যাপারে আমি অন্যতম সাক্ষী।''

তিনি আরো বললেন, 'আল্লাহর কসম, তোমরা কোন দিকে চলে গেলে আমি তোমাদের মুর্তিগুলোর জন্য অবশ্যই একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করবো ।''

তারা যখন শহর থেকে দূরে এক মেলায় গেল, তখন হযরত ইব্রাহীম (আ.) মূর্তিঘরে প্রবেশ করে মূর্তিগুলোকে চর্ণ বিচুর্ণ করে দিলেন। কেবল একটি মূর্তি অটুট রাখলেন, যা দৈহিক ও সন্মানের দিক থেকে তাদের নিকট সর্ব প্রধান ছিল। যে কুড়ালটি দিয়ে তিনি মুর্তিগুলো ভেঙ্গেছিলেন, তা বড় মুর্তির গলায় ঝুলিয়ে রাখলেন, যাতে করে তারা মনে করে যে, এসব কাণ্ড বড় মূর্তিই ঘটিয়েছে।

হযরত ইব্রাহীমের (আ.) সম্প্রদায় বললো, 'আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি যে এরূপ আচরণ করলো, সে নিশ্চয়ই সীমালংঘনকারী।'

তাদের কেউ কেউ বললো, এক যুবককে ওদের সমালোচনা করতে শুনেছি, সে ইব্রাহীম বলে কথিত।

তারা বললো, তাকে জনসন্মুখে হাজির কর, যাতে তারা তাকে দেখতে পারে।'

তারা বললো, হে ইব্রাহীম তুমিই কি আমাদের উপাস্যগুলোর প্রতি এরূপ আচরণ করেছ?'
হযরত ইব্রহীম (আ) বললেন, 'আমি নয়, বরং উপাস্যদের প্রধান একাজ করেছে। তাদের জিজ্ঞেস কর,যদি তারা কথা বলতে পারে।'

তখন তারা মনে মনে চিন্তা করে দেখলো এবং একে অপরকে বলতে লাগলো, তোমরাইতো সীমা লংঘনকারী! কারণ তোমরা মুর্তিগুলোকে অরক্ষিত অবস্থায় রেখে বাইরে চলে গেছ।'অতঃপর লজ্জায় তাঁদের মস্তক অবনত হয়ে গেল এবং তারা পরস্পরে বললো, 'তুমিতো জানই যে, এরা কথা বলে না।'

হযরত ইব্রাহীম (আ.) বললেন,'তবে কি তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুর ইবাদত করবে যা তোমাদের কোন উপকার করতে পারে না, ক্ষতির করতে পারে না?
তিনি আরো বললেন, ধিক তোমাদের প্রতি এবং আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের ইবাদত করছ, তাদের প্রতিও তবে কি তোমরা বুঝবেনা?

তারা বললো,তাঁকে পুড়িয়ে ফেল এবং তোমাদের দেবতাগুলোর সাহায্য নিয়ে তা কর যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

আল্লাহ বললেন,'হে আগুন ! তুমি ইব্রাহীমের জন্য ঠাণ্ডা এবং নিরাপদ হয়ে যাও। (৫২:৭০)
আল্লাহ আরো বলেন, তারা তাঁর ক্ষতি সাদনের ইচ্ছা করেছিল, কিন্তু আমি তাদের কওমে দিলাম সর্বাদিক ক্ষতিগ্রস্ততা। তাঁকে আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছিল, কিন্তু সেই আগুন হয়ে গেল শীতল ও আরামের কারণ।

কুরআনের এই ঘটনার প্রতি লক্ষ্য করে ইকবাল বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

آج بھی ہو جو ابراہیم کا ایمان پیدا
آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا

অনুবাদ:

আজও যদি সৃষ্টি হয় ইব্রাহীমের ঈমান,
তবে ধারণ করতে পারে আগুন, বাগানের রূপ। (ইকবাল -১১, পৃ. ২২৪)

সারকথা

আল্লামা ইকবাল তাঁর কাব্যেও ভাবধারা পরিগ্রহ করেছেন কুরআন মজীদ, হাদীস শরীফ ও বুযুর্গানে দীন এর বাণী থেকে, পাশ্চাত্য দর্শন থেকে নয়।

তিনি তাঁর আরমুগানে হিজায' গ্রন্থে বলেন:

نه از ساقی نه از پیمانه گفتم
حدیث عشق بی باکانه گفتم
شنیدم آنچه از پاکان امت
ترا با شوخیٔ رندانه گفتم

অনুবাদ:

পানপাত্র বা পানপাত্র বাহক থেকে বলিনি,
ইশ্‌কের কথা নির্ভীকভাবে বলছি।
মিল্লাতের পাক লোক থেকে যা শুনেছি,
স্বাধীনচেতার সাহস নিয়ে তা তোমাকে বলেছি। (ইকবাল- ৫, পৃ. ১৪৭)

কুরবানী ত্যাগের শিক্ষা দেয়:

কুরবানী বলতে শুধু গরু ,ছাগল, মহিষ, দুম্বা ইত্যাদি যবাই করা বোঝায় না। বরং এর দ্বারা আল্লাহ তায়ালার সন্তুষ্টি অর্জন বোঝায়। কুরবানী আল্লাহর নবি হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাঈল (আ.) এর অতুলনীয় ত্যাগের স্মৃতি বহন করে। এর মাধ্যমে মুসলমানগণ ঘোষণা করেন যে, তাঁদের কাছে নিজ জানমাল অপেক্ষা আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের মূল্য অনেক বেশি। তারা পশুর গলায় ছুরি চালিয়ে এর রক্ত প্রবাহিত করে আল্লাহর কাছে শপথ করে বলে, ''হে আল্লাহ ! তোমার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য যেভাবে পশুর রক্ত প্রবাহিত করছি, প্রয়োজনে আমাদের শরীরের রক্ত প্রবাহিত করতেও কুণ্ঠিত হব না। কে কত টাকা খরচ করে পশু ক্রয় করেছে কার পশু কতমোটা তাজা, কত সুন্দর আল্লাহ তা দেখতে চান না। তিনি দেখতে চান কার অন্তরে কতটুকু আল্লাহর ভালবাসা ও তাক্‌ওয়া আছে। পবিত্র কুরআনে মহান আল্লাহ বলেন:

لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوي منكم

অর্থ ‘’কখনো আল্লাহর নিকট পৌছায় না এগুলোর গোশত এবং রক্ত বরং পৌছায় তোমাদের তাকওয়া (২২: :৩৭)

قال يبني اني اري في المنام اني اذبحك فانظر ما ذا عري قال يابت افعل ما تومر ستجدني ان شاء الله من الصبرين فالما اسلما وتله للجبين ونادينث ان يا ابراهيم . قد صدقت الرويا انا كذلك نجزي المحسنين

[ইব্রাহীম বলল, ‘বৎস আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে আমিযবাহ্ করছি, এখন তোমার অভিমত কি বল? সে বললো, ‘হে আমার পিতা আপনি যা আদিষ্ট হয়েছেন, তাই করুন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে আপনি আমাকে ধৈর্যশীল পাবেন।’ যখন তারা উভয়ে আনুগত্য প্রকাশ করল এবং ইব্রাহীম তাঁকে কাত করে শায়িত করল,তখনআমি তাকে আহবান করে বললাম, ‘হেইব্রাহীম!তুমি তো স্বপ্নাদেশ সত্যই পালন করলে!’এইভাবেই আমি সৎকর্মপরায়ণদের পুরস্কৃত করে থাকি। (৩৭: ১০২-১০৫)

পিতা ইব্রাহীম পিতৃ সুলভ সহমর্মিতা সত্বেও আপন পুত্র ইসমাঈলকে কুরবান করতে উদ্যত হলেন এবং কিশোর পুত্র ইসমাঈলও আল্লাহর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন করে স্বেচ্ছা প্রণোদিত হয়ে নিজেকে কুরবানীর জন্য উপস্থিত করলেন। এ ঘটনার প্রতি ঈঙ্গিত করে ইকবাল বলেন:

یہ فیضان نظر تھا یاکہ مکتب کی کرامت تھی
سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی

অনুবাদ:

একি রুহানী দৃষ্টির দান ছিল, নাকি মক্তবের কারামত!
কে শেখালো ইসমাঈলকে সন্তান সুলভ এই আদাব ইহতেরাম! (ইকবাল-১১, পৃ. ২১)

*হযরত ইসমাঈলের এই আনুগত্য প্রদর্শন কোন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ফসল নয়। এ ছিল তাঁর পিতা হযরত ইব্রাহীমের পবিত্র দৃষ্টির ফলশ্রুতি। (আরেফ -৯২, পৃ. ৬৩)

আত্মত্যাগ ও আত্মসমর্পনের মূর্ত প্রতীক ছিলেন হযরত ইব্রাহিম (আ.) ও হযরত ইসমাইল (আ.) মানুষের জীবনে এ শিক্ষা গ্রহণ করলে তারা হয়ে উঠবে একে অপরের প্রতি সহানুভূতিশীল, পরোপকারী ও আত্মত্যাগী। আত্মত্যাগী মানুষই সমাজ ও রাষ্ট্রের কল্যাণ বয়ে আনতে পারে। নিজের সুখ শান্তির বাহিরে যারা সমাজের মানুষের সুখকে বড় করে দেখে, তারাই প্রকৃত মানুষ। কুরআনি ত্যাগের শিক্ষা আমাদেরকে পরোপকারে উৎসাহিত করবে ও মানবতাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটবে।

দানের উৎকৃষ্ঠ উপমা:

لن تنالوا البر حتي تنفقوا مما تحبون

[তোমরা যা ভালবাস, তা হতে ব্যয় না করা
পর্যন্ত কখনো পুণ্য লাভ করবে না] (৩: ৯২)

তাবুক যুদ্ধের প্রস্তুতির জন্য রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সালাম) সাহাবা কিরাম (রা.) দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান। এ আহ্বানে তাঁদের প্রত্যেকেই সাধ্যমতো সাড়া দেন। তবে এ ক্ষেত্রে উছমান (রা.) সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ যুদ্ধে সব মিলে উছমান (রা.) এর দানের পরিমাণ ছিল নয়শ সুসজ্জিত উট এবং একশ সুসজ্জিত ঘোড়া,দুশ উকিয়া (প্রায় সাড়ে উনত্রিশ কিলো রৌপ্য) ও এক হাজার দীনার (প্রায় সাড়ে পাঁচ

Dhaka University Institutional Repository

কিলো স্বর্ণ)। কিন্তু এতদসত্ত্বেও আবু বকর (রা.) দানের ক্ষেত্রে যে মর্যাদা অর্জন করেন, তা অন্য কারো ভাগ্যে জুটেনি। (সালিহী, সুবুলল হাদয়ি ওয়ার রাশাদ, খ- ৫, পৃ. ৪৩৫)

''উমার (রা.) বর্ননা করেন, রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) যখন আমাদের অর্থদানের আহ্বান জানালেন, তখন আমার নিকট প্রচুর অর্থ- সম্পদ ছিল। আমি মনে মনে ভাবতে থাকি, যদি আমি কোনো দিন আবু বকর (রা.) কে প্রতিযোগিতায় হারাতে পারি, তবে আজই পারবো। আমি আমার সম্পদের অর্ধেক নিয়ে রাসুলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর খিদমতে উপস্থিত হই। রাসুলুল্লাহ (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, ما ابقيت لاهلك তোমার পরিবারের জন্য ঘরে কী পরিমাণ রেখে এসেছো? আমি বললাম مثله এর সমপরিমাণ সম্পদ পরিবারের লোকদের জন্য রেখে এসেছি। কিন্তু আবু বকর (রা.) ঐ দিন তাঁর ঘরে যা কিছু ছিল তা সবই নিয়ে রাসুল (সা.) দরবারে হাযির হন। রাসুল (সা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন , ما ابقيت لاهلك তোমার পরিবারের জন্য ঘরে কী রেখে এসেছো? আবু বকর (রা.) আরয করলেন, ابقيت لهم الله ورسوله আমি তাদের জন্য আল্লাহ ও তার রাসুলকে রেখে এসেছি।'' উমার (রা.) বলেন, لا اسابقك الي شيء ابدا সে দিন থেকে আমার বিশ্বাস জন্মালো যে, আমি কখনোই আবু বকর (রা.) থেকে অগ্রগামী হতে পারবো না। হাদীস (আবু দাউদ, আস সুনান, (কিতাবুয যাকাত), হা. নং. ১৪২৯ তিরমিযী, আস সুনান, (কিতাবুল মানকিব), হা. নং. ৩৬০৮।

আবু বকর (রা.) এর দানের পরিমাণ ছিল চার হাজার দিরহাম। তিনিই সর্বপ্রথম দান নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন।

বলাই বাহুল্য যে, সে দিন 'উমার (রা.) যা করেছেন, তাতে তাঁর মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব কাজ করছিল অবশ্যই এ প্রতিযোগিতা ভালো কাজে প্রশংসনীয়। তবে আবু বকর (রা.) এর দান তাঁর চেয়ে অনেক মহৎ ছিল। তিনি সে দিন যা করেছেন, তাতে কারো সাথে প্রতিযোগিতার কোনো মনোবৃত্তি তাঁর ছিল না, তিনি কারো প্রতি না তাকিয়েই এ দান করেছিলেন, যা সত্যিই মহত্তম। (আহমদ-৭০, পৃ. ১৮২)

সিদ্দীক রা 'শীর্ষক কবিতায় যে ঘটনাটি ইকবাল তার 'বাংগে দারা'গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন, তা তাবুক যুদ্ধ সংক্রান্ত। এ ঘটনাটি ঘটে নবম হিজরীর রজব মোতাবেক ৬৩০ খ্রিষ্টাব্দের মদীনা আক্রমণ করার জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করছে। নবীজী বিষয়টি অবগত হয়ে যুদ্ধ প্রস্তুতির আদেশ দেন। সে সময় মদীনায় ভীষণ দুর্ভিক্ষ ছিল। যুদ্ধ চালানোর মত পার্থিব সঙ্গতি ইসলামি স্টেটের ছিল না। সে জন্য অর্থ সম্পদ দান করতে উৎসাহিত করেন। হযরত উসমান (রা) আমাদের দেশের বর্তমান মুদ্রা অনুযায়ী আনুমানিক এক লক্ষ্যের ও বেশী টাকা দান করেন। হযরত উমর (রা.)তার যাবতীয় সম্পদের অর্ধেক নবীজীর সামনে উপস্থিত করেন। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার ও সন্তানদের অধিকার রয়েছে। বাকী অর্ধেক আমি ইসলামের জন্য উৎসর্গ করছি। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা.) তার যাবতীয় ধন -সম্পদ নবীজীর (সা.) হাতে তুলে দিলেন, এমন কি তার গায়ে তালি লাগানো যে জামাটি ছিল, তাও তিনি খুলে দিলেন। নবীজী (সা.) যখন তাকে জিজ্ঞেস করলেন, পরিবার সন্তান-সন্ততির জন্য কি রেখে এসেছেন? উত্তরে হযরত আবু বকর (রা.) বললেন: তাদের জন্য আল্লাহ ও আল্লাহর রাসুল রয়েছেন। হযরত আবু বকরের এই উদারতা ও আত্মোৎসর্গ বর্ণনা করে ইকবাল বলেন:

پروانے کو چراغ نے بلبل کو پھول بس

صدیق (رض) کے لئے ہے خدا کا رسول (ص) بس

অনুবাদ:

পতঙ্গের জন্য প্রদীপ আর বুলবুলের জন্য ফুলই যথেষ্ট,

Dhaka University Institutional Repository

সিদ্দীকের (রা) জন্য আল্লাহর রসুলই যথেষ্ট। (ইকবাল- ১১, পৃ. ২৫১)

শয়তান আদম (আ.) কে সেজদা না ক'রে এবং অহংকার করে কাফেরে পরিণত হলো, কিন্তু মুমিনের জন্য সে হয়ে দাঁড়ালো ঈমান যাচাইয়ের কৃষ্টিপাথর ও খুদী বৃদ্ধির সহায়ক।

হযরত আদম (আ.) শয়তানের প্ররোচণায় বেহেশতের নিষিদ্ধ গাছের ফল খেয়ে গুনাহ করেছিলেন। ইবলীস শয়তানও অহংকারবশত আদম (আ.) কে সেজদা না করে পাপ কার্য করেছিল। ইকবালের ভাষায়- কুরআন কারীমে হযরত আদম (আ.) ও শয়তান উভয়ের দিক থেকে যে পাপের উদ্রেক হয়েছিল, তার উল্লেখ রয়েছে। কিন্তু গুনাহ এর ব্যাপারে আদম (আ.) যে আচরণ করেছিলেন, তা ছিল শয়তানের আচরণ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। হযরত আদম (আ.) থেকে পাপের উদ্রেক হওয়ায় তিনি লজ্জাবনত হয়ে বলেছিলেন:

ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفرلنا وترحمنا لنكونن من الخسرين

অনুবাদ:

হে আমাদের প্রতিপালক ! আমরা নিজের উপর জুলুম করেছি। তুমি যদি

আমাদের ক্ষমা ও দয়া না কর, তবে আমরা সম্পূর্ণ ধ্বংশ হয়ে যাবো। (৭: ২৩)

কিন্তু শয়তান থেকে পাপের উদ্রেক হওয়ায় সে বলে উঠলো:

فبما اغويتني لاقعدن لهم صراطك المستقيم

অনুবাদ:

তুমি আমাকে যেমন পথভ্রষ্ট করেছ, আমিও তেমনি তোমার সোজা
পথের উপর মানব জাতির দিকে তাক করে বসে থাকবো। (৭:১৭)

উভয়ের আচরণের মধ্যে পার্থক্য পরিস্কার। আদম (আ.) পাপের দায়িত্ব নিজেই গ্রহণ করেছিলেন এবং এবং এটা স্বীকার করেছিলেন যে, আল্লাহ তায়ালা তাঁকে ভাল মন্দের পথ বেছে নেয়ার এখতিয়ার দিয়েছিলেন। কিন্তু শয়তার তার পাপের জন্য খোদাকে দায়ী করেছিল। ইকবাল এই ঘটনাকে ইবলীস ও খোদার মধ্যে এক কথোপকথনের মাধ্যমে বর্ণনা করেছেন। ইবলীস বলছে, ''আমি আদমকে সেজদা করি নাই, কারণ তা আল্লাহর অভিপেত ছিলনা।' ইবলীস বলে:

اے خدائے کن فکان مجھ کو نہ تھا آدم سے بیر
آہ وہ زندانی نزدیک و دور و دیر و زود
حرف استکبار تیرے سامنے ممکن نہ تھا
ہاں مگر تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود

অনুবাদ:

হে সৃষ্টি কর্মের খোদা ! আদমের প্রতি আমার কোন শত্রুতা ছিলনা,
কিন্তু দুঃখের বিষয়, সে নৈকট্য দুরত্ব ও সত্তর গৌণের কয়েদখানায় আবদ্ধ।
তোমার সন্মুখে আমার অহংকার কোনমতেই সম্ভব ছিলনা,
কিন্তু আদমকে সেজদা কনা তোমারই অভিপেত ছিলনা। (ইকবাল ১১, পৃ. ৪২-৪৩)

এর উত্তরে শয়তানের স্বাধীন ইচ্ছাকে দায়ী করে আল্লাহ তায়ালা ফেরেশতাদের প্রতি সম্বোধন করে বলেন:

یزداں پستی فطرت نے سکھلائی ہے یہ م جت ے
کہتا ہے تیری مشیت میں نہ تھا میرا سجود
دے رہا ہے آپ کی آزادی کو مجبوری کا کام
ظالم اپنے شع لہ سوزاں کو خود کہتا ہے دود

অনুবাদ:

স্বভাবের হীনতা তাকে (শয়তানকে) শিখিয়েছে এই হুজ্জত
সে বলছে: ‘‘আদমকে আমার সেজদা করা
তোমারই অভিপ্রেত ছিলনা।’’
সে আপন আযাদীকে অভিহিত করছে অক্ষমতা বলে,
এই জালিম নিজ জ্বলন্ত অগ্নিশিখাকে ধুঁয়া বলে
আখ্যায়িত করছে।

পূর্বেই বলা হয়েছে শয়তান খোদাকে বলেছিল, ‘‘আমি তোমার আদম সন্তানকে সোজা পথ থেকে বিচ্যুত করবো।’শয়তানের এই প্রতিজ্ঞার ফলে পাপ পূর্ণ ও ভাল মন্দের লড়াই আরো তীব্র হয়ে উঠলো। আর এই নীরস দুনিয়া কর্মতৎপরতায় সরগরম হয়ে উঠলো। ইকবালের ধারণায়, শয়তান আমাদের জীবন যুদ্ধে বিঘ্ন ঘটিয়ে আমাদের ‘খুদী’কে আরো দৃঢ় আরো প্রাণবন্ত আরো পূর্ণতাপ্রাপ্ত করে তুলেছে। ইকবালের ভাষায়, সেই দিকটি বিবেচনা করলে বলতে হয় যে, শয়তান আমাদের ক্ষতির চাইতে উপকার বেশী সাধন করেছে। বেহেশত থেকে আদম (আ.) এর পতন মানুষের উপকারই সাধন করেছে।

Dhaka University Institutional Repository

পঞ্চম অধ্যায়:
ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ইকবালের কবিতায় ও দর্শন

পঞ্চম অধ্যায়

ইসলামি দৃষ্টিভঙ্গি ইকবালের কবিতায় ও দর্শন:

اسلام

روح اسلام کی ہے نور خودی نار خودی

زندگانی کے لئے نار خودی نور وحضور!

یہی ہر چیز کی تقویم ، یہی اصل نمود

گرچہ اس روح کو فطرت نے رکھا ہے مستور

لفظ اسلام سے یورپ کو اگر کد ہے تو خیر

دوسرا نام اسی دین کا ہے فقر غیور

(১)

ইসলাম

Dhaka University Institutional Repository

খুদীর আলো আর খুদীর উষ্ণতা হলো ইসলামের প্রাণ,
খুদীর উষ্ণতা জীবনকে করে আলোকিত, আল্লাহর অস্তিত্বে বিশ্বস্ত
প্রকৃতি যদিও রেখেছে এই রূহকে অদৃশ্য,
তবু তা বস্তুনিচয়ের শক্তি, বস্তুর আত্ম প্রকাশের উৎস।
ইসলাম' শব্দে ইউরোপীয়দের যদি থাকে বিরক্তি,
তবে বলবো এ ধর্মের অপর নাম ফাকরে গায়ূর তথা
ঈর্ষাসূচক স্বয়ংসম্পূর্ণতা। (ইকবাল -১৯৩৬. পৃ. ২৫)

توحید

زندہ قوت تھی جہان میں یہی توحید کبھی
آج کیا ہے ؟ فقط اک مسئلہ علم کلام !
روشن اس ضو سے اگر ظلمت کردار نہ ہو
خود مسلمان سے ہے پوشیدہ مسلمان کا مقام!
میں نے اے میر سپہ تیری سپہ دیکھی ہے
قل ہو اللہ کی شمشیر سے خالی ہیں نیام
آہ اس راز سے واقف ہے نہ ملا نہ فقیہ ہ
وحدت افکار کی بے وحدت کردار ہے خام
قوم کیا چیز ہے قوموں کی امامت کیا ہے !
اس کو کیا سمجھیں یہ بیچارے یہ دو رکعت کے امام

(২)

(তাওহীদ)

ছিল তওহীদ কোন সময় ধরণীতে এক জীবন্ত শক্তি,
আজ তার অবস্থা কি? শুধু ইলমে কালাম' *এর একটি বিষয়।
ইহা হয় উজলা যদি এর আলোকে চরিত্রের আঁধার,
মুসলিমের কাছেই থাকবে অজানা মুসলিমের অবস্থান।
হে দিশারী ! দেখেছি আমি তোমার ফৌজ ,
খাপ তোমার রয়েছে শূন্য কুহুক আল্লাহ'র তরবারী থেকে।
আহ্ জানে না এই তত্ত্ব মোল্লা আর ফকীহ:
মুসলিমের কর্ম -ঐক্য বিনা, চিন্তা ঐক্যের কোন দাম নেই।
জাতি কি, জাতির নেতৃত্ব কি,

Dhaka University Institutional Repository

কি বুঝবে এ তত্ত্ব হতবাগা দুরাকাআতের ইমাম। (ইকবাল- যরবে কালীম, পৃ. ১৮.)

ব্যাখ্যা:

খোদ মুসলিমের কাছেই থাকবে মুসলিমের মূল্য অজ্ঞাত এর মানে: মুসলমান জানেনা যে, তাদেরকে কি উদ্দেশ্যে ধরায় পাঠানো হয়েছে; কোন উদ্দেশ্য পূর্ণ করার দায়িত্ব তাদের জিম্মায় রাখা হয়েছে। দুনিয়াতে আল্লাহর খিলাফত প্রতিষ্ঠা করার জন্য তাদেরকে যে পাঠানো হয়েছে, এ কথা তাদের অনেকেই জানে না। ‘কুলহু আল্লাহ’ এর তরবারি নেই তাদের দিশারীর খাপে। এর মানে হলো তওহীদের রুহ তাদের মধ্যে দৃষ্ট হয় না।

(تقدیر)

نا اہل کو حاصل ہے کبھی قوت وجبروت
ے خوار زمانے میں جوہ ر ذاتی!
شاید کوئی منطق بو نہاں اس کے عمل میں
تقدیر نہیں تابع منطق نظر آتی!
ہاں ایک حقیقت ہے کہ معلوم ہے سب کو
تاریخ امم جس او نہیں ہم سے چھپاتی !
ہر لحظہ ہے قوموں کے عمل پر نظر اس کی!
براں صفت تیغ وپیکر نظر اس کی !

(৩)

(তক্‌দির)

হয় কখনো অযোগ্য ব্যক্তি, ক্ষমতা আর দাপটের অধিকারী,
হয় কখনো যোগ্যতার অধিকারী, জগতে লাঞ্ছিত গঞ্জিত।
রয়েছে হয়তো বা তার একাজে নিহিত কোন যুক্তি,
মনে হয় বাহ্যত, তক্‌দির নয় বিবেক বুদ্ধির অধীন
কিন্তু আছে একটি বিষয়, জাতিসমূহের ইতিহাস;
‘‘থাকে দৃষ্টি তক্‌দিরের সদা, জাতির কর্মের উপর,
এ দৃষ্টি তার, ধারল যেন দু’ধারী তলোয়ার! (ইকবাল-যরবে কালীম, পৃ, ১৭)

ব্যাখ্যা:

কবি এ কবিতায় তক্‌দির সম্পর্কে সাধারণ লোকের ধারণা তুলে ধরার পর এর আসল রূপ বর্ণনা করেন। কোথাও কোথাও যখন পার্থিব ক্ষেত্রে অযোগ্য লোককে উন্নত এবং যোগ্য লোককে অনুন্নত দেখা যায়, তখন লোকেরা মনে করে যে, এসবই তক্‌দিরের কর্ম; তক্‌দির যুক্তি প্রমাণ কিছুই মেনে চলে না; তা যা-ই চায়, তা-ই করে থাকে। কিন্তু এটা স্থায়ী সত্য নয়।

Dhaka University Institutional Repository

বাস্তব সত্য হলো- তকদির জাতির কর্ম দেখে। যে জাতি চেষ্টা তকদিরে তৎপর হয়, সাহস আর জান বাজি রেখে কাজ করে, সে জাতি উন্নতির শিখরে পদার্পন করে, আর যে জাতি এসব গুণের অধিকারী নয়, সে জাতি ভূপৃষ্ঠ হতে মুছে যায় বা দীনহীন হয়ে কোন রকমে বেঁচে থাকে। এতে বোঝা যায়, তক্দির হলো কর্মফল। কুরআন ও এ বিষয়ে সাক্ষ্য দেয়:

ذلك بان الله لم يك مغيرا نعمة انعمها
علي قوم حتي يغيروا ما بانفسهم

ফিরাউনের বংশধর ও তার পূর্বকার পাপিষ্ঠ লোকদের কথা উল্লেখ করে আল্লাহ বলেন যে, তাদের এ শাস্তি হয়েছে নিজেদের বদ কাজের পরিণতি স্বরূপ। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে তাঁর নিয়ামত দান করলে তা কখনো তিনি ছিনিয়ে নেন না, যতক্ষণ না ওরা আপন অবস্থায় অবনতি ঘটায় এবং শাস্তিকে নিজেদের দিকে টেনে আনে।

اجتہاد

ہند میں حکمت دیں کوئی کہاں سے سیکھے
نہ کہیں لذت کردار نہ افکار عمیق
حلقۂ شوق میں وہ جرات اندیشہ کہاں
آہ محکومی و تقلید و زوال تحقیق
خود بدلتے نہیں قرآں کو بدل دیتے ہیں
ہوئے کس درجہ فقیہان حرم بے توفیق!
ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب
کہ سکھاتی نہیں مومن کو غلامی کے طریق

(৪)

ইজতিহাদ

উলামার প্রতি।
কোথা হতে কেউ শিখবে ভারতে দীনের তত্বকথা,
নেই কোথাও কর্মপ্রেরণা, নেই চিন্তার গভীরতা।
সুফীদের মাহফিলে কোথায় সেই
চিন্তা ভাবনার সাহসিকতা!
আহা পরাধীনতা ! অন্ধ অনুকরণ আর গবেষণার পতন!
বদলে না নিজে, বদলে দেয় কুরআন,
দীনের ফকীহগণ কতটুকু হয়েছেন তওফীকহীন!
এ পরাধীনদের না কি এই ধারণা:
অঙ্গহীন এই কুরআন,

Dhaka University Institutional Repository

কারণ তা শেখায় না মুমিনদের পরাধীনতার পথ। (ইকবার-যরবে কালীম. পৃ. ১৪)

এ কবিতায় ঐ ইজতিহাদের স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে, যা মুসলমানেরা পরাধীনতার সময় অবলম্বন করেছ।

(مومن)

ہو حلقۂ یاراں تو ابریشم کی طرح نرم
رزم حق وباطل ہو تو فولاد ہے مومن!
افلاک سے ہے اس کی حریفانہ کشاکش
خاکی ہے مگر خاک سے آزاد ہے مومن!
جچتے نہیں کنجشک وحمام اس کی نظر میں
جبریل واسرافیل کا صیاد ہے مومن

(৫)
(মুমিন)

মুমিন কোমল রেশমের ন্যায় বন্ধু আসরে
বদলে যায় সে ইস্পাত লোহার সত্য অসত্য -রণে।
থাকে আকাশের সাথে তার বৈরী টানাপড়েন,
মাটির তৈরী সে, কিন্তু থাকে মাটি থেকে আযাদ।
পড়েনা তার নজর চাকচিকে আর কবুতর গায়ে,
জিব্রীল আর ইস্রাফীল তার নগ্ন শিকার | (ইকবাল —যরবে কালীম, পৃ. ৪১)

مذہب

اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر
خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی
ان کی جمعیت کا ہے ملک ونسب پر انحصار
قوت مذہب سے مستحکم ہے جمعیت تری
دامن دیں ہاتھ سے چھوٹا جمعیت کہاں
اور جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی!

Dhaka University Institutional Repository

(৬)

মাযহাম

হে মুসলমান ! করোনা তুলনা আপন জাতির
পাশ্চাত্য জাতিসমূহের সাথে,
সম্পূর্ণ ভিন্ন রসুলে হাশেমীর জাতি
গঠিত হয় ইউরোপের জাতি
দেশ ও খান্দানের ভিত্তিতে,
দৃঢ়তা লাভ করে তোমার জাতি
ধর্মের শক্তিতে।
থাকবে কোথায় তোমার জাতীয়তা
ছুটে গেলে ধর্মের আঁচল হাত থেকে?
বিধায় নেবে ধর্ম ও জাতীয়তা বিদায় নিলে।

نماز

بدل کے بھیس پھر آتے ہیں ہر زمانے میں
اگر نہ پیر ہے آدم جواں ہیں لات ومنات
یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے
ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات !

(৭)

(নামায)

আদম যদিও হয়েছে বুড়ো, রয়েছে লাত মানাত (মুর্তি)
তা আসে ভোল বদলে কালে কালে ফিরে ফিরে।
লাগে তোমায় কঠিন নামাজের একটি সেজদা,
কিন্তু তা দেয় মান যে মুক্তি হাজার সেজদা থেকে! (ইকবাল —যরবে কালীম, পৃ. ৩২)

ব্যাখ্যা:

এ দু'টি শে'র এ নামাজ ও তওহীদের মর্মকথা বর্ণনা করা হয়েছে। মানুষের ভূ পৃষ্টে আসার পর যদিও হাজার হাজার বছর বিগত হয়েছে, কিন্তু মানুষের তুলনায় লাত মানাত মুর্তি এখনো রয়ে গেছে বেশ জোয়ান। সেগুলো শক্তি ও প্রভাব রয়েছে এখনো অক্ষুণ্ণ। তা নব নব বেশে কালে কালে ফিরে ফিরে আসে।

মূর্তি পূজার মানে কি? মানুষ খোদাকে বাদ দিয়ে পীর ফকীর ক্ষমতাধর মানুষ বা সরকারী কর্মকর্তার কাছে মাথা নওয়াবে। তাদেরকে আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থকারী বলে মনে করবে, যা এক প্রকারের শেরেক বই আর কিছু নয়।

Dhaka University Institutional Repository

আমাদের যুগে মুসলমানরা মাটির বা পাথরের পূঁজা করে না বটে, কিন্তু আপন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য তারা শক্তির অধিকারী মানুষ বা সরকারী কর্মকর্তার এমনভাবে তোয়াজ করে থাকে,যা কেবল খোদার কাছেই করা উচিত। এ জন্যই কবি ইকবাল বলেন, আদম বুড়ো হলেও মুর্তিপূজার মত শেরেকী কাজ এখনো রয়েছে জোয়ান। মানুষ খোদার কাছে না চেয়ে শক্তির অধিকারী মানুষের কাছে মতলব পুরো করতে চাইছে। নামাজ কি শিখায়? শুধু খোদার কাছে মাথা নত করা, শুধু খোদার কাছে সাহায্য পার্থনা করা। এটাই তো তওহীদের শিক্ষা। এ জন্যই ইকবাল বলেন, যে ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে খোদার বান্দা হবে, নামাযের এক সেজদা তাকে হাজার লোকের তোষামোদ -খোশামোদ থেকে মুক্তি দেবে।

صبح

یہ سحر جو کبھی فردا ہے کبھی ہے امروز
نہیں معلوم ہوتی کہ ہے کہاں سے پیدا
وہ سحر جو جس لرزتا ہے شبستان وجود
ہوتی ہے بندہ مومن کی اذاں سے پیدا

(৮)

(ভোর)

এই ভোর, সৃষ্টি হয় যা আগামী কাল আর
আজের আকারে,
জানি না সৃষ্টি হয় তা কোথা হতে।
ঐ ভোর, কেঁপে উঠে যাতে জীবনের অন্ধকার,
সৃষ্টি হয় তা মুমিন বান্দার আযান হতে। (ইকবল-যরবে কালীম, পৃ. ৬)

ব্যাখ্যা:

এক ভোর সৃষ্টি হয় সূর্যোদয়ের ফলে । এর সঠিক কারণ কারো জানা নেই । এতে দূর হয় জগতের অন্ধকার, সৃষ্টি হয় আলো।

আরেক ভোর, যাতে কেটে যায় মানব জীবনের অন্ধকার, সূচনা হয় নব জীবনের। এই ভোরের জন্ম হয় মুমিনের আযান হতে।

(کافر و مومن)

کل ساحل دریا پہ کہا مجھ سے خضر نے
تو ڈھونڈ رہا ہے سم افرنگ کا تریاق؟
اک نکتہ مرے پاس ہے شمشیر کی مانند

Dhaka University Institutional Repository

ہرندہ و صیقل زدہ وروشن وبراق

کافر کی ہے پہچان کہ آفاق میں گم ہے

مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہیں آفاق

(৯)

কাফের ও মোমেন

বললেন খিযির কাল আমাকে নদীর কূলে:
'খুঁজছো তুমি পশ্চিমা সভ্যতা বিষের প্রতিষেধক।''
আছে আমার কাছে তলোয়ার সম এক সূক্ষ্ম কথা।
যা কর্তক, শানে ধারাল, উজ্জ্বল আর চকচকে:
কাফেরের চিহ্ন সে হারিয়ে যায় সৃষ্টিরাজিতে,
মুমিনের চিহ্ন তার মধ্যে হারিয়ে যায় বিশ্ব প্রকৃতি।*(ইকবাল –যরবে কালীম, পৃ. ৩৯)

---

*কাফের বিশ্বের আনেক বস্তুকে ভয় করে এবং সেগুলোর ক্ষতি এড়ানোর উদ্দেশ্যে তাদের পূজা অর্চনা করে থাকে। আগের কালের লোকেরা চাঁদ,সূর্য, আগুন, পহাড় দরিয়া, ইত্যাদিও পূঁজা করতো। এখনো হিন্দু ও অন্যান্য জাতি তাই করে থাকে। এ অর্থেই বলা হয়েছে কাফের হারিয়ে যায় সৃষ্টিরাজিতে''। পক্ষান্তরে মুমিনের মধ্যে হারিয়ে যায় গোটা প্রকৃতি। বিশ্বের সকল বস্তুর উপর সে শাসন কার্য চালায়; প্রকৃতিকে সে বশীভূত করে আপন ও সৃষ্টির কাজে লাগায়। তার বিশ্বাস বিশ্বকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষ ও সৃষ্টির উপকারার্থে। আল্লাহ মানুষকে 'আশরাফুল মাখলুকাত রূপে সৃষ্টি করেছেন। দুনিয়ায় এ মর্যাদার অধিকারী হলো মুমিন। এই অর্থেই বলা হয়েছে 'মুমিনের মধ্যে হারিয়ে যায় বিশ্ব প্রকৃতি।'

(امامت)

تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے

حق تجھے میری طرح صاحب اسرار کرے

ہے وہی تیرے زمانے کا امام بر حق

جو تجھے حاضر وموجود سے بیزار کرے

موت کے آئین میں تجھ کو دکھا کر رخ دوست

زندگی تیرے لئے اور بھی دشوار کرے

دے کے احساس زیاں تیرا لہو گرما دے

فقر کی سان چڑھا کر تجھے تلوار کرے

Dhaka University Institutional Repository

فتنہ ملت بیضا ہے امامت اس کی
جو مسلماں کو سلاطیں کا پرستار کرے

(১০)

(আমানত)

করছ জিজ্ঞেস আমাকে তুমি
নেতৃত্বেও স্বরূপ,
করূণ তোমাকে আল্লাহ
রহস্য -জ্ঞাত আমার মত
সত্য নেতা ঐ লোক তোমার যুগ
যে করবে তোমায় নাখোশ হাল জামানার প্রতি।
(যে নেতা তোমার মনে হাল-জামানার অবস্থা বদলে দিয়ে
অধিকতর ভাল অবস্তা সৃষ্টির প্রেরণা যোগাবে।)
দেখাবে তোমায় খোদার দীদার
শাহাদাতের মৃত্যুর | আয়নায়,
কে তুলবে জীবনকে তোমার
কঠিনতর আগের চেয়ে।
জাগিয়ে ক্ষতির অনুভূতি তোমার রক্তকে
কের তুলবে উষ্ণতান,
দরবেশীর শান দিয়ে তোমায় করে তুলবে
ধারাল তলোয়ার।
মুসলিম জাতির জন্য বিপদস্বরূপ
তারই নেতৃত্ব,
যর করন তুলবে মুসলমানদের
বাদশার পূজারী (ইকবাল —যরবে কালীম, পৃ.৪৬)

(جنت میں)

کہتے ہیں فرشتے کہ دلاویز ہے مومن
حوروں کو شکایت ہے کم آمیز ہے مومن

ফেরেশতা বলেন: মুমিন-চরিত্র হৃদয়গ্রাহী,
হুরেরা করে অভিযোগ: মুমিন কম মিশুক।

(১১

ব্যাখ্যা: মুমিন পৃথিবীতে

আকাশ থেকে যে আপদ বিপদ নামে মুমিনের উপর,
সে তার মোকাবিলা করে দৃঢ় সংকল্প নিয়ে।

Dhaka University Institutional Repository

তাই বলা হয়েছে: ‘‘থাকে আকাশের সাথে তার বৈরী টানাপড়েন।’’
মুমিন মাটির মানুষ, কিনতু তার উদ্দেশ্য হয় আকাশ চুম্বী।
চামচিক্য আর কবুতরের উপর নজর পড়ে না তার।
ফেরেশতাদের ছাড়িয়ে যায় দক্ষ অগ্রগামী নজর।
তাই বলা হয়েছে:
‘তার নগ্ন শিকারে পরিণত হয় জিব্রীল আর ইস্রাফীল।’’
মুমিন বেহেশত
বেহেশত তার ব্যক্তিত্ব হয় ফেরেতাদের জন্য চিত্তাকর্ষক,
কিন্তু তার কম মেলামেশার ফলে হুর হয় তার প্রতি বিরাগ ভাজন।
(কারণ মুমিনের লক্ষ্য হলো কেবল আল্লাহর দীদার) (ইকবাল- যরবে কালীম, পৃ .৪১)

اے روح محمد

شیرازہ ہوا ملت مرحوم کا ابتر!
اب تو ہی بتا تیرا مسلماں کدھر جائے
وہ لذت آشوب نہیں بحر عرب میں
پوشیدہ جو ہے مجھ میں وہ طوفان کدھر جائے
ہرچند ہے قافلہ واحلہ و زاد
اس کو بیاباں سے حدی خوان کدھر جائے
اس راز کو اب فاش کر اے روح محمد (ص)
آیات الٰہی کا نگہبان کدھر جائے

(১২)

অনুবাদ: মুহাম্মদ (সা.) এর আত্মা

হয়েছে বিনষ্ট মিল্লাতে মরহুমের শৃঙ্খলা,
তুমিই বল এখন যাবে কোথায় মুসলমান!
নেই সেই জোশ আরব সাগরে,
সুপ্ত রয়েছে যে ঝড় আমার মনে,তাযাবে কোন পথে?
(আরবদের মধ্যে এখন ইশকে ইলাহী ও ইশ্‌কে রাসুলের
সেই প্রেরণা নেই | কবি বলেন, এখন আমি এ ব্যাপারে
কার সাহায্য নেবো?)

Dhaka University Institutional Repository

কোথায় যাবে হুদীর গায়ক সেই পাহাড়-মরু হতে,
হয়েছে যদিও সে কাফেলাহীন, সোয়ারিহীন, পাথেয়বিহীন।
হে রুহে মুহাম্মদ (স.) আপনিই বলুন এই গূঢ়কথা!
যাবে কোথায় এখন, আয়াতে ইলাহীর নিগাবান।

مردان

خدا

وہ ی ہےبندہ حر ص کی ضرب ہے کاری
نہ وہ کہ حرب ہے جس کی تمام عیاری
ازل سے فطرت احرار میں ہیں دوش بدوش
قلندری و قبا پوشی وکلہ داری
زمانہ لے کے جسے آفتاب کرتا ہے
انہیں کی چاک میں پوشیدہ ہے وہ چنگاری
وجود کعبیں کا طواف بتاں سے ہے آزاد
یہ تیرے مومن و کافر ناری

(১৩)
(আল্লাহর বান্দা)

ঐ লোকই আযাদ বান্দা যার আঘাত হয় কার্যকর
ঐ লোক নয়, যার যুদ্ধ সব প্রতারণা।
স্বাভাবে থাকে আযাদ বান্দার গোড়া থেকেই পাশাপাশি:
কলন্দরী, আবা-কাআ আর তাজমুকুট পরিধান।
(সত্যিকার আযাদ বান্দা দরবেশ হয়েও বাদশাহী করে থাকে,
আর বাদশা হয়েও সে চলে দরবেশী ভাব নিয়ে।)
নিহিত থাকে তার স্বাভাবে ঐ অগ্নিশিখা,
যাকে তুলে নেয় যামানা, পরিণত করে দিবাকর
(আযাদ ব্যক্তির মনে-প্রাণে থেকে আল্লাহর ইশ্‌কের
ঐ অগ্নিশিখা, যা দীর্গ দিন ধরে পৃথিবীর জন্য
পথ প্রদর্শনের উৎসরূপে কাজ করে।)
ঐরূপ লোকই থাকে মূর্তি -পূজা-মুক্ত;
না হয়, খোদা ! তোমার বান্দা-মুমিন কাফের

Dhaka University Institutional Repository

সবাই যুন্নাবী।

حکم الٰہی

پابندیٔ تقدیر کہ پابندیٔ حکم

یہ مسئلہ مشکل نہیں اے مرد خرد مند

اک آن میں سو بار بدل جاتی ہے تقدیر

ہے جس کا مقلد ابھی ناخوش ابھی خرسند

تقدیر کے پابند نباتات وجمادات

مومن فقط احکام الٰہی کا ہے پابند

(১৪)

(আল্লাহর হুকুম)

তুমি জিজ্ঞেস করছ:
মানুষ অনুসরণ করবে তক্‌দিরের, নাকি খোদার হুকুমের?
হে বুদ্ধিমান! কঠিন নয় এ প্রশ্নের উত্তর।
মুহূর্তে বদলে যায় তক্‌দির শতবার,
তক্‌দিরের অনুযায়ী এখন খোশ, পরক্ষণে নাখোশ।
(উদ্দেশ্য পূর্ণ হলো, সে খোশ, পূর্ণ হলোনা, সে নাখোশ।)
তক্‌দিরের অনুযায়ী কেবল উদ্ভিদ আর জড়বস্তুও,
(কারণ এদের ইচ্ছা-প্রতিজ্ঞা বলতে কিছুই নেই।)
মুমিন তাবেদারী করে কেবল আল্লাহর হুকমের।
(মুমিন আল্লাহর হুকম মেনে চলে, শ্রমের ফল ভাল হোক,
আর খারপই হোক। খারাপ হলে আল্লাহর মর্জি মেনে
সে সবর করে।)

قم باذن اللہ

جہان اگرچہ دگرگوں ہے قم باذن اللہ

وہی زمیں وہی گردوں ہے قم باذن اللہ

کیا نوائے انا الحق کو آتشیں جس نے

Dhaka University Institutional Repository

تری رگوں میں وہی خون ہے قم باذن اللہ

غمیں نہ ہو پراگندہ ہے شعور ترا

فرنگیوں کا یہ افسوں ہے قم باذن اللہ

(১৫)

(জাতীয় গান)

(১৯১১)

চীন ও আরব আমাদের ভারত আমাদের,
আমরা মুসলমান, সারা জাহান আমাদের দেশ।
ইসলামি জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো ধর্ম-দেশ নয়,
তাই যেখানেই মুসলমান আছে, সেটাই আমাদের দেশ।
[বিশ্বের সকল মুসলমানরা আমাদের জাতিগত ভাই।]
আমাদের বক্ষে আছে তাওহীদের আমানত,
সহজ নয় বিলীন করা আমাদের নাম নিশান।
দুনিয়ার মূর্তিঘরগুলোর মধ্যে কাবা আমাদের প্রথম ঘর,
আমরা এর প্রহরী,তা আমাদের প্রহরী।
তরবারির ছায়াত লালিত হয়ে আমরা হয়েছি জোয়ান,
জাতুয় পতাকা আমাদের খঞ্জররূপী হেলাল।
হয়েছি গুঞ্জিত পাশ্চাত্যের মরুতে আমাদের আযান,
হয়নি কোথাও বিঘ্নিত আমাদের বহমান স্রোত।
হে আকাশ!নই দমিত আমরা অসত্যের সুন্মুখে,
করেছ আমাদের যাচাই তুমি শতবার।
হে স্পেনের বাগান! আছে কি মনে দিন তোমার,
ছিল যবে আমাদের বাসা তোমার শাখা-প্রশাখার।
হে দাজলা তরঙ্গ! তুমিও চিন আমাদের,
এখনো করে মাঠ তোমার দরিয়া আমাদের কাহিনী।
[দাজলা নদীর দুই তীরে বাগদাদ শহর গড়ে উঠেছিল,
যা এশিয়ার সাম্রাজ্যের কেন্দ্রভুমি।
বাগদাদের পুর্বকার প্রভাব-প্রতিপত্তি আজ না থাকলেও
আমাদের শ্রেষ্ঠত্বের কাহিনী নিশ্চয় দাজলার মনে আছ।]
হে পবিত্র আরব ভুমি !আমরা দিয়েছি প্রাণ তোমার ইজ্জত লাগি,
রয়েছ এখনো রগে রগে তোমার, আমাদের বহমান খুন।
হেযাজ-আমীর নবীজী (স.) কাফেলা প্রধান আমাদের,
রয়েছে ঐ নামে এখনো আমাদের জানের সান্ত্বনা।
ইকবালের জাতীয় গান যেন ঘন্টা-ধ্বনি,
হয়েছে তৈরী আবার কাফেলা আমাদের, পথ চলার তরে।

(১৬)

আদম

Dhaka University Institutional Repository

অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মায়া আদম যার নাম
আল্লাহর রহস্য সে বাক স্ফুর্তি সম্ভব নয় সেথা,
সৃষ্টির প্রারম্ভ থেকেই জামানা সফররত
বহু পথ চলার পর ও প্রাচীন নয় সে।
সংশয় না থাকে যদি বলে দেই সুস্পষ্ট করে
আদম সন্তানের অস্তিত্ব দেহ নয়, প্রাণও নয়।

(১৭)

ওহী

বিত্তহীন নিঃস্ব বুদ্ধির নেতৃত্বের যোগ্যতা নেই
আন্দাজ-অনুমানের নেতৃত্বে বিপর্যস্ত জীবনের কর্মসূচী,
আলোকশূন্য চিন্তা তোমার
আর ভিত্তিহীন কর্মানুরাগ,
জীবনের অন্ধকার রাত রোশন হবে-একথা কঠিনতর,
সৎও অসৎকাজের গ্রন্থী খুলবে কেমন করে
দি জীবন নিজেই না হয় জীবন রহস্যের ব্যাখ্য

(১৮)

নবুওয়াত

আরিফ ও মুজাহিদ নই আমি
নই আমি ফকীহ মুহাদ্দিস
জানিনা নবুওয়াতের সঠিক মর্যাদাও
দৃষ্টি আমার প্রমারিত তবু আলমে ইসলামের প্রতি
নীলাভ আকাশের হৃদয় বার্তা জেনেছি অনেক
এ যুগের আঁধার রাতে দেখেছি আমি
পূর্ণ চন্দ্রের মতো উজ্জ্বল একটি আলোর শিখা
সে নবুওয়াত মুসলিম এর জন্য শুস্ক তৃণ পল্লব সম
যে নবুওয়াতে নেই শক্তি ও শোকতের পয়গাম। (ইকবাল যরবে কলীম, পৃ. ৫১)

(১৯)

মর্দে মুসলমান

প্রতি লহমায় মুমিনের নতুন প্রকাশ
কথা ও কর্মে সে আল্লাহর প্রমাণ।
প্রতাপ, কতৃত্ব, ক্ষমা ও পবিত্রতা
এ চারের সম্মিলনে মুমিনের জীবন গ্রন্থী।
মাটির মানুষ তবু প্রতিবেশী জিব্রীল আমীনের
আবাস তার বুখারা ও বাদখশানে নয়।
মুমিনের গভীর রহস্য অজ্ঞাত সবার কাছে
বাহ্যত’ কারী হলেও আসলে সে কুরআন
দুনিয়ায় তুলাদণ্ড সে, তুলাদণ্ড কিয়ামতেও।
নীহার বিন্দু, সে শীতল করে হৃদয় লালাফুলের
তুফান সে, কম্পিত করে বক্ষ তটনীর।

Dhaka University Institutional Repository

সকাল-সন্ধ্যা তার প্রকৃতি চিরন্তন আনন্দ মুখর
ইচ্ছাগুলো একাত্ম সুরা'আর রহমানের ন্যায়।
আমার চিন্তার কর্মশালিন জন্ম নেয় অসংখ্য সিতারা
তোমার তক্দিরের সিতারাটি
খুঁজে নাও সেখান থেকে। (ইকবাল- যরবে কলীম,পৃ. ৫৩)

(২০)

আরব ও আমীরদের প্রতি

অসন্তুষ্ট না হন আরবের আমীরগণ
হিন্দের এ কাফের বান্দা দুঃসাহস দেখায়
দুটি কথা বলার:
প্রথম শেখানো হলো এ তত্ত্ব যাকে
কোন সে উম্মত-
'মুস্তাফার ঐক্য ও আবু লাহাবের বিভেদ?
সামানা ও সীমান্তে তার অস্তিত্ব নয়
মুস্তাফার সাথেই সংযোগ আরব জাহানের।

(২১)

আল্লাহর নির্দেশ

তক্দিরের আনুগত্য
সে আনুগত্য আল্লাহর নির্দেশের,
এ জটিল সমম্যা নয় হে প্রাজ্ঞ মানুষ।
শতবার তক্দিরের পরিবর্তন এক লহমায়,
অনুগত বান্দা তার
মুহর্তে ম্রিয়মান আবার পুলকিত মুহূর্তেই।
তক্দিরের অনুগত
উদ্ভিদ জড়পিণ্ড যত,
মুমিন অনুগত শুধু খোদার নির্দেশের। (ইকবাল-যরবে কলীম, পৃ. ৫৬)

(২২)

জিহাদ

কুম বিইযনিল্লাহ
পরিবর্তিত যদিও এ জাহান
জেগে ওঠো আল্লাহর হুকুমে,
এখনো রয়েছে একই পৃথিবী একই আকাশ
জেগে ওঠো আল্লাহর হুকুমে।
অগ্নিগর্ভ করলো আনাল হকে'র কন্ঠকে যে
সেই রক্তধারা প্রবাহিত তোমার ধমনিতে
চেতনা বিক্ষিপ্ত বলে শোকার্ত হয়ো না তুমি
এ কেবল ফিরিংগী মায়া

Dhaka University Institutional Repository

জেগে ওঠো আল্লাহর হুকুমে।

(২৩)

ইবলিস ও আল্লাহ

ইবলিস:

হে খোদা আদমের সাথে আমার ছিল না শত্রুতা,
আহা! সে জীবন কয়েদির মতো
নিকট,দুর আর বিলম্ব ও দ্রুত
তবুও দম্ভোক্তি তোমার সামনে ছিল অসম্ভব
আমার সিজদাটির তোমার ইচ্ছার বুকে হয়নি উদ্ভব

আল্লাহ;

এ রহস্য জানলে কখন
বিদ্রোহের পূর্বে, না পরক্ষণ ?

ইবলিস;
এ রহস্য জেনেছি পরে
হে খোদা ! তাজাল্লি তোমার সৃষ্টিরে পূর্ণ করে।
আল্লাহঃ (ফেরেশতাদের সম্বোধন করে):
নিম্নমুখী স্বভাব তার
শিখিয়েছে এ যুক্তি অসার,
তাই তো বলে তোমার ইচ্ছার বুকে
ছিল না সিজদা আমার,
তাই তো অক্ষমতা নাম দেয়
সে তার স্বাধীনতার,
জ্বলন্ত অগ্নিকে ধুম্রজাল বলা
জালিমের কাজ।

(২৪)

হে মুহাম্মদের আত্মা!

জাতির ঐক্যসূত্র ছিন্নভিন্ন দেখো আজ
তুমিই বলো মুসলিম যাবে কোন পথে?
আরব সমুদ্র নেই ঝটিকার সেই স্বাদ
যে তুফান প্রচ্ছন্ন হৃদয়ে আমার যাবে কোন পথে?
যদিও কাফেলা বাহন ও পাথেয়বিহীন
এ পর্বত প্রান্তর থেকে হদিগানকারী যিবে কোন পথে
এ রহস্য ভেদ করো তুমি হে মুহাম্মদের আত্মা!
আল্লাহর আয়াতের মুজাফিজরা যাবে কোন পথ

(২৫)

ইসলামি জীবনবোধ

মুসলমানের জীবন কি, একথা কি জানাবো তোমায়?
ভাবনার চূড়ান্ত আর উন্মাদনার পূর্ণতা,

Dhaka University Institutional Repository

উদয় সূর্যের ঔজ্জ্বল্য নিয়ে, অস্ত তার
অনন্ত ও বৈচিত্রময় জামানার মতো,
চলতি যুগের লজ্জায় সে নয় আড়ষ্ট
প্রাচীন যুগের কল্পকাহিনী ও যাদুও নেই তাতে
ভিত্ তার চিরন্তন জীবন সত্যের ওপর,
জীবন সত্য এটি, প্লেটোর তেলেসমাতি নয়,
উপাদান তার জিব্রীলের সৌন্দর্যবোধ
আজমের শুভ্র মনন আর আরবের হৃদয় উত্তাপ।

(২৬)

তাসাউফ

মহাশূন্য জগতের আর আল্লাহর অস্তিত্বের তত্ব
হরমের দুঃখ নাশক নয় যদি, তাহলে কিছুই নয়।
অর্ধরাত্রে আল্লাহর স্মরণ, নির্লিপ্ত ধ্যান আর আনন্দ
তোমার খুদীর রক্ষায় ব্যর্থ যদি, তাহলে কিছুই নয়।
যে বুদ্ধির তীর বিদ্ধ করে চন্দ্র ও সপ্তর্ষির প্রাণ
হৃদয় তরংগের সহযোগী নয় যদি, তাহলে কিছুই নয়।
প্রজ্ঞা যদিও বলে লা'-ইলাহা' তাতেই বা লাভ কি?
দৃষ্টি ও দিল যদি মুসলিম না হয়, তাহলে কিছুই নয়।
আমার আলোচনা অবিন্যস্ত, বিস্ময়ের নেই কিছু তাতে
প্রভাতের বিকিরণ যদি স্পন্দিত না হয়, তাহলে কিছুই নয়।

(২৭)

ইসলাম

খুদীর নুর খুদীর অগ্নি ইসলামের প্রাণ,
খুদীর অগ্নি জীবনের জন্য নূর ও অবস্থিতি,
সব কিছুর পঞ্জিকা এটি সব কিছুর মূল
এ প্রাণশক্তিকে যদিও আবৃত রেখেছে প্রকৃতি।
ইসলাম শব্দে ইউরোপের ঘৃণা যদি হয়
তাহলে আত্মমর্যাদাশীল ফকিরী
এ দীনের অন্য এক নাম।

(২৮)

ভারতীয় ইসলাম

চিন্তার ঐক্যসূত্রই মিল্লাতের প্রাণ-আর কিছু নয়,
ঐক্যের বিলুপ্তির সাথে ইলহাম ও ধারণ করে ইলহাদের রূপ।
ঐক্য সংরক্ষণ বাহুর শক্তি ছাড়া সম্ভব নয়,
বুদ্ধিরা ব্যর্থ এখানে, নিষ্ফল সব কাজে ।
হে মর্দে খোদা ! সে শক্তি তোমার আয়ত্তে নেই

Dhaka University Institutional Repository

যাও, আল্লাহকে স্বরণ করো বসে কোনো পর্বত গুহায়!
দীনতা, দাসত্ব আর হতাশা চিরন্তন
এই যার তাসাইফ সে ইসলাম কর উদ্ভাবন।
হিন্দে মোল্লার সিজদার অনুমতি আছে দেখে
নাদান ভেবেছে ইসলাম স্বাধীন এই দেশে।

(২৯)
ভারতীয় মুসলমান

বাহ্মন তাকে বলে দেশদ্রোহী
ইংরেজ ভাবে ভিখারী এ মুসলিম
পাঞ্জাবের নবীর শরীয়ত বলে
কাফের এসব প্রাচীন মুমিন।
হকের আওয়াজ ধ্বনিত হবে
কোনখানে কবে শুনিনি তা
দ্বন্দ্বমুখর এই পরিবেশে
প্রাণে যে আমার নামে দীনতা। (ইকবাল যরবে কলীম –পৃ.)

(৩০)
কালামে ইকবাল

ছাড় ভয়,ছাড় দুঃখ. ছাড় অনুতাপ,
পাথরের মত হো তুমি কছিন-
তাহ'লেই হবে তুমি হীরক।
যে-ই করবে কছিন সংগ্রাম
আর বজ্রহাতে ধরবে তলোয়ার
দোনো জাহান- আলোকিত হবে তার নুরে।
'সঙ্গ-ই আসোয়াদ' যা শোভা পাচ্ছে কাবার ঘরে
সে ত কিছুই নয়! মুলে সে ত এই মাটি।
অথচ দেখ তার মর্যাদা!
সিনাই পাহাড়ের চেয়েও বেশি তার মান।
সাদা-কালো সব মানুষই দেয় তারে চুম্বন!
কঠোরতার মধ্যেই নিহিত আছে জীবনের গৌরব।
দুর্বলতা আর অপরিপক্কতা-
এই হ'ল জীবনের ব্যর্থতার মূল কারণ। (ইকবাল-আসরারে খুদী, পৃ. ২৫৪)

(৩১)
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ

খুদীর গোপন রহস্য লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ

Dhaka University Institutional Repository

খুদী তরবারি শান প্রস্তর তার লা- ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
এ যুগ সন্ধানে ফেরে তার ইবরাহীমের
সারাটা দুনিয়া হলো কুতখানা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
সওদা করেছো তুমি আত্ম অহংকারের
লাভ ক্ষতির প্রবঞ্চনা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ
পার্থিব ধন-সম্পদ এই সম্পর্ক আত্মীয়তা
সন্দেহ-সংশয়ের বুত এরা লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
স্থান- কালের উপনীত হয়েছে প্রজ্ঞা
অথচ স্থান-কাল অস্তিত্বহীন,লা ইলাহ ইল্লাল্লাহ।
গুল ও লালা'র ঋতুর মুখাপেক্ষী নয় এ গীত
শীত ও বসন্ত সবেতেই লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।
জামাতের আস্তিনে যদিও মূর্তি সংগোপনে
রয়েছে লুকিয়ে
প্রচারের নির্দেশ তবু আমার প্রতি
লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ।

(৩২)

মিসরবাসীদের প্রতি

আবুল হওল নিজেই এ তত্ব শিখিয়েছে আমাকে
যে আবুল হলো প্রাচীন রহস্যজ্ঞানী:
যে শক্তি আকস্মিক পরিবর্তন আনে জাতির ভাগ্যের
সে শক্তির মোকাবিলায় অক্ষম দার্শনিকের প্রজ্ঞা।
প্রতি যুগে স্বাভাব তার পরিবর্তনশীল
কখনো মুহাম্মদের তরবারি সে
কখনো মুসার লাঠি।

(৩৩)

আবিসিনিয়া

ইউরোপের শকুনরা এখনো জানে না একথা
কত বিষ জর্জর আবিসিনিয়ার এ শবদেহ,
হতে চলেছে এ পুরাতন শবদেহ ছিন্নভিন্ন ।
সভ্যতার পূর্ণতা মানবিক শিষ্ঠতার ধ্বংস
দস্যুবৃত্তি জীবিকা তাই দুনিয়ার বহুজাতির,
প্রত্যেক নেকরে ফেরে নিরহ ছাগশিশুর সন্ধানে।
হায়! ঈসায়ী ভজনালয়ের মর্যাদার আয়নাকে
ইতালী জনসমক্ষে করে দিল চাকনা চুর
হে গীর্জার অধিনিয়ক! এ সত্য হৃদয়বিদারক।

(৩৪)

জাবিদ নামা

নয়টি সুধী বচন

(১)

সন্ধানীর কাছে নয় এ — পৃথিবী অন্ধ যবনিকা,

Dhaka University Institutional Repository

ডুবুরীর কাছে নয় তরঙ্গ কোনই বিভীষিকা।

(২)

নতুন পৃথিবী মাঝে নতুন জীবনে জেগে ওঠা-
কী মধুর –জরা ফেলে যৌবনের মধুবনে
আবার নতুন করে ফোটে।

(৩)

সকল মৃত্যুর পারে আছে, আর
তারি মাঝে আছে সত্য –সার
জীবনের । যদিও মানুষ
দেখে ভয়ে পরাজয়ে মৃত্যুর অঙ্কুশ।

(৪)

সময় সে তিক্ততা ও মাধুর্যের এক সমন্বয়
শত অশুভের শরে বিদ্ধ এক শুভ আশীর্বাদ,
অশুভ প্রভাবে তার শূন্য হয় পূর্ণ লোকালয়,
গতির মূহুর্ত শুধু পায় তার পুণ্যের প্রসাদ।

(৫)

অবিশ্বাসী যারা , তারা মৃত -আত্মা, সংসর্গে তাদের
তৃপ্ত থাকা নাহি সাজে প্রাণবন্ত বীর সংগ্রামীর।
আল্লাহকে বিশ্বাস যার , সে মানূষ জীবন্ত অধীর;
দৃপ্ত জিগীষায় নিজ প্রবৃত্তির সাথে সংগ্রামের
অবসান নাহি তার ‘; চিতাবাঘ যেন সে বনের,
হরিণ -শিশুর প্রতি ধাবমান অক্লান্ত, অস্থির।

(৬)

অতন্দ্র -নিষ্ঠায় জাগে যে কাফের ব্যাকুল অন্তরে
আপনার প্রতিমা সন্মুখে,
সে অনেক শ্রেষ্ঠ জানি তার চেয়ে মসজিদ চত্বরে
যে মোমেন নিন্দ্রা যায় সুখে।

(৭)

কেবল অন্ধই দেখে যত মন্দ ছায়া
সূর্যের দৃষ্টিতে নাই আঁধারের মায়া।

(৮)

মৃত্তিকায় মূল রেখে বীজ হয় বৃক্ষে পরিণত,
অথচ মানুষ থাকে মৃত্তিকার পিণ্ড নির্বিকার।
মাটি থেকে শক্তি নিয়ে বীজ ওঠে উর্ধ্বে ক্রমাগত,
যতক্ষণ নাহি ডযায় সূর্য থেকে প্রাণের সম্ভার।

(৯)

গোলাপেরে কহিলাম, বল মোরে বেদনা বিধুর-
কেমনে ধুলির থেকে পাও তুমি গন্ধ সূমধুর,
মঞ্জুল বরণ আর ? কহিল সে, ‘’সহজ এ কথা বোঝ নাকো
হে নিবোর্ধ বুদ্ধিজীবী নর! কথকতা
আসে নাকি বৈদ্যুতিক তরঙ্গের পরে? শোন তবে,
দুর্বার আবেগ এক গড়ে তোলে একান্ত নীরবে

Dhaka University Institutional Repository

জীবন আমার , প্রাণে সংগোপন মোর সংবেদন,
প্রগলভ, চঞ্চল আর ভাসমান তোমার বচন।

(১০)

জীবন ক্ষণস্থায়ী এবং চিরস্থায়ী উভয়ই,
সৃষ্টি- প্রতিভা আর ঔৎসুক্যই এর সব কিছু।

তুমি জীবন্ত ? তবে উৎসুক হো , সৃষ্টিধর্মী হও
আমার মতো সারা জগতকে জয় করো।

যা প্রতিকূল তা ধ্বংস করে দাও,
তোমার অন্তর থেকে জগৎসৃষ্টি করো।

অপরের গড়া পৃথিবীতে জীবনযাপন-
স্বাধীনচেতা মানুষের কাছে তা অতীব দুরূহ।

(১১)

আন্তরিকতার নীতিকে সুদৃঢ়ভাবে ধারণ করো,
সুলতান ও আমীরের ভয় থেকে নিজেকে পবিত্র করো।
ক্রোধে বা আনন্দে কখনো ত্যাগ করো না বিচারবোধ,
দারিদ্র্যে অথবা সম্পদে কখনো ভুলে যেয়ো না তাকে ।
দেহ মনের পরিপূর্ণ সংরক্ষণ বিনা
পরম ক্ষমতা লাভ সম্ভব হয় না!
ওড়ার আনন্দ বিনা জীবন কিছুই নয়,
নীড় নয় তার প্রকৃতির অনুকূল।
ধর্মের পথে হীরকের মতো কঠোর হয়ে বেঁচে থাকো
দিলকে আল্লার দিকে রাখো,
সন্দেহ বর্জন করে বেঁচে থাকো

বাংগে দারা

(৩৫)

মুনাজাত

শূন্য পালকি ভরে দাও প্রেমে আশেক ও মাশুকের ।
পথহারা এই হরিণের দেখাও তুমি কাবার পথ।
শহরবাসীর অন্তরে দাও প্রেম সে ময়দানের।
পথিকদিগের চরণে আবার চলার ছন্দ দাও।
গতির আগুনে পুড়ে যাক যত বিঘ্ন কন্টকের ।
সু-বাইয়া সম গগনচুম্বী লক্ষ্য তাদের হোক।
কূল-ঘেরা নদী আযাদী লভুক মুক্ত-সমুদ্রের ।
আঁধার যুগের বুকে এঁকে দাও প্রেম-কলঙ্ক-দাগ
লজ্জায় যেন মুখ ঢেকে রয় চাঁদ সে আসমানের।
আমি বুলবুল কাঁদি বসে এই ফুলঝরা বাগিচায়।
হে দাতা, তাছির হয় যেন কিছু আমার ক্রন্দনের।
(অনুবাদক: গোলাম মোস্তফা)

Dhaka University Institutional Repository

(৩৬)

মদনিয়াৎ-ই- ইসলাম

শুনবে কি ভাই মুসলমানের জিন্দিগী কী রূপ?
সংগ্রাম আর উন্মাদনার রূপ সে অপরূপ ।
সূর্য তাহার এক আকাশে রাঙা করে ফের সে হেসে চায়।
শুধুই কেবল যুগ-যমানাই মিছাল হবে তার
বিচিত্র সে নিত্য নতুন দৃশ্য চমৎকার।
বর্তমানের দৈন্যে তাহার নাইক শরম ভয়
অতীত যুগের খুশ-খেয়ালেও মশগুল সে নয়।
চিরন্তনের ভিত্তি পরে তার বুনিয়াদ।
জিব্রাইলের মতই তাহার রূপ-পিয়াসী প্রাণ
সত্য এবং সুন্দরেরও করে সে সন্ধান।
আযমের সে প্রাচুর্য আর দৈন্য আরবের
এই হল তার সত্য স্বরূপ ভিত্তি জীবনের।
(অনুবাদক: গোলাম মোস্তফা)

(৩৭)

বালাদ-ই- ইসলাম

দিল্লী

দিল্লী-সে আমাদের ব্যাথা-মসজিদ
এখানে ঘুমায় কত আশা-উম্মিদ।
এ- পাক যমীন কেন পাবে নাক মান?
এখানে রয়েছে কত মহিমার দান।
শুয়ে আছে হেথা কত বাদশা-ফকীর
শৃঙ্খলা দিল যারা সারা ধরণীর;
তাদের কাহিনী আজো পরান মাতায়,
সব গেছে, তবু স্মৃতি নাহি যায়।

(৩৮)

বাগদাদ

দিল্লীই নহে শুধু-বাগদাদ ও ভাই
মুসলিম-গৌরব-মহিমার ঠাই।
এ-বাগান ছিল কত শোভায় অতুল
এই খানে ফুটেছিল কত হেজাযের ফুল।
এ-বাগান হেরেমের দিয়েছে হরষ
নায়েব ই রসুলদের পেয়েছে পরশ!
এই দেশ ছিল এক নয়া গুলশান-
এর প্রতি-ফুল ছিল প্রতিটি বাগান।
যাদের প্রভাবে রোম কেঁপেছিল হায়
তারা আজ এইখানে নীরবে ঘুমায়!

(৩৯)

কর্ডোভা

Dhaka University Institutional Repository

কর্ডোভা আমাদের ছিল আঁখি-নুর
মাগরিবী যুলমাতে যেন কোহেতুর।
আজি আর নাই তার শিখা সে জ্যোতির
মরীচিকা ছেয়ে আছে নব প্রগতির!
ইউরোপে দিল আলো দীপ শিখা যার
সে-দীপ নিভিয়া গেছে-নেমেছে আঁধার!

(৪০)

কুস্তুনতুনিয়া

কুস্তুনতুনিয়ার ছিল খুব নাম
কাইজার বাদশার শক্তির ধাম।
এল সেথা মেহদীর নব অভিযান
বুকে তার উড়াল সে বিজয়-নিশান।
এর মাটি পাক সেই হেরেমের প্রায়
যেখানে সুরের নবী নঅরবে ঘুমায়!
মধুময় ছিল এর আকাশ বাতাস,
আবকু আয়ুবের ছিল এইখানে বাস।
ইসলামি মিল্লাত ছিল এর পর-
বহু যমানার খুনে গড়া এ নগর

(৪১)

মদীনা

হে পাক মদীনা ভূমি,নাই তব তুল,
তোমার বুকেতে সুখে ঘুমায় রসুল।
হজ-ই আকবর যথা কা'বার কাছে
তোমার দিদারে সেই মহিমা আছে।
সৃষ্টির আংটিতে নগনার প্রায়
তুমি শোভিতেছ চির-জ্যোতির আভায়।
আশ্রয়-স্থল যিনি সারা-ধরণীর
তুমি দিলে আশ্রয় সেই নবীজীর।
তারি উম্মৎগেল ছড়ায়ে ধরায়
জামশেদ কাইজার লুটাইল পায়।
মুসলিম চায় যদি স্বদেশ ভুমি-
ইরান কি পায় নয়-সে তুমি
হে পাক মদীনা, তুমি চির দিবসের
আশ্রয় ভুমি সারা মুসলমানের।
তারে আজ তব বুকে ফের টেনে নাও,
তোমার প্রেমের বাণী তাহারে শনাও।
প্রভাত আসিলে যথা শিশির আসে
মোরাও তেমনি রব তোমার পাশে।

(৪২)

(স্বদেশিকতা)

Dhaka University Institutional Repository

এই যমানায় বহুৎজাম ও সাকী দেখতে পাই,
কতই নুতন প্রেম তরীকা,-কে করে তার শুমার ভাই!
মুসলিমেরা ও বানিয়েছে এক নতুন হেরেম-কী অদ্ভুত।
নয়া তমদ্দুনের আযর গড়িয়ে দেছে অনেক বুৎ।
সে সব তাজা খুদার সেরা মূর্তি সে ভাই দেশ-মাতার
পিরহান তাহার কাফন মোদের মজহাব এবং সভ্যতার।
নতিন তমদ্দুনের গড়া ওয়াৎনিয়াতের সেই সুরং।
তৌহিদেরই ঝাণ্ডাবাহী মরদ-ই মুমিন-তোমার নাম,
লকব তোমার 'মুস্তাফাবী'-ওতান তোমার দীন-ইসলাম।
দেখাও তুমি দৃশ্য মোদের অতীত যুগের সেই কাবা'র
মিথ্যা বাতিল দেবদেবীদের লোপাট করে দাও আবার।
স্বদেশ মাঝে বন্দী হলে মরবে তুমি-সে নির্ঘাৎ
নীল দরিয়ার থাকবে তুমি মাছের মতন দীল আযাদ
দেশ-বর্জন-সুন্নত ভাই মোদের প্রিয় নুরনবীর
সেই সুন্নত আদায় করা ফরয তোমার জিন্দিগীর।
সিয়াসাতের ভাষায় ওতান ধরে সে এক নতুন রূপ
নবুয়তের ভাষায় তার অর্থ হল অন্যরূপ।
এক জাতি যে আরেক জাতির দুশমন-তার মূলত এই,
দেশ-বিজয়ের নেশাও আসে এই স্বদেশের প্রেম থেকেই।
রাষ্ট্র থেকে ধর্ম যে আজ পৃথক-তারো এই কারণ
এতেই করে সবলরা ভাই দুর্বলদের আক্রমণ।
ওয়াৎনিয়াতের তরেই আজি খণ্ডিত সব মানব-জাত
দীন ইসলামের কওমিয়াতের জড় কেটে দেয় ওয়াৎনিয়াৎ
(অনুবাদ:গোলাম মোস্তফ)

(৪৩)

মোল্লা ও বেহেশত

শ্রদ্ধেয় সেই পীর সাহেবকে যখন দেয়া হল
স্বর্গে আসার খোদার দেওয়া হুকুম নামাখানা
আমি তখন সেখানটাতেও হাজির ছিলাম বলে
অবাধ্য এ কন্ঠ আমার শুনলো না আর মানা।
জোড় করে হাত খোদার কাছে আরজি করি পেশ:
তক্ছীর আমার মাফ করবেন পরোয়ারদিগার
(অনুবাদক আবুল হোসেন)

(৪৪)

খোদার দুনিয়া

মাটির আধাঁর গর্ভে লালন করে কে লক্ষ বীজ?
সমুদ্রের ঢেউ থেকে আকাশে তোলে কে কালো মেঘ?
পশ্চিম পাহাড় থেকে ডেকে আনে কে মধুর হাওয়া

Dhaka University Institutional Repository

এ' সোনার মাঠ কার? কার ওই সূর্যের স্বচ্ছ আলো?
মুক্তার দানায় ভরে কে সোনালী ফসলের শিষ?
মাসগুলো ঘুরে আসে কার অমোঘ আদেশে?
এ' জমি তোমার নয়, হে ভুস্বামী, তোমার তো নয়,
নয় পূর্বপুরূষের, তোমার আমার কারো নয়।
(অনুবাদক আবুল হোসেন

(৪৫)

প্যারির মসজিদ

স্থপতির কারিগরি ছাড়া
এখানে দেখার আছে কী আর এমন,
পাশ্চাত্যের এ এবাদৎগার?
এখানে খোদার নাম গন্ধ নাই আর
কোথায় মসজিদ
ফিরিঙ্গী ওঝারা সব মসজিদের এ পাথুরে শবে
দিয়েছে পূজোর প্রাণ ভরে।
তাছাড়া তুলেছে কারা এ মূর্তি-মন্দির?
সেই একই দস্যুরাই
করছে দামাস্কাসকে মরূভূমি যারা।
(অনুবাদক আবুল হোসেন)

(৪৬)

ইউরোপ ও সিরিয়া

সবচেয়ে সাচ্চা সৎ মানূষের ব্যথায় কাতর
সিরিয়া ফিরিঙ্গীদের দিয়েছিলো সে পয়গম্বর।
ইউরোপ দিয়েছে আজ সিরিয়াকে প্রতিদান তার
মদ জুয়া দিয়েছে আজ সিরিয়াকে প্রতিদান তার
মদ জুয়া আর বেশ্যা হাজার হাজার।
(অনুবাদক আবুল হোসেন

(৪৭)

তোমরা ও আমরা

আমরা না হয় কানাই হলাম আর
তোমরা আলোর রয়ের জগৎদেখো।
তাই বা কী
আমরা নালিশ কোরেইগেলাম, আর
তোমরা নিজেই নিজের নসিব লেখো।
তাই বা কী
ঠাঁই ঠিকানাও আমাদের নেই, আর
তোমাদের ঘর তাবৎজগৎ-জোড়া।
তাই বা কী
পুঁজির হিসাব তোমাদের নেই, আর
আমরা শুধুই ছুটাই ক্ষতির ঘোড়া।

Dhaka University Institutional Repository

তাই বা কী
তোমরা হাওয়ার জাহাজ উড়োা,আর
আমরা শিকার পাল ছেঁড়া নৌকার।
তাই বা কী
থাকবো না হয় হাজার হাতীর জোর
তাই বা কী
না হয় হলো একান্ত কমজোর
তাই বা কী
এই হো আর ঐ হো না কেনো
তাই বা কী
সুখ কোথাও নেই দুনিয়ার জেনো।
তাই যদি হয় বাহার তোমার ,আর
বৈশাখ মাসের পাহাড় আমরা হই
তাই বা কী
(অনুবাদক আবুল হোসেন)

(৪৮)
মেরাজ রজনী

গগন-গম্বুজ হতে সন্ধাতারা ডাক দিয়ে বলে,
ঊষা যার বন্দনায় নতশির আজ সেই রাত!
সুদুর আরশ-সেতো হিম্মতের এক পদক্ষেপ-
মোমিন বলিছে ডাকি মে'রাজের সুমহান রাত।
সকলে তা জেনে নিয়ে প্রভাত-তারা কাছ থেকে
বললো শিশির ডেকে : এমনকি পরিচিত মাটি
শিশির বিন্দুর কাছে শুনে নিলো স্বর্গীয়-সে বাণী।
শিশিরের কথা শুনে ফুল তার আঁখি ভরে নিলো-
যন্ত্রণায় কেঁপেছিল ছোট ছোট কুঁড়ির হৃদয়:
সুন্দর বাগান থেকে কেঁদে গেলো বসন্ত
একাকী যে যৌবন এসেছিল একদিন বেড়াতে
সেখানে চলে গেল দুঃখের পা ফেলে।
(মনির উদ্দীন ইউসুফ)

(৪৯)
একটি সন্ধ্যা

ধূসর চাঁদের আলো কেমন নীরব হয়ে আছে,
সমস্ত গাছের শাখা প্রশাখা প্রশান্ত, নড়ে না একটিও
উপত্যকা-সুরকার সেও আজ নীরব : নিশ্চুপ
অজস্র পর্বত শ্রেণী সবুজ পোশাকে আচ্ছাদিত,
মূর্ছাহত সৃষ্টি যেনন গুমমগ্ন রাত্রির শিয়রে।
এ প্রশান্ত লগ্ন থেকে এমন সুরের আবির্ভাবঃ
নেকার নদীর স্রোত এখন বহে না দুরে আর।
নীরব তারার-গড়ি সম্মুখে চলেছে এক মনে,

Dhaka University Institutional Repository

বাজে না ঘুন্চির শব্দ অবিরাম সেই যাত্রা পথে।
পাহাড়, নিকুঞ্জ, নদী সব আজ নিস্তব্ধ, নীরব।
সমস্ত প্রকৃতি যেন নিমগ্ন ধ্যানের সুগভীরে-
হে হৃদয় চুপ করো, দুঃখ ভুলে ঘুমাও কেবল।
(আবদুস সাত্তার)

(৫০)
ইউরোপীয় সভ্যতা

জ্ঞান আর বিজ্ঞানের নবালোকে হয়েছে উজ্জ্বল,
শোনা যায়, এই পথে সেরা হলো দুর ইউরোপ:
কিন্তু এ যে সত্য নয়, সেই জ্ঞান স মুদ্রের বুকে
এক বিন্দু পানি নেই-তৃষ্ণা যাতে দুর হতে পারে
রূপ আর আর ঐশ্বর্যের দীপ্তি নিয়ে ভরা আছে সব-
ব্যাঙ্কের প্রাসাদমালা, কী আশ্চার্য এই-
বাহ্যিক রূপের কাছে ম্লান হয় সে সব প্রাসাদ-
মন্দির ও গীর্জা নামে পরিচিত যারা।
তেজারতি নাম নিয়ে জুয়া খেলা চলে অবিরাম।
লক্ষের মুনাফা লুটে কিস্তিমাৎ করে একজন-
জ্ঞান আর বিজ্ঞানের, আর সেই সেরা তমদ্দুন
এ সবের নাম নিয়ে রক্তচোষা হয়েছে সরকার।
অথচ সাম্যের বাণী রাত্রিদিন প্রচলিত হয়-
বেকারী, শৈথিল্য আর নগ্নতার ,শুদু দারিদ্র্যের
পেয়েছে অনেক কিছু আকঙ্খার সুমহৎ দান
এ সব নিয়ে এলো সে দেশের জাতীয়তাবাদ।
(মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ)

(৫১)
ইউরোপীয় সংস্কৃতি

বুদ্ধিতে দীপ্তিতে ভরা পশ্চিমের জীবনের গতি
প্রেমের সুরাহী দিয়ে পূর্ণ হল প্রাচ্যের জীবন:
উজ্জ্বল প্রেমের পথে বৃদ্ধি পায় বাস্তবের পথ
বুদ্ধির পথেই চলে প্রেম তার স্থায়িত্বের দিকে।
জাগো, সবে বাঁধো এই নব বুনিয়াদ-
প্রেম আর বুদ্ধি দিয়ে অন্য এক নয়া জগতের
(মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ)

(৫২)

Dhaka University Institutional Repository

তুলুয়ে ইসলাম

তারার আলো নিভু নিভু চিহ্ন যে এই নও ঊষার
পূর্ব গগনে সূর্য হাসে নিদ্রাতে কেউ রয় না আর ।
মুর্দা শিরায় প্রাচীর পুনঃ সঞ্জীবনী রক্ত বয়
আবু সিনা, আলফারাবীর বুঝা ইহা সাধ্য নয়।
মুসলমানের হুশ ফিরেছে পশ্চিমা ঐ ঝঞ্ঝাতে
সিন্ধু -জলে মুক্তা ফলে তরঙ্গেরই সংঘাতে ।
মহান খোদা মুমিনদের অচিরেই করবে দান
তুর্কী-কদর ,হিন্দি-মেধা, আরবী ভাষা, উচ্চ শান।
ফুলকুড়িদের নয়ন-কোণে যদিও আছে তন্দ্রা- রেশ
গাও জোড়ে গান ভোরের পাখি, সেটুকুও হোক নিঃশেষ।
কুঞ্জে, কুলায়, শাখায় শাখায় জাগাও কাপন মঞ্জুসুর
পারদ হতে চঞ্চলতার স্বভাব কভু হয় কি দুর?
বিস্ময়ে বর্ম শোভা সে জন কিবা দেখবে আর
বীর গাজীদের বাহাদুরী দেখল পুত নয়ন যার।
বিকাশ লাভের যন্ত্রণা দাও গুলে লালার হৃদয় ফের
শাহাদতের নেশা জাগাও সবার মনে এই বাগের।
ফাল্গুনী সে বৃষ্টি সম মুসলমানের অশ্রু জল
পয়দা হবে মুক্তো তাতে খলীল নবীর সিন্ধুতল।
শুভদিনের আগমনী যায় শোনা এ মিল্লাতের
হাশিম-শাখি পত্র, পাতা, ফুল, কুড়িতে সাজবে ফের।
শিরাজ-বালা, তাব্রিজ দিল, কাবুলী মন আন লুটে
প্রভাত সমীর ফুলের সুবাস নিয়ে যেমন যায় ছুটে।
উসমানীদের চারিদিকেতে যদি ও আজি বিপদ ঘোর
ভয় কি তাতে, হাজার তারার মরণে হয় একটি ভোর।
বিশ্ব- বিজয় হতে কঠিন লাভ করা তার তত্বগুণ।
হৃদয় আঁখি হয় উজালা ঝরলে পরে কলজে খুন।
হাজার রাতের কান্না শেষে দীর্ঘ দিনের তপস্যায়
নার্গিস হয় সফল তবে, ফোটা কুঁড়ি ফুল শাখায়।
সুর বেহাগে দাও মাতিয়ে বুলবুলি এ কুঞ্জতল
কবুতরের কোমল ডানায় জাগুক শূন্যের বজ্রবল।
সুপ্ত তোমার হৃদয়-মাঝে সিন্ধু জীবন রহস্যের ।
দাও খুলে তার রুদ্ধ দুয়ার বেহুশ জাতি জাগুক ফের।
তুমি খোদার হস্ত বাণী, খোদায়ী তেজে শক্তিমান
সকল দ্বিধা দুর করে ফের দাঁড়াও উঠে মুসলমান
আকাশ সীমা পার হয়েও যাত্রী তুমি দুর পথের
গ্রহতারা পথের ধুলি তবু সুদূর মঞ্জিলের ।
লয় হবে সব তুমিই রবে তোমার কোন নাই মরণ
তুমিই খোদার শেষ নিশানী সত্তা তোমার চিরন্তন।
তোমার বুকের রাঙা খুনে বিশ্ব-বাসর রঞ্জিত
ইব্রাহিমী! তোমার দ্বারাই জগৎসভা সজ্জিত।
বীজ তোমাতে সুপ্ত বিপুল সম্ভাবনা যোগ্যতার
ক্ষেত্র তুমি সৃষ্টি লীলার নিত্য নতুন পরীক্ষার।
পানি মাটির জগৎথেকে চিরস্থায়ী জগৎঠাই

Dhaka University Institutional Repository

নবী যাহা সঙ্গে নিলেন সে উপহার তুমিই ভাই।
ঐতিহাসিক সত্য ইহা মহান বিজয় আসবে ফের
প্রাচ্যভুমি আসবে পুনঃকন্ধাতলে মুসলিমের।
সত্য ন্যায় ও গুজায়াতের সবক তুমি রৌ আবার
তোমার শিরে আসবে পুনঃ কুল দুনিয়ার শাসনভার।
মুসলমানী রহস্য এ, ফিতরতের এই বিধান
উখুয়াত ও প্রেম দিয়েই হয়গো বিজয় দেশ জাহান|
রক্ত এবং বর্ণভেদের গর্ব করে ধুলিসাৎ
তুর্ক, ইরানী ভুলে গিয়ে হো সকলে এক জামাত।
আর কত কাল রইবে চুপে বন-বিটপী শাখার পর
বাজু তোমার ঈমান করবে তেমন আঁধার ধরা দীপ্তিমান।
কোন তাকতে পদানত রোম ও ইরান মুসলিমের
আলীর বাজু ত্যাগ বুজরের আর সততা সালমানের।
চলল ধেয়ে স্বাধীন জাতি শেকল ভাঙার গান গেয়ে
যুগান্তরের বন্দীরা তাই দেখল মহাবিস্ময়ে।
ঈমান বলেই ভিত্তি অটল হয় জগতে মিল্লাততের
নয় বাহুবল, প্রমাণ দেখ তুরানী ও জার্মানের।
এই মাটিরই কায়ার মাঝে পয়দা যখন হয় ঈমান
জিব্রাইলের মতই তখন হয় সে মহাশক্তিমান।
অধীনতা করতে খতম ব্যর্থ অসি ,সুকৌশল
সব গোলামীর শেকল ভাঙে সাচ্চা একিন,ঈমান বল।
রুহুল আমীন খান

(৫৩)

নালায়ে এতিম

হায়! কি বলি, বক্ষপঞ্জরে এখন আর প্রাণ নেই।
উজ্জ্বল প্রদীপ যখন নির্বাপিত হয়ে যায় -
মাহ্‌ফিলের যোগ্যতা তার থাকে না।
হে জীবন কাব্যের লীলাভুমি-আমি তোমার উপযুক্ত নই:
নৈরাশ্য যা অতিক্রম করতে পারে-এটা তেমন স্থানই নয়।
হায়! শারাবখানায় মজলিসে আমি কি মুখে শরীক হই,
চুর্ণ বিচুর্ণ হয়ে যায় যা-আমি যে সে পেয়ালা।
আফসোসের কাঁটার কাছে বর্শার তীক্ষ্ণ ফলক ও লজ্জা পাচ্ছে-দুখের
ইউসুফ প্রাণ বিযারের সৌন্দর্য পণ্য হতে চলেছে
ধ্বংসীভূত বাগানের বুলবুলের যে গান-
সে গানের সুর কেন শত ফরিয়াদের চেয়েও হৃদয় বিদারক হবে না?
অস্বস্তির হাত এগিয়ে আসছে পরণের কাপড় ছিন্নবিচ্ছিন্ন করে দেবার জন্য-
দুঃখের অশ্রু জামাকাপড় প্লাবিত করে নীচের দিকে বইতে লাগল।
ক্রন্দনরত দিল উষার প্রান্তরের জন্য এমনি চঞ্চল হয়ে পড়েছে –
ফুল বাগিচার জন্য বুলবুল যেমন ছটফট করতে থাকে |
জীবনের হাটে বসে এখন আর আমরা কি কিনতে পারি?
(হে মন)যাও কোন প্রান্তরে গিয়ে একাকী বসে ক্রন্দন কর।
ক্ষোভ-দুঃখে অত্যন্ত দিল-আনন্দ উপভোগের উপযোগী নয়,

কবর শিয়রে জ্বালানো প্রদীপ-খুশীর মজলিসের উপযুক্ত নয়।
আসমানের নীচে আরাম উপভোগকারীর চিহ্নই নেই
ক্ষোভ-দুঃখ ছাড়া সুখের কপোল লালিমা নেই।
আমাদের আনন্দ প্রভাত ও শত সায়াহ্নের ঈর্ষাযোগ্য
মানুষের অস্তিত্ব আরামের দিলের ধূলো-স্বরুপ (আরামহীন)
জীবন সাগরের স্থায়িত্ব নির্ভর করে আশা ভরসার জোয়ার ভাটার উপর
মাঝে মাঝে আবার খুশীর হাওয়াও এসে পড়ে।
যে মুহুর্তে জীবনে ভালোবাসার আলোকচ্ছটা পড়ল
পরিবর্তনের ঘনঘটা-তখনই বিপদের ঝড় নিয়ে আসল।
(আবুয্ যোহা নূর আহমদ)

(৫৪)
শিশুর প্রার্থনা

প্রার্থনা হয়ে আসিতেছে মুখে যাহা কিছু আমি চাই,
হে খোদা আমার জিন্দেগী হোক শমাসম রোশনাই।
এ দুনিয়া থেকে আমার দমেতে আঁধিয়ার হটে যাক,
যত ঠাই আছে সব ঠাই মোর চমকেতে চমকাক।
হোক গৌরব আমার দমেতে মোর এই স্বদেশের,
ফুলের কারণে যথা গৌরব হয় ফুল বাগানের।
পরোয়ানা প্রেম সম ইয়া রব হোক মোর এ জীবন,
জ্ঞানের শমার সেন ইয়া রব হোক প্রেম বন্ধন।
দরিদ্র যারা, মোর কাজ হোক তাহাদের হিমায়ৎ,
দরদীর নে বিত্তের সনে হোক না মুহব্বৎ।
যা কিছু খারাপ,আল্লা,তা থেকে রেখো গো বাঁচিয়ে মোরে,
যে পথ পূণ্য সেই পথে মোরে নিগুলো চালনা ক'রে।
(সত্য গঙ্গোপাধ্যায়)

পায়ামে মাশরিক:

(৫৫)
আল্লাহর রাজত্ব

আন্দালুসের উপকুল তারেক
যখন জাহাজ জ্বালিয়ে দিল
লোকেরা বলল, বুদ্ধির বিচারে
তোমার কাজটি বড় ভুল হল।
স্বদেশ হতে পড়ে আছি দুরে
কিভাবে ফিরব আবার
উপায় সহায় পরিত্যাগ করা
জীবনের কোন বিধান বলো
মৃদু হেসে তরবারীর তাপ স্পর্শ করলেন
আর ঘোষণা দিলেন
আটক নয় আমাদের পৃথিবী কোন দেশে
খোদার দুনিয়া জুরেই তো আমাদের ঘর।
(মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

Dhaka University Institutional Repository

(৫৬)

প্রেম

যে বুদ্ধির একটি নির্ভীক বালক জ্বালিয়ে দেয় পৃথিবী
প্রেমের কাছেই শিক্ষা নেয় সে বিশ্বজয়ের নিয়ম-বিধি।
প্রেমই তোমার প্রাণে যে কোন ভাবের উন্মেষ ঘটায়
রুমীর উন্মত্ততা হতে ফারাবীয় বিস্ময়। সবকিছুই
প্রাণ-সঞ্জিবনী একখাটি বলছি,তাতে আমি আনন্দে উদ্বেলিত
এসব দুঃখ চিন্তা সত্বে ও প্রেমের মাঝেই অন্তর
শান্তির সন্ধান পায়,
সকল চটিল অর্থ ঠাই পায় না ভাষার বুকে
ক্ষণিকের জন্যে অন্তরের সাথে একাত্ম হও
হয়ত তুমি বুঝবে।
(মুহাম্মদ ঈসা শাহেদী

(৫৭)

খোদা

একই মাটিতে জলে আমি বানালাম বিশ্ব
তুমি ভিন্ন করে নাম দিলে ইরান,তাতার দেশ ,জিজ্ঞাসিবার:
মৃত্তিকার অণুকণা দিয়ে আমি বানালাম লৌহ,
তুমি ভাই দিয়ে তৈরী করেছ যত তলোয়াল ,তীর বারবন্দুক।
বাগানের গাছ কাটবার জন্যে তুমি বানালে কুড়াল,
আর যে পাখী গান করে তার জণ্যে খাঁচা।
(অমিয় চক্রবর্তী)

(৫৮)

মানব

তুমি তৈরি করেছ এাত্রি,আমি তো জ্বেলেছি আলোক।
মাটি তোমার, তাই দিয়ে রচলাম পান পাত্র।
তোমার ছিল মরুভূমি। পর্বত: অরণ্য:
আমার হ’ল তৈরী ফুলের কানন, গোলাপ ফুলের বাগান।
আমি সে, যে পাথর’কে ক’রে দেয় আয়না,
বিষ হতে যে বানায় মধু।

জাভিদ নাম: (৫৯)

সত্তার পরীক্ষা

কোন স্তরে আছে সত্য এ অস্তিত্ব তোমার?
জীবন না মৃত্যু, কিংবা জীবমৃত? পরীক্ষায় তার
তিনটি সাক্ষীকে ডাকো, জেনে নাও সত্য অবস্থান।
প্রথমে তোমার নিজ চেতনাকে জানাও আহবান-

সে হবে প্রথম সাক্ষী, তার চোখে নিজেরি আলোকো
দেখে নাও নিজ সত্য, জেনে নাও আছো কোন লোকে
অপরের চেতনাকে তারপর জানাও শমন
সে হবে দ্বিতীয় সাক্ষী:দেখো সেই পরের অহং
কী দেখে তোমার মাঝে সত্য, জেনে নাও আছো কোন লোকে।
তৃতীয় সাক্ষীর চোখে তারপর নিরীক্ষা তোমার
আল্লার চেতনা সেই মহাসাক্ষী, আলোকেতে তাঁর
জেনে নাও নিজ সত্য। যদি সেই আলোকের আগে
অকম্প্র দাঁড়াতে পারো, কেবল তখনি আপনাকে
জেনে প্রাণবন্ত আর চিরন্তন-আল্লারি মতন
(কেবল তখনি তুমি অনন্তে সংস্থিত একজন)!
সেই মাত্র শুদ্ধ সত্য, যে মানুষ আল্লার সন্মুখে
মুখোমুখি দাঁড়াবার শক্তি রাখে চোখে আর বুকে
মে'রাজের রহস্য কি? সে তো এক সাক্ষীর সন্ধানে
প্রাণবন্ত অভিযান, একমাত্র যার সাক্ষ্যদানে
তোমার অস্তিত্ব পায় পরিপূর্ণ সত্যের স্বীকৃতি
যে সাক্ষীর সমর্থনে তুমি পাও চিরন্তন স্থিতি।
কে পারে সন্মুখে তঁর দাঁড়াতে অকম্প দেহ-মনে!
যে পারে, সে নিকষিত হেম (শুভ্র সত্যের দহনে)
তুমি কি শুধুই এক বিনশ্বর তুচ্ছ ধূলিকণা?
(তোমারো অতলে আছে অসীমের মহাসম্ভাবনা)।
আপন খুদীর গ্রন্থি বজ্র-দৃঢ় করো তুমি তবে ।
যত ক্ষুদ্র হোক সত্তা, জেগে ওঠো তাহারি বৈভবে।
তালিম হোসেন

(৬০)

ইবরাহীমের মত ঈমান যদি
বিদ্যমান থাকে,
আজ ও অগ্নিকুণ্ডে তৈরি হতে পারে পুষ্পকানন।

(৬১)

কাফিরের পরিচয়, সে দুনিয়ার মধ্যে হারিয়ে যায়,
আর মুমিনের মধ্যে দুনিয়াই হারিয়ে যায়।

(৬২)

পোষাক পরিচ্ছদে নাসারা, সংস্কৃতিতে হিন্দু
এমন মুসলমান
যাকে দেখে ইহুদিরা পর্যন্ত লজ্জা পায়।

(৬৩)

পৃথিবী বক্ষে মুসলমান সূর্যের মত,
কখনো এদিকে ডোবে ওদিকে উদিত হয়
কখনো ওদিকে অস্ত যায় এদিকে ওঠে।

(৬৪)

প্রাণ স্পন্দনহীন দেহের প্রতি

Dhaka University Institutional Repository

খোদার কোন আগ্রহ নেই,
জীবিত খোদা জীবিতদেরই খোদা

(৬৫)

সে-ই মর্যাদা লাভ করে জন্মভুমিতে যে আবদ্ধ না থাকে
সেই পুষ্প মস্তকে শোভা পায়
কাননের মায়া যে পরিত্যাগ করে।

(৬৬)

সে-যামানায় মুসলমান হয়ে
তারা বিশ্বব্যাপী মর্যাদা লাভ করলো
আর আজ কুরআন ছেড়ে দিয়ে
তুমি সবার কাছে অসন্মানিত।

(৬৭)

বাদশাহীর বৈভব হোক বা গণতন্ত্রের তামাশা হোক,
রাজনীতি থেকে ধর্ম যদি আলাদা হয়,
তা হলে যা থাকে সেটা চেঙ্গিস খানের রীতি।

(৬৮)

মেয়েরা ইংরেজী পড়ছে
দেখা যাক, এই নাটক কী দৃশ্য মেলে ধরে
দৃষ্টি পর্দা উঠবার অপেক্ষায় আছে

(৬৯)

যদিও আমার জন্ম হিন্দুস্থানে
কিন্তু আমার চোখের জ্যোতি
বুখারা কাবুল এবং তবরিযের পবিত্র ধুলি থেকে

(৭০)

খোদা তোমাকে কোনো-ঝড়ের
মুখোমুখি করে দিন
কারণে তোমার সমুদ্রে যে-তরঙ্গ তাতে কোন উত্তালতা নেই।

(৭১)

ধরা পৃষ্ঠে যদি নিজের স্থান করে নিতে চাও,
হৃদয় বেঁধে নাও আল্লাহর সাথে
এবং মুস্তাফার পথে চলো

(৭২)

স্থানের গণ্ডিতে যদি যদি আবদ্ধ হও
পরিণাম ধ্বংস
সমুদ্রে থাকো মাছের মত স্বদেশ -মুক্ত।

(৭৩)

আবার সত্য ন্যায় ও হিম্মতের
পাঠ গ্রহণ করো,
পৃথিবীর নেতৃত্ব তোমার কাছে ফিরে আসবে।

(৭৪)

তরূণদের মধ্যে প্রভাতের চাঞ্চল্য দান করো,

Dhaka University Institutional Repository

বাজপাখির এই বাচ্চাগুলোকে
আবার ডানা ও পালক দাও

(৭৫)

মাশুকের কি মজা
সে -কথা আশ ইক জানে,
আর পুষ্পের শাখে প্রশাখে কী আনন্দ,
সে -কথা জানে বুলবুল।

(৭৬)

মর্দে মুমিনের পরিচয় হলো,
যখন মৃত্যু আসে,তার অধর ছুঁয়ে
জড়িয়ে থাকে মৃদু হাসির মৃদু রেখা।

Dhaka University Institutional Repository

ষষ্ঠ অধ্যায়
ইকবালের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবনা

ষষ্ঠ অধ্যায়

ইকবালের প্রাচ্য ও প্রতীচ্য ভাবনা:

ইকবালের কাব্যে ও দর্শনে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের নানা বিষয়ে স্থান পেয়েছে। প্রাচ্য বলতে আমরা বুঝি এশিয়া এবং পাশ্চাত্য বলতে বুঝায় ইউরোপ ও আমেরিকাকে। বিশ্ব মানবের প্রতি ইকবালের বক্তব্য রাজনৈতিক, কী আধ্যাত্মিক, সে সম্পর্কে দীর্ঘ আলোচনা হলে পাঠকদের সুস্পষ্ট একটা ধারণা হবে বলে আমি মনে করি, কিন্তু এ সম্পর্কে কোন মহলের খানিকটা বিভ্রান্তি পরিলক্ষিত হয় বলে আমরা এই বিষয়ে এইখানে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়োজন বোধ করছি। প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের বিভিন্ন বিষয়ে তথা রাষ্ট্র, গণতন্ত্র, শিল্পকলা, অর্থনীতি, সাম্য,

Dhaka University Institutional Repository

স্বাধীনতা, জাতীয়তাবাদ, সাহিত্য, সভ্যতা, সংস্কৃতি, সংগ্রাম প্রভৃতির প্রতি কবি-দার্শনিক ইকবালের দৃষ্টি ছিলো অত্যন্ত গভীর ও সুদূরপ্রসারী।

ইকবাল যে যুগে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, তখন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে মানুষের জীবন ও জীবনের বিভিন্ন বিভাগে এক অস্বাভাবিক ও বিস্ময়কর বিপ্লবের সৃষ্টি হচ্ছিলো। চারিদিকে এক মহাবিপর্যয় ও জাতীয় চরিত্রের মেরুদণ্ড চূর্ণ হবার সুস্পষ্ট লক্ষণ তীব্রভাবে পরিলক্ষিত হচ্ছিলো। জীবনের প্রত্যেক ক্ষেত্রেই পশ্চিমা দেশের অন্ধ অনুসরণ একটি অপরিহার্য কর্তব্যে পরিণত হয়েছিলো। তাঁদের এই মনো:বৃত্তিতে বিস্ময় প্রকাশ করে বিস্মিত হয়ে ইকবাল তাঁর *যরবে কলিম* গ্রন্থের 'প্রাচ্যের জাতিরা' শীর্ষক কবিতায় বলেন:

আবরণমুক্ত বাস্তবের চিত্র দেখে না তারা
দাসত্ব ও অনুসৃতিতে নষ্ট যাদের দৃষ্টিশক্তি,
ইরান ও আরবকে জীবিত করবে
কেমন করে ফিরিংগী সভ্যতা?
যে নিজেই মুখ থুবরে পড়ে আছে মৃত্যু শয্যায়। (ইকবাল-৯২, পৃ. ৬২)

এই মানসিকতাকে এবং ইকবাল মুসলিম জাতির উন্নতি-অগ্রগতির পথে প্রধান অন্তরায় বা রোগের কারণ হিসেবে আখ্যায়িত করে *যরবে কলিম* গ্রন্থে 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য' শীর্ষক কবিতায় বলেন:

এখানে রোগের কারণ দাসত্ব ও অন্ধ অনুভূতি
ওখানে রোগের কারণ গণতান্ত্রিক রীতিপদ্ধতি,
প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যও থেকে নিস্কৃতি নেই কারো
পৃথিবীতে দৃষ্টি ও দিলের রুগ্নতার ব্যাপক বিস্তৃতি।
(আব্দুল মান্নান তালিব অনুদিত । (ইকবাল-৯২, পৃ. ১৩৪)

ইকবাল যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষাবিদদের সন্মুখে শিক্ষার্থী হিসাবে নতজানু হয়ে বসে এবং পশ্চিমা সভ্যতার ভাণ্ডার হতে আকণ্ঠ মধু পান করতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু প্রাচ্য দেশের পীর-মুর্শিদদের নিবিড় সাহচর্যের প্রভাবেই হোক বা আল্লাহ প্রদত্ত সৌভাগ্যের বদৌলতেই হোক-একথা অত্যন্ত সত্য যে, ইকবাল ইউরোপীয় চিন্তাধারা ও মতবাদের যত ঘনিষ্ঠতর পর্যবেক্ষণের সুযোগ পেয়েছিলেন,পাশ্চাত্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিরূদ্ধে তাঁর মন ততই বিক্ষুদ্ধ ও বীতশ্রদ্ধ হয়ে উঠছিল। বস্তুত পশ্চিমা রাজনীতির কল্পনামূলক (Theoretical) শিক্ষা এবং জীবনের সাধারণ অভিজ্ঞতাই তাঁকে এই প্রবঞ্চনাকর সভ্যতার সর্বগ্রাসী আক্রমণ হতে রক্ষা করেছে। জানা যায় তিনি বার্গসো হার্বার্ট স্পেন্সার প্রমুখ দার্শনিকের মতবাদ সম্পর্কে যতই গভীরভাবে গবেষণা করতেন, ততই তাঁর মনে বস্তুবাদের (Materialism) বিরুদ্ধে একটা চরম বিতৃষ্ণা ও তীব্র বিদ্বেষের মনোভাব দানা বেঁধে উঠছিল। অনুরূপভাবে ইকবাল যতই পশ্চিমা সুধীবৃন্দ রচিত গ্রন্থাবলী গভীর মনোনিবেশ সহকারে অধ্যয়ন করছিলেন, ততই তিনি তাদের জীবন দর্শনের প্রতি আস্থাহীন হয়ে পড়ছিলেন। 'আরমগানে হিজায' গ্রন্থে কবির পরিণত বয়সের চিন্তাধারা স্বতস্ফূর্ত হয়ে অভিব্যক্তি
হয়েছে; তাতেই তিনি পাশ্চাত্যের বিরূদ্ধে তীব্র ঘৃণা প্রকাশ করে বলেছেন:

مئ از ميخانه ي مغرب چشيدم   بجان من که درد سرخریدم
نشستم با نکو یان فرنگی   ازآن بی سود تررو زی ندیدم

পশ্চিমের শরাবখানায় আমি পান করেছি রঙিন সুরা,
তাতে লাভ হয়নি কিছুই আমার

Dhaka University Institutional Repository

শিরঃ পীড়া ব্যতীত,
পশ্চিমা পূর্ণস্মাদের সাহচর্য লাভ করেছি আমি দীর্ঘকাল,
নিরর্থক সময় কাটেনি আমার
তার চেয়ে আর কোনদিন। (ইকবাল -৫, পৃ. ৪৪৭)

প্রাচ্য দেশের নানাবিধ চরম দুরাবস্থা ও নিত্য নৈমিত্তিক দুঃখ ও লাঞ্ছণার তীব্র অনুভূতি ধীরে ধীরে ইকবালের মস্তিস্কের গোপন পর্দায় চিন্তাধারার এক নবতর গুলবাগিচা রচনা করে দিয়েছে।

ইকবালের বক্তব্য শুধু রাজনৈতিক ভাবাপন্ন ,না এর বুনিয়াদ আধ্যাত্মিক নীতিবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত , এই প্রশ্নের উত্তরে কেউ কেউ বলেছেন:" ইকবালের সমগ্র বাণীই একটা আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক ভাবধারায় আচ্ছন্ন ,এমনকি তাঁর দার্শনিক কবিতা ও গজলগুলো ও রাজনৈতিক ভাবধারায় উচ্ছসিত । মিঃ ডিকেন্সের কথায় ইকবালের বাণী হিংসা উদ্দীপক-যাতে ধ্বংস, উচ্ছৃঙ্খলতা ও রক্তপাতের স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।''

আমাদের কথা এই যে, ইকবালের কাব্য সম্পর্কে এই ধরনের অভিযোগ সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। প্রকৃত ব্যাপার এই যে, সাম্রাজ্যবাদী ও রক্ষণশীল ইউরোপ প্রাচ্য জাতিসমূহের মধ্যে যখনই কোনো নতুন ও নবচেতনার সামান্য স্ফুরণও দেখতে পেয়েছে তখনি তাঁদের মন ভীত ও শংকিত হয়ে উঠেছে এবং প্রাচ্য দেশের উপর তারা অত্যাচারের স্টীম রোলার চালিয়েছে। এর প্রতিক্রিয়া স্বরূপ প্রতিশোধ ও প্রতিহিংসার অগ্নিবিপ্লব জেগে উঠবার ভয়ে তারা আতংকিত হয়েছে। প্রাচ্যের রাষ্ট্রগুরু সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী যখন প্রাচ্য জাতিকে সংঘবদ্ধ হবার আহ্বান জানিয়েছেন ,তখন ইউরোপ এটাকে একটা ভয়ানক প্রতিহিংসামূলক আন্দোলন মনে করেছিলো এবং কল্পিত বিপদের খেয়ালী চিত্র অংকিত করে বিশ্ব মানবের নিকট একে কলংকিত ও হেয় প্রতিপন্ন করবার হীন প্রচেষ্টা চালাতে দ্বিধাবোধ করেননি। পাশ্চাত্য জাতি এই সব করেছিল নিজেদের সাম্রাজ্যবাদ ও রক্ষণশীলতার যে দুচ্ছেদ্য নিগূঢ় দ্বারা প্রাচ্য মানবকুলকে নির্মমভাবে বেঁধে রেখেছিল , তাকে আরো তীব্র ও দীর্ঘস্থায়ী করবার ইচ্ছায়। এই জন্যই আর. এ. নিকলসন, (R. A. Nicholson) ফরেস্টার, (Foraster) ডিকেন্সন (Dikention) প্রমুখ পাশ্চাত্য মনীষী ইকবালের শিক্ষা ও চিন্তাধারার মাধ্যমে প্রাচ্য দেশ হতে এমন এক বিপ্লবী বজ্রনির্ঘোষ শুনতে পেলেন, যার ভিত্তি মানব প্রকৃতির নিগূঢ়তম ও সূক্ষ্ম অনুভূতির জগতে বিস্তার লাভ করছিলো। যার প্রভাবে প্রাচ্য জাতি নিশ্চিতরূপে এমন এক নবজীবনের প্রত্যক্ষ অনুভূতির সন্ধান পেতে পারে, যা নিঃসন্দেহে সকল অন্যায় ও জুলুমের বিরূদ্ধে এক দুর্দমনীয় ও সুদূঢ়প্রসারী বিপ্লব সৃষ্টি করতে সক্ষম। এই জন্যেই ইকবালের পাশ্চাত্য সমালোচকগণ তাঁর বক্তব্যকে 'আক্রমণাত্মক রাজনৈতিক বক্তব্য' বলে অভিহিত করবার দুঃসাহসিক স্পর্ধা দেখিয়েছেন। কিন্তু এ সম্পর্কে ইকবাল নিজেই একটি প্রবন্ধে বলেছেন:

'এই দ্বন্দ্ব-কলহ হতে আমি রাজনৈতিক নয়-কেবল নৈতিক অর্থই গ্রহণ করে থাকি। অথচ নিটশের (Nitsa) সন্মুখে রয়েছে এর রাজনৈতিক উদ্দেশ্য।'

এতদ্ব্যতীত *পায়ামে মাশরিক* কাব্যের ভূমিকায় এই নিগূঢ় তত্ব তিনি বলিষ্ঠতর ভাষায় ব্যক্ত করেছেন:

প্রাচ্য জাতির এই কথা জেনে নেয়া একান্ত আবশ্যক যে, সর্বপ্রথম ব্যক্তিজীবনের গভীর অভ্যন্তরে কোনো প্রকার বাস্তব বিপ্লব সৃষ্টি না হলে সামাজিক জীবনের নিজস্ব পরিবেশ কোনোরূপে 'বিপ্লবাত্মক পরিবর্তন সূচিত হওয়া সম্ভব নয়। কোনো নতুন জগৎ বাহ্যিকরূপে পরিগ্রহ করতে পারে না যতক্ষণ পর্যন্ত তার অস্তিত্ব প্রথমে সকল মানুষের মনের কোণে দানা বেঁধে না উঠবে'।

প্রকৃতির এই অটল নিয়মকে কুরআন মজীদে সহজ ও গভীর ভাষায় বলা হয়েছে।

Dhaka University Institutional Repository

ان الله لايغير مابقوم حتي يغير ما بانفسهم

'আল্লাহ কোন জাতির অবস্থার একবিন্দু পরিবর্তন করেননা, না যতক্ষণ তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন সাধনে প্রয়াসী হয়। (কুরআন -১৩:১১)

ইকবাল বলেন এটি ব্যষ্টি ও সমষ্টি উভয় জীবন সম্পর্কেই সত্য এবং আমি আমার ফারসি গ্রস্থাবলীতে এই সত্যই প্রমাণ করবার জন্যে বিশেষ চেষ্টা করেছি।

ইকবাল এখানে যে অভ্যন্তরীণ দ্বন্দের দিকে ইশারা করেছেন তা অর্থনৈতিক ও তামাদ্দুনিক বিপ্লবযা- জাতির মূল অনুভূতিকেই পরিবর্তিত করে দেয় তার হৃদয়দেশকে এমন একটা নিগূঢ় ও গভীর চেতনায় পরিপূর্ণ করে দেয় যেখান হতে 'খুদী বা অহমের চিত্তহারী সুরঝংকার স্বভাবতই ধ্বনিয়া উঠে। এই ধরনের বিপ্লবকে সক্রিয়ভাবে বাস্তবে রূপায়িত করতে হলে শ্রান্তিহীন সংগ্রাম আবশ্যক | এই নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে আমরা বলতে চাই যে, প্রতিনি সংস্কৃতির ও সভ্যতা পাশ্চাত্য ইকবাল ,য়ত তীব্র বিরোধিতা করেছেন যেখানে বুদ্ধি এবং বস্তুবাদ আদর্শগত ও মৌলিকতার মর্যাদা দখল করে রয়েছে| পক্ষান্তরে ইকবাল তাঁর সমস্ত কাজের ভিত্তি স্থাপন করেছেন বিনয় ও প্রেম এর উপর| উপোরন্ত, এই একটি জিনিসকেই তিনি নিখিল জড়জগতের প্রকৃত উন্নতি ও সুস্থতার মৌলিক কারণ বলে মনে করেন। পাশ্চাত্য সংস্কৃতির বিরুদ্ধে ইকবালের অভিযোগ এই যে, এর সমগ্র শাখা-প্রশাখাই এই বুদ্ধিবাদ ও জড়বাদের Materialism) মারাত্মক সংক্রামক ব্যাধিতে আক্রান্ত ও জর্জরিত| এ কারণে ইউরোপীয় সভ্যতার গোটা দেহসত্তা প্রতিনিয়ত দুর্বল ,পঙ্গু এবং জীর্ণশীর্ণ হয়ে যাচ্ছে| প্রাচ্য জাতি যখনই আত্মজ্ঞান হারিয়েছে, গভীর নিদ্রায় অচেতন হয়ে পড়েছে, ইকবালের দরদি অন্তর নিদারূণ ব্যথায় ভারাক্রান্ত হয়ে উঠেছে। এই দুঃসহ আঘাতে তাঁর দুই চক্ষু কোটর হতে তপ্তগলিত অশ্রুর বন্যা প্রবাহিত হয়েছে| এই নিরাকার বেদনা মূর্ত হয়ে উঠেছে তাঁর *পায়ামে মাশরিক, যরবে কলিম, বাংগেদারা, জাবিদনামা, যাবুরে আযম,* ও *আরমগানে হিজায,* প্রভৃতি গ্রন্থাবলিতে| উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠেছে তাঁর বেদনার্ত সুর ঝংকার-সারা দুনিয়াকে করে তুলেছে ব্যাকুল চঞ্চল | এই সব গ্রন্থের পৃষ্ঠায়-পৃষ্ঠায়, পত্যেকটি কবিতার পংক্তিতে–পংক্তিতে শব্দের প্রতিটি ধ্বনিতে আমরা দেখতে পাই পাশ্চাত্যের স্থূল বস্তুবাদ ও দেহকেন্দ্রিক দর্শন বিজ্ঞান ও চিন্তাধারার প্রতি ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ইকবালের হৃদয় মন জর্জরিত হয়ে উঠেছে। সমগ্র পৃথিবীর উপর ইউরোপের রাষ্ট্রীয় প্রাধান্য ও সাম্রাজ্যবাদের প্রতি ও ইকবালের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়েছে| কিন্তু তিনি সর্বাপ্রেক্ষা অধিক দুঃখিত ও মর্মাহত হয়েছেন ইউরোপের আত্মিক ব্যাধি ও তার সভ্যতায় ধর্ম ও চরিত্রের প্রভাবহীনতা দর্শনে। অপরদিকে প্রাচ্য জাতিও সঙ্গে সঙ্গে এরই অনুকরণে সেই সব মানসিক রোগে আক্রান্ত হয়ে পড়েছে, এটি দেখে তিনি আরো অধিক বেদনা বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন। মোটকথা, ইকবালের বক্তব্যের উদ্দেশ্য দুইটি| প্রথমত: প্রাচ্যদেশ ও জাতিকে প্রাশ্চত্যের মানসিক ও আধ্যাত্মিক ব্যাধি হতে রক্ষা করা আর দ্বিতীয়ত: খোদ ইউরোপকেও এর এই মারাত্মক রোগের কথা জানিয়ে সতর্ক ও সাবধান করে দেয়া | এসব আলোচিত সমস্ত কথাই *পায়ামে মাশরিক* গ্রন্থে সুস্পষ্টরূপে ফুটে উঠেছে। এরই দুইটি পঙক্তি

عجب آن نیست که اعجاز مسیحا داری　　عجب این است که بیمار تو بیمار تر است

دانش اندوخته دل زکف انداختة　　آه از آنقدر گران مایه که درباخته

বিস্ময়কর নয় তোমার হাতে আছে
মসীহর অপূর্ব চিকিৎসার শক্তি
বরং তোমার রোগী হচ্ছে ক্রমাগত রুগ্নতর
এটাই হচ্ছে বিস্ময়কর।

Dhaka University Institutional Repository

বুদ্ধি অর্জন করেছ বটে
দিলকে করেছ উপেক্ষা;
আফসোস, এই উপেক্ষিত সম্পদই ছিল
অধিক মূল্যবান। (ইকবাল-৫, পৃ. ১৩৪)

যাবুরে আজম গ্রন্থে তিনি বলেন:

بر عقل فلک پیما تر کانه شبخون به   یک ذره درد دل از علم افلاطون به

তুর্কী জাতির আকাশচারী জ্ঞানের চেয়ে
শ্রেষ্ঠ নৈশ আক্রমণ,
বিন্দুমাত্র সমবেদনা শ্রেষ্ঠ
আফলাতুনের জ্ঞানের চেয়ে। ((ইকবাল-১১, পৃ.৩৫৬)

বালে জিব্রীলে তিনি বলেন:

بر نہ مان ذرا آزما کے دیکھ   فرنگ دل کی خرابی خرد کی معموری

দোষ ধরোনি-দেখো করে পরীক্ষা ,
পশ্চিমা মনের ধ্বংসের উপর
কায়েম হবে সত্যিকার জ্ঞান। (ইকবাল-১১, পৃ.৬৫)

এই কবিতাগুলি এবং এই ধরনের আরো অনেক কবিতা এই নিগূঢ় তত্ত্ব আমাদেরকে জানিয়ে দেয় যে , ঘৃণা এই ছিল। বিদ্যমান ঘৃণা আন্তরিক ইকবালের প্রতি ভাবধারার মূল সংস্কৃতির ইউরোপীয়লেনিন nilaL , এইচ,ওয়েলস .জি. (H. G. Wells) বার্নার্ড শ' (Barnad sow) ও সিংলারের ঘৃণাবিদ্বেষ হতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জিনিস। কারণ এরা প্রকৃত রোগ সম্পর্কে কিছুটা ধারণা করতে পারলেও এর প্রতিষেধক আজও আবিস্কার করতে সমর্থ হননি, যেমন করতে পেরেছেন দার্শনিক কবি ইকবাল। ইকবালের একটি নিজস্ব দৃষ্টিকোণ ও চিন্তাপদ্ধতি বিদ্যমান তা ইউরোপের সর্ববিধ ব্যাধির পক্ষে এক 'অব্যর্থ মহৌষধ' রূপে প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু দাম্ভিক পাশ্চাত্য জাতির কর্ণকুহরে ইকবালের মর্মবিদারী আওয়াজ কোনদিনই প্রবেশ করতে পারবে কি তা ? বলা মুশকিল।

রাজনীতি ও ধর্মনীতি পরস্পর সম্পৃক্ত:

রাজনীতি ও ধর্মনীতির প্রাচীন বিতর্কে ইকবাল ধর্মহীন রাষ্ট্রের) Secular state) প্রবল বিরোধীতা করেছেন। তাঁর মতে মার্টিন লুথার খৃষ্টবাদের ভয়ানক শত্রু, কেননা তিনিই ধর্ম ও রাষ্ট্রকে দুইটি বিভিন্ন ও পরস্পর বিরোধী বস্তু বলে ঘোষণা করেছিলেন।

ইউরোপে যে জীবন-দর্শনের প্রভাবে ধর্ম ও রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করা হয়েছে ,তার মূলে রয়েছে জড় ও আত্মার (Matter and Spirit) দ্বৈতবাদ (এই ভ্রান্ত দর্শনই মানবতার কাফেলাকে বস্তুবাদের (Materialism) ঊষার মরূতে বিভ্রান্ত ও দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ঘুরে মরতে বাধ্য করেছে। ইকবালের দৃষ্টান্তে ধর্ম ও রাষ্ট্র দেহ ও আত্মার সমতুল্য-এদের পারস্পরিক নিবিড় সংযোগ জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে অপরিহার্য আর এদের পারস্পরিক বিরোধ বিচ্ছেদের নিশ্চিত পরিণতি ধ্বংস: ইকবালের রাষ্ট্র দর্শনের দেহ ও প্রাণ-জড় ও আত্মা দুইটি অবিচ্ছিন্ন মৌলিক উপাদান। গুলশানে রাযই জাদীদ’ গ্রন্থে তিনি বলেছেন:

تن وجان را د و تا گفتن کلام است   تن وجان را د وتا دیدن حرام است
کلیسا سبحه بطرس شمارد   کہ با او حاکمی کارے نہ دارد
بدن را تا فرنگ ازجان جدا دید   نگاهش کلک ودین راهم دوتا دید
بہ تقلید فرنک از خود را میدند   میان ملک و دین ربطی ندیدند

বস্তু ও আত্মার দ্বিধাবিভক্তি আপত্তিকর;
বস্তু ও আত্মাকে ভাগ করা হারাম।
গীর্জা শুধু জপমালা নিয়ে থাকলো বিব্রত,
রাষ্ট্রনীতির সম্পর্ক সে করলো অস্বীকার।
পশ্চিমা দর্শন গড়ে উঠলো
বস্তু ও আত্মার দ্বৈতবাদের উপর।
দৃষ্টিতে তার
রাষ্ট্র ও ধর্ম হলো স্বতন্ত্র।
পশ্চিমের অন্ধ অনুকরণে
এই জাতি হলো বিভ্রান্ত
ধর্ম ও রাষ্ট্রের সম্পর্ক সে হলো বিস্মৃত। (ইকবাল -৯৩, পৃ .৪৫)

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান সম্পূর্ণরূপে ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ বিবর্জিত। আর ইউরোপে এই ধর্ম বিবর্জিত রাজনীতির প্রবর্তক হয়েছেন মেকিয়াভেলী। মেকিয়াভেলী স্পষ্ট বলেছেন: নাগরিকগণ ইচ্ছা করলে চলতে পারে; কিন্তু রাষ্ট্রকে এর উর্ধ্বে থাকতে হবে। এজন্যে একে যে কোন পন্থা ও উপায় অবলম্বন করতে বিন্দুমাত্র কুন্ঠিত হওয়া চলবে না। অবশ্য রাজনৈতিক স্বার্থোদ্ধারের জন্যে ধর্ম ও নৈতিকতার দোহাই দেয়া যদি কিছুমাত্র উপকারী হয়, তবে তা করতেও কোন বাধা থাকতে পারে না। বস্তুত এই ধোঁকাবাজী, প্রতারণা ও সুযোগ সন্ধানী কর্মপন্থাকেই ইকবাল ‘মেকিয়াভেলী রাষ্ট্রনীতি’বলে অভিহিত করেছেন।

রাষ্ট্র পরিচালনায় ইসলামি নীতি অন্যান্য রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। এতে আদর্শ বিষয়ক দিক প্রধান্য পায়। রাষ্ট্র ব্যবস্থার একমাত্র অধিকার আল্লাহ তা’য়ালার। মুসলিম শাসক এবং রাষ্ট্রব্যবস্থা ইলাহী শাসন বাস্তবায়নের মোক্ষম উপায়। (শরীফ- ৭৮, পৃ. ৫৪)

আল্লাহর ঘোষণা হল-‘আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো বিধান দেবার কোনো অধিকার নেই।’ (কুরআন-৪০ :৬৭)

দ্বীন এবং রাজনীতির এই অবিচ্ছেদ্য সম্পর্কের দিকে ইঙ্গিত করে ইকবাল বলে:,

Dhaka University Institutional Repository

''In Islam God and the universe,spirit and matter, church and state are organic to each other. (ইলাহাবাদের ভাষণ, ২৯ ডিসেম্বর, ১৯৩০ খ্রি.)

ইকবালের দৃষ্টিতে দ্বীন ও দুনিয়া রাষ্ট্র ও নৈতিকতার পূর্ণ সমন্বয়ে, শক্তি ও পরাক্রম এবং ফকীরী ও বাদশাহীর সামঞ্জস্য সাধনেই মানবতার কল্যাণ নিহিত রয়েছে। হযরত জুনাইদের দুনিয়াবিমুখতা ও আর্দশিরের রাষ্ট্র দখল একত্র সমন্বিত হলে চিন্তা ও কর্মের এমন এক জীবন্ত সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠা সম্ভব, যার দরূণ মানুষ তাঁর নিয়তিকে পরিপূর্ণতা দান করতে পারে। অন্যথায় মানবতার উত্থান চরমভাবে বার্থ হতে বাধ্য।

ইকবালের দৃষ্টিতে আধুনিক সভ্যতা যে রাষ্ট্রনীতি উপাস্থাপিত করেছে তা একটি বল্গাহীন দৈত্য ছাড়া কিছু নয়। যারই উপর করাল দৃষ্টি নিক্ষিপ্ত হয়, তাই জ্বলে পুড়ে ছাড়খার হয়ে যায়। (আ. রহীম-২০, পৃ. ৩৬)

مری نگاہ میں ہے یہ سیاست لادین واہ رمن ودوں نھاد مردہ ضمیر
ہوئی ہے ترک کایشا سے حاکمی آزاد فرنگیون کی سیاست ہے دیو ہے زنجیر

আমার দৃষ্টিতে বর্তমান রাষ্ট্রনীতি
ধর্মের প্রভাবমুক্ত,
শয়তানের ক্রীতদাসী নীচ প্রকৃতি,
আত্মা তার মৃত।
গীর্জার প্রভাব যখন হল বিবর্জিত
শাসন-ক্ষমতা হল মুক্ত, স্বেচ্ছাচারী
পাশ্চাত্যের রাষ্ট্রনীতি হল
বল্গাহীন দৈত্যের মতো। (ইকবাল -১১, পৃ. ৩২১)

রোমুযে বে খুদী,গ্রন্থে ইকবাল লিখেছেন:

تا حکومت مسند مذهب گرفت اىں شجر در گاشن مغرب گرفت
قصهى دين مسيحائى فسرد شعله و شمع كيسائى فسرد

রাষ্ট্র যেদিন দখল করলো ধর্মের মর্যাদা,
ঈসায়ী ধর্মের সেদিন হলো অবসান,
নিভে গেল গীর্জার শেষ স্ফুলিঙ্গ।
পাশ্চাত্যের বাগিচার জন্ম নিল এ বিষবৃক্ষ। (ইকবাল -৯৪, পৃ .৫১)

নবীজী বলেন:

الدين و الدنيا تومان

[দীন ও দুনিয়া হলো যমজ সন্তানের ন্যায়।]

অর্থাৎ দীন ও দুনিয়া পরস্পর সম্পৃক্ত। একটা ছাড়া অপরটা মেলে না। দীন ছাড়া দুনিয়া লাভ করা যাবে না পক্ষান্তরে দুনিয়া ছাড়া ধর্ম টিকিয়ে রাখা যাবে না।আল্লাহ মানুষকে দু'জাহানের কল্যাণ সাধনের জন্য সৃষ্টি করেছেন। (আব্দুল্লাহ-৩৬, পৃ. ৬২)

'বালে জিব্রিল' গ্রন্থে 'দুনিয়া 'ও সিয়াসত' শীর্ষক যে কবিতা তিনি লিখেছেন, তাকে ধর্ম ও রাষ্ট্রের এই সূক্ষ্ম ও জরূরী সম্পর্কের প্রতি তিনি সর্বাধিক গুরূত্ব আরোপ করেছেন:

Dhaka University Institutional Repository

ہوئی دین ودولت میں جس دم جدائی ہوس کی امیری ہوس کی وزیری
دوئی ملک ودین کے لئے نامرادی دوئی چشم تہذیب کی نابصیری

ধর্ম ও রাষ্ট্র যেদিন হলো স্বতন্ত্র
সর্বত্র কায়েম হলো লালসার আধিপত্য।
রাষ্ট্র ধর্ম উভয়েরই হলো ব্যর্থতার সূচনা,
এই স্বাতন্ত্রই হলো সভ্যতার অদূরদর্শিতার প্রমাণ। (ইকবাল-৯৫, পৃ.৬৩)

ইকবালের মতে ধর্ম ও রাজনীতি দুটি শক্তি একটি অপরটির সম্পূরক। তার ভাষায়-

آن دو قوت حافظ یک دیگر اند کائنات زندگی را محورا ند

ধর্ম ও রাজনীতি-দুটি শক্তি, একটি অপরটির পরিপূরক
জীবন-বিশ্বের জন্য এ দুটি হলো মেরূরেখা স্বরূপ। (ইকবাল—৫ ,পৃ. ১৮২)

অতীতে রাজনীতি ধর্ম বিবর্জিত ছিলো না, বরং দেশ শাসনের সামগ্রিক চরিত্র ছিলো ধর্মের উপর ভিত্তিশীল। জার্মান সংস্কারক মার্টিন লুথার (১৪৮৩-১৫৫৬) ধর্ম থেকে রাজনীতিকে বিচ্ছিন্ন করেন। রাজনীতির উপর ধর্মীয় নেতা তথা পাদ্রীদের যে প্রভাব ছিলো, তার বিলোপ সাধন করাই ছিল লুথারের উদ্দেশ্য। এপথ ধরেই মুসলমানের মধ্যে এক শ্রেণির আলিম বলে থাকেন, আলিমদের রাজনীতি না করাই উচিৎ, তাঁরা ধর্মচর্চা নিয়েই ব্যস্ত থাকবেন।

পক্ষান্তরে মার্টিন লুথারের বিপরীতে ইটালীর রাজনীতিক জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা ছিলেন। তাঁর মতে, রাজনীতির স্বার্থে ও দেশের খাতিরে বৈধ-অবৈধ যে কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করা সরকারের পক্ষে অসমীচীন হবে না। ক্রমে ক্রমে ইউরোপীয় রাজনীতিকগণ মেকিয়াভেলীর নীতি বিবর্জিত এই দর্শনের অনুসরণ করেন। ফলে শাসনক্ষেত্রে দেখা দিল ত্রুটি-বিচ্যুতি ও অন্যায়-অবিচার। বর্তমার ইউরোপ, আমেরিকা ও অন্যান্য দেশে এই ধর্ম বিবর্জিত তথা নীতিবিচ্যুতি শাসন পদ্ধতি চালু রয়েছে। আমাদের বাংলাদেশে ও অনেক বুদ্ধিজীবী মনে করেন, এখানে রাজনীতি হবে ধর্ম নিরপেক্ষ। সরকার পদ্ধতি ও হবে ধর্ম নিরপেক্ষ। (আব্দুল্লাহ -৮৩, পৃ. ৭০)

ইকবালের একটি পঙক্তি এখানে বিশেষ পুনিধাণযোগ্য:

جلال پادشاہی ہوکہ جمہوری تماشا ہو جداہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی

বাদশাহী বিক্রম আর গণতন্ত্রের তামাশা,
ধর্ম রাজনীতি থেকে বিচ্ছিন্ন হলে
অবশিষ্ট থাকে শুধু চেংগিজী নীতি। (ইকবাল-৯৫, পৃ. ৫৪)

যরবে কলীম গ্রন্থের একটি কবিতায় ধর্মহীন রাজনীতিকে ইকবাল ভূতের কন্যা ও পংকিল মনোবৃত্তির পরিচায়ক বলে উল্লেখ করেছেন এবং রাজনীতির কাণ্ডারীদিগকে মুক্তি দিতে পারে একমাত্র ইসলাম। ইসলাম ধর্ম ওরাষ্ট্রের এই দ্বৈতবাদকে চূর্ণ করে মানব জীবনের স্বাভাবিক একত্বকে সুপ্রতিষ্ঠিত করেছে এবং রাষ্ট্রশক্তি ও নৈতিক মূল্যবোধকে পরস্পরের সহিত ওতপোতভাবে জড়িত করে দিয়েছে।

یہ اعجاز ہے ایک صحرانشین کا بشیری ہے آئینہ دار نذیری
اسی میں حفاظت ہے انسانیت کی کہ ہوں ایک جنیدی واردشیری

এ হচ্ছে এক মরূবাসীর কৃতিত্ব
মানবরূপেই তিনি হয়েছেন
মানবতার পথ প্রদর্শক।

Dhaka University Institutional Repository

তারই আদর্শ হচ্ছে মানবতার রক্ষাকবচ
একই ব্যক্তির মধ্যে হয় শাহী ও দরবেশীর সংমিশ্রণ।) ইকবাল—১১, পৃ. ১৫৪)

The Reconstruction of Religious thought in Islam গ্রন্থে ইকবাল বলেন:

Islam as a polity is only a practical means of making this principle (of tawhid)a factor in the intellectual and emotional life mankind. It demands loyalty to God and not to thrones .And since God is the ultimate spiritual basis of all life . loyalty to God actually amounts to man 's loyalty to his own ideal nature.

এই তাওহীদ বা আল্লাহর একত্ব (নীতিকে মানুষের চিন্তাজগতে ও ভাবজগতে জীবন্ত রূপ দেয়াই কার্যত ইসলামের সমাজ ও রাষ্ট্রবিধানের সবচেয়ে বড় কাজ। ইসলাম দাবি করে একমাত্র আল্লাহর আনুগত কোন সিংহাসনের প্রতি আনুগত্য নয়। আর যেহেতু আল্লাহই সমগ্র জীবজগতের আধ্যাত্মিক অভিব্যক্তির মূল বিদান, আল্লাহর প্রতি বস্তুত মানুষের আপন আদর্শ প্রকৃতির প্রতি আনুগত্যের নামান্তর। (ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন)

ইকবাল কোন রাষ্ট্রকেই নৈতিক নিয়ম-বিধান হতে মুক্ত দেখতে প্রস্তুত নন । তাঁর মতে রাষ্ট্রকে অবশ্যই নৈতিক বিধানের অধীন ওঅনুগত হতে হবে। অন্যথায় মানবতার চরম বিপর্যয় অবশ্যম্ভাবী। ইকবালের মতে মানবতাকে এই ধ্বংসের হাত হতে রক্ষা করতে পারে একমাত্র ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা

। মহাকবি ইকবাল ইসলাম-বিরোধী এই ধর্ম নিরপেক্ষ ও লোকায়ত শাসন পদ্ধতির বিরুদ্ধে দৃঢ় হস্তে লেখনী পরিচালনা করেন।

ইসলামি রাষ্ট্র

ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আকীদা বিশ্বাস থেকে আরম্ভ করে ইবাদত করে ইবাদত, লেনদেন পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাজনৈতিক জীবন, অর্থনীতি, দাওয়াত, জিহাদ এবং তাসাউফ সহ এতে সবকিছুর দিক-নির্দেশনা রয়েছে। প্রকৃত মু'মিন হ ওয়ার জন্য যেমনিভাবে সহীহ আকীদা ও বিশুদ্ধ আমল জরূরী অনুরূপ রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতি এবং অর্থনীতি ইত্যাদির ক্ষেত্রেও ইসলামি অনুশাসন মেনে চলা আবশ্যক।
প্রকাশ থাকে যে, দীনি পরিভাষায় রাষ্ট্রবিজ্ঞানকে 'ইলমুস সিয়াসাহ্' বলা হয়। আলিমগণ এর সংজ্ঞা বিভিন্নভাবে বর্ণনা করেন। অভিধান শাস্ত্রের পণ্ডিত ব্যক্তিদের মতে:

السياسة استصلاح الخلق بارشادهم الي الطريق المنجي في العاجل و الاجل

দুনিয়া ও আখিরাতের মুক্তির পথ নির্দেশ করে মানুষের কল্যাণ সাধন করাকে 'সিয়াসত'-রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলা হয়।
জামিউর রূমূয গ্রন্থে রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সংজ্ঞায় বলা হয়েছে;

انها هو القانون الموضوع لرعاية الاداه و المصالح و انتظام الاموال

আর্থিক ব্যবস্থাপনার সুষ্ঠুতা ও জনগণের কল্যাণ সাধনের নিমিত্তে রচিত আইন-কানুন ইত্যাদিকে ' রাষ্ট্রবিজ্ঞান বলে।

আল্লামা আবুল মা'আলী (র) মুসামারা গ্রন্থে খিলাফত-এর সংজ্ঞা উল্লেখপূর্বক বলেন;

الخلافة هي الرياسة الغامة في الدين و الدنيا خلافة عن النبي صلي الله عليه وسلم

রাসুলুল্লাহ (সা.) এর প্রতিনিধি হিসাবে দীন ও দুনিয়ার যাবতীয় বিষয়ে সর্বস্তরের মুসলমানদেরকে ব্যাপক নেতৃত্ব দান এবং সঠিক পথে পরিচালনা করাকে ইসলামের পরিভাষায় 'খিলাফত বলা হয়।
রাষ্ট্রের সংজ্ঞা ও প্রকৃতি

এ্যারিষ্টটল তাঁর ' রাজনীতি' গ্রন্থে রাষ্ট্রের সংজ্ঞা প্রসঙ্গে লিখেছেন পরিপূর্ণ ও স্বনির্ভর জীবন গঠনের উদ্দেশ্যে কতিপয় পরিবার ও গ্রামের সমন্বয়ে গঠিত সংগঠনই রাষ্ট্র।অধ্যাপক গার্নারের মতে, রাষ্ট্র হচ্ছে এমন একটি জনসমাজ যা সংখ্যায় অল্পাধিক-বিপুল যা কোন নিদিষ্ট ভুখণ্ডে স্থায়ীত্বভাবে বাস করে, যা কোন বাইরের

Dhaka University Institutional Repository

শক্তির নিয়ন্ত্রণমুক্ত স্বাধীন অথবা প্রায় স্বাধীন এবং যার এমন একটি সুগঠিত শাসনতন্ত্র আছে ;যার প্রতি প্রায় সকলেই স্বভাবত আনুগত্য স্বীকার করে।

অথধ্যাপক গার্নারের এই সংজ্ঞাটি বিশ্লেষণ করলে রাষ্ট্রের চারটি উপাদান বের হয়ে আসে। ১. জনসমষ্টি ২. নির্দিষ্ট ভুখণ্ড,৩. সরকার ৪. সার্বভৌমত্ব। আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞানীদের মতে, যে কোন রাষ্টের জন্য এই চারটি উপাদান অত্যাবশ্যক।(আধুনিক রাস্ট্রবিজ্ঞান-পৃ. ৩৩-৩৪)

পর্যালোচনা:

ইসলাম রাষ্ট্রের উপরোক্ত উপাদান চতুষ্টয়ের মধ্যে প্রথম তিনটিকে স্বীকার করে। কিন্তু সার্বভৌমত্বের বিষয়টি ইসলাম স্বীকার করে না। কেননা আধুনিক রাষ্টবিজ্ঞানের মতে, সার্বভৌমত্ব হচ্ছে রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত সকলের উপর স্থাপিত এক অপ্রতিহত ক্ষমতা । ইহা রাষ্ট্রের অন্তর্ভূক্ত প্রত্যেক প্রজ্ঞা ও প্রত্যেক জনসংঘের উপর শাসন করার ও বশ্যতা আদায় করার সীমাহীন ক্ষতা । সার্বভৌমত্ব রাষ্ট্রের সেই বিশেষত্ব যার ফলে রাষ্ট্র নিজের ইচ্ছা ব্যতীত অন্য কোন কিছু মেনে নিতে বা অপর কারো নিকট আইনত দায়ী হতে পারে না। এই ক্ষমতার কারণে অন্য কোন শক্তিই রাষ্ট্রের উপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ করতে পারে না। সার্বভৌমত্ব থাকার কারণেই রাষ্ট্র অভ্যন্তরীণ সকল ব্যাপারে অগাধ কর্তৃত্ব করার অধিকারী হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে এ কারণেই রাষ্ট্র বাইরের সকল শক্তির অধীনতা বা নিয়ন্ত্রণ হতে সম্পূর্ণ মুক্ত থাকে। (আ. রহীম-৯৬, পৃ. ৩৮-৩৯)

ইসলামি জীবন দর্শন অনুসারে আল্লাহতায়ালা বিশ্বভুবনের মালিক, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। স্বর্গ-মর্তে যা কিছু আছে সবারই মালিক আল্লাহ।

বিশ্ব এবং তাঁর সমুদয় প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি বিশ্বজগতের প্রভু ও প্রতিপালক।

কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব খোদার । খোদাই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি, জনসাধারণ বা ব্যক্তিসাধারণ এই শক্তির অধিকারি নয়। জনসাধারণ রাষ্ট্রের নাগরিক মাত্র, মালিক নয়। বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর মতো রাষ্ট্রের মালিকানা ও খোদার। খোদার বিধান অনুসারেই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতির্ষ্ঠিত হয়। নবী রাসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত আদেশ-নিষেধই ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ। অন্যান্য নবীর মতো হযরত মোহাম্মদ (স) আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশনাবলীর আলোকেই তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের নমুনার পরিপন্থী কোনো নির্দেশ দিতে পারে না। ইসলামি রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা হয়। কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক সমগ্র মুসলমান সমাজই এই রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় ভুমিকা পালন করে। রাষ্ট্র শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছে পবিত্র কুরআন শরীফে। কুরআনের ২৯ পারার শুরুতেই রয়েছে আল-মূলক বা রাষ্ট্র নামক সুরাটি রয়েছে যে, আল্লাহর নবী হযরত দাউদ (আ.) ও হযরত সোলায়মান (আ.) রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতির্ষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হযরত ইউসুফ (আ) মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স.) রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

কুরআনে উল্লেখের পূর্বে গিরিকগণ রাষ্ট্র শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তাকে বর্তমানের জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত না করে নগররাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মতো ইসলামের রাজনৈতিক জীবন ও সুদৃঢ়-আধ্যাতিক ও নৈঐতিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতির্ষ্ঠিত এবং খোদায়ী নির্দেশনাবলী দ্বারা পরিচালিত।

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি,তার কাঠামো, কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। বলা যায় তুলনাহীন। এটা কোনো যাযকতন্ত্র নয়, যেখানে একটি বিশেষ শ্রেণীর মানুষ উত্তাধিকার সূত্রে কিংবা অন্য কোন উপায়ে সমস্ত খোদায়ী অধিকারের মালিক হয়ে বসে এবং নিজেদের অন্যান্য নাগরিকের উর্ধ্বে ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে মনে করে। ইসলামই রাষ্ট্র কোনো শ্রমিকতন্ত্র দ্বারা শাসিত হয় না-এখানে গুটিকতেক

Dhaka University Institutional Repository

প্রতিহিংসা পরায়ণ শ্রমিক সর্বময় দখল করে বসতে পারে না। এমনকি ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থা ও শাসনব্যবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র একটি জিনিস। (ফিরোজা-৩১,পৃ. ৫৪)

ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য:

ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো এমন একটি সমাজ গঠন করা যেখানে সকল মানুষ জীবনের সর্বক্ষেত্রে বিশ্বস্রষ্টা আল্লাহ তা'আলার বিধানের একনিষ্ঠ অনুগামী হবে, নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে এবং সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। এ বিষয় সম্পর্কে কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে:

الذين ان مكنهم في الارض اقاموا الصلوة واتوا الزكوة وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر والله عاقبة الامور

তারা এমন লোক যে, আমি তাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠা দান করলে তারা নামায কায়েম করবে, যাকাত প্রদান করবে, সৎকাজের আদেশ দিবে ও অসৎকাজে নিষেধ করবে। (কুরআন:২২: ৪১)

এই আয়াত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুকমতের বুনিয়াদী লক্ষ্যসমূহ হচ্ছে নিম্নরূপ।

১.নামিয কায়েম করা.২. যাকাত প্রদান করা. ৩. সৎকাজতথা ন্যায় ও কল্যাণকর কাজের আদেশ করা ও তা প্রতিষ্ঠা করা. ৪. অসৎকাজে তথা সকল অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখা। প্রণিধানযোগ্য যে, এখানে নামায কায়েম করার কথা বলে শারীরিক যত ইবাদত আছে এসবের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। অথ্আৎ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রপ্রদানের অন্যতম দায়িত্ব হলো, রাষ্ট্রের সকল জনগণের জন্য শারীরিক ইবাদত আদায়ের সুষ্ঠু পরিবেশ তৈরি করা, যাতে প্রত্যেক নাগরিক নির্বিঘ্নে তা আদায় করতে পারে। অগত্যা কেই যদি তা পালন না করে তবে তার জন্য প্রয়োজনে শাস্তির ব্যবস্থা করা। এমনিভাবেই আর্থিক ইবাদতের যত দিক রয়েছে এগুলো যথাযথভাবে পালন ও কায়েমের সার্বিক ব্যবস্থা করাও রাষ্ট্রের অন্যতম উদ্দেশ্য। ইকবাল এসম্পর্কে যরবে করীম গ্রন্থে বলেন:

যদিও মূরীদান মেনে নেয়া হক কথা
তিক্ত লাগে আলেম ও শায়খের কাছে ফকীরের বাণী।
নিস্তেজ হয় জাতির কর্মস্পৃহা তখন
বিতর্ক শুরু হয় যখন যাত ও সিফাতের দর্শনের
যদিও প্রাচীন দেউলের এ নীতি প্রাচীনতর
স্থায়ী নয় পানপাত্র, পানপাত্র, সাকী এরা কেউ
তবুও শরাবের অধিকার একমাত্র সে জাতির
তিক্ত পানি যার যুবকদের কাছে হয় মধু সদৃশ। (ইকবাল- যরবে কালীম পৃ. ৬৯)

আয়াতে উল্লেখীত المعروف এবং المنكر শব্দ দু'টো ব্যাপক অর্থবোধক। অর্থাৎ সর্বপ্রকার সৎ কল্যাণজনক কাজের আদেশ দেওয়া এবং তা বাস্তবায়িত করা ইসলামি রাষ্ট্রের বিশেষ কর্তব্য। অনুলুপভাবে সমস্ত পাপ ও অকল্যাণজনক কাজে বাধা দেওয়া এবং তা মূলোৎপাটিত করাও ইসলামি রাষ্ট্রের বিশেষ দায়িত্ব । এ দায়িত্ব পালনের মাধ্যমেই একটি সুন্দর ও আদর্শ সমাজ এবং কাঙ্খিত রাষ্ট্র গড়ে তোলা সম্ভব। (আ. রহীম-৯৭, পৃ. ৫৪৫)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি রাষ্ট্র ও শাসনব্যবস্থা কতকগুলো নীতিমালার ওপর প্রতিষ্ঠিত:

১. খোদায়ী বিধান অনুযায়ী মুসলমানগণ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগতভাবে তাঁদের কার্য সম্প্রাদন করবে। মুসলমানদের কাজ হবে কুরআন দ্বারা অনুপ্রাণিত ও পরিচালিত। কেননা আল্লাহ তার খাঁটি বান্দাদের জন্য কুরআনকে সংবিধানরূপে মনোনীত করেছেন। এর দ্বার্থহীন ঘোষণা হলো যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে বিচার ফায়সালা কিংবা শাসন করতে ব্যর্থ হয়- তারাই অবিশ্বাসী কাফির, তারই দুস্কর্মকারী জালিম । তারাই বিদ্রোহী ফাসিক।

২. ইসলামি রাষ্ট্রের মালিক হলেন সর্বশক্তিমান আল্লাহ। যেহেতু আল্লাহর হাতেই রয়েছে সকল বিশ্বভূখণ্ডের সার্বভৌমত্ব, সেহেতু কোনো রাষ্ট্রের সার্বভৌমত্ব কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির হাতে থাকতে পারে না। জনগণ আল্লাহর নিকট থেকে এই সার্বভৌমত্ব আমানত হিসেবে লাভ করে এবং তাঁরই বিধিবিধান প্রবর্তন ও তাঁর ইচ্ছার প্রতিফলন ঘটতে কর্মরত থাকে। শাসক তা যে কোনো শাসকই হোন না কেন, শুধুমাত্র একজন কার্যনির্বাহী,যাকে জনগণ তাদের সেবা করার জন্য আল্লাহর আইন অনুযায়ী মনোনীত করে। এটাই হলো ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তিভুমি যা বিশ্বজাহান-যার একমাত্র স্রষ্টা আল্লাহর এবং যেখানে কেবলমাত্র তিনিই সার্বভৌম ক্ষমার মালিক।

৩. ইসলামি রাষ্ট্রের লক্ষ্য হলো খোদায়ী সংবিধান অর্থাৎপবিত্র কুরআনের বিধিবিধান প্রতিষ্ঠা করা। পবিত্র কুরআনের বর্ণিত শর্ত অনুযায়ী ন্যায়বিচার প্রতিষ্টা এবং বর্ণ, গোত্র ও ধর্মনির্বশেষে প্রতিটি নাগরিকের জন্য নিরাপত্তা ও প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করা পবিত্র দায়িত্ব বলে ইসলামি রাষ্ট্র মনে করে। নাগরিকগণ যতক্ষণ আইনানুগ ও শান্তিপ্রিয় থাকবে ততক্ষণ মৌল মানবাধিকারের ক্ষেত্রে ধর্মীয় কিংবা গোত্রীয় সংখ্যালঘিষ্টতার কোনো প্রশ্নই উঠবে না।

৪.আল্লাহর আইন প্রবর্তনের জন্য প্রতিষ্ঠিত ইসলামি রাষ্ট্রকে কোনো অনৈসলামিক প্রকৃতির রাজনৈতিক সংবিধান দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা অথবা বিদেশী শক্তির পদানত করা যেতে পারে না। আল্লাহর পক্ষ থেকে তারই লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনে যথোচিত ক্ষমতা প্রয়োগের জন্য তাকে অবশ্যই পুরোপুরি স্বাধীন থাকতে হবে। যে মূলনীতি থেকে ইসলামি রাষ্ট্রের উৎপত্তি হয়েছে, তা হলো – মুসলমান হলো সেই ব্যক্তি, যে একমাত্র আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে, তার আইনের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে এবং উক্ত আইন প্রয়োগকারী ও তার শর্তাবলী পালনকারীদের প্রতি সর্বাত্মক সহযোগিতা ও সমর্থনের ইচ্ছা জ্ঞাপন করে। অতএব, কোনো মুসলিম জাতির পক্ষে অনৈসলামিক প্রকৃতির কোনো রাজনৈতিক সংবিধানের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করা বিপরীত লক্ষ্য ও প্রকৃতির কোনো অনৈসলামিক সরকারের বশ্যতা স্বীকার করা ইসলামের সাথে মোটেই সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

৫. শাসক যেই হোক না কেন তিনি জনগণের ওপর কোনো সার্বভৌম শক্তি নন। তিনি জনগণ দ্বারা নির্বাচিত জনঘণের প্রতি দায়িত্ব পালনকারী একজন কর্মচারীমাত্র। তিনি জনগণের ওপর কর্তত্ব লাভ করেন আল্লাহর আইনের প্রতি তার আনুগত্য থেকে,যে আইন আল্লাহর তত্বাবধানে সম্পাদিত একটি পবিত্র চুক্তির মতো শাসক ও শাসিতকে আবদ্ধ করে রাখে। কর্তৃত্ব লাভ করেন আল্লাহর আইনের প্রতি তার আনুগত্য থেকে, যে আইন আল্লাহর তত্বাবধানে সম্পাদিত একটি পবিত্র চুক্তির মতো শাসক ও শাসিতকে আবদ্ধ করে রাখে । কর্তৃত্বশীল লোকদের প্রতি আনুগত্য প্রকৃতপক্ষে আল্লাহর আইন ও রাসুলের সুন্নাহর প্রতি তাদের আনুগত্যের ওপর নির্ভরশীল।

৬. ইসলামি রাষ্ট্রে শাসক ও প্রশাসকগণ নির্বাচিত হবেন উত্তম গুণাবলিসম্পন্ন নাগরিকদের মধ্য থেকে। তারা মনোনীত হবেন তাদের ধার্মিকতা, যোগ্যতা ও উপযুক্ততার ভিত্তিতে। কেবলমাত্র বংশীয় আভিজাত্য, খান্দানী প্রতিপত্তি ও অর্থনৈতিক মানমর্যাদা সরকারি পদের জন্য প্রয়োজনীয় গুণসম্পন্ন কোনো প্রার্থী তৈরি করতে পারে না। এ সকল বৈশিষ্ট্য ব্যক্তির যোগ্যতাকে সমুন্নত ও করে না ব্যাহত ওকরে না। প্রত্যেক প্রার্থীকে বিচার করতে হবে তার নিজস্ব যোগ্যতার ভিত্তিতে।

একটি ইসলামি রাষ্ট্রে যতগুলো ইচ্ছা প্রতিনিধিত্বশীল পরিষদ কিংবা পৌর সরকারের অস্তিত্ব থাকতে পারে। ইসলামি রাষ্ট্র নির্বাচন কিংবা মনোনয়নের অধিকার এবং প্রশাসনের আচরণ উভয়ই নিয়ন্ত্রিত হয় আল্লাহর আইন দ্বারা। সার্বিকভাবে সমাজের সর্বোত্তম স্বার্থরক্ষা করাই হবে এবং প্রধানতম লক্ষ্য। হযরত মোহাম্মদ (স.) বলেন, যে কেউ যোগ্যতর লোক (আমানতদার) বর্তমান থাকা মত্বেও কোনো সরকারি পদের আমানত অন্য কারো উপর ন্যাস্ত করল, সে আল্লাহর ,তার রসুল এবং মুসলিম জনগণের ন্যস্ত আমানতের সাথেই বিশ্বাসঘাতকতা করল। রাজনৈতিক দৃষ্টিতে এর অর্থ দাঁড়ায়: নির্বাচকমন্ডলী কোনোক্রমেই নৈতিক অর্থে জাতীয় ঘটনাবলি সম্পর্কে উদাসীন থাকতে পারে না। তারা যখনই কোনো ভুটাভূটিতে অংশ নেবে সযত্ন অনুসন্ধান ও সুচিন্তিত সিদ্ধান্তের পরই তাদের নিরাপত্তআর সর্বোত্তম রক্ষাকবচ ও দায়িত্বশীল নাগরিকত্বের অধিকারী হতে পারে, আধুনিককালের অনেক গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রই যার অভাব রয়েছে।

৭. ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় নির্বাচন অথবা মনোনয়নের মাধ্যমে জনগণ কর্তৃক শাসক নিযুক্ত হবার পর প্রতিটি নাগরিকের ওপর এরূপ নির্দেশ রয়েছে যে তারা যেন নিজ নিজ সাধ্য অনুসারে প্রশাসনের কার্যাবলি তদারক করে এবং জনস্বার্থে সংশ্লিষ্ট প্রশ্ন তোলে। প্রশাসন যদি আল্লাহ ও জনগণের প্রদত্ত আমানতের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তবে তার সরকারি পদে বহাল থাকার কোন অধিকার নেই। অবশ্যই তাকে অপসারিত করে কাউকে তার স্থানে নিয়োগ করতে হবে এবং এটা যাতে জনগণের স্বার্থেই সম্পাদিত হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা প্রতিটি জনগণের কর্তব্য। এ কারণে কোনো ইসলামিক রাষ্ট্রে উত্তারিধিকার সুত্রে ক্ষমতা লাভ কিংবা আজীবন ক্ষমতায় থাকার কোনো বিধান নেই।

৮ জনগণ কর্তৃক শাসক নির্বাচিত হলেও সেই শাসক আল্লাহর বিধানের অনুসারী। তার সর্বপ্রথম দায়িত্ব।

আল্লাহর প্রতি এবং পরবর্তীতে জনগণের প্রতি।শাসকের পদটি আল্লাহর প্রতি নিছক প্রতীক নয়। অথবা তার ভূমিকাও নৈর্বিক্তিক নয়। তিনি কেবলমাত্র কাগজপত্রে সই করা অথবা ভালো মন্দ নির্বিশেষে জনগণের ইচ্ছা পুরণ করার উপযোগী একজন অসহায় শিখশীনন। তিনি দ্বিমুখী দায়িত্ব পালনের অধিকারী। তাকে অবশ্যই জনগণের পক্ষ থেকে তাদেরই সর্বোত্তম স্বার্থে আল্লাহরন আইন অনুসারে প্রকৃত ক্ষমতা প্রয়োগ করতে হবে। রাষ্ট্রপ্রধান একদিকে তার আচরণের জন্য আল্লাহর কাছে দায়ী,অন্যদিকে তিনি জনগণের কাছে দায়ী। জনগণই রাষ্ট্র শাসনের হাতে তাদের আমানত অর্পন করেছে। শাসক জনগণের সাথে কিংবা তাদের প্রতিনিধিদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করছেন, সে সম্পর্কে আল্লাহর সামনে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। কিন্তু শাসক ও জনগণ উভয়ে কিভাবে কুরআনের সাথে ব্যবহার করছেন,আল্লাহর দেয়া অবশ্য পালনীয় বিধানকে তারা কতটা মেনে চলছেন, সে সম্পর্কে তাদেরকে ও জবাবদিহি করতে হবে।

৯ .ন্যায়বিচারকে একটি অভিন্ন আইনে পরিণত করে বিশ্বের সার্বভৌম প্রভু মহান আল্লাহর প্রতি তাদের নির্ভেজাল আনুগত্যকে রাষ্ট্রের একটি নিয়মিত কর্মধারায় পরিণত করে এবং বলিষ্ঠ নৈতিকতাকে প্রশাসনের একটি মহৎঅঙ্গীকাররূপে গ্রহণ করে শাসক জনগণের সেবায় ব্রতী হন।

যদিও পবিত্র কুরআন ইসলামি রাষ্ট্রের সংবিধান, তথাপি মুসলমানদের অভিন্ন বিষয়াদি পরামর্শের ভিত্তিতে নির্বাহ করার জন্য আল্লাহ তাদের জন্য প্রতিটি নাগরিককেই আদেশ দেয়া হয়েছে। কার্যকর ও ফলপ্রসূ পন্থায় এই কর্তব্য পালন করতে হলে শাসকবর্গকে অবশ্যই রাষ্ট্রের প্রাজ্ঞ ও অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের নিকট থেকে পরামর্শ

Dhaka University Institutional Repository

গ্রহণ করতে হবে। দেশের সাধারণ নাগরিকগণ ও প্রয়োজনে শাসককে পরামর্শ দেবার অধিকার রাখে। যখন সুযোগ আসবে, তারা নির্ভয়ে খোলাখুলিভাবে ও স্পষ্ট ভাষায় নিজেদের অভিমত ব্যক্ত করবে।

১০. রাষ্ট্রপরিচালনা খলীফা এবং কর্মকর্তাদের জন্য একটি আমানত। এ আমানত যাদের সোপর্দ করা হবে তারা এ ব্যাপারে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকবেন। কুরআন মজীদে ইরশাদ হয়েছে

ان الله يامركم ان تؤطوا الامنات الي اهلها واذا حكمتم بين الناس ان تحكموا باعدل ان الله نعما يعظكم به ان الله كان سميعا بصيرا

নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন আমানত তার হকদারকে প্রত্যার্পণ করতে। যখন তোমরা মানুষের মধ্যে বিচারকার্য পরিচালনা করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সাথে বিচার করবে। আলআহ তোমাদেরকে যে উপদেশ দেন তা কত উৎকৃষ্ট। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। (কুরআন: ৪:৫৮)

১১. মানুষ জন্মগতভাবে আযাদ। তাদের এ আযাদী কোনভাবেই খর্ব করা যাবে না। মানুষের ব্যক্তিগত আযাদী; মত প্রকাশের আযাদী এবং ব্যবসা বাণিজ্যের আযাদী ইত্যাদি বিষয়াদিতে নিশ্চয়তা প্রদান রাষ্ট্রের বুনিয়াদী নীতিমালা সমূহের অন্তর্ভূক্ত। এ ব্যাপারে কোনরূপ শিথিলতা গ্রহণযোগ্য নয়। উল্লেখ্য যে, ভৌগলিক আযাদী ওএক ধরনের আযাদী বটে। তবে এটাকে প্রকৃত আযাদী সাথে সাথে আদর্শিক আযাদী ও তাদের হাসিল হয়। পক্ষান্তরে মানুষ যদি মানুষের রচিত আইন শাসনের অধীনে পরিচালিত হয়, তবে ভৌগলিক স্বাধীনতা অর্জন করা সত্ত্বেও তারা পরিপূর্ণভাবে স্বাধীন নয়। এজন্যই কবি ইকবাল বলেন

گر تو خواہی حری و دل زندگانی کن بندگی کن بندگی

তুমি যদি প্রকৃত আযাদী ও স্বাধীনতা চাও তবে মানুষের গোলামী প্রত্যাখ্যান করে আল্লাহর গোলামী মেনে নাও। (ইকবাল -১১, পৃ. ২৭৬)

Dhaka University Institutional Repository

কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি কাম্য ছিল?

বাংগে দারা গন্কের 'জাওয়াব-এ খিযির কবিতায় (১৯২১) ইকবাল খিযির (আ.) এর সাথে বিভিন্ন সরকার পদ্ধতির ভাল মন্দ দিক সিয়ে আলোচনাই করেছেন, কিন্তু তিনি এ কবিতায় বা অন্য কোথাও পরিস্কারভাবে বলেননি যে, তিনি কোন পদ্ধতির সরকার নিজ দেশ বা অন্য দেশের জন্য শ্রেয় মনে করেন। কুরআন হবদীসের কোথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ উল্লেখ নেই যে, কোন ধরনের সরকার পদ্ধতি আল্লাহর নিকট পছন্দনীয়। তবে কুরআনের আয়াত-আম-রোহুম সুরা বাইনাহুম'' তাদের (নেতাদের) পরামর্শ অনুযায়ী স্টেটের যাবতীয় বিষয় পরিচালিত হবে- এর আলোকে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, ইসলাম গণতন্ত্রের মাধ্যমেই সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় বিষয়াদি পরিচালনা করতে চায় যেমনটা হয়েছিল নবীজী (স.) ও খুলাফা এ রাশিদীন (রা) এর যুগে।

ইকবাল যদি ও ইউরোপীয় গণতন্ত্রের কড়া সমালোচনা করেছেন, কিন্তু তিনি কুরআনে নির্দেশ করা গণতন্ত্র পরিহার করার কথা কোথাও উচ্চারণ করেননি। তিনি রাজতন্ত্র ও পুজিতন্ত্রের ঘোর বিরোধী ছিলেন। কোন কোন দিক থেকে তিনি রাশিয়ার সমাজতন্ত্রের ভাল ভাল দিকগুলোর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন বটে। কিন্তু তা ও তিনি পুরোপুরি মেনে নিতে পারেনি। তার মতে আধ্যাত্মিকতা বিবর্জিত জড়বাদধর্মী সমাজতন্ত্র ইসলাম সম্মত নয়। তাই সেটাও তিনি মেনে নিতে পারেননি। তার যুগে প্রচলিত সরকার পদ্ধতিসমুহের মধ্যে রাজতন্ত্র, পুঁজিতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রকে বাদ দিলৈ বাকি থাকে কেবলমাত্র গণতন্ত্র। তাই বলতে হয়, তিনি তদানিন্তন যুগে প্রচলিত গণতন্ত্রকে সংশোধন করে তা প্রয়োগের কথাই ভেবে থাকবেন এবং সেটাই হলো তার মতে, ইসলামি সমাজতন্ত্র। সুতরাং পরিশেষে বলা চলে, তিনি নিজ দেশ ও অন্যদেশের জন্য ইসলামি সমাজবাদই কামনা করেছেন। ১৯৩৭ ষালের ২৮ মে তিনি কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর নিকট লিখিত একমাত্র একপত্রে বলেন: ''ইসলামের মূলনীতির সঙ্গে খাপ খায়-এমন কোন ধরনের সামাজিক গণতন্ত্র গ্রহণ করা হলে তা নতুন কোন বিপ্লব হবে না,বরং তা হবে ইসলামের মৌলিক বিশুদ্ধতার প্রতি প্রত্যাবর্তন। ইকবালের ভাষায় বলতে গেলে: (আব্দুল্লাহ-৮০, পৃ. ৫২)

For Islam the acceptance of social democracy is the same suitable form and consistent with the legal principles of Islam,is not a revolution but a return to the original p urity of Islam

(Iqbal,-98, p. 19)

বিভিন্ন সরকার পদ্ধতি সম্পর্কে ইকবাল জাওয়াব এ খিযির কবিতায় ও অন্যান্য স্থানে যে সব মন্তব্য তুলে ধরেছেন, তা বিশদভাবে আলোচনা করলে ত৭আর প্রকৃত মনোভাব প্রতীয়মান হবে বলে আমি মনে করি।

Dhaka University Institutional Repository

রাজতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতি বিরোধী কেন?

ইকবালের মতে, ভুমির মালিকানা কোন ব্যক্তি,বংশ বা জাতি তথা স্টেটের নয়, বরং পৃথিবীতে যা কিছু আছে, সবকিছুরই মালিক আল্লাহ। কুরআন ও হাদীসে আছে: الارض لله জমিন আল্লাহর। চাষীরা জমিন চাষ করে এর ফসল ভোগ করবে; চাষীই জমিনের মালিক।''

(রইস আহমদ,জাফরী, ইকবাল আওর সিয়াসতে মিল্লী, পৃ ১৯০)

যে চাষ করবে না, ভুমিতে তার মালিকনা নেই; সে জমির ফসল ভোগ করতে পারবে না। এটা ইসলামের বিধান। ইকবাল আল আরদু লিল্লাহ নামক কবিতায় বলেন:

ای خدایا یہ زمیں تیری نہیں تیری نہیں

تیری آبا کی نہیں میری نہیں

হে জমিদার এভুমি তোমারনয়, তোমার নয়!
তোমার বাপদাদার নয়, তোমার নয়, আমারো নয়!

ফরমানে খোদা''শীর্ষক কবিতায় ইকবাল বলেন: (ইকবাল-৯৯, পৃ. ১৬১)

جس کھیت سے دہقاں کو میسر نہیں روزی

اس کھیت کے ہر خوشۂ گندم کو جلا دو

যে জমির ফসল চাষী ভোগ করতে পারেনা,
তার প্রতিটি শস্যকণা জ্বালিয়ে দাও।

এখানে ইকবাল পরোক্ষভাবে বলেছেন যে চাষীই জমিনের মালিক জমিদার নয়; তা না হয় তিনি চাষীকে জমিদারের জমিনের ফসল পুড়িয়ে ফেলতে বলবেন কেন?

অন্যত্র ইকবাল কৃষকের দান তুলে ধরে বলেন:

تاج پہنایا ہے کس کی ہے کلا ہے نے اسے

کس کی عریانی نے بخشے ہے اسے زریں قبا

اس کے آب لالہ کون کی خون دہقان سے کشید

تیری میرے کھیت کی مٹی ہے اس کی کیمیا

Dhaka University Institutional Repository

কার শিরস্ত্রানহীনতা বাদশাকে পরিয়েছে তাজ?
কার বিবস্ত্রতা বাদশাকে দিয়েছে সোনালী জামা?
লালাফুলের চাকচিক্য সে পয়েছে কৃষকের খুন থেকে !
তোমার আমার ক্ষেতের মাটি কৃষকের রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ফল।(ইকবাল-৯৯, পৃ. ১৪৯)

ভুমির মালিক আল্লাহ হওয়া সত্বেও রাজা বাদশা ও সামান্তবাদীরা তাঁর জমিনের উপর কব্জা জমায় এবং প্রজাদের নিকট থেকে জোর জবরদস্তি করে খাজনা আদায় করে। ইকবাল এই রাজতন্ত্র ও সামন্তবাদ তথা জমিদারি প্রথার ঘোর বিরোধী ছিলেন। তিনি আল্লাহ কালামের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেন:

ان الملوك اذا دخلوا قريه افلسدوها وجعلو اعرة اهلها اذلة

ও অপমানিত করে। রাজা বাদশাগণ যখন কোন দেশ জয় করে তখন সেই দেশের মধ্যে সে ফ্যাসাদ সৃষ্টি করে এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদের লাঞ্চিত করে। (৩৪:২৭)

ইকবাল কুরআনের এই মর্ম অবলম্বন করে খিযিরের কন্ঠে বলেন:

تباؤں تجھے رمزآیہ الملوک
سلطنت اقوام غالب کی ہے اک جادوگری
خواب سے بیدار ہوتا ہے محکوم اگر
پھرسلا دیتی ہے اس کو حکمراں کی ساحری

এসো তোমাকে রাজবাদশা বিষয়ক আয়াতের মর্ম বলি :
রাজতন্ত্র হলো বিজয়ী জাতিসমূহের ভেলকিবাজি,
নিদ থেকে একটু জাগে যদি পরাধীন জাতি,
ঘুম পাড়ায় তাকে আবার শাসকের জাদুগরি। (ইকবাল-১১, পৃ. ২৯৭)

উপরের কবিতাংশ ইকবাল এটাই বোঝাতে চেয়েছেন যে, রাজতন্ত্র পদ্ধতির সরকারে রাজা বাদশা ও সামন্তবাদীগণ নানা বাহানা রচনা করে প্রজাদের শাসন শোষণ করেও থাকে: পরাধীন লোকের কোনভাবে মাথাচাড়া দিয়ে উঠলেই শাসনতান্ত্রিক বা অর্থনৈতিক কিছুটা সুযোগ সুবিধা দিয়ে তাদের ঘুম পাড়ানো হয়, আর রাজতান্ত্রিক শাসন-শোষণ চালানো হয়।

Dhaka University Institutional Repository

পুঁজিবাদী সরকার পদ্ধতির বিরেধী ছিলেন কেন?

পুঁজিবাদী সরকার পদ্ধতিও ইকবালের মনপুত ছিল না: কারণ এতে একটি বিশেষ শ্রেনী তথা পুঁজিবাদীদের হাতে দেশের ধন সম্পদ পুঞ্জীভূত হয়ে পড়ে ; যান্ত্রিক উৎপাদন ক্ষমতা গুটিকতক লোকের হাতে কুক্ষিগত হয়ে দাঁড়ায়; দেশের মানুষ দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির জন্য তাদের হাতের ক্রীড়নকে পরিণত হয় ; উৎপাদকদের উপর সরকারের সক্রিয় নিয়ন্ত্রণ না থাকলে প্রয়োজনীয় দ্রবাদির শূল্য লাগামহীনভাবে বাড়তে থাকে এবং তা জনগণের ক্রয়ক্ষমতার উর্ধ্বে চলে যায়। ফলে দেশে সৃষ্টি হয় বিশৃঙ্খলা আর অশান্তি।

ইকবালের মতে, পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যে সর্বদা অসন্তোসজনক সম্পর্ক বিরাজ করেছে। শ্রমিকদের প্রতি পুঁজিপতিদের আচরণ অত্যাচার ও শোষণমূলক । এ বিষয়ে ইকবাল বেশ কয়েকটি জোরদার কবিতা লিখেছেন। জোয়াব এ খিযির'' কবিতায় তিনি বলেন, এ যাবৎ পুঁজিপতির মজদুরদের সাথে প্রতারণা করে আসছে এবং অপরিমিত ও নিম্ন মজুরি দিয়ে তাদের ঠকিয়ে আসছে।

دست دولت آفریں کو مزد یوں ملتی رہے
اہل ثروت جیسے دیتے ہیں غریبوں کو زکات!
مکر کی چالوں سے بازی لے گیا سرمایہ دار
انتہائے سادگی سے کھا گیا مزدور مات

সম্পদ উৎপাদকরা এতটা কম পায় মজুরি,
ধনশালীদের কাছ থেকে গরীবরা যেমন পায় যাকাত,
পুঁজিপতিরা প্রতারণার জাল বুনে জিতে গেল,
মজদুরেরা চরম সরলতায় মার খেয়ে গেল।(ইকবাল -৯৮,পৃ. ২৯৭-৯৮)

বিশ শতকের দ্বিতীয় দশকে সাম্যবাদীরা পুঁজিপতিদের প্রতারণা ও বঞ্চনার জাল ছিন্নভিন্ন করে রাজনীতির আকাশে সৃষ্টি করলো এক নব দিগন্ত। জার্মান দার্শনিক ও সমাজবাদী নেতা কার্লমার্কস -১৮১৮) রাশিয়ায় সালে ১৯১৭ (১৯২৪ -১৮৭০) লেলিন প্রবর্তক সাম্যবাদের ধরে সুত্র দর্শনের অর্থনৈতিক এর (১৮৮৩ মহাবিপ্লব এক আনলেন ; বিশ্বের এক বিরাট অংশে পড়ে গেল হৈচৈ। ধীরে ধীরে কয়েকটি দেশ সেদিকে হাত বাড়িয়ে দিল। ইকবাল ছিলেন পুঁজিবাদের দুশমন। ইসলামি ভাবধারার সাথে সাম্যবাদী চিন্তাধারার বেশ কিছুটা মিল থাকায় তিনি সেই মতবাদে প্রভাবিন্বিত হন এবং বলতে গেলে সেদিকে অনেকটা ঝুকে ও পড়ের।
''কার্ল মার্কস কী আওয়িজ '' (কার্ল মাকর্স এর আহবান) কবিতায় ইকবাল বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

یہ علم و حکمت کی مہرہ بازی یہ بحث و تکرار کی نمائش!
نہیں ہے دینا کواب گوارا پرانے افکار کی نمائش

পুঁজিবাদের সমর্থন অর্থনীতিবিদ ও দার্শনিকদের প্রতি কার্ল মার্কস ইকবালের কণ্ঠে বলেন:
নিক্ষেপ করেছ তোমরা জ্ঞান বিজ্ঞানের অনেক গুটি,
করেছ অনেক তর্কবিতর্কের প্রদর্শনী,
পছন্দ নয় এখন দুনিয়ার কাছে পুরনো চিন্তার ছড়াছড়ি।

লেনিনের আবির্ভাবে ইকবাল উৎফুল্ল হয়ে জোয়াব এ খিযির কবিতায় বলেন:

آفتاب تازہ پیدا بطن گیتی سے ہوا
آسماں ٹوٹے ہوئے تاروں کا ماتم کب تلک

কালের উদরে জন্ম নিয়েছে তাজা এক সূর্য,
হে আকাশ ডুবুডুবু তারাসমূহের জন্য কাঁদবে আর কতদিন। (ইকবাল,বাংগেদারা,পৃ. ২৯৯)

এই পংক্তিতে ইকবাল ‘তাজা সূর্য বলে রাশিয়ার কমিউনিজমের প্রবর্তক লেলীনকে বুঝিয়েছেন। ডুবুডুবু তারাসমুহ দ্বারা তিনি পুরনো সামান্তবাদী ও পুঁজিবাদী সরকারের প্রতি ইঙ্গিত করেছেন। তিনি বলেন, লেনিন রাশিয়ার রাজনীতিতে এক মহাবিপ্লব ঘটিয়েছেন। এখন আর জমিদারি, জায়গীরদারি পুঁজিবাদ ও রাজতন্ত্রমূলক সরকার পদ্ধতির কথা ভাবতে হবে না। সেখানে বিলুপ্ত হতে চলেছে। ইকবাল তার ‘ইশতিরাকিয়াত’’(সাম্যবাদ) কবিতায় মানুষকে সাম্যবাদে প্রভাবান্বিত হতে দেখে আনন্দিত হয়ে বলেন :

قوموں کی روش سے مجھے ہوتا ہے معلوم
بے سود نہیں روس کی یہ گرمی رفتار!
اندیشہ ہوا شوخی افکار پہ مجبور
فرسودہ طریقوں سے زمانہ ہوا بیزار!
انساں کی ہوس نے جنہیں رکھا تھا چھپا کر
کھلتے نظر آتے ہیں بتدریج وہ اسرار
قرآن میں ہو غوطہ زن اے مرد مسلماں
اللہ کرے تجھ کو عطا جدت کردار
جو حرف قل العفو میں پوشیدہ ہے اب تک
اس دور میں شاید وہ حقیقت ہو نمودار

Dhaka University Institutional Repository

মনে হয় বিভিন্ন জাতির হালচালে,
নিস্ফল নয় রাশিয়ার এই গরম গতিবিধি,
ভাবতে বাধ্য হয়েছে মানুষের মন এই নতুন চিন্তায়,
নাখোশ হয়েছে মানুষ পুরনো পদ্ধতির ঘানি টানায়,
গোপন রেখেছিল যা বিলাসী মানুষের লোভ,
খুলছে সে তাত্ব এখন ধীরে ধীরে মানুষের কাছে,
হে মুসলমান ! চেষ্টা কর কুরআনকে বুঝার,
দিবেন খোদা তোমায় নতুন চরিত্র,
যে সত্য এতদিন ছিল গোপন কুলিল আফবা ‘’শব্দে,
এ যুগ হয়তোবা হবে তা বিকশিত। (ইকবাল- ১১, পৃ. ১৩৮)

লেলীন খোদাকে হুযুর-মে (লেনিন খোদাকে দরবার) কবিতায় ইকবাল একটি কবিতাকারে ধ্বংস কামনা করেন। ঐ কবিতায় লেনিন খোদার কাছে কতগুলো প্রশ্ন উপস্থাপন করেন। সেগুলো হলো হে খোদা আমি কি করে বুঝবো যে, তুমি আছ কি নাই ? কারণ এ ব্যাপারে চিন্তাবিদদের মত ক্ষণে ক্ষণে বদলে যাচ্ছে ।তুমি কোন মানুষটির মাবুদ ? আকাশ তলে মাটির যেসব মানুষ আছে, তাদের না অন্য কারোর ? আমি তো দেখি প্রাচ্যের খোদা হলো সাদা চামড়ার ইংরেজি জাতি পক্ষান্তরে পাশচাত্যের খোদা হলো চকচকে সোনা চাদি । (ইকবাল -৯৮, পৃ. ১৪৪)
এরপর লেনিন ইউরোপের বুদ্ধিমান লোকদের সম্পর্কে বলেন:

এই জ্ঞান, এই বুদ্ধিমত্তা এই কর্মকাণ্ড, এই গভর্নমেন্ট এরা রক্তপান করে অথচ শিক্ষা দেয় সাম্যের । বেকারত্ব, নগ্নতা মদ্যপান ও দারিদ্র্য-এসব কি ইউরোপীয় নাগরিকদের কর্ম বিজয়?
হে খোদা তুমি শক্তিমান, ন্যায়বান, কিন্তু তোমার দুনিয়ায় মজদুরদের জীবনযাত্রা এত তিক্ত কেন? কখন ডুবে যাবে পুঁজিবাদের নৌকা তোমার দুনিয়া অপেক্ষায় রয়েছে বিচার দিনের।
উক্ত কবিতার ভাষায় প্রতীয়মান হয় যে ইকবাল ইউরোপীয় সমাজ ব্যবস্থার প্রতি অসন্তুষ্ট ছিলেন এবং রাশিয়ার শ্রমিক মজদুরদের প্রতি সহানুভূতিশীল।

‘’ইশতিরাকিয়াত কবিতায় উদ্ধৃত কুলিল আফবা কুরআনের এই বাক্যাংশ থেকে মর্ম অনুধাবন করে ইকবাল নীতিগতভাবে সাম্যবাদকে স্বাগত জানিয়াছিলেন। তার মতে পুঁজিপতি ও শ্রমিকদের মধ্যকার যে অর্থবন্টন ব্যবস্থা রয়েছে, তা অসাম্য ও অত্যাচামূলক। এই অসাম্য ও অত্যাচারের বিষয়ে ইকবাল বেশ কয়েকটি জোড়ালো কবিতা লিখেছেন। পায়ামে মাশরিক গ্রন্থে ইকবাল কিসমত নামায়ে সারমায়দার ওয়া মযদুর (পুঁজিপতি ও মজদুরদের ভাগ্যলিপি) শীর্ষক কবিতায় অত্যন্ত সুন্দরভাবে পুঁজিবাদী ও মজদুরদের অসমঞ্জস্যমুলক জীবনের তুলনামুলক একটি চিত্র অংকন করেছেন। এই অসামঞ্জস্য ও অসাম্য হলো ইকবালের খুদী বিরোধী।

যা হোক, সাম্যবাদের বিষয়টি ইকবালের কবিতায় একটি কৌতুহলপূর্ণ ও চিন্তনীয় অবস্থান জুড়ে আছে। তিনি তার ‘’বালে জিব্রীল কাব্যগ্রন্থে সাম্যবাদের সমর্থনে এমন কতক জোড়ালো কবিতা লিখেছেন যাতে বাহ্যত মনে হয় যে, তিনি সমাজবাদী ছিলেন। বস্তুত তা নয়। সাম্যবাদের এত স্তুতি সত্বেও ঐ সরকার পদ্ধতির কতকগুলো মৌলিক বিষয়ের সাথে তিনি একমত হতে পারেনি । তার মতে সাম্যবাদের নীতি হলো নাস্তিক্যজনিত। এখানে আল্লাহর স্বীকৃতি নেই; তার প্রতি আনুগত্য নেই; উদর পুর্তি হলো এর প্রধান উদ্দশ্য ; এতে আধ্যাত্মিকতার লেশ নেই; পরকালের প্রতি বিশ্বাস নেই; অল্পো কথায়, এই মতবাদ হলো নিছক জড়বাদধর্মী । পরিণামের দিক

Dhaka University Institutional Repository

থেকে সমাজতন্ত্র ও রাজতন্ত্রের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই; রাজতন্ত্রবাদীরা হলো অর্থের পূঁজারী; সমাজবাদীরা হলো উদর পুঁজারী।

ইকবাল কার্ল মাকর্স এর স্বরূপ বর্ণনা করে বলেন:

صاحب سرمایہ از نسل خلیل
یعنی آں پیغمبرِ بے جبریل
زانکہ حق در باطل او مضمر است
قلب او مومن ودماغش کافر است
غربیاں گم کردہ اند افلاک را
در شکم جویند جان پاک را
رنگ وبو از تن نگیرد جان پاک
جز بطن کارے ندارد اشتراک
دین آن پیغبر حق ناشناس
برمساوات شکم دارد اساس
تا اخوت را مقام اندر دل است
بیخ او در دل نہ در آب و گل است
ہم ملوکیت بدن را فربہی است
سینۂ بے نور او از دل تہی است

‘’পুঁজি নামক গ্রন্থের রচয়িতা হলেন ইব্রাহীম খলীলের বংশধর
কিন্তু ইনি হলেন জিব্রাঈলবিহীন পয়গাম্বর ;
এর অসত্যোর মধ্যে ও সত্য নিহিত আছে;
এর কারণে গরীবেরা হারিয়েছে রুহ;
জীবন তালাশ করে তারা উপরে
রংরূপ লাভ করে না অন্তে দেহ থেকে;
উদর ছাড়া কোন নেই সাম্যবাদের;
ঐ সত্য না জানা পয়গাম্বরের ধর্মের
ভিত্তি হলো উদরের সাম্য
ভ্রাতৃত্বের স্থান হলো-মনে,
এর শিক্র থাকে অন্তরে, দানাপানিতে নয়।
রাজা বাদশাদের ও একই উদ্দেশ্য দেহ পালন।
ইকবাল আরো বলেন
রাজতন্ত্রের উদ্দেশ্যহলো-দেহ তরতাজা করা,
বাদশার আলোকবিহীন বক্ষ হলো অন্তর শূন্য। (নদবী-১০০, পৃ. ৩১৩)

Dhaka University Institutional Repository

ইসলাম ও গণতন্ত্র:

ইসলামি নীতিতে গণতন্ত্রের ধরণ হল ব্যক্তি নিজেকে জনগণের কাছে পেশ করবে না বরং জনগণই ব্যক্তিকে মনোনিত করবে| আর মনোনিত ব্যক্তি তার উপর অর্পিত দায়িত্বের ব্যাপারে আমানতদারের ভূমিকা পালন করে থাকেন। এটাই হল ইসলামি গণতন্ত্র।

ইসলামের রাজনৈতিক নীতিমালার সাথে গণতন্ত্রের উপরিউক্ত নীতিমালাসমূহের সাথে কোন বিরোধ নেই। জনগণের ওপর কর্তৃত্ব করার জন্য শাসক হিসেবে চেপে বসার কোন অনুমতি ইসলামে নেই। হযরত মুহাম্মাদ (স.) এর পরে যে চার জন রাষ্ট্রনায়ক খুলাফায়ে রাশেদীন হিসেবে বিখ্যাত তাঁরা নিজেরা চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেননি। জনগণের মতামতের ভিত্তিতে এবং তাদের ইচ্ছা ও আগ্রহেই তাঁরা দায়িত্ব গ্রহণ করেছেন। তাঁদের নির্বাচনের পদ্ধতি একই রকম ছিল না; কিন্তু তারা প্রকৃতপক্ষে নির্বাচিতই ছিলেন, তাঁরা কেউই এ পদের প্রার্থী ছিলেন না। আল্লাহর রাসুলের (স.) এর ঘোষণা অনুযায়ী পদের জন্য লালায়িত বা আকাঙ্ক্ষী ব্যক্তিদের পদের অযোগ্য মনে করতে হবে। এ- কারণেই হযরত আলী (রা.) এর পর হযরত মুয়াবিয়া (রা:) সাহাবির মর্যাদায় অধিষ্ঠিত থাকা সত্বে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য নন কারণ, তিনি চেষ্টা করে শাসন ক্ষমতা দখল করেছেন। অথচ হযরত ওমর বিন আব্দুল আজিজ (রা) সাহাবী না হওয়া সত্বে ও খুলাফায়ে রাশেদীনের মধ্যে গণ্য বলে বিবেচিত। এর কারণ হলো, রাজবংশের রীতি অনুযায়ী তাঁর পূর্ববর্তী শাসক তাকে মনোনীত করার পর ঐ পদ্ধতিতে ক্ষমতাসীন হওয়া ইসলাম সম্মত নয় বলে তিনি পদত্যাগ করেন এবং জনগণ তারই উপর আস্থা স্থাপন করায় তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করতে বাধ্য হন। শাসন ক্ষমতার জন্য আকাঙ্ক্ষিত হওয়া ইসলামে নিষিদ্ধ| কিন্তু যদি কার ও প্রতি দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় তাহলে তিনি তা পালন করতে বাধ্য। দায়িত্ব উপেক্ষা করে তিনি পালিয়ে যেতে পারেন না। ইসলামের এই নীতি আধুনিক গণতন্ত্র অপেক্ষা নিঃসন্দেহে অনেক বেশি উন্নত ধরনের | (ফিরোজা -৩১ ,পৃ .১১০)

দীনই ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল ভিত্তি | মানব কল্যাণের উদ্দেশ্যে দীন ইসলামকে গ্রহণের আহ্বান জানায় ইসলামি রাষ্ট্র বিশ্ববাসীকে| তবে ইসলাম অন্য ধর্মে হস্তক্ষেপ করতে নিষেধ করে।

ইসলামি রাষ্ট্র খিলাফত ও শূরা ভিত্তিতে পরিচালিত হয়। জনসাধারণের অধিকার ও ক্ষমতা আল্লাহরই বিশেষ অনুগ্রহ বা দান। সকল বিধি বিধানের মূল উৎস হলো কুরআন ও সুন্নাহ। এখানে ঐ জনমতই গ্রহণযোগ্য হবে, যা কুরআন সুন্নাহর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ| এতদুভয়ের পরিপন্থী কোন মত ইসলামি রাষ্ট্রে গ্রহণযোগ্য নয়।

ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় কুরআন, সুন্ন আহ ও ফিক্‌হ গ্রন্থে যে সব জিনিস বৈধ এবং যে সব জিনিস অবৈধ ঘোষিত হয়েছে তাই বৈধ -ই বৈধ বা অবৈধ হিসাবে গণ্য। কারো পক্ষে এর ব্যতিক্রম করার ইখতিয়ার নেই।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি রাষ্ট্রে ইমাম বা খলিফা (রাষ্ট্রপ্রধান) শূরার ভিত্তিতে কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে পরিচালিত করে থাকেন।

ইসলামি রাষ্ট্রের যিনি প্রধান হবেন, তিনি হবেন সবচেয়ে বড় আইনবেত্তা ও শ্রদ্ধাবান আলিম। আল্লাহর হুকুমের আনুগত থেকে গণরায়কে সাথে নিয়ে তিনি আজীবন এ পদে অধিষ্ঠিত থাকতে পারবেন।

(আ. রহীম-৯৭, পৃ. ৫৪৫)

রূশোর মতে প্রকৃত গণতন্ত্রের ভিত্তি হচ্ছে সততা ও পূর্ণ। ইকবাল এই ব্যাপারে রুশোর মতবাদ সমর্থন করেন। কেননা এটিই হচ্ছে খোদায়ী ব্যবস্থার বাস্তব দাবি। ইকবাল বিশ্বের মানুষকে ইউরোপের গণতন্ত্রের রাজনীতির ফাঁকি, প্রতারণা হতে দূরে থাকতে প্রকাশ্যে বিরোধিতা করতে আহ্বান জানিয়েছেন এবং প্রেম ভালবাসা, জনসেবা, সুদৃঢ় ঈমান ও পরিপূর্ণ বিশ্বাস দ্বারা বিশ্বজয় করার শিক্ষা দিয়েছেন।

ولایت پادشاہی وعلم اشیا کی جہانگیری   یہ سب کیا ہیں فقط اک نقطہ ایمان کی تفسیری

یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم   جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمشیریں

বাদশাহীর ঐশ্বর্য আর বস্তুবিজ্ঞানের ব্যাপ্তি-

সব কিছুই হচ্ছে ঈমানের বাস্তব অভিব্যক্তি।

সুদৃঢ় প্রত্যয়, অবিরাম কর্মচঞ্চলতা

আর বিশ্ববিজয়ী প্রেম

এই হচ্ছে শানিত কৃপাণ

জীবনের সংগ্রামক্ষেত্র। (আ. রহীম- ২০, পৃ. ৫৭)

ইসলামি বিধি অনুসারে সরকারের ভুলত্রুটি ধরিয়ে দেয়া জনগণের পবিত্র দায়িত্ব। নামাজে পর্যন্ত ইমাম ভুল করলে মুক্তাদির ওপর লুকমা (ভুল ধরিয়ে দেয়া) দেয়া ওয়াজিব। ইসলামের দৃষ্টিতে শাসক হবে রাসুলের প্রতিনিধি। নামাজের ইমাম যেমন রাসুলের প্রতিনিধি দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে ভুল করলে তাকে সংশোধনের দায়িত্ব মুক্তাদিদের পালন করতে হয়, তেমনি রাসুল (স) যে নিয়মে শাসন করতেন এর ব্যতিক্রম দেখলে সংশোধনের চেষ্টা করা জনগনের কর্তব্য। এ- সকল দিক বিবেচনা করলে গণতন্ত্রের বিশ্বজনীন নীতি ও ইসলামের সাথে সাদৃশ্যপূর্ণই। ইসলামের নীতি গণতন্ত্রের চাইতে ও অনেক উন্নত ও ত্রুটিমুক্ত।

Dhaka University Institutional Repository

পাশ্চাত্য গণতন্ত্রের ধারণা:

প্রচলিত গণতন্ত্র পাশ্চাত্য থেকেই আমদানি হয়েছে। এরূপ গণতন্ত্রে জনগণের সার্বভৌমত্ব স্বীকৃত। সার্বভৌমত্বের অর্থ হলো রাষ্ট্রীয় আইন রচনা ও প্রয়োগের সর্বোচ্চ শক্তি। আইনের সর্বজনীন সংজ্ঞা হলো (থধরিং রিষষঃযব ড়ভঃযব ংড়াব৫বরমহ) সার্বভৌম সত্তার ইচ্ছাই আইন। আধুনিক গণতন্ত্রের সংজ্ঞায় জনগণই সার্বভৌম সত্তা। তাই জনগণ ও জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত আইনসভা যে কোনো বিষয়ে চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয়ার অধিকারী। অবশ্য পার্লামেন্ট বা আইনসভা জনগণের প্রতিনিধিদের দ্বারা রচিত শাসনতন্ত্র মেনে চলতে বাধ্য। তবে আইনসভার দুই-তৃতীয়াংশ বা তিন-চতুর্থাংশ সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটে শাসনতন্ত্র পরিবর্তন বা সংশোধন করা যায়। নির্বাচিত পার্লামেন্টই বাস্তবে জনগণের সার্বভৌম শক্তি প্রয়োগ করে থাকে। শাসনতন্ত্র ব্যতীত আর কিছুই পার্লামেন্টের ক্ষমতা খর্ব করতে পারে না।

পাশ্চাত্য বলতে আমেরিকা ও ইউরোপকেই বুঝায়। সেখানে ধর্মের অস্তিত্ব থাকলেও তারা জড়বাদে (বস্তুবাদে) বিশ্বাসী;তাদের সভ্যতার ভিত্তিই হলো জড়বাদ। এ মতবাদের সার কথা হলো বস্তুর উর্ধ্বে অতীন্দ্রিয় কোনো সত্তার বিশ্বাস করা জরূরী নয়। মানুষ তার জ্ঞান বুদ্ধি বিবেক ও অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সকল বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সক্ষম। Divine guidance বা ঐশ্বরিক নির্দেশনার কোনো প্রয়োজন পাশ্চাত্যের শাসনব্যবস্থায় প্রযোজন নেই। ধর্মীয় ব্যাপার এ সকলেই নিজস্ব বিশ্বাসস্বাধীনতা ভোগ করে। কিন্তু রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে ধর্মকে টেনে আনা ও অযোক্তিক ও অপ্রয়োজনীয়

যদিও মানুষ নৈতিক জীব এবং ভালো মন্দ সম্পর্কে সর্বজনীন ধারণা ও চেতনা সবাই স্বীকার করে, থথাপি অধিকাংশ মানুষ একমত হয়ে এ সবের বিরূদ্ধে ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার অধিকারী বলে তারা মনে করে।

এ নীতির ভিত্তিতেই পাশ্চাত্যের সব দেশেই আইনের পারস্পরিক সম্মতির ভিত্তিতে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হোয়া ছাড়াও নারী পুরূষ যে কোনো সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। ইসলামে এসব বিষয় হারাম বলে বিবেচিত। রাষ্ট্রীয় আইনের সুবাদে পাশ্চাত্যে নারী পুরূষ সকল প্রকার শারীরিক ও মানসিক স্বাধীনতা ভোগ করতে পারে;কিন্তু এরুপ স্বাধীনতা ভোগের ফলে সমাজে পাশবিক অনাচার, পরিবার ভাঙ্গা, অবৈধ সন্তান জন্মসহ নানা অরাজকতার সৃষ্টি হয়। ইসলাম এরুপ স্বাধীনতা কখনই সমর্থন করে না। ইসলাম ধর্মে বা ইসলামি রাষ্ট্রে এরুপ গণতন্ত্র স্বীকার্য নয়।

পাশ্চাত্য সমাজে গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার নামে ব্যভিচার প্রচলিত রয়েছে, তাতে এ কথাই প্রমাণিত হয় Divine guidance-কে অস্বীকার করে কেবলমাত্র জ্ঞান-বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হলে মানুষ পশুর চেয়েও অধম হতে পারে।

ইউরোপের গণতান্ত্রিক শাসন প্রণালী সম্পর্কে ইকবাল কখনো অনুকুল মত পোষণ করেন নাই। তাঁর মতে এই গণতন্ত্র ও স্বৈরাচার, সাম্রাজ্যবাদ ও সাধারণ পরাধীনতা প্রতিষ্ঠার একটি অভিনব উপায়মাত্র। এর বাস্তব দৃষ্টান্ত ফরাসী গণতন্ত্র ও বৃটিশ গণতন্ত্র পেশ করা যেতে পারে । বস্তুত পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিতিক শাসন ব্যবস্থা মানুষকে শুধু গোলামই বানিয়েছে, গোলামী হতে মুক্তি দিতে সমর্থ হয়নি। সর্বোপরি মানবতার যেসব গুরূত্বপুর্ণ সিদ্ধান্ত জীবনের গতিপথে দিক নির্ণয় করে একে সংখ্যাধিক্যের ভোটের অধীন করে দেয়া নিঃসন্দেহে মানবতার

Dhaka University Institutional Repository

চরম অবমাননা। গণতন্ত্রের সবচেয়ে বড় ত্রুটি এই যে এটি মানুষকে গণনা করতে জানে বটে, কিন্তু তার বুদ্ধিবৃত্তি ও মস্তিস্কের ওজন করতে এটি মোটেই প্রস্তুত নয় | অথচ এই ওজন করা ছাড়া সম্মিলিত সমাজ ব্যবস্থায় সুবিচার ও সুশৃঙখলা স্থাপিত করা সম্পূর্ণরূপে অসম্ভব | *যরবে কলীম* 'গ্রন্থে এ সম্পর্কে ইকবাল স্পষ্ট ভাষায় বলেছেন:

جمہوریت اک طرز حکومت ہے کہ جسمیں

بندوں کو گنا کرتے ہیں تولا نہیں کرتے

গণতন্ত্র এমন এক শাসনপ্রণালী

যেখানে মানুষকে গণনাই করা হয়,

পরিমাপ করা হয় না

তাদের মস্তিস্কের | (ইকবাল- ১৩, পৃ. ১৫০)

অর্থাৎ গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতিতে নির্বাচন প্রার্থীদের মূল্যায়ন করা হয় না, বরং ভোটাদিক্যের উপর ভিত্তি করে প্রতিনিধি নির্বাচিত করা হয়, কিন্তু এটা দেখা হয়না যে, যে ব্যক্তি অধিকতর ভোট লাভ করেছে, সে যোগ্য প্রার্থী কিনা|

নীতি হিসেবে ইকবাল মূল রাষ্ট্রযন্ত্রের মধ্যে জনসাধারণকে প্রবেশাধিকার দানের আদৌ পক্ষপাতী নহেন। কারণ তার মতে প্রত্যেকটি সাধারণ ব্যক্তিকেই আল্লাহ তায়ালা সুক্ষ ও জটিল রাষ্ট্রনীতি বুজিবার মতো বুদ্ধি ও প্রতিভা দান করেননি| তিনি খিলাফতে ইসলামীয়া সম্পর্কে যে পুস্তিকা রচনা করেছেন তাতে তিনি নির্বাচন প্রথাকে এক প্রকার সমর্থনই করেছেন। কিন্তু মনে হয়, পরবর্তীকালে তাঁর এই মতে ধীরে ধীরে কিছুটা পরিবর্তন স উচিত হয়েছিল। তিনি আসলে সমগ্র পৃথিবীতে শান্তি ও শৃংখলা স্থাপনের জন্যে একজন পূর্ণ ও তীক্ষ্ণ অনুভূতিশীল এবং আত্মকেন্দ্রিক ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের (self centred personally) আবশ্যকতা মর্মে মর্মে অনুভব করতেন। নিটশেরমতো তিনিও এক জীবন্ত ও শক্তিসম্পন্ন ব্যক্তিত্বের জন্ম সম্ভাবনায় বিশ্বাসী, কিন্তু উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, নিটশের নেতা বস্তুভিত্তিক শক্তি ও বর্বরতার প্রতীক, আর ইকবালের ইমাম বস্তুভিত্তিক ও আধ্যাত্মিক উভয় প্রকার শক্তিরই পূর্ণ সমন্বয়। পায়ামে মাশরিক গ্রন্থে কবি বলেন:

পায়ামে মাশরিক' কাব্যগ্রন্থে ''জমহুরিয়াত'' (গণতন্ত্র) শীর্ষক কবিতায় ইকবাল গণতান্ত্রিক সরকার পদ্ধতির সমালোচনা করে বলেন:

متاع معنی بیگانه از دور فطرتان جوئی

زموران شوخی طبع سلیمانی نمی آید

گریز از طرز جمهوری غلام پخته کارے شو

که از مغز دو صد خر فکر انسانے نمی آید

নীচ প্রকৃতির মানুষের কাছে তুমি অন্যের অধিকার প্রতিষ্ঠার আশা করছ?

পিঁপড়ার নিকট সুলায়মানের (আ) স্বভাব আশা করতে পার না।

গণতান্ত্রিক পদ্ধতি থেকে দূরে থাক, অভিজ্ঞ মানুষের অনুগত হও,

কারণ দু'শটি গাধার মস্তিস্ক থেকে একজন মানুষের চিন্তা নিঃসৃত হয় না।

(ইকবাল-১০১, পৃ. ১৫৮)

Dhaka University Institutional Repository

ইউরোপীয় গণতান্ত্রিক পদ্ধতির দোষত্রুটি দেখেই তিনি এরূপ মন্তব্য করেছিলেন। ইকবাল বলেন:

ہے وہی ساز کہن مغرب کا جمہوری نظام

جس کے پردوں میں نہیں غیر از نوائے قیصری

পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বাজে সেই পুরনো সুর,

এর আড়ালে রাজতান্ত্রিক সুর ছাড়া আর কিছুই নেই। (ইকবাল-১১, পৃ. ২৯৬)

বস্তুত যেসব পরাধীন জাতির উপর গণতন্ত্রের অনুগ্রহ(?) বর্ষিত হয়েছে, সেসব দেশের মানুষ পিঁজরাবদ্ধ কুসুমের ন্যায় শুষ্ক ও শীর্ণ হয়ে ঝরে পড়ার অবস্থায় উপনীত হয়েছে।

আরমগানের হিজাজ গ্রন্থে ইবলীসের পরামর্শসভা শীর্ষক যে কবিতা লিখিত হয়েছে, তাতে কবি পাশ্চাত্য দেশের গণতান্ত্রিক শাসন পদ্ধতিকে সাম্রাজ্যবাদ ও শোষণ পীড়নের একটা প্রধান হাতিয়ার বলে ঘোষণা করেছেন। এই শাসনপদ্ধতির বাহ্যিক আকৃতি যদিও উজ্জ্বল ও মনোমুগ্ধকর, তথাপি এর অভ্যন্তর চেংগীজের অপেক্ষাও ভীষণ কুৎসিত ও বীভৎস। ইকবাল তাঁর শেষ জীবনের রচনাবলীতে গণতন্ত্রের দোষত্রুটি সম্পর্কে পূর্বাপেক্ষা তীব্রতর সমালোচনার অবতারণা করেছেন। কেননা তাঁর মতে সেই পুরাতন সাম্রাজ্যবাদ, বেনিয়া মনোবৃত্তি এবং স্বৈরাচার এর মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বর্তমান রয়েছে।

কাইজার উইলিয়াম এবং লেনিনের কথোপকথন এ এই সূক্ষ্ম তত্ত্ব উদঘাটিত হয়েছে যে, সমস্ত মানব - প্রকৃতি শুধু পরাক্রমশালী ও শক্তিমান অত্যাচারী ব্যক্তিত্বের সন্মুখেই মস্তক অবনমিত করতে বাধ্য হয়। স্বেচ্ছাচারী রাষ্ট্রসমূহে যে ত্রুটি-বিচুযতি রয়েছে, গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায়ো ঠিক তাই বিদ্যমান। এদের মূল পার্থক্য কিছুই নাই।

ইকবাল ছিলেন ইসলামি চিন্তাবিদ। তাঁর সাহিত্য হলো ইসলামি চিন্তাধারার নির্যাস। আর ইসলাম তো গণতন্ত্রের ভিত্তিতে সরকার পরিচালনার নির্দেশ দেয়। তাই আমরা কি করে ভাবতে পারি যে, তিনি সত্যিকার অর্থে গণতন্ত্র বিরোধী ছিলেন? ইকবাল যে ইসলামি গণতন্ত্র চেয়েছিলেন, তা ছিল মূলত সমাজবাদী গণতন্ত্র, যাকে ইসলামি সমাজবাদ বলা যেতে পারে। ইসলামি গণতন্ত্র সন্মন্ধে ইকবাল ''Islam as a moral and political ideal'' শীর্ষক প্রবন্ধে বলেন:

The best form of Government for such a community would be democracy, the ideal of which is to let man develop all the possibilities of his nature by allowing him as much freedom as practicable. Democracy,then is the most important aspect of Islam regarded as a political ideal.

(A Hasan-102 p-82)

আশ্চার্যের বিষয় হলো, পাশ্চাত্য সভ্যতা স্রষ্টাকে অস্বীকার করে না। কিন্তু সামষ্টিক জীবনে তারা স্রষ্টার নির্দেশ মেনে চলার প্রয়োজন মনে করে না। তারা তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষতায় বিশ্বাসী। আবার তারা ধর্মও বিশ্বাস করে। কিন্তু ধর্মকে তারা রাজনৈতিক জীবনে সম্পৃক্ত না করে ব্যক্তিগত জীবনে সম্পৃক্ত সীমাবদ্ধ রাখা প্রয়োজন মনে করে।

ইসলামিক রাষ্ট্র ও পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের মধ্যে ব্যাপক ও মৌলিক পার্থক্য রয়েছে:

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি জীবন দর্শন অনুসারে আল্লাহতায়ালা বিশ্বভুবনের মালিক, তিনি সব কিছুর স্রষ্টা ও প্রতিপালক। স্বর্গ-মতে যা কিছু আছে-সবারই মালিক আল্লাহ। বিশ্ব এবং তাঁর সমুদয় প্রশংসা তাঁর প্রাপ্য-সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই প্রাপ্য যিনি বিশ্বজগতের প্রভু ও প্রতিপালক।

কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে রাষ্ট্রের প্রকৃত সার্বভৌমত্ব খোদার। খোদাই রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তি, জনসাধারণ বা ব্যক্তিসাধারণ এই শক্তির অধিকারী নয়। জনসাধারণ রাষ্ট্রের নাগরিক মাত্র,মালিক নয় । বিশ্বের অন্যান্য বস্তুর মতো রাষ্ট্রের মালিকানা ও খোদার। খোদার বিধান অনুসারেই ইসলামি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। নবী রাসুলদের মাধ্যমে প্রেরিত আদেশ - নিষেধই ইসলামি রাষ্ট্রের বুনিয়াদ;। অন্যান্য নবীর মতো হজরত মুহাম্মাদ (সা.) আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধি ছিলেন। আল্লাহর প্রেরিত নির্দেশাবলীর আলোকেই তিনি ইসলামি রাষ্ট্রের নমুনা দিয়ে গেছেন। কোনো আইনসভা, কোনো শাসন কর্তৃপক্ষ বা কোনো বিচারসভা এই নমুনার পরিপন্থী কোনো নির্দেশ দিতে পারে না।

ইসলাম রাষ্ট্রীয় জীবনব্যবস্থাকে প্রকৃত গণতন্ত্র বলা হয়। কোরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক সমগ্র মুসলমান সমাজই এই রাষ্ট্র পরিচালনায় সক্রিয় ভূমিকা পালন করে। রাষ্ট্র শব্দটির সর্বপ্রথম ব্যবহার হয়েছে পবিত্র কুরআন শরীফে। কোরআনের ২৯ পারার শুরুতেই রয়েছে আল-মুলক বা রাষ্ট্র নামক সুরাটি। পবিত্র কুরআনে উল্লেখ রয়েছে যে,আল্লাহর নবী হজরত দাইদ (আ.) ও হজরত সোলায়মান (আ.) রাষ্ট্রক্ষমতা লাভের মাধ্যমে আল্লাহর দ্বীনকে বিজয়ী শক্তি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হয়েছিলেন। হজরত ইউসুফ (আ) মহানবী হযরত মোহাম্মদ (স) রাষ্ট্র ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। কুরআন উল্লেখের পূর্বে গ্রিকগণ রাষ্ট্র শব্দটিকে যে অর্থে ব্যবহার করেছেন তাকে বর্তমানের জাতীয় রাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত না করে নগররাষ্ট্র হিসেবে আখ্যায়িত করাই যুক্তিযুক্ত। সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনের মতো ইসলামের রাজনৈতিক জীবন ও সুদৃঢ়-আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তিভূমির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খোদায়ী নির্দেশাবলী দ্বারা পরিচালিত।

ইসলামের রাজনৈতিক পদ্ধতি, তার কাঠামো,কার্যকারিতা ও উদ্দেশ্যের দিক থেকে সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমী। বলা যায় তুলনাহীন। এটা কোনো যাজকতন্ত্র নয়, যেখানে একটি বিশেষ শ্রেণির মানুষ উত্তারিকার সুত্রে কিংবা অন্য কোনো উপায়ে সমস্ত খোদায়ী অধিকারের মালিক হয়ে বসে এবং নিজেদের অন্যান্য নাগরিকের উর্ধ্বে ধরাছোঁয়ার বাইরে বলে মনে করে। ইসলামি রাষ্ট্র কোনো শোমিকতন্ত্র দ্বারা শাসিত হয় না-এখানে গুটিকতক প্রতিহিংসা পরায়ণ হয়।

প্রথমত: ইসরামি গণতন্ত্রে রাষ্ট্র সার্বভৌম ক্ষমতা আল্লাহর। জনগণ আল্লাহর খলিফা বা প্রতিনিধিমাত্র। আল্লাহর নির্দেশ অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব জনসাধারণের। কিন্তু পাশ্চাত্য গণতন্ত্রে রাষ্টের প্রকৃত মালিক জনগণ। তারাই রাষ্ট্র পরিচালনার বিধি নির্দেশ প্রণয়ন করে রাষ্ট্র পরিচালনা করে।

দ্বিতীয়ত: গণতন্ত্র, ধর্মতন্ত্র বা খোদাতন্ত্র (ঞযবড়বৎধপু) নয়। কেননা ইসলামি জীবন ব্যবস্থার কোনো ক্ষেত্রেই বিশেষ শ্রেণীর কোনো স্থান নেই: কিন্তু থিওক্র্যাসিতে পুরোহিত বা ধর্মযাজকরাই খোদার নামে নিজেরা আইন প্রণয়ন করে এবং সেই আইনের বলে রাষ্ট্রীয় শাসনকার্য পরিচালনা করে। ইসলামি রাষ্ট্রে সমগ্র মুসলিম সমাজই রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করে। পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র হলো জনগণের জন্য পরিচালিত সুশাসন। পক্ষান্তরে ইসলামি গণতন্ত্র হলো জনগণ পরিচালিত আল্লাহর শাসন,যারা যোগ্যতার ও সততার ভিত্তিতে নির্বাচিত বা মনোনীত হন এবং সমগ্র মানবমন্ডীর কল্যাণের জন্য কাজ করেন- ইসলামি রাষ্ট্রে তারাই সাকের মর্যাদায় আসীন। ইসলামি গণতন্ত্রে মুসলিম জনসাধারণই শাসনকর্তা নিয়োগ করেন এবং যোগ্যতা ও সততার আলোকে তাঁকে কাজে বহাল রাখতে বা কাজ থেকে রবখাসস্ত করতে পারেন। এখানে সকল মুসলমানই আল্লাহর প্রতিনিধি। বংশ ও পদমর্যদার কোনো উপরি পাওনা নেই। ইসলামের দৃষ্টিতে সৎকর্মশীল ব্যক্তিই মুসলমানদের মধ্যে উচ্চ পদমর্যদার দাবিদার। শাসন কর্তৃপক্ষ তাঁদের কাজের জন্য আল্লাহ ও জনগণের নিকট জবাবদিহি করতে বাধ্য।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি ও রাষ্ট্রে পরিণত বয়স্ক সুস্থ মস্তিস্কসম্পন্ন পুরুষ ও নারী শাসন ব্যাপারে তাঁদের মতামত প্রকাশ করার অধিকার রাখে। সংখ্যার নীতি নয়, যোগ্যতা ও সততার নীতি ইসলামি গণতন্ত্রের ভিত্তি। ইসলামি রাষ্ট্র ব্যবস্থায় দলের সদস্য হলো আল্লাহ হতে পূর্ণ ঈমান স্থাপনকারী মুমিন বান্দাগণ। সুতরাং দেখা যায় যে, আল্লাহর সার্বভৌমত্ব ও জনগণের প্রতিনিধিত্বই ইসলামি গণতন্ত্রের বা রাষ্ট্র ব্যবস্থার মূল।

বিশ্বের সকল মানুষের জন্যই ইসলাম কতকগুলো মৌলিক অধিকার প্রদান করে। এই মৌলিক অধিকার সমূহ সকল অবস্থায়ই শ্রদ্ধা লাভের বস্তু। মানুষের রক্ত পবিত্র। যথার্থ কারণ ছাড়া রক্তপাত মহাপাপ;নারী, শিশু, বৃদ্ধ, রুগ্ন ও আহতদের প্রতি জুলুম ইসলামে কঠোরভাবে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। সর্ব অবস্থায় নারী জাতির সম্মান সংরক্ষণ করা আবশ্যক । দুস্থ জনগণের খাদ্য বস্ত্র ও সর্বপ্রকার সাহায্য প্রদান করা আবশ্যই করণীয়। ইসলামি রাষ্ট্রে জাতি ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ এ সকল মৌলিক অধিকার লাভ করে থাকে।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় দুই শ্রেণীর নাগরিক আছে। মুসলমান ও জিম্মি (অমুসলমান)। মুসলমান নাগরিক এক আল্লাহর বিধানকে ইসলামি রাষ্ট্রের ভিত্তি বলে বিশ্বাস করে। তারা আল্লাহর খলিফা এবং আল্লাহর বিধান অনুসারে রাষ্ট্র পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় প্রত্যেক নাগরিকের কতকগুলো মৌলিক অধিকার ও কতকগুলো দায়িত্ব রয়েছে। প্রত্যেক নাগরিকের জীবন, ধর্ম, মান, ব্যক্তিগত স্বাধিনতা সংরক্ষণের,ব্যক্তিগত মতামত ও বিশ্বাস ব্যক্ত করার মৌলিক প্রয়োজন মিটানোর ও রাষ্ট্র পরিচালনার অধিকার রয়েছে। এ সকল মৌলিক অধিকারের পাশাপাশি নাগরিকদের প্রতি কতকগুলো দায়িত্ব আরোপিত হয়েছে। যেমন, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য, রাষ্ট্রের উন্নতির জন্য ত্যাগ ও শ্রম স্বীকার। শাসন কর্তৃপক্ষের সাথে আন্তরিক সহযোগিতা, প্রয়োজনে রাষ্ট্রের নিরাপত্তা জন্য হানমাল কোরবান করা।

ইসলামি রাষ্ট্রের জীবন ব্যবস্থায় মুসলমান নাগরিকদের মতো অমুসলমান নাগরিক বা জিম্মিরা ও জীবন, ধন, সন্মান, বিশ্বাস, ও সংস্কৃতির অধিকার লাভ করে থাকে।

অমুসলমানদের ধর্মীয় নিয়মকানুন পালনের অধিকার ও ধর্মপ্রচারের অধিকার স্বীকৃত হয়েছে। তাদের ইসলামি রাষ্ট্রের নীতি নির্ধারণের অধিকার নেই। কতকগুলো গুরত্বপুর্ণ পদ ছাড়া তারা রাষ্ট্রের যে কোন পদে নিযুক্ত হতে পারবেন। অর্থনৈতিক দিক থেকে মুসলমান অমুসলমান নাগরিকের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। অমুসলমান রাষ্ট্রে সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমান নাগরিকদের জন্য নর নারীর পক্ষে অপরিহার্য। তবে ব্যক্তিগত জীবনে তারা ইসলামের অনুশাসন মেনে চলবে।

ইসলামে রাজতন্ত্রে কোনো স্থান নেই। মুসলিম সমাজই রাষ্ট্রের পরিচালক। কুরআন ও সুন্নাহ মোতাবেক রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব মুসলমানদের। রাষ্ট্র পরিচালনার জন্য বিশ্বাসীদের মধ্য থেকে একজন রাষ্ট্রপ্রধান (আমির) নিযুক্ত হয়ে থাকেন। এই পদে অধিষ্ঠিত হবাব জন্য কোনো বিশেষ বংশে জন্মগ্রহণ করার প্রয়োজন নেই।

রাষ্ট্র পরিচালনার যোগ্যতা ও সততা থাকলে যে কোনো মুসলমান রাষ্ট্রের আমির পদে অধষ্ঠিত হতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধান আল্লাহর কাছে ও জনগণের কাছে তার কৃতকার্যের জন্য জবাবদিহি করতে বাধ্য। নিজে দক্ষতা প্রমাণ ও প্রদর্শন করতে পারলে এবং সততা ও বিশ্বস্ততার প্রমাণ সুনিশ্চিত করতে পারলে রাষ্ট্রপ্রধান জনগণের সমর্থন লাভ করে দীর্ঘদিন শাসকের পদ অলংকৃত করতে পারেন। কিন্তু এসব গুণাবলির অভাব দেখা দিলে তাকে রাষ্ট্রপ্রধানের পদ থেকে জনগণ যে কোনো মুহূর্তে বহিস্কার করতে পারে। রাষ্ট্র পরিচালনার ব্যাপারে সাহায্য করার জন্য উপদষ্টোমন্ডলী নিযুক্ত হয়ে থাকেন। কোনো ব্যাপারে রাষ্ট্রপ্রধান বা সরকার প্রধান যদি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চান তবে আমাকে অবশ্যই সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থন লাভ করতে হবে। যে সকল ক্ষেত্রে কুরআন

Dhaka University Institutional Repository

ও হাদিসের প্রত্যক্ষ নির্দেশ পাওয়া যায় না, সে সকল ক্ষেত্রে জনগনের সম্মতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করতে হয়। প্রয়োজন মনে করলে রাষ্ট্রপ্রধান জনগনের সিদ্ধামত্ম নাকচ করে দিতে পারেন ও নিজের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করতে পারেন। রাষ্ট্রপ্রধানকে তার যে কোনো অপরাধের জন্য কাজীর বিচারে সোপর্দ করা যেতে পারে।

কুরআন ও সুন্নাহর নির্দেশই ইসলামি রাষ্ট্রের কানুন। যে সকল ব্যাপারে কুরআন ও সুন্নাহর কোনো প্রত্যক্ষ নির্দেশ পাওয়া যায় না সে সকল ক্ষেত্রে মুসলমানগণ নতুন আইন প্রনয়ন করতে পারে, তবে সে আইন কোনোক্রমেই কুরআন ও সুন্নাহর পরিপন্থী হতে পারবে না। ইসলামের মূলনীতিও জীবন পদ্ধতি সম্পর্কে সুষ্ঠ জ্ঞান সম্পন্ন মুসলমানগণই ইসলামিক আইনের ব্যাখ্যা প্রদান, আইনের সংস্কার সাধন ও প্রয়োজনে নতুন আইন প্রণয়ন করতে পারবেন।

ইসলামি রাষ্ট্রব্যবস্থায় বিচার বিভাগকে সর্বময় প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। যদিও বিচার বিভাগের বিচারকগণ শাসন বিভাগ কর্তৃক নিযুক্ত হয়ে থাকেন, তথাপি শাসনকর্তা তার যে কোনো অপরাধের কারণে বিচার বিভাগের সন্মুখে সাধারণ অপরাধীর মতোই উপস্থিত হবেন। বিচারালয়ে উঁচু-নিচু,ধনী- দরিদ্র অশিক্ষিত সকলেই সমান। এমনকি রাষ্ট্রপ্রধানও গুরুতর অপরাধে অভিযুক্ত হলে সাধারণ অপরাধীর তো আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াতে বাধ্য এবং একজন সাধারণ অপরাধীর মতোই বিচারে তিনি দণ্ডিত হবেন।

পাশ্চাত্যের সঙ্কীর্ণ জাতীয়তাবাদের মূলে কুঠারাঘাত করে ইসলাম কুরআনের ভাষায় প্রচার করেছেন সকল মুসলমান ভাই ভাই।''এই কথাটির মধ্যেই মুসলিম জাতীয়তার মূল বৈশিষ্ট্য প্রস্ফুটিত হয়ে উঠেছে। ভৌগলিক সীমারেখা,বংশ, ভাষা,সংস্কৃতি কোনো কিছুই মুসলিম জাতীয়তার সাথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারে না। আল্লাহ ও রাসুলের ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারী যে কোন মুসলমান, সে পৃথিবীর যেকোনো প্রান্তের অধিবাসীই হোক না কেন, সে মুসলমান সমাজের অন্তর্ভূক্ত। রক্তের সম্পর্ক নয়, ভাষার সম্পর্ক নয়, ভৌগলিক সম্পর্ক ও নয় একআত্র আল্লাহ ও রাসুলের বিশ্বাসের স্বর্ণশৃঙ্খলই সমগ্র বিশ্বের মুসলমাদের এক জাতিতে পরিণত করেছে। তাওহীদের যে অনির্বাণ শিখা বিশ্বাসীদের আঁধার পথের আলোকবর্তিকা-সেই তাওহীদের প্রাণশক্তি সকল দেশের মুসলমানকে বিশ্বভ্রাতৃত্বের সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির ছায়াতলে সমবেত করে।

মুসলিম জাতীয়তার মূলনীতি মুসলিম রাষ্ট্র ব্যবস্থার বৈদেশিক নীতিনির্ধারণ করে থাকে। শান্তির আকাংখা ও ধৈর্যশীলতা মুসলমানদের জাতীয় জীবনের এক উজ্বল দিক। ইসলাম বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে শান্তি স্থাপনের মাধ্যমে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠার তাগিদ দেয়। ইসলামের মহানবী হযরত মুহাম্মদ (স) এবং তাঁর প্রতিনিধি ও বিভিন্ন রাষ্ট্রের সাথে শান্তি চুক্তি স্থাপন করেছিলেন। ইসলাম বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে সম্প্রতিক চুক্তিপত্রের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করতে নির্দেশ দেয়। অন্যপক্ষ যতদিন পর্যন্ত সম্পাদিত চুক্তির শর্তসমুহ মেনে চলে ততদিন মুসলমান এ সম্পর্কে কোনো প্রকার ভিন্ন মানসিকতা প্রদর্শন করবে না। যদি কোনো দল অন্য দলের প্রতি জুলুম করে, তবে নির্যাতিত বা মজলুম দলের পক্ষ সমর্থন করবে। তাদের সাহায্য সহযোগিতার মাধ্যমে জুলুমের অবসান ঘটাতে মুসলমানদের প্রতি নির্দেশ প্রদান করা হয়েছে।

পাশ্চাত্যের গণতন্ত্র ইসলামি গণতন্ত্র থেকে ভিন্নতর কোনো সন্দেহ নেই। পাশ্চাত্যের অনুকরণে প্রাচ্যের গণতন্ত্রকে আদর্শের মর্যাদা দেয়ার প্রবণতা রয়েছে। অথাৎ অধিকাংশ জনগনের মতামত বা সংখ্যাগরিষ্ঠ ব্যক্তির মতামতকেই গণতান্ত্রিক রীতি অনুসারে যথার্থ ও গ্রহণ করা যায়। সংখ্যাগরিষ্ঠের এরূপ মতামত যদি নৈতিকতাবিরোধী হয় তথাপি গণতন্ত্রের স্বার্থে তা বৈধ বলে গ্রহণ করা হয়। গণতন্ত্রের এই নীতি বর্তমান যা প্রাচ্যে ও পাশ্চাত্যে বিদ্যমান রয়েছে, তা মানুষ্যত্ব ও মানবতাবিরোধী। মানুষ নৈতিক জীবন, মানুষের মধ্যে বিশ্বজনীন মূল্যবোধ রয়েছে, সত্য কথা বলা ভালো। মিথ্যা বলা অপরাধ ''এই মহান বাক্য চিরন্তনও বিশ্বজনীন। মানুষ তার স্বার্থ হাসিলের জন্য মিথ্যা কথা বললেও তা ন্যায়সঙ্গত বা যথার্থ বলে মেনে নেয়া যায় না। অধিকাংশ মানুষ কোনো বিষয়ে মিথ্যা কথা বললেই তা বৈধ বলে গণ্য হতে পারে না। যুক্তি, বুদ্ধি ও স্বাস্থ্যবিজ্ঞান মদ্যপানকে মন্দ কাজ বলে স্বীকার করে। আমেরিকার আইন সভায় ১৯১৯ সালের জানুয়ারি মাসে শাসনতন্ত্রের ১৮তম

Dhaka University Institutional Repository

সংশোধনীর মাধ্যমে মদকে অবৈধ ঘোষণা করে আইন পাশ করা হয়। কিন্তু ১৯৩৩ সালের ডিসেম্বর মাসে শাসনতন্ত্রের ২১তম সংশোধনীর মাধ্যমে পূর্ববর্তী আইন বাতিল করে মদকে বৈধ বলে ঘোষণা করা হয়।

মদ যদি ভালো হয়ে থাকে তবে তা সকল সময়ের জন্যই ভালো। মন্দ হলে সকল সময়ের জন্যই মন্দ। যেমন মন্দই সত্য কথা বলা বা অন্য যে কোনো মন্দ বা গর্হিত কাজ। কিন্তু গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে এ সকল অন্যায় বা অনৈতিক বা মন্দ কাজকে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতের ভিত্তিতে বৈধ, উত্তম ও ন্যায়সঙ্গত হিসেবে প্রতিষ্টা করা অযৌক্তিক ও অনৈতিক।

ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, সত্য ও মিথ্যার সিদ্ধান্ত ভোটের মাধ্যমে নির্ধারিত হতে পারে না। এসব শাশ্বত মূল্যবোধের ব্যাপার। ইসলামিক নীতি অনুসারে যাদের কোনো স্থায়ী মূল্যবোধ নেই তারা গণতন্ত্রকে জীবনের আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করতে পারে। যারা শাশ্বত মূল্যবোধে বিশ্বাসী তাঁদের নিকট গণতন্ত্র হলো কেবলমাত্র একটি বিধান বলে ইসলাম গ্রহণ করে না।

আধুনিক গণতন্ত্রীদের মধ্যে এরুপ প্রশ্নের উদয় হতে পারে যে, তাহলে ইসলামে গণতন্ত্র আছে কিনা। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর পৃথিবীতে কমপকক্ষে এক হাজার বছর মুসলিম শাসন চালু ছিল। এই দীর্ঘ শাসনামলে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতার উত্থান-পতন হয়নি। কিন্তু ইসলামের আদালত ও ফৌজদারি আইন চালু থাকায় এবং এর ফলে ন্যায়বিচার প্রতির্ষ্ঠিত হওয়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠ অমুসলমানগণ ও সেই শাসনের বিরুদ্ধে বড় ধরনের বিদ্রোহ করেনি, ইতিহাসে এরূপ কোনো নজির নেই যে, জনগণের বিদ্রোহহের কারণে মুসলিম শাসনামলে ক্ষমতার পরিবর্তন হয়েছে।

হযরত মুয়াবিয়া (রা.) থেকে উমাইয়া বংশের পরবর্তীতে আব্বাসীয় বংশের এবং আরো পরে বংশগত রাজতন্ত্র চালু ছিল। সরকারের সামরিক শক্তিই ক্ষমতার উৎস বলে বিবেচিত হতো। শক্তিশালী সামরিক বাহিনী প্রতির্ষ্ঠিত সরকারকে পরাজিত করে দখল করত। জনগেণর সিদ্ধান্ত গ্রহণের কোনো শক্তি বা অধিকার ছিল না, অথচ তখন ইসলামি আইন প্রচলিত থাকায় ঐ শাসনামলকে ইসলামি মনে করা স্বাভাবিক ছিল।

এ কারণেই প্রশ্ন তোলা যায় যে, ইসলামে গণতন্ত্র আছে কিনা। মধ্যপ্রাচ্যে বংশগত রাজতন্ত্র বা স্বৈরশাসন এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে। মধ্যপ্রাচ্যের অনেক দেশেই ইসলামি বহু আইন জারি থাকা সত্ত্বেও গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে সরকার গঠন ও পরিবর্তন হয় না। কিন্তু প্রকৃত ইসলামি বিধনাবলী গণতন্ত্রের পরিপন্থী নয়। নবী রাসুলগণই ইকামাতে দ্বীনের আন্দোলনের আদর্শ। তারা জনগণকে দ্বীনের দাওয়াত দিয়েছেন। যে কাওম সম্প্রদায় আন্দোলন করে স্বীয় কোনো দেশে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ইসলামি হুকমাত কায়েম করেননি, নবীগণ মানুষের মন জয় করার চেষ্টা করেছেন। মানুষের মনের ওপর শক্তি প্রযোগ করা যায় না বলেই জোর করে জনগণকে হেদায়েত করা সম্ভব নয়। মক্কার জনগণ রাসুল (স) এর দাওয়াত কবুল করতে রনাজি হননি বলে সেখানে দ্বীন প্রথমে বিজয়ী হয়নি। মদিনার জনগণ স্বেচ্ছায় ইসলাম কবুল করায় রাসুল (স) সেখানে ইসলামি সরকার কায়েম করতে সক্ষম হয়েছেন।

জনগণ ইসলামি সমাজব্যবস্থা কবুল করতে রাজি না হলে আল্লাহতায়ালা কোনো অনিন্দুক জনগোষ্ঠীর ওপর দ্বীনের নেয়ামত জোর করে চাপিয়ে দেন না। জসগণের সমর্থন নিয়ে সরকার পরিবর্তন করার পদ্ধতি একই গণতন্ত্র বলে। রাসুল (স) মদিনায় যে ইসলামি বিপ্লব সাধন করেছেন তা গণতান্ত্রিক পন্থায় করেছেন। তিনি জোর জবরদস্তির মাধ্যমে মদিনাবসীদের ওপর ইসলামি শাসন চাপিয়ে দেননি।

প্রকৃত অর্থে গণতন্ত্র হলো যুক্তি, বুদ্ধি যোগ্যতা ও খেদমতের প্রতিযোগিতা। সত্যিকার গণতন্ত্র খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগেই প্রথম চালু হয়। ইতিহাস থেকে প্রমাণিত যে প্রথম চার খলিফা নিজেরা চেষ্টা করে ক্ষমতা দখল করেনি। তারা একই পদ্ধতিতে নির্বচিত হননি, কিন্তু অবশ্যই তারা নির্বাচিত হয়েছেন, এ থেকে বলে কথাই প্রমানিত হয় যে, ইসলাম নির্বাচনের নির্দিষ্ট কোনো পদ্ধতি বাধ্যতামূলক করেননি। বিভিন্ন যুগে বিভিন্ন দেশে

Dhaka University Institutional Repository

নিজেদের উপযোগী নির্বাচন পদ্ধতি গ্রহণ করার স্বাধীনতা রয়েছে। পদ্ধতি যে রকমই হোক একমাত্র নির্বচনের মাধ্যমেই ক্ষমতাসীন হতে হবে এটিই ইসলামের সুস্পষ্ট নির্দেশ। সাহাবাগণের যুগেই এই নীতি প্রতিষ্ঠিত হয়।

উপরিউক্ত আলোচনার পেক্ষাপটে আমরা বলতে পারি যে, মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য সবোর্ত্তম পদ্ধতির সরকার হলো-গণতান্ত্রিক সরকার। কারণ এ পদ্ধতির সরকারই জনগণকে যথাসম্ভব স্বাধীনভাবে তাদের সুপ্ত প্রতিভা বাস্তবায়ন করার সুযোগ এনে দেয়। গণতন্ত্রই ইসলামের সব চাইতে গুরুত্বপূর্ণ দিক। এটাই ইকবালের কামনা ছিল।

সাম্যবাদ:

ইসলাম কেবলমাত্র মানব ধর্ম নয়, মানবাধিকার তথা সাম্য ও শান্তির ধর্ম। প্রতিবেশীকে ক্ষুধার্ত রেখে, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত রেখে এই ধর্ম প্রতিপালন করা চলে না ইসলাম ধর্মে ভোগ ও আনন্দ উপেক্ষিত নয়। কিন্তু ধনী সম্পদশালী হবে এক শ্রেণিকে বঞ্চিত রেখে এমন ধর্ম পালন করা চলে না। ইসলামের মূল্যমান ব্যবস্থায় সাম্যনীতি কিংবা আরো সুন্দর ও সুস্পষ্টভাবে বলা যায়,ন্যায়পরায়ণতা হচ্ছে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। ইসলামের শিক্ষা হলো ,আল্লাহর দৃষ্টিতে সকল মানুষ সমান, কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে সবাই অভিন্ন নয়। যোগ্যতা, সম্ভাবনা, উচ্চাকাঙ্খা, ধন-সম্পদ ইত্যাদি ক্ষেত্রে তাদের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। কিন্তু এর পার্থক্যের ওপরই কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী অন্যের ওপর নিজের শ্রেষ্ঠত্বের আসন স্থাপন করতে পারে না।

আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্রের ক্ষেত্র তার বংশ, গোত্র, তার দৈহিক বর্ণ, তার সম্পদের পরিমাণ এবং তার সম্ভ্রমের মাত্রার কোনো গুরুত্ব নেই। আল্লাহর কাছে একমাত্র স্বীকৃত পার্থক্য হলো তাকওয়া বা ধর্মভীরুতা আর একমাত্র গ্রহণযোগ্য মাপকাঠি হলো পূর্ণশীলতা ও আধ্যাত্মিক উৎকর্ষ। পবিত্র কুরআনে আল্লাহ বলেছেন,হে মানব জাতি জেনে রাখ, আমি তোমাদের বিভক্ত করে দিয়েছি বিভিন্ন জাতি ও উপজাতিতে। যাতে করে তোমরা পরস্পরকে জানতে পারো। জেনে রাখো, তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি পুণ্যবান, আল্লাহর দৃষ্টিতে সে-ই সম্মানী।’(আল-কুরআন)

আল্লাহর কাছে মানুষের মর্যাদার ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ বা সামাজিক মর্যাদার কোনো মূল্য নেই, এ সবের পার্থক্য একেবারেই কৃত্রিম ও মূল্যহীন। এসবের পার্থক্য বা তারতম্য আল্লাহর দৃষ্টিতে মানুষের মর্যাদাকে এতটুকু প্রভাবিত করে না। উপরন্ত সমতার এই মূল্যমান নিছক কোনো শাসনতান্ত্রিক অধিকার কিংবা ভদ্রলোকের চুক্তি অথবা সৌজন্যমূলক বদান্যতা নয়, মুসলমানগণ একে ঈমানের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গরূপে গুরুত্বের সাথে গ্রহন করে এবং এর প্রতি আন্তরিকভাবে বিশ্বস্ত ও অত্যন্ত গভীরে গোথিত। কতকগুলো মূল ভিত্তি থেকে ইসলামি সাম্যনীতির ধারণার উন্মেষ ঘটে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামি সাম্যনীতির ভিত্তিসমূহ যথা:

১ .সকল মানুষ বিশ্বলোকের প্রভু এক অভিন্ন ও শ্বাশত আল্লাহর সৃষ্টি।

২. সকল মানুষ একই মানবকুলের অন্তভূর্ক্ত এবং আদম ও হাওয়ার বংশধারার সমান অংশীদার।

৩ .আল্লাহ তার সমগ্র সৃষ্টির প্রতি ন্যায়পরায়ণ ও দয়াশীল। কোনো বিশেষ গোত্র বা যুগ বা ধর্মের প্রতি তার পক্ষপাতিত্ব নেই। সমগ্র বিশ্বলোক তার সাম্রাজ্য এবং সমগ্র প্রাণীই তাঁর সৃষ্টি ।

৪. সমগ্র মানুষ সমানভাবে জন্মগ্রহন করে বলে কেউই কোনো বিশেষ অধিকার নিয়ে আসে না এবং সমস্ত মানুষ সমানভাবে মৃত্যুবরণ করে বলে কেউই পার্থিব কোনো সম্পদ সঙ্গে নিয়ে যায় না।

৫. আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকেই তার নিজস্ব গুণাবলির ভিত্তিতে এবং তার নিজস্ব কর্মকান্ডের আলোকে বিস্তার করেন ।

৬. আল্লাহ মানুষকে শুধু মানুষ হিসেবেই দিয়েছেন সন্মান ও মর্যাদার অধিকার ।ইসলাম ঘোষিত সাম্যের এই নীতি চিরন্তন, শ্বাশত ও অপরিবর্তনীয়। ইসলামের দৃষ্টিতে বিশ্বের বিভিন্ন অঞ্চলে মানুষকে বিভিন্ন মূল থেকে উৎসারণ করা হয়েছে। এ ধারণাটা সম্পূর্ণ অসত্য, বিভ্রান্তিকর ও প্রতারণাপূর্ণ। স্রষ্টাই স্রষ্টাই মানুষকে উচু ও নীচু, শরীফ ও রজীল, উন্নত ও হীন অনুন্নত বা উত্তম ও নিকৃষ্ট এরূপ বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত করে সৃষ্টি করেছেন এ কথাও সম্পূর্ণ মিথ্যা। পৃথিবীর সকল মানুষের মৌল দৃষ্টি উপাদান ইসলামের দৃষ্টিতে এক, অভিন্ন, কুরআন মজিদে বহু ক'টি আয়াত এ- কথা অত্যন্ত বলিষ্ঠভাবে বলা হয়েছে। একটি আয়াতে বলা হয়েছে, সেই মহান সত্তাই তোমাদের সকলকে মাটির মৌল উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করেছেন, পরে শুক্রকীট থেকে, তারপর জমাট বাঁধা রক্ত থেকে, তারপর তোমাদের শিশুর আকার-আকৃতিতে মাতৃগর্ভ থেকে বাইরে এনেছেন। পরে ক্রমশ তোমাদের বৃদ্ধি দান করেছেন, যেন তোমরা শক্ত সামর্থবান হয়ে উঠতে পারো। (কুরআন ৪০:৬৭)

সমস্ত মানুষকে অভিন্ন লক্ষ্য ও যত্নে সৃষ্টি করা হয়েছে। মানুষের মৌল সৃষ্টি উপাদান যেমন অভিন্ন, তেমনি মাতৃগর্ভে তার অবস্থান, প্রবৃদ্ধি লাভ, আকার –আকৃতি দান ও অঙ্গসৌষ্ঠর গঠনে অভিন্ন ও পার্থক্যহীন যত্ন ও ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। এই দিক দিয়েও কোনো মানব শ্রেণিকে স্বতন্ত ও ভিন্নতর যত্ন, ব্যবস্থাপনায় সৃষ্টি করা হয়েছে বলে দাবি করার বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। অতএব, কোনো বিশেষ মানব শ্রেণির বিশেষত্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব বলতে ও কিছু থাকতে পারে না।

টি ডব্লিউ আরনোল্ড বলেছেন, হজ্ব এবং যাকাত মুসলমানের স্বরণ করিয়ে দেয় যে, বিশ্ববাসীরা ভাই ভাই। বিশ্বে সাম্যবাদ, বিশ্বভ্রাতৃত্ব অর্জন ইসলামের এক মহা অবদান, ড. লেইটনার বলেন, সব মানুষ সামান, তারা ভাই ভাই এটা কেবলমাত্র মুসলমানদের কথার কথা নয়,বহু মুসলিম দেশে ক্রীতদাসদের উচ্চ মর্যাদা দেয়াতে এটা প্রমাণিত হয়েছে। দিল্লীর প্রথম সম্রাট কুতুবদ্দিন একজন ক্রীতদাস ছিলেন।

উপরোক্ত বিষয়গুলোতে ইসলামি সমতা ও সাম্যনীতির পশ্চাতে নিহিত রয়েছে কয়েকটি মূলনীতি। সাম্যের এই আদর্শ যখন পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হবে, তখন জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মীয় নিপীড়নের বাস্তবায়িত হবে, তখন অত্যাচার ও নির্যাতনের কোনো অবকাশ থাকবে না। তখন আল্লাহর মনোনীত ও অমনোনীতি জাতি, অনুগ্রহভাজন ও নিন্দাভাজন বংশ, গোত্র সামাজিক উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের নাগরিক প্রভূতি ধারণা ও পরিভাষাগুলো নিতান্তই অর্থহীন ও অকেজো হয়ে পড়বে।

ইসলামে সাম্যের ধারণা (conception of equality) ইসলামি জীবন ব্যবস্থার অন্যান্য

Dhaka University Institutional Repository

বৈশিষ্ট্যগুলোর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। আল্লাহ তা'য়ালা মানুষকে এইভাবে সম্বোধন করেছেন।

يا ايها الناس অথবা يا ايها الانسان হে লোকসকল অথবা হে মানুষেরা অথবা الحمد الله رب العالمين অর্থাৎ সমগ্র জগতের পালনকর্তা। নৈতিক ও বাস্তব সকল অর্থেই আল্লাহ সকল সৃষ্টিলোকের পালনকর্তা। এই প্রতিপালনের মুসলিম অমুসলিম, ধার্মিক আমরা না। করেন বৈষম্য প্রকার কোনো ধলো-কালো অধার্মিক-উৎ মূল আমাদের কাজেই থেকে। মাটি হয়েছে সৃষ্ট আদম আর সন্তান আদমের সকলেই (origin)একই। মানুষের মাঝে বিভাজনের মাপকাঠিই হচ্ছে তার কর্ম ও কীর্তি এবং এর ফলাফল। ইকবালের কাছে এই বিষয়টি স্পষ্ট হয়েছিলো তাঁর যৌবনের প্রারম্ভেই। কারণ তাঁর ;নি করেন লাভ জ্ঞান এই সূত্রেই উত্তারাধিকার শুধু ইকবাল বক্তৃতা বিভিন্ন ইকবালের করেছিলো। সাহায্য ব্যাপারে এ তাঁকে ও পরিবেশ ও শিক্ষকবৃন্দ–বিবৃতি এবং সাহিত্যে তাঁর মানবতা চর্চার প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায়। তাঁর *রোমুযে বিখুদী* কাব্যগ্রন্থের সুলতান মুরাদ ও স্থপতির কাহিনীটি এ ক্ষত্রে বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য।

উল্লেখ্য, তুকিস্তানের একটি শহর খোযান্দে যা রূশ সরকার ১৮৬৬ সালে দখল করে নিয়েছিলো। সে সময় ওখানে তাযিক গোত্রের লোকদের বসবাস ছিলো। এই শহরটি কোকান্দ থেকে ৭৫ মাইল দূরে অবস্থিত ছিলো, তৎকালে এর লোকসংখ্যা ছিলো ৩৭ হাজার। রেশমএবং তৈজসটত্রের ব্যবসা -বাণিজ্যের জন্য বিখ্যাত ছিলো।মুসলিম শাসনামলে এ শহরটি জ্ঞানবিজ্ঞান ও শিল্প-চর্চার কেন্দ্র ছিলো। সুলতান মুরাদ একটি মসজিদ নির্মাণের জন্য একজন স্থপতিকে নিয়োগ দান করেছিলেন। স্থপতি কাজীর দরবারে ন্যায় বিচার দাবি করেন। কাজী ইসলামের নির্ধারিত কিসাসের বিধান সম্পর্কে সুলতানকে অবহিত করলে তিনি অকপচিত্তে নিজের দোষ স্বীকার করেন এবং কিআসাস (প্রতিশোধ) গ্রহনের জন্য প্রস্তুত হন। তিনি জজজামার অস্তিন খুলে তাঁর হাত বাড়িয়ে দেন, কিন্তু শেষ মুহূর্তে স্থপতি তাঁকে বক্ষমা করে দেন। কিসাসের বিধানের সাথে সাথে সরাসরি অথবা রক্তমূল্য আদায়ের মাধ্যমে ক্ষমা করার বিধান ও ইসলাম দিয়েছে। (তারিক- ৫৩, পৃ. ২৪১)

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

ولكم في القصاص حياة ياولي الباب لعلكم تتقون

যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে :
হে বোধসম্পন্ন ব্যক্তিগণ কিসাসের মধ্যে জীবন নিহিত রয়েছে পারো হতে সাবধান তোমরা যাতে
(কুরআন-১:১৭৯)

কিসাসের বিধানের পাশাপাশি ক্ষমা প্রদর্শন ও বিধি অনুসরণের মাধ্যমে যথাযথ প্রাপ্য প্রদানের শিক্ষা ও কুরআন দিয়েছে। যেমন বলা হয়েছে :

فمن عفي له من اخيه شيئ فاتبتع بالمعروف و اداء اليه باحسان

তার ভাইয়ের পক্ষ হতে কিছুটা ক্ষমা প্রদর্শন করা হলে যথাযথ বিধির অনুসরণ করা ও সততার সাথে তার দেয় আদায় বিধেয়। (কুরআন ১:১৭৮)

অপর আরেক আয়াতে বলা হয়েছে:

ان الله يامر بلعدل و الاحسان و ايتائي ذي القربي و ينهي عن الفحشاء و المنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون

আল্লাহ ন্যায়পরায়ণতা, সদাচরণ ও আত্মীয়-স্বজনকে দানের নির্দেশ দিয়েছেন এবং নিষেধ করেছেন অশ্লীলতা, অসৎকার্য ও সীমালঙ্গনকে; তিনি তোমাদেরকে উপদেশ দেন যাতে তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারো। (কুরআন:১৬:৯০)

সুলতান মুরাদ স্থপতির উপর যে জুলুম করেছিলেন বিলম্বে হলেও তিনি তা বুঝতে সক্ষম হন। কবি ইকবাল বলেন:

گفت شه از کرده خجلت برده ام　　　اعتراف از جرم خود آورده ام

Dhaka University Institutional Repository

گفت قاضی فی القصاص آمد حیات　　زندگی گیرد باین قانون ثبات

বাদশাহ বলেন, আমার কৃতকর্মের জন্য আমি অনুতপ্ত
আমি কৃত স্বীয় জুলুমকে স্বীকার করে নিচ্ছি।
কাজী বলেন নিহিত জীবন রয়েছে কেসাসেই ,
এ বিধানের মাধ্যমেই মানব জীবন স্থিতিশীলতা লাভ করে। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৭৩)

এ দিকে বাদশার অপরাধের স্বীকৃতি এবং কুরআনের বিধান অনুযায়ী কাজীর ফায়সালা মেনে নিতে প্রস্তুত দেখে ফরিয়াদী স্থপতির মনে দয়ার উদ্রেক হলো এবং কুরআনের বিধানের অনুসরণেরই তিনি সুলতানকে ক্ষমা করার ঘোষণা দিলেন। যেমন :

چو مراد ایں محکم شنید　　دست خویش از آستین بیروں کشید
مدعی را تاب خاموشی نماند　　آیۃ بالعدل و الاحسان خواند
گفت از بهر خدا بخشیدمش　　از برای مصطفی بخشیدمش

যখন মুরাদ এ সুদৃঢ় আয়াত শুনলেন
তখন আস্তিন থেকে নিজ হাত বের করে দিলেন।
ফরিয়াদী স্থপতি পারেনি থাকতে নীরব আর
ন্যায় ও দয়ার আয়াতটি উচ্চারিত হলো মুখে তার
বলেন খোদার দিলাম করে মাফ তাঁকে আমি তরে
ক্ষমা করলাম তাঁর মহান রাসুল মুস্তাফার তরে। (ইকবাল-৫, পৃ. ৭৩)

ইসলামের বিধান হচ্ছে -

پیش قرآن بنده و مولا یکی است　　بوریا و مسند دیبا یکی است

কুরআনের চোখে প্রভু ও দাস এক সমান
ছন্ন মাদুর আর গালিচা সব এক সমান। (ইকবাল- ৫, পৃ. ৭৩)

এ কাহিনীর মধ্যদিয়ে ইকবাল দেখাতে চেয়েছেন যে, ইসলাম সাম্যের ধর্ম। স্থপতির ওপরে জুলুম করার কারণে সুলতান অবশ্যই অপরাধী, যে কারণে তিনি শাস্তি পাওয়ার যোগ্য। ন্যায়পরায়ণ কাজীর নির্দেশে তিনি শাস্তি মাথা পেতে নিয়েছিলেনও বটে। ন্যায় বিচারের ক্ষেত্রে কিসাসের (প্রতিশোধ) বিধান কার্যকরী করা ছাড়া কাজীর কাছে আর কোনো বিকল্প পথ ও ছিলো না। কিন্তু ক্ষমা মহত্তের লক্ষণ। ইসলাম ক্ষমা পছন্দ করে তাই সুলতানের প্রতি স্থপতির এই ক্ষমা ও করূণা অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। কারণ, এটি ও কুরআনের বিধানেরই অনুকীর্তি। ইসলামের ন্যায় বিচার উন্নতশীর দোর্দণ্ড প্রতাপের অদিকারী বাদশাহকেও অতিসাধারণ মানুষের কাছে নতি স্বীকার বাধ্য করে, অপরাধীদের কাঠগড়ায় দাঁড় করিয়ে তাকে জবাবদিহিতার সন্মুখীন করে। এখানে কে রাজা আর কে প্রজা তা বিবেচ্য নয়; বিবেচ্য বিষয় হচ্ছে ন্যায় ও ইনসাফ। ইআকবাল তাঁর অমর কাব্যে এই সাম্যের নিদর্শন স্থাপন করে গেছেন উপরিউক্ত কাহিনীটির আলোকে। (চিশতি-৫৬, পৃ. ১৫৯)

ইকবাল পুঁজিপতি ও মেহনতি শ্রমিকদের সম্পর্কেও তার কাব্য সাহিত্যে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করেছেন। তিনি দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পেরেশানি ও অসহায় অবস্থা এবং পুঁজিপতিদের অত্যাচার ও জবরদস্তি দেখে অশ্রু বর্ষণ করেছেন। তাদের প্রতি ইকবালের ছিলো অসামান্য সহানুভূতি । তিনি কৃষক ও শ্রমিক ,মজদুরদেরকে তাদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হওয়ার জন্য আহবান জানিয়েছেন । তিনি খেযরে রাহ শীর্ষক কবিতায় হযরত খিযির.আ) প্রতি শ্রমিকদের ভাষায় এর ও শিল্পপতিদের প্রবঞ্চনা ও প্রতারণার কথা তুলে ধরেন। ইকবালের এ বক্তব্য শ্রমিক শ্রেণির জেগে ওঠার জন্য একটি ঘোষণাপত্র হিসাবে গণ্য করা হয়।

بندۂ مزدور کو جا کر مرا پیغام دے　　خضر کا پیغام کیا ہے یہ پیام کائنات

Dhaka University Institutional Repository

اے کہ تجھ کو کھا گیا سرمایہ دار حیلہ گر   شاخ آہو پر رہی صدیوں تلک تیری ہرات

মজদুর বেচারাকে পৌঁছে দাও আমার এ পয়গাম

এতো নয় আমার   বিশ্বজগতের হলো এ ,পয়গাম (খেযেরের) পয়গাম।
ওহে মজদুর ! ধোঁকাবাজ পুঁজিপতি তোমার সব লুটেপুটে খেয়ে ফেলেছে,
আর শত বছর ধরে তোমার ভাগ্য নিহিত রয়েছে হরিণের শিঙ । (ইকবাল-১১,পৃ. ২১৯)

উপরিউক্ত বিষয়গুলোতে ইসলামি সমতা ও সাম্যনীতির পশ্চাতে নিহিত রয়েছে কয়েকটি মূলনীতি। সাম্যের এই আদর্শ যখন পরিপূর্ণরূপে কার্যকর হবে ,তখন জাতিবিদ্বেষ ও ধর্মীয় নিপীড়নের কোনো সুযোগ থাকবে না। যখন এই খোদায়ী অধ্যাদেশ সম্পূর্ণ বাস্তবায়িত হবে, তখন অত্যাচার ও নির্যাতনে কোনো অবকাশ থাকবে না। তখন আল্লাহর মনোনীতি ও অমনোনীতি জাতি, অনুগ্রহভাজন ও নিন্দাভাজন বংশ গোত্র,   সামাজিক উচ্চবর্ণ ও নিম্নবর্ণের নাগরিক প্রভৃতি ধারণা ও পরিভাষা গুলো নিতান্তই অর্থহীন ও অকেজো হয়ে পড়বে।

স্বাদেশিকতাবাদ:

আধুনিক রাষ্ট্রবিজ্ঞান স্বাদেশিকতাবাদ (وطنیت)-কে সমাজ-সংস্কার ভিত্তিরূপে গ্রহণ করিয়াছে, এটাই হচ্ছে এ দ্বীন, এটা হচ্ছে ঈমান। বস্তুত ধর্ম ও নৈতিক মূল্যবোধ পরিত্যাগ করার পর স্বদেশপ্রেম বা উগ্র স্বদেশিকতার অন্ধ নেশায় মানুষের সমগ্র জীবন আচ্ছন্ন হওয়াই অত্যন্ত এবং প্রত্যেকটি ভৌগলিক (অঞ্চলভিত্তিক)জাতীয়তা সৃষ্টি করেছে এবং প্রত্যেকটি ভৌগলিক অঞ্চলের অধিবাসীদিগকে একটি স্বতন্ত্র জাতি ও রাষ্ট্রের মর্যাদা দিয়াছেন এরা নিজেদের দেশকে বসিয়েছে ঠিক আল্লাহর স্থানে। দেশরক্ষার জন্য জান-মাল,দ্বীন-ধর্ম ও নৈতিক মূল্যমান-এক কথায় সব কিছু বিসর্জন দিতে ও তারা প্রস্তুত হচ্ছে। আল্লামা ইকবাল এই ধরনের স্বাদেশিকতায় আদৌ বিশ্বাসী ছিলেন না । তিনি একে ইসলামের সম্পূর্ণ বিপরীত এক মতাদর্শ-আর ধর্মের পরিভাষায় একে একটি রব সৃষ্ট দেবতা' বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।
একে চুর্ণ-বিচুর্ণ করতে না পারলে দ্বীন ও ধর্মের ধ্বংস অনিবার্য বলে তিনি মত প্রকাশ করেছেন।

امن دور میں م ئے اہے جام اور ہے جم اور

ساقی نے بنا کی روش لطف وکرم اور

مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم اور

Dhaka University Institutional Repository

تہ ذب کے ازرونے ترشوائے صنم اور
ان تازہ خداؤں میں بڑاے وطن ہے
جوپیراہ ن اس کاہے وہ مذہ ب کا کفن ہے
یہ بت کہ تراشیدہ تہ ذیب نوی ہے
غارت گرکہ کاشانہ دین نبوی ہے
بازو ترا توحید کی قوت سے قوی ہے
اسلام ترا دیس ہے تو مصطفوی ہے
نظارہ دیرینہ زمانے کو دکھادے
اے مصطفوی جاک مین اس بت کو ملادے

এ যুগের সুরা,পানপাত্র,সুরাপায়ী
সব কিছুই নতুন,
সাকী উদ্ভাবন করেছে প্রেম ও জ্বালার নতুন ধরন।
মুসলিম তৈরী করে নিয়েছে
নতুন হেরেম
সভ্যতার মূর্তি নির্মাতা গড়ে তুলেছে নতুন মূর্তি।
এসব নব সৃষ্ট উপাস্যের মধ্যে সবার বড়ো ওয়াতন-
তার যা দেহাবরণ,
তা’ হচ্ছে ধর্মের কাফন।
যে মূর্তি গড়ে তুলেছে এ নতুন সভ্যতা,
ধ্বংস করেছে সে দ্বীনে নববী’র আগার।
বাহু তোমার বলিষ্ঠ তাওহীদের শক্তিতে,
ইসলাম তোমার দেশ।
আর তুমি হচ্ছো মুস্তাফার অনুসারী।
হে মুস্তাফার অনুসারী,
চিরন্তন দৃষ্টিভঙ্গি এনে দাও
এ নতুন যুগের চোখে,
এ মূর্তির আবর্জনা মিলিয়ে দাও
মাটির সাথে | (ইকবাল-১১, পৃ. ৩০৪)

ইকবাল স্বাদেশিকতাবাদের তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। তাঁর মতে এটা মানুষের মধ্যে এক কৃত্তিম ব্যবধানের সৃষ্টি করে বলে এর এক নাম মূর্তিপূজা। ইকবাল বলেন, মানুষ মূর্তি রচনা ও মূর্তি পূজার এমনই অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে যে, এর একটি চুর্ণ হলে নতুন করে আর একটি রচনা করে ও ওর পূজায় নূতন উদ্যমে লিপ্ত হয়। নিত্য নূতন মূর্তি রচনা ও মূর্তি পূজার এ ধারা আদিকাল হতে বর্তমান যুগ পর্যন্ত চলে এসেছে। এই মূর্তি গুলির বাহ্যিক রূপ ও আকার-আকৃতিতে কিছুটা বৈষম্য থাকলেও মূলত এদের মধ্যে কোরই পার্থক্য নেই। অতএব

Dhaka University Institutional Repository

মানবতার মুক্তি বিধানের অভিযানে যেখানে অসংখ্য বিগ্রহ চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হয়েছে, সেখানে স্বদেশিকতার এ নবতর বিগ্রহকেও অনতিবিলম্বে চূর্ণ করা মানবের মানসিক মুক্তির জন্যে অপরিহার্য।

اے کہ خوردستی زمرنالہ خلیل
گرمی خونت زصبائے خلی
برسراین باطل حق پیرہ ن
تیغ لا موجود الا ہو ویزن

পান করেছো তুমি খলিলের জাম থেকে,
তপ্ত হয়েছে তোমার শোনিত
তারই সুরা রসে;
আঘাত করো লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহর তরবারি দ্বারা
অসত্যের মস্তকে। (ইকবাল -১১, পৃ. ১৮৯)

ইকবাল স্বদেশিকতা ও সংকীর্ণ অঞ্চলভিত্তিক জাতীয়তার দাসত্ব হতে মুক্তি লাভের জন্যে বিশ্বমানবকে উদাত্ত আহ্বান জানিয়েছেন। ইসলাম একদিক যেমন বর্ণ, গোত্র ও বংশীয় আভিজাত্যকে নিস্তনাবুদ করেছে অপরদিকে স্বদেশিকতার বিগ্রহকে ও চুরমার করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, মানুষ যে ভুখণ্ডে বসবাস করে, এর সাথে তার আন্তরিক সম্পর্ক ও টান থাকা অতি স্বকাভাবিক, এর কেহ অস্বীকার করতে পারে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, মানুষের পবিত্র আত্মা ও হৃদয় মন স্বদেশের মৃত্তিকর সংকীর্ণ খাঁচায় এমনভাবে বন্দী হবে যে, এর স্বাভাবিক ও মানসিক মুক্ত পক্ষ সংকুচিত হয়ে পড়বে। ইকবার ঘোষণা করেছেন:

یہی مقصود فطرت ہے یہی رمز مسلمانی
اخوت کی جہاں گیری محبت کی فراوانی
بتاں رنگ وخون کو توڑکر ملت میں گم ہوجا
نہ تورانی ہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی

ভ্রাতৃত্বের বিশ্ব ব্যাপকতা ,প্রেম প্রাচুয্
এ হচ্ছে প্রকৃতির চাহিদা
আর মুসলমানীর মূলতত্ব।
বর্ণ ও রক্তের গড়া মূর্তিকে বিচুর্ণ কর;
আত্মবিলোপ কর মিল্লাতের মাঝে,
তোমার পরিচয় হবে না
তুরানী, ইরানী বা আফগানী বলে|(ইকবাল-১১, পৃ. ২১৫)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবালের মতে এই আক্রমণঅত্মক ও বিদ্দষবিষাক্ত-স্বদেশিকতা বাদেরই পরিণতি হচ্ছে সাম্রজ্যবাদ। স্বদেশিক জাতীয়তাবাদের অগ্রনায়ক শ্লোগান দিয়ে থাকেন-My country Right or wrong''

ইকবাল মনে করেন, এ হিংসাত্মক ও অন্ধ স্বদেশপ্রীতি মানুষকে কোন দিনই হক ও বাতিল-ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে পার্থক্য করবার সুযোগ দেয় না। আর মানুষ যদি এ মহান গুণ হতে বঞ্চিত হয়, তা হলে কোন দুস্কৃতিই আর তার সাধ্যাতীত থাকে না।

কোন ভৌগলিক সীমারেখাকে কেন্দ্র করে অঞ্চলভিত্তিক জাতি গঠন করাও ইকবালের দৃষ্টিতে মারাত্মক ভুল। এজন্য তিনি সর্বভারতীয় ভিত্তিতে জাতি গঠন আদৌ সমর্থন করতে পারেননি। বরং সর্বভারতীয় জাতীয়তাবাদের সমর্থন ম ও লানা মাদানীর তিনি তীব্র ভাষায় সমালোচনা করেছেন। বস্তুত ইকবালের এ সম্পর্কীয় যাবতীয় চিন্তাধারা ইসলামি সমাজদর্শনের মৌলিক ভাবধারার সাথে পূর্ণ সামঞ্জস্যশীল । ইসলাম স্বদেশিকতার সংকীর্ণ গণ্ডীতে বন্দী হয়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়েযাক, ইকবাল তা কিছুতেই সমর্থন করতে পারেননি। কেননা ইকবালের রাষ্ট্রদর্শন কুরআনের বিশ্বমুসলিম ভ্রাতৃত্ববাদের উপর স্থাপিত।

ঐক্য ও সম্প্রীতি:

ঐক্য বলতে বুঝায় একতাবদ্ধ হওয়া একত্রিত হওয়া, মিলেমিশে থাকা এর বিপরিত হল হানাহানি ঝগড়া ফ্যাসাদ, বিসংবাদ, অনৈক্যে অনিষ্ট অশান্তি ইত্যাদি। ইসলামে ঐক্য সম্প্রীতির নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। এসম্পর্কে আল্লআহ কুরআনে বলেন,

واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكرو نعمت الله عليكم اذ كنتم اعدأ فالف بين قلوبكم
فاصبحتم بنعمته اخوانا وكنتم علي شفا حفرة من النار فانقذكم منها كذالك بين الله أيته لعلكم تتقون

এবং তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জু দৃঢ়ভাবে ধারণ করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। তোমরা অনুগ্রহকে স্মরণ করো; তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু এবং তিনি তোমাদের হৃদয়ে প্রীতি সঞ্চার করেন। ফলে তাঁর অনুগ্রহে তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নিকুণ্ডের পপ্রান্তে ছিলে, আল্লাহ তা হতে তোমাদেরকে রক্ষা করেছেন। এরুপে আল্লাহ তোমাদের জন্য নিদর্শন বিবৃত করেন যাতে তোমরা সৎপথ পেতে পারো। (কুরআন ২:১০৩)

পবিত্র কুরআনের অন্যত্র বলা হয়েছে:

ولاتكونوا كالذين تفرقوا واخعلفوا من بعد ما جأ هم البينات واولئك لهم عذاب عظيم

Dhaka University Institutional Repository

তোমরা তাদের মতো হয়ো না যারা তাদের নিকট স্পষ্ট নিদর্শন আসার পর বিচ্ছিন্ন হয়েছে ও নিজেরা মতনৈক্য সৃষ্টি করেছে। তাদের জন্য রয়েছে মহাশাস্তি। (কুরআন-২-১০৫)

পবিত্র কুরআনে এরূপ আরো বলা হয়েছে:

قل يا اهل الكتاب تعالوا الى كليه سوم بيننا و بينكم الانعبد الا الله ولا تشرک به شيئا ولا يتخذ بعضا بعضا اربابا.

তুমি বলো, হে আহলে কিতাব! এসো সে কথায় যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে এক ও অভিন্ন যেন আমরা আল্লাহ ব্যতীত কারো ইবাদত না করি, কোনো কিছুতেই তাঁর শরীক না করি এবং আমাদের কেই কাইকে ও আল্লাহ ব্যতীত প্রতিপালকরূপে গ্রহণ না করি। (কুরআন-২: ৬৪)

বিশ্ব মুসলিম ঐক্য আন্দোলনের সুচনা:

প্রচ্যের অগ্নিপুরুষ বীর মুজাহিদ সৈয়দ জামাল উদ্দিন আফগানীই (জন্ম ১৮৩৯ মৃত্যু ১৮৯৭) মুসলিম বিশ্বের বেদনার্ত, পারস্পরিক তিক্ততা ও বিপর্যয়ের মূহুর্তগুলোকে অত্যন্ত গভীর সচেতন ও সমগ্রভাবে অবলোকন করেন এবং বিশ্বমানবতার মুক্তির আলোকে,বিশ্বাসের তীব্রতায়, জীবনের কলোলিত শক্তির দ্যোতনায় প্যান ইসলাম বা বিশ্ব মুসলিম ঐক্য আন্দোলনের ডাক দেন। আফগানী তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, বিপুল জীবনী শক্তি, বিশ্বাসের গভীরতা, দূরদর্শী নেতৃত্ব, গভীর জ্ঞান, অসাধারণ পাণ্ডিত্য, জ্বালাময়ী বাগ্মিতাকে সম্বল করে এশিয়া, আফ্রিকা এ ইউরোপের যখন যেখানে ছুটে গেছেন তখন সেখানেই বিভেদাক্রান্ত মুসলিম দুনিয়ার ঐক্যের উপর গুরূত্বরোপ করেন এবং এ ঐক্যের মধ্যেই ভবিষ্যৎ মুসলিম উম্মাহর মুক্তির স্বর্ণোজ্জল চিত্র নির্মাণ করেন। তিনি ইসলামের আধুনিক মূল্যবোধের নিরিখে আত্মবিশ্বাসহীন মুসলমানদের অন্তরে প্রত্যয়ের অগ্নি শিখা প্রজ্জ্বলিত করেন এবং সার্বিক জাগরণ সৃষ্টি করেন। ফজলুর রহমান লিখেছেন:

''His pan Islamism was basically a doctrine of unity of the Muslim world and constitionalism'

মুসলিম ঐক্যে ইকবালের অবদান:

বিশ্ব মুসলিম ঐক্যের গৌরবোজ্জল রাহবার ‘মিল্লাতে ইসলামিয়ার রূপকার কবি ইকবালের বিশ্বাস ও সৃজনশীলতায় উনিশ শতকে সুচিত প্যান ইসলামি আন্দোলনেরর চেতনার উদ্দিষ্ট সমস্ত গুণ ও উপজীব্য বত্মান। ইকবালের রাজনৈতিক দর্শন ও কবি চেতনার মূলে মুসলিম ঐক্যের এই প্রাবানী বিধৃত। অগ্নিপুরুষ সৈয়দ জামালুদ্দিন আফগানীর স্বপ্ন ও মনন নিসৃত চিন্তা ভাবনা সমকালে প্যান ইসলামিজম আন্দোলনের পথ ধরে মুসলিম ঐক্য ও পূনর্জাগরণের যে অনির্বাণ মশাল পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ আক্রান্ত ইসলামি দুনিয়ার উজ্জলতর হয়ে উঠেছিল ইকবাল তারই রজতপ্রভা বিশ শতকের মলিন আকাশে মুঠি মুঠি করে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন সৈয়দ জামাল উদ্দীন স্রোত উপমহাদেশের মুসলমানদের নব উদ্দীপনা দিয়েছিল। ভারতের মুসলমানরা আফগানী শক্তির বিরুদ্ধে প্রতিরোধের ইতিহাস নির্মাণে সোচ্চার হয়ে উঠল। তারা নব জাগরণের পথ ধরে জেগে উঠলো। বলা যায় পরবর্তীতে উপমহাদেশের খেলাফত আন্দোলন, স্বাধিকার স্বতন্ত্রের লড়াই এ পরিণতিতে স্বতন্ত্র আবাসভুমি অর্জনের সংগ্রামে মুসলমানদের অধিকতর ত্যাগের দৃষ্টান্ত স্থাপন অনেকটা চিরঞ্জীব দিশারী আফগানীর প্রেরনায়ই হয়েছিল। আফগানীর ইসলামি একত্বের পুনর্জাগরণ অবিচ্ছিন্নভাবে চলে এসেছে।মহাকবি ইকবাল এ প্রবক্তা দলের একজন প্রতিপত্তিশীল ব্যক্তি। (ইকবাল সংসদ- ৯ নভেম্বর ১৯৯৯)

আল্লামা ইকবাল মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতির জন্য সবসময়ই সচেষ্ট ছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন মুসলমানযেন তাদের হারানো সন্মান ও গৌরব পুনরূদ্ধার করে স্বীয় উম্মাহকে সিসাঢালা প্রাচীরের মতো শক্তিশালী করে এবং মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য তাঁর চেষ্টার কোনো কমতি ছিলো না। বলাবাহুল্য , আল্লামা ইকবালের সব সময়কার চিন্তার মুসলমানদেরকে কিভাবে এক্যবদ্ধ করা যায় সে ব্যাপারেও এ পরিকল্পনা প্রণয়ন করা। কারণ, তিনি জানতেন যে, মুসলমানদের উন্নতি ও অগ্রগতি ও ঐক্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। মুসলমান এমন এক জাতি যার ভিত্তি সর্বপ্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলো কুরআনের দর্শনের ওপরেই । আর কুরআনের দর্শন

Dhaka University Institutional Repository

হচ্ছে, মুসলমানরা যেকোনো মূল্যে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি এবং ধর্মের পরিপূর্ণ বিকাশও হতে পারে এ দর্শনের ওপর ভিত্তি করেই। যেমন পবিত্র কুরআনে বলা হয়েছে:

ان اقیموا الدین و لا تفرقوا

তোমরা তোমাদের জীবনব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠিত করো এবং পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না। একটি প্রসিদ্ধ প্রবাদ রয়েছে একতায় উত্থান বিভেদে পতন' (United we stand and divided we fail) ঠিক ইকবালো মুসলমানদেরকে ভেদাভেদ ও পতনের হাত থেকে রক্ষা করার উদ্দেশ্যে ঐক্যের ওপর গুরূত্বারোপ করেছেনএভাবে:

منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک
ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک
حرم پاک بھی اللہ بھی قران بھی ایک
کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں
کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں

এ জাতির লাভ আর লোকসান একই

সকলের নবী এক, ঈমান এবং ধর্মের এক ও অভিন্ন

আল্লাহ পবিত্র হারাম আর কুরআন সবই এক

কতই না উত্তম হতো যদি মুসলমানরাও হতো এক।

কোথাও রয়েছে উপদলীয় কোন্দল আর কোথাও সত্তাগত বিভেদ

এ যুগে বিশ্বে অগ্রগতির বক্তব্য কি এটিই? (ইকবাল - ১১, পৃ. ২৩০)

ইকবাল হযরত মুহাম্মদ (সা.)এক জীবনাদর্শকে মুসলিম মিল্লাতের ঐক্যের জন্য গুরূত্বপূর্ণ উপাদান হিসেবে গণ্য করেছেন। ইকবাল এব্যপারে অবহিত ছিলেন যে, মুসলমানদের দু:খ-দুর্দশা এবং পশ্চাদপদতার মূল কারণ হচ্ছে তাঁদের অনৈক্য রাসুল (সা.) মুসলমানদেরকে একটি ঐক্যবদ্ধ জাতি হিসেবে শুধু গঠনই করেন নি, বরং বিশ্বের বুকে তাদের মর্যাদাকে সম্প্রসারিত পন্থায় প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং স্বল্প সময়ের ব্যবধানে মুসলমানরা দুনিয়ার বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ছিলো, রাষ্ট্র ও গঠন করেছিলো। কিন্তু মুসলমানদের মধ্যে যখন অনৈক্যের বীজ বর্ণিতহলো তখন থেকে মুসলমানরা তাদের স্বীয় অবস্থান থেকে দুরে সরে পড়লো।

উল্লেখ করা যেতে পারে যে, যার অন্তরে তাওহীদ বা একত্ববাদের আমানত সংরক্ষিত আছে সে দুনিয়ার কোনো শক্তিকে পরোয়া করে না; বরং তার স্বাধীন মন মানসে ঈমানের ঔজ্জ্বল্য বিরাজমান থাকে। তার একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত হচ্ছে ইমাম হোসেন মাথা নত করেননি।

موسی و فرعون و شبیر و یزید — این دو قوت از حیات آید پدید
زنده حق از قوت شبیری است — باطل آخر داغ حسرت شیری است
رمز قرآن لز حسین آموختیم — زآتش شعله ها اندوختیم

ফেরাউনের মোকাবেলায় মূসা আর ইয়াজিদের মোকাবেলায় শাব্বির

Dhaka University Institutional Repository

এ উভয় শক্তির জীবন থেকে প্রতিভাত হয়েছে।

শাব্বিরের শক্তি থেকেই সত্য জীবন্ত হয়েছে,

বাদশাহির দু:খে –যাতনা থেকে বাতিলের আগমন।

কুরআনের রহস্য আমরা হোসাইন থেকেই শিখেছি

আর তাঁর অগ্নি থেকেই আমরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গগুলো ধারণ করেছি। (ইকবাল -৫, পৃ.২৫৬)

এখানে দু'টি ঐক্যবদ্ধ শক্তির প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। এর একটি হচ্ছে বাতিল শক্তি বা একান্তই পরিত্যাজ্য এবং এ শক্তিই ছিলো ইয়াযিদী শক্তি যে সত্যের প্রতীক ইমাম হোসেইন (রা.) এর বিরূদ্ধে বহু সৈন্যসামন্তসহ সত্যের বিরূদ্ধে চড়াও হয়েছিলো। অন্যদিকে ইমাম হোসাইন যত ক্ষুদ্রই হোক একটি ঐক্যবদ্ধ দল যা সংখ্যায় তুলনামুলকভাবে নগন্য শক্তি হলেও বাতিলের বিরূদ্ধে দণ্ডায়মান হয়েছিলেন।

পৃথিবীতে হক বাতিলের এই যে লড়াই আবহমানকাল থেকে চলে এসেছে-যার প্রমাণ ইতিহাস রয়েছে যেমন মুসা ও ফেরাউনের সংঘর্ষ। আর সেদিকেই ইকবাল ইশারা করেছেন আলোচ্য পংক্তিগুলোতে এবং বলেছেন যে পরিবেশে সত্যেরই জয় হয়েছে। সত্যের শক্তিই বড় ষক্তি। সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত ঐক্যেই সঠিক ঐক্য।

রাসুল (সা.) এর আধ্যাত্মিক বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ইসলামি সমাজের সংহতির আরেকটি কার্যকর ধারণার উন্মেষ ঘটিয়েছেন। রাসুল (সা.) এর মাধ্যমে পৃথিবীতে আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হয়েছে এবং তাঁরই আধ্যাত্মিক নেতৃত্ব এবং সাধনা দীপ্ত কর্মমুখর প্রচেষ্টায় দুনিয়ার তাবৎ মুসলমানেরা একটি কেন্দ্রে মিলিত হয়েছে। রাসুল (স.) কে নেতা মেনে যে ঐক্যবদ্ধ ইসলামি সমাজ নির্মানের ধরণা গড়ে উঠেছে তাঁর প্রকৃত মর্ম নিহিত রয়েছে মানব জাতির জন্য তাঁর এই বিশিষ্ট বাণীর প্রকৃতিততে। বিশৃঙ্খলার মধ্যে তিনি এনেছেন শৃঙ্খলা ও মানব ঐক্যের বার্তা এবং পরিণতিতে সামাজিক সাম্য ও সুবিচার। ইকবাল বলেন:

আমাদের সংহতি আমাদের ধর্ম এবং

আমাদের আইন-

সব কিছুরই বুনিয়াদ হচ্ছে রেসালাত।

তাতে সৃষ্টি করে

আমাদের বিভেদের মধ্যে ঐক্য এবং

আমাদেরকে ঐক্য বদ্ধকরে

এক সুসংঘবদ্ধ সমাজে –(রোমুযে বেখুদী)

ইকবালের কাছে মিল্লাত হলো বিকশিত ব্যক্তিত্বের একটি কার্যক্ষম সমষ্টি যা সমাজকে দেয় একটি স্বতন্ত্র সত্তা।

The community is an entity which in all its functions and activities motivated by power and a spirit of triumph. The unity acquired though the megrence of several individuals gives the commmunity a unique personality of its own . (Maqalat in Iqbal s.a.v.Moeeni)

ইকবালের বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে বড় বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তিনি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে মানবজাতির মধ্যে ঐক্য সংহতি ও ভালবাসা সৃষ্টি করে তাদেরকে একই প্লাটফর্মে দাঁড় করতে চেয়েছেন। তিনি চেয়েছেন আদের মধ্যে সহমর্মিতা, ভ্রতৃত্ব ও সাম্য বিরাজমান থাকুক। মোট কথা, ইকবাল বিশ্বমানবতাকে একটি অখণ্ড মানবসত্তা হিসেবে বিবেচনা করেছেন। তিনি বলেন:

Dhaka University Institutional Repository

بتہ رنگ خصوصیت نہ ہو میری زبان   نوع انسان قوم ہو میری وطن میرا جہاں

আমার ভাষণ যেন কোনো বর্ণ বিশেষের মধ্যে সীমিবদ্ধ না থাকে

পৃথিবীর সমস্ত মানুষ নিয়েই আমার জাতি গঠিত আর সমগ্র পৃথিবী হোক আমার দেশ। (হক-১০৩, পৃ. ৩)

ইকবালের ধ্যান ধারণায় কোনো রকম সংকীর্ণতা পরিদৃষ্ট হয়নি তিনি দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে একই আদমের বংশোদ্ভুত বলে বিশ্বাস করতেন, তেমনি বিশেষ করে পৃথিবীর দুর্বল, অসহায় ও বঞ্চিত মানুষদেরকে দাদের অধিকার আদায়ের জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন আর আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদকে(Tarritirial Nationalism) তিনি ঘৃণা করেছেন মনে প্রাণে। কারণ, আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদ হচ্ছে একটি সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি যা বিশ্বমানবতার ঐক্যের পরিপন্থী। যেমন তিনি বলেন:.

قوت مذہب وچیز ہے وہ نہیں تم بھی نہیں   جذب باہم جو نہیں محفل انجمن بھی نہیں

জাতি তো সৃষ্টি ধর্মের ভিত্তিতে

যদি ধর্মই না থাকে তবে তুমিও থাকবে না।

পারস্পরিক আকর্ষণ যদি না থাকে

তাহলে তারকা মেলাও টিকে থাকবে না। (চিশতি-১৫, পৃ. ৫৩৫)

ভৌগলিক ও আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি যদিও ইসলাম সমর্থিত নয়, কিন্তু তা সত্ত্বেও দেশ ও দেশাত্মবোধ ইসলামি ঐক্যের পথে মটেও অন্তরায় নয়। ওখানে কোনোরূপ সংঘর্ষ বা বৈরিতার সুযোগ নেই, বরং আছে সংহতির সুযোগ। আর এ সুযোগ কেবল ইসলামই প্রদান করেছে। দেশ,জাতি ও বর্ণের বিভাজনকে ইকবাল অত্যন্ত খারাপ দৃষ্টিতে দেখতেন। কারণ, এ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি মানবীয় সত্তাকে খণ্ডবিখণ্ড করে দেখা এবং মানুষের মধ্যে সৌহার্দের পরিবর্থে ঘৃণা ও বিদ্বেষ ছড়িয়ে থাকে।

ইকবাল ছিলেন ইসলামি জাতীয়তার সন্ধানী। তার লক্ষ্য ছিলো এক বিশাল ইসলামি স্বদেশ; মাটির ওপরে যে সীমান্ত তান তাঁর লক্ষ্য ছিলো না তিনি তাঁকে প্রকৃত মানুষ বলে মনে করেন যিনি ইসলামের শাস্ত্রীয় বিধানের আওতার মধ্যে থেকে কাজ করেন, কিন্তু সেই সাথে সকল মানুষের ভ্রাতৃত্ব, অভিন্নতা ও সমতা সম্পর্কেও কথা বলেন। কারণ, তাঁর কাছে মানুষই বড় কথা এবং তিনি বলেন, যে, সকল মানুষই এক মহাদেহের বিভিন্ন অঙ্গ প্রতঙ্গস্বরূপ; তারা অভিন্ন প্রকৃতি, স্বভাব কাঠামো ও আশা আকাঙ্কার অধিকারী । তাই ভৌগলিক বিভাগ ও রাজনৈতিক বিন্যাস কখনোই যেন মুসলিম উম্মাহকে বিচ্ছিন্ন করে না ফেলে এবং তাদের শৃঙ্খলাকেও যেন বিনষ্ট করতে না পারে।

ـنہ افغانیم و نی ترک و تناریم   چمن زادیم و از یک شاخساریم
تمیز رنگ و بو برما حرام است   کہ ما پرورده یک نو بهاریم

আমরা না আফগানি, না তুর্কি, না তাতারি

আমরা বাগানের ফুল এবং অভিন্ন শাখা থেকে জন্ম

রং ও ঘ্রাণের বাবধান আমাদের জন্য হারাম

কারণ, আমরা একই নব বসন্তের দ্বারা লালিত। (ইকবাল-১১, পৃ. ২০৩)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল পাশ্চাত্যের জাতীয়তাবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে গৃণা করেছেন। কারণ পাশ্চাত্য জাতীয়তাবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে আঞ্চলিক ও গোষ্ঠীতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিতে| তাই তিনি তাঁর স্বজাতিকে তা পরিহার করার জন্য আহবান জানিয়েছেন | তিনি বলেন:

آنکی جمعیت کا ہے ملک ونسب پر انحصار قوت مذہب سے مستحکم جمعیت تری

তাদের জাতিসত্তা দেশ এবং বংশীয় দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে সীমাবদ্ধ

আর তোমার জাতিসত্তা তো ধর্মীয় শক্তির বলেই হয়ে থাকে সুদৃঢ়। (হক -১০৩, পৃ.৪)

অর্থাৎ ইকবাল বুঝাতে চেয়েছেন যে, মুসলিম জাতির শক্তি-সামর্থ্য ধর্মীয় বলেই সুদৃঢ় ও মজবুত হয়ে থাকে| কারণ ধর্ম এমন একটি জিনিস যা মানুষকে সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির উর্ধ্বে স্থান দেয় এবং এ ধর্মীয় শক্তিই হচ্ছে এমন এক শক্তি যা সাধনার সুমহান শৈলচূড়া হতে একই সমতলে মানুষকে ঐক্যবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে দিতে সক্ষম।

ইকবাল শুধু তাঁর দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গিকে কবিতার বাহন কিহসাবে ব্যবহার করেননি, বরং তিনি সাধারণভাবে দুনিয়ার সকল মানুষকে বিশেষভাবে মুসলমানদেরকে ঐক্যবদ্ধভাবে জাগিয়ে তোলার জন্য তাঁর কবিতাকে ব্যবহার করেছেন এবং বলেছেন, যে পৃথিবীর মানুষ, হে মুসলিম জাতি তোমরা পৃথিবীর সকল জুলুম এবং ধর্মহীনতার বিরূদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হও| তিনি এ ব্যাপারে সবসময়ই উদ্বিগ্ন ছিলেন এবং তিনি তাঁর হৃদয়ের উদ্বিগ্নতা থেকেই বলেছেন:

کم نظر بیتابی جانم ندید   اشکارم دید وپنهانم ندید

সংকীর্ণ দৃষ্টির অধিকারী মানুষ আমার হৃদয়ের অস্থিরতা দেখেনি,

আমার বাহ্যিক অবস্থায় তারা দেখেছে মাত্র,

আমার অন্তরে সুপ্ত অস্থিরতা তারা দেখেনি। (হক -১০৩, পৃ. ৫)

মুসলমানদের তো এমন একটা যুগও অতীত হয়েছে মুসলমানদের প্রাথমিক যুগ) যখন তাদের হাতে বর্তমান যুগের মতো সম্পদ বৈভব আর না ছিলো কোনো সাজ সরঞ্জাম আর না ছিলো কোনো বিশাল রাজত্ব। তা সত্বেও তারা এ পৃথিবীতে একটি বিরাট জাতি হিসাবে নিজেদেরকে পরিচিত করে তুলে ছিলেন যে কারণে সমগ্র বিশ্ব তাদেরকে সন্মান দিতো এবং তাদেরকে পরাভূত করতে পারে এমন কারো সাধ্যো ছিলো না, বরং তাদের ঐক্য এবং প্রবল আধ্যাত্মিক শক্তির কারণে তারা বড় হড় শক্তিশালী জাতিগুলোকে পরাজিত করেছে এবং তাদেরকে নতি স্বীকারে বাধ্য করেছে। তিনি বলেন:

مٹایا قیصر وکسری کے استبداد کو جس نے

وہ کیا تھا؟ زور حیدر' فقر بوذر صدق سلمانی

کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا!

نگاہ مرد مؤمن سے بدل جاتی نہیں تقدیری

যে জিনিস রোম সম্রাট ও সাসানি সম্রাটের

জুলুম নিপড়নকে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিলো

Dhaka University Institutional Repository

সেটা কী জিনিস? তা ছিলো হায়দারের বাহুবল,

আবু যারের দারিদ্র্য এবং সালমানের সততা।

(বলো) কেউ কি তাদের বাহুবলকে অনুভব করতে পারে?

মর্দে মুমিন এর দৃষ্টিশক্তিতে মানুষের ভাগ্যলিপি ও পরিবর্তত হয়ে যায়। (হক ১০৩, পৃ. ৫)

বর্তমানে যদি মুসলিম উম্মার স্বাধীনভাবে বেঁচে থাকতে চায় তাহলে তাদের প্রাথমিক দায়িত্ব হচ্ছে তাদের কথা ও কর্মে, ধ্যান ও ধারণায় ঐক্য ও সংহতি সৃষ্টি করতে হবে। এবং ঐক্যের মূল সূত্র হবে তাওহীদ ও রেসালাত তথা আল্লাহর একত্ববাদ ও মহানবীর (সা.) এর মিশন। এ প্রসঙ্গে ইকবাল বলেন:

ما سوا اللہ مسلمان بندہ نیست　　پیش فرعون سرش افگندہ نیست

মুসলমান আল্লাহ ছাড়া আর কারো দাস নয়,

ফেরাউনী শক্তির নিকট তার মাথা নত হয় না। (হক -১০৩, পৃ. ৫)

মুসলিম জাতির ঐক্য প্রতিষ্ঠায় ইকবালের নিরন্তর প্রচেষ্টা অব্যাহত ছিলো। তাঁর কাব্যচর্চার শুরুর দিকেই তিনি তাওহীদ বিশ্বাসকে মানুষের ঐক্য ও সংহতির দলিল হিসাবে উপস্থাপন করেন যার মানে হচ্ছে এই যে, মানুষের ঐক্য তাওহীদ -বিশ্বাসের ওপর নির্ভরশীল। ইকবাল বলেন:

زبان سے کر گیا توحید کا دعوی تو کیا حصل　　بنایا ہے بت پندار کو اپنا تو نے

کنویں میں تو نے یوسف کو دیکھا بھی تو کیا دیکھا　　ارے عاقل! جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے

তোমার মুখ থেকে যদি তাওহীদের দাবি বাদ যায়

বলো! তবে তার পরিণতি কী হতে পারে?

তুমি তো কল্পিত দেবতাকে নিজের খোদা বানিয়েছো

কূপের মাঝে যদি ইউসূফকে দেখে থাকো তবে কী দেখলে? (ইকবাল -১১, পৃ. ১০১)

ওহে অবচেতন, যা স্বাধীন ছিলো তাকে তুমি পরাধীন ও বন্দী করে দিয়েছো। ইকবাল লক্ষ্য করেছেন যে, যারা নিজস্ব উদ্ভাবনী ও কর্মশক্তিকে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনার্থে কাজে লাগিয়েছে, তারা সফল হয়েছে। ইতিহাসে এর প্রচুর প্রমাণ রয়েছে।

خدا آن ملتی را سروری داد　　که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت سروکاری ندارد　　که دهقانش برای دیگری کشت

আল্লাহ সেই জাতিকেই নেতৃত্ব দান করেছেন

যে নিজের হাতেই নিজের ভাগ্য রচনা করেছে।

আর সে জাতির সাথে আল্লাহর কোনো সম্পর্ক নেই

যাদের কৃষকরা অন্যের জন্য চাষাবাদ করে। (ইকবাল -৫, পৃ. ৩২৩)

বর্তমান যুগের সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য। অনৈক্যের কারণেই আজ মুসলমানরা পৃথিবীর সর্বত্র বিড়ম্বনার শিকার হচ্ছে। কাজেই মুসলমানদেরকে এ বিষয়টি যতার্থভাবে উপলদ্ধি করতে হবে।

Dhaka University Institutional Repository

ইসলামের প্রতি আহ্বান মানে হচ্ছে ঐক্যের প্রতি আহ্বান। কারণ, ঐক্য তাওহীদের দৃষ্টিভঙ্গি থেকেই উদ্ভূত। ইসলামের আবির্ভাবের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমগ্র জাতি-চাই আরব হোক, তুর্ক হোক, পারস্য বা ইরানি হোক সবাইকে নিয়েই এই পৃথিবীর বুকে একটি মহান সম্প্রদায় গড়ে তোলা যার নাম হবে মুসলিম বা ইসলামি উম্মাহ। এভাবে সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় যে জাতিসত্তা গঠিত হয় তাকে পৃথিবীর কোনো শক্তি পরাভূত করতে পারে না। পাশ্চাত্যের সংকীণ্র জাতীয়তাবাদ থেকে উদ্ভূত দৃষ্টিভঙ্গি পৃথিবীর জাতিসমূহকে ভিন্ন ভিন্ন জাতিতে রূপান্তরিত করে শাসন ও শোষণের যে পরিকল্পনা নিয়ে থাকে ইসলাম তা সমর্থন করে না। কারণ, এধরনের জাতীয়তার অর্থ হচ্ছে মানুষের মধ্যে বিভেদ ও পার্থক্য সৃষ্টি করা, পরস্পরকে পস্পরের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেয়া। ইসলামি ঐক্য সাধারণত পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ব বন্ধনের ওপর প্রতিষ্টিত। একজন মুসলমান সে পৃথিবীর যে স্থানেই বাস করূক না কেনো সে মুসলিম উম্মাহর একজন সদস্য এবং উম্মাহর ভালো-মন্দ, কল্যাণ অকল্যাণ তাকে প্রতিনিয়ত সম্পৃক্ত করে থাকে। মহাকবি ইকবাল মনে করতেন মুসলমান মুসলিম দেশসমূহের মূলসমস্যা হচ্ছে তাদের মধ্যে বিভক্তি, অনৈক্য ও বিরোধ। যে কারণে মুসলমানরা ক্রমশ দূর্বল হয়ে পড়েছে। তিনি কুরআনের এই বাণীসমূহ মর্মে মর্মে উপলদ্ধি করেছিলেন।

ان الذين فرقوا دينهم و كانوا شيعا لست منهم في شئ

যারা নিজেদের জীবন ব্যবস্থাকে খণ্ড খণ্ড করে দিয়েছে এবং দলে দলে বিভক্ত হয়ে পড়েছে তাদের সাথে নিশ্চয়ই তোমার কোনো সম্পর্ক নেই। (কুরআন ৬-১৫৯)

ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم اصبرو ان الله مع الصابرين

তোমরা পরস্পর ঝগড়া-বিবাদ করো না, অন্যথায় তোমাদের মধ্যে

দুর্বলতা সৃষ্টি হবে এবং তোমাদের প্রতিপত্তি নিশেষ হয়ে যাবে।

ধৈর্যসহকারে কাজ করো আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে রয়েছেন। (কুরআন ৭:৪৬)

ইকবাল মনে করেন ধর্মীয় ও সামাজিক ঐক্য মূলত তাওহীদের মর্মবলীর মধ্যেই নিহিত রয়েছে। কারণ ঐক্যের মূল কেন্দ্র হচ্ছে তাওহীদ। যারা স্রষ্টায় বিশ্বাসী নয় এবং বিশ্বাসী নয় স্রষ্টার একত্ববাদে, তাদের মধ্যে পার্থিব ও অপার্থিব কোনো ঐক্যই কার্যকরী হতে পারে না। কারণ, তাওহীদভিত্তিক ঐক্যের যে দৃষ্টিভঙ্গি তা এতোই ব্যাপক ও বিস্তৃত যে, তাওহীদে যারা বিশ্বাসী নয় তাদের র্দষ্টিভঙ্গি সংকীর্ণতার উর্ধ্বে স্থিতিলাভ করতে পারে না।

قوت دين از مقام وحدت است　　　وحدت از مشهود گردد ملت است

كثرت هم مدعا وحدت شود　　　پخته چون وحدت شود ملت شود

একত্ববাদ থেকেই ধর্মীয় শক্তির উন্মেষ ঘটে থাকে

এই ঐক্য যখন প্রতিভাত হয়, পরিগঠিত হয়, পরিগঠিত হয় জাতি। (ইকবাল- ৫, পৃ. ২৮০)

বিপুল সংখ্যক লোক যখন একটি উদ্দেশ্য বহন করে তখন তা তাদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে।আর ঐক্য যখন পরিপক্ক হয় তখন একটি শক্তিশালী জাতি গঠিত হয়। একজন কবি ও মানুষ হিসাবে ইকবাল নিজেকে স্থান ও কালের বন্দিত্ব থেকে মুক্ত করেছেন এবং মানবতাকে স্বীয় কবিতার চৈন্তিক অক্ষ হিসাবে গ্রহণ করে কবিত্বকে অনুপ্রেরণার এক বিরাট উৎসে পরিণত করেছেন। ইকবালের দৃষ্টিতে মিল্লাত মানে এমন কোনো জাতি নয় যে, ভৌগলিক বিচার তা কোনো স্থানবিশেষে অবস্থান গ্রহণ করবে।

ملت از يكرنگى دلهاستى　　　روشن از يک جلوه اين سيناستى

اهل حق را حجت و دعوى يكى است　　　خيمه هاى ما جدا دلها يكى است

از حجاز و چين و ايرانيم ما　　　شبنم يک صبح خندانيم ما

Dhaka University Institutional Repository

كثرت هر مدعى وحدت شود وحدت شود   پخته چون وحدت شود ملت شود

মিল্লাত হলো হৃদয়সমূহের অভিন্ন রং

এই সীনাই এর এক ঝলক ঔজ্জ্বল্য।

সত্যপন্থীদের দলিল ও দাবি অভিন্ন,

আমাদের তাঁবুগুলো ভিন্ন, কিন্তু হৃদয়গুলো অভিন্ন।

আমরা হেজায, চীন ও ইরানি,

একই প্রভাতের হাস্যোজ্জ্বল শিশিরবিন্দু আমরা।

প্রতিটি দাবির বহুত্বই ঐক্যে পরিণত হয়। (ইকবাল-৫, পৃ. ৬৩)

ঐক্য যখন দৃঢ় হয় তখন জাতিতে পরিণত হয়। ইকবালেরের নিকট মুসলমানদের জন্য ইসলামই হচ্ছে তাদের জাতীয়তার পরিচয় ও দেশপ্রেমের ভিত্তি। আর যতদিন পর্যন্ত এই চিন্তাধারা তাদের মধ্যে জীবিত ছিলো ততোদিন পর্যন্ত তাদের ঈমানের ভিত্তিতেই তাদের ঐক্য প্রতিষ্ঠিত ছিলো এবং তাদের গৌরবও ভাগ্যে জুটেছিলো।

যদি নবী করিম (সা.) মক্কার কাফেরদেরকে যদি বলতেন যে, তোমরা তোমাদের দেবদেবীর পূজা অর্চনায় অটল থাকো এবং আমরাও তাওহীদের ওপর অটল থাকবো। তা হলো আঞ্চলিক, বংশীয় ভাষাগত এবং দেশগত অংশীদারিত্বের কারণে তোমাদের এবং আমাদের মধ্যে বর্তমান রাজনৈতিক সমঝোতা প্রতিষ্টিত করে একটি আরব জাতীয়তাবাদী ঐক্য প্রতিষ্টা করে নিতে পারি। তবে এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, এর ধর্ম এবং শাসনব্যবস্থা ও উভয়টির মধ্যে সমন্বয় সাধন করতে পারতো। কিন্তু এটি মহানবী (সা.) এর পথ ও পদ্ধতি হতো না। অথচ মহানবী (সা.) নিজের গোত্র ও দেশ ত্যাগ করে মদীনাতে উপনীত হয়ে ঈমানের ওপর ভিত্তিশীল এবং মুহাজিরদেরকে ঐক্যবদ্ধ করে একটি নতুন রাষ্ট্রের ভিত্তি স্থাপন করেন যাতে ধর্ম ও শাসন ব্যবস্থায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। (জাবেদ-১০৪, পৃ. ১০২) ইকবাল বলেন:

فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں   موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں

ব্যক্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে জাতির সাথে সম্পর্কের মাধ্যমে

অথচ এককভাবে সে কিছুই নয়,

তরঙ্গের অস্তিত্ব কেবল সমুদ্রের মাঝেই-

সমুদ্রের বাইরে এর কোনো অস্তিত্ব নেই। (Ed khawaja-105 p 124)

ইকবাল ছিলেন ঐক্যের আহ্বায়ক। তিনি মুসলিম জাতিকে ইসলাম ধর্ম রক্ষায় ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান। তিনি মুসলমানদের ধন দৌলত ও সকল কামনা বাসনা যেন ধর্ম ও কাবার হেফাজতের জন্য নিবেদিত হয় তাই প্রার্থনা করেছেন। তাঁর কামনা ছিলো মিশর থেকে শুরূ করে চীন পর্যন্ত সকল মুসলমান এক ও অভিন্ হয়ে যাক। অন্যথায় তারা ক্রমান্বয়ে নিচিহ্ন হয়ে যাবে।]

سیاست چھوڑکر داخل حصار دیں میں ہو   ملک و دولت ہے فقط حفظ حرم کا اک ثمر

ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لئے   نیل کے ساحل سے لے کر تا بخاک کاشغر

পুনরায় রাজনীতি ছেড়ে দিয়ে ধর্মের গণ্ডির মধ্যে প্রবেশ করো

ধন দৌলত এ সবই যেন হয় কেবল তোমার পবিত্র কাবা রক্ষার উদ্দেশ্যে

Dhaka University Institutional Repository

পবিত্র মক্কা ও কাবা রক্ষায় এক হও হে মুসলিম জাতি।

নীলনদের তীর থেকে কাশগড়ের ভূমি পর্যন্ত। (ইকবাল ১১, পৃ. ২৯৫)

জাতির জীবন যখন ঐক্য চিন্তার ওপর প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তখন জাতি অগ্রগতি সাধন করতে পারে। অর্থাৎ যখন এ জাতির সকল মানুষ একই চিন্তার অধিকারী হয়ে যায় তখনই কল্যাণ বয়ে আনে। এখানে অভিন্ন চিন্তা দু,রকমের হতে পারে। একটি হলো বিশ্বাসকেন্দ্রিক অভিন্ন চিন্তা অর্থাৎ একটি জাতির সকল মানুষ একই বিশ্বাসের অনুযায়ী হবে এবং তারা বিচ্ছিন্ন হবে না। এর অর্থ হলো তারা একমাত্র কুরআন ও সুন্নাহর অনুসারী হবে। দ্বিতীয়টি হলো একটি জাতির সামনে তাদের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকেন্দ্রিক চিন্তা। এ অবস্থায় জাতির সকল মানুষ একই পদ্ধতির ব্যাপারে চিন্তা করবে। এসবকেই বলা হয় ঐক্যচিন্তা।

ঐক্যের সংরক্ষণ হুকমত বা শাসনব্যবস্থা ছাড়া প্রতিষ্টিত হতে পারেনা। এ জন্য জাতিকে শক্তি সামর্থ্যের ধারোক হতে হবে। যদি কোনো ব্যক্তি এই ঐক্যকে ধ্বংস সাধনে চেষ্টা করে তবে জাতিকে শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে ব্যক্তির সংশোধন করা বাঞ্ছনীয়। এখানে শক্তি প্রয়োগ প্রয়োজন হয়ে উঠে যেখানে চিন্তাশক্তি খুব একটা কাজে লাগে না। এ ক্ষেত্রে পুরো জাতির অগ্রগতি ও উন্নতির জন্য যেকোনো পদক্ষেপই গ্রহণযোগ্য। (চিশতী ১০৬, পৃ. ১৩২)

ہے زندہ فقط وحدتِ افکار سے ملت　　وحدت ہو فنا جس سے وہ الہام بھی الحاد

وحدت کی حفاظت نہیں بے قوتِ بازو　　آتی نہیں کچھ کام یہاں عقلِ خداداد

চিন্তার ঐক্যের মাধ্যমেই জাতি জিন্দা থাকে

যে এলহাম (স্বর্গীয় বার্তা) ঐক্য বিলীন হয়

তা এলহাদে (নাস্তিকতায়) পরিণত হয়।

ঐক্যের সংরক্ষণ বাহু শক্তি ছাড়া হয় না

এখানে শুধু যুক্তি বুদ্ধি কোনো কাজে আসে না। (ইকবাল -১১, পৃ. ৫৪৮)

ইকবাল মনে করেন মুসলিম মাত্রেরই বল-বিক্রম, শীর্য-বীর্য, মাহাত্ম ও শক্তি-সামর্থ্য এই চারটি বৈশিষ্ট্য থাকা প্রয়োজন। আর এ বৈশিষ্ট্যগুলো নিয়েই সংগ্রামে ঝাপিয়ে পড়তে হবে তাঁকে। তবে এ সংগ্রাম কোনো পাশবিক প্রবৃত্তি চরিতার্থ করার জন্য নয়, বরং আল্লাহর বাণীকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়ে আল্লাহর রাজত্ব কায়েম করার উদ্দেশ্যে বিরত থাকতে হবে। ইকবালের চিন্তাপ্রসূত এ সংগ্রাম বা আন্দোলনের মাধ্যমেই পৃথিবীর বুকে আল্লাহর প্রতিনিধিত্ব কায়েমসহ শান্তি ও ঐক্য প্রতিষ্টিত হতে পারে।

জাতীয়তাবাদ (Nationalism):

জাতীয়তাবাদ (Nationalism) সম্পর্কে ইকবালের অভিমত এতই সুস্পষ্ট যে, সে বিষয়ে খুব বেশি আলোচনা করা অপ্রয়োজনীয়। জাতি বা নেশন বলতে মানুষের একটি সমষ্টিকে বুঝায়। যে জাতীয়তার ভিত্তি দেশ, বর্ণ, গোত্র, এবং ভাষার ঐক্যের উপর স্থাপিত, ইকবাল এই ধরনের জাতীয়তাবাদের ঘোর বিরোধী ছিলেন। ইংল্যাণ্ড গমনের পূর্বে তিনি দেশভিত্তিক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিলাত গমনের পর তার এ মনোভাবের পরিবর্তন ঘটে। তিনি সেখানে গভীরভাবে ইউরোপীয় দর্শন ও ইসলামি দর্শনে অধিকতর পড়াশোনা করে বুঝতে পারলেন যে, কুরআনে বর্ণিত ধর্মভিত্তিক তথা তাওহীদ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদই সত্য, ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ নয়। সেখানে বসেই তিনি বলতে লাগলেন:

نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا

Dhaka University Institutional Repository

بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے

সারা বিশ্ব থেকে ভিন্নতর করেছেন এ মিল্লাতের ভিত্তিকে আরবের স্থপতি;

দেশ নয় আমাদের মিল্লাত-কেল্লার ভিত্তি। (ইকবাল-১০৭, পৃ. ১৪৪)

ইউরোপ জাতীয়তা ভিত্তি হলো ভাষা, বর্ণ, দেশ ও গোত্র| ইকবালের মতে এই জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসনবাদ গোত্রে জাতীয়তাবাদ এই ; বৈষম্যের বর্ণ দেয় জন্ম জাতীয়তাবাদ এই ; সৃষ্টি গোত্রে ব্যবধান। করেএতে এক দেশ নিজ দেশের স্বার্থে অপর দেশের প্রতি রাখে লুলুপ দৃষ্টি দেশ এক ; আনতে কেড়ে দৌলত-ধন দেশের অপর চায়সম্পদে র চালায় হামলা দেশ ক উপর; দেশের ধনের সাদা মানুষ অবজ্ঞা করে কৃষ্ণ মানুষকে দেখে চক্ষে ভিন্ন মানুষকে গোরা মানুষ বর্ণের কৃষ্ণ সমাজ ; আনে শ্রেণিগত অসাম্য| এই জাতীয়তাবাদে পৃথিবীতে জাতির সংখ্যা বেড়েই চলে চলে দেশে দেশে বৈরিতা। ও প্রতিযোগিতা ইউরোপ গিয়ে ইকবাল এমন একটা দুনিয়া দেখলেন, যা ছিলো তাঁর জন্য দুশ্চিন্তার কারণ। তিনি লক্ষ্য করলেন, ইউরোপীয় সভ্যতার বাহ্য চোখ ঝলসায় বটে, কিন্তু এর ভিতরটা ফাঁকা| এ সভ্যতা পুঁজিবাদ ও জড়বাদ ভিত্তিক। এরা নানা ছুতোনাতা দাঁড় করে বিশ্বের সাথে প্রতাড়ণা করছে; শাসন আর শোষণ চালিয়ে যাচ্ছে; এদের মধ্যে নীতির বালাই নেই। ইকবাল ভাবলেন, সকল মানুষ যদি আদম সন্তানই হয়, তবে মানুষে মানুষে এত পার্থক্য কেন?

এই স্বাদিশকতা ও জাতীয়তা সম্পর্কে ইকবালের বিস্তারিত অভিমত জানার জন্যে আমরা তাঁর বিরাট কাব্যের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। ইকবালকাব্য পাঠে উপলব্ধি করা যায় যে প্রচলিত জাতীয়তাবাদের ইকবাল কর বিরোধিতা প্রকাশ্যে ধারণারছেন এবং বিশ্বের সার্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের প্রতি শ্রদ্ধাশীল মানুষ কে এই অস্বাভাবিক ও অবাঞ্ছিত জাতীয়তাবাদকে অস্বীকার করার জন্যে আহবান জানিয়েছেন। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করেছেন:

اقوام جہاں میں ہے رقابت تو اسی سے　　تسخیر ہے مقصود تجارت تو اسی سے

خالی ہے صداقت سے سیاست تو اسی سے　　کمزور کا گھر ہوتا ہے غارت تو اسی سے

اقوام میں مخلوق خدا بٹتی ہے اس سے　　قومیت اسلام کی جڑ کٹتی ہے اس سے

এরই ফলে সৃষ্টি হয় দ্বন্দ্ব
বিশ্বের জাতিসমূহের মধ্যে
বিশ্বজয়ই লক্ষ্য হয়ে উঠে

ব্যবসা বাণিজ্যের ;
এরই ফলে রাজনীতি হয়
ন্যায়নীতির সম্পর্ক বর্জিত,
দুর্বলের সংসার হয় বিপর্যস্ত
এরই প্রভাবে।।
জাতীয়তাবাদ বিছিচন্ন করে দেয়
মানব ঐক্যের বন্ধন,
ইসলামি কাওমিয়াতের
বন্ধন হয় ছিন্নবিচ্ছিন্ন।- (ইকবাল-১১, পৃ. ১৮৮)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল ইউরোপের এই সংকীর্ণ চিন্তাধারা ও কর্মের বিপরীতে যেমনি ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্ত তেমন ছিলেন বিমূঢ়। সেখানে একদিকে যেমন শত ধর্মের মোকাবেলায় মানবিকতার দর্শনের বড় ধুমধাম করে প্রচার করা হয়ে থাকে ,অপরদিকে এই ভুখণ্ড জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতাবাদের ন্যায় এমনি ধ্বংসাত্মক মতবাদের সৃষ্টি করে এ পুরো ভুখণ্ডের মানুষকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য যে, পশ্চিমাদের অবলম্বিত জাতীয়তাবাদ ও ধর্মহীন রাজনীতির ফলে গত বিশ শতকে ঘটে গেলো দুটি বিশ্বযুদ্ধ। বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলিম মনীষী এ কথায় একমত যে ,স্বাদেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের চেতনাই হলো যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ। (তারিক ৫৩, পৃ. ২৫৫)

অন্যদিকে প্রাচ্যের তথা মুসলিম জাতীয়তাবাদের ক্ষেত্রে ভৌগলিক সীমারেখা, দেশ, ভাষা, বর্ণ ও গোত্রের কোনো বালাই নেই। এই জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো ধর্মীয় বিশ্বাস তথা তাওহীদ। এই মতবাদে জাতির সংখ্যা হ্রাস পায় এবং তা নেমে আসে দুইয়ের কোঠায়-আস্তিক ও নাস্তিকে সারা বিশ্বের মুসলমান এক জাতির আওতায় চলে আসে; এই জাতিত্ববোধ মানুষে মানুষে অনৈক্য দূর করে এবং বাড়িয়ে দেয় পরস্পর মিল মহব্বত। সারা বিশ্বের মুসলমান ভাই ভাইয়ে পরিণত হয়। ইসলামে জাতীয়তাবাদকে ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়। মানুষ ও মানুষের মধ্যে ইসলাম কোনো বৈষয়িক, বস্তুভিত্তিক কিংবা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য পার্থক্য সমর্থন করে না। ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মূল থেকে উদ্ভূত। বিশ্বের মানবজাতির মধ্যে দল গোত্রের পার্থক্য কেবলমাত্র পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্যই করা হয়েছে। পরস্পরের হিংসা –বিদ্বেষ, গৌরব-আহঙ্কার বা ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে নয়। এই বাহ্যিক পার্থক্য ও বিরোধের কারণে মানবতার মৌলিক ঐক্য ভুলে যাওয়া অন্যায়।

জাতীয়তাবাদের বাহ্যিক আবরণ খুবই মনোমুগ্ধকর বটে; কিন্তু ইউরোপীয় জাতিসমূহের লালসা এবং জাতীয়তাবাদী দেশসমূহের ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা কোন অনুভূতিশীল অন্তরের কাছে সহনীয় হতে পারে না। ইকবাল জাতীয়তাবাদের মূল উৎস ও প্রধান কেন্দ্রকে সুস্পষ্টরূপে উপলদ্ধি করে মর্মান্তিকভাবে হতাশ হয়ে উঠেছেন। ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাদের তীব্র প্রতিবাদ এবং এর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা, তেমনি অপর দিকে রয়েছে ইসলামি জাতীয়তার প্রতি অকুন্ঠ বিশ্বাস এবং এর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ। এ সম্পর্কে ইকবাল বলেন:

قلب ما از هند روم و شام نیست   مرزو بوم او بجز اسلام نیست
مسلم استی دل باقلیمی مبنه   گم مشو اندر جهان چوں و چند
دل ببست آورکه پنها ئے دل   من شود گم این سرائے آت گل
ازر سالت در جهان تکویں ما   ازرسالت دین ما ایمان ما

সিরিয়া,তুরস্ক বা ভারতের সাথে
জন্মভুমি তার আর কোথাও নয়
জন্মভুমি তার আর কোথাও নয়
ইসলাম ছাড়া
আবদ্ধ করো না তোমার অন্তর
কোনো দেশের বন্ধনে,
হারিয়ে ফেলো না তোমার আপনাকে
বিরোধের বিশ্বে
জয় কর অন্তর ,
কারণ তার বিপুল প্রসারের মাঝে
আত্মবিলুপ্ত হতে পারে
জল ও কর্দমের সমগ্র পান্থ নিবাস।
নবুয়তের ভিত্তিতে কায়েম হয়েছে
আমার অস্তিত্ব দুনিয়ার বুকে,

Dhaka University Institutional Repository

নবুয়তের ভিতরেই নিহিত রয়েছে
আমার দ্বীন ও ঈমান। (ইকবাল- ১০৭, পৃ. ১২৯-৩০)

কোনো ভাষা, গোত্র, বর্ণ, কোনো ধন সম্পত্তি বা জমির বিরোধ ইসলামের পরিসীমার –মুসলমানদের মধ্যে পরস্পরে কোনো বৈষম্যমূলক সীমা নির্ধারণ করতে পারে না। সে অধিকার কারো নেই। মুসলিম ব্যক্তি চীনের বাসিন্দা হোক, কি মরক্কোর বাসিন্দা হোক-কৃষ্ণাঙ্গ গোক আর সেতাঙ্গ হোক, হিন্দি ভাষাভাষি হোক,কি আরবি হোক, একই রাষ্টের নাগরিক হোক কি বিভিন্ন রাষ্ট্রের সমাজের সদস্য হোক, ইসলামি সৈন্যবাহিনীর তারা সৈনিক, ইসলামি আইন ও বিধানের সংরক্ষক। ইসলামি শরীয়তের একটি ধারাও ইবাদত, পারস্পরিক লেনদেন, সমাজব্যবস্থা, অর্থনীতি, রাজনীতিকোনো একটি ব্যাপারেও লিঙ্গ, ভাষা বা জন্মভুমির দিক দিয়ে মুসলমানদের মধ্যে বিন্দুমাত্র পার্থক্য করে না- কউকে অন্য কারো ওপর শ্রেষ্ঠ বা হীন বলে অভিহিত করে না।

ইসলামি জাতীয়তার মধ্যে একাধিক জাতীয় স্থান পেতে পারে না। ইসলামি জাতীয়তার মধ্যে বংশীয় স্বাদেশিক ভাষা ও বর্ণ ভিত্তিক জাতীয়তার সমাবেশ হওয়া সম্পূর্ণই অসম্ভব। যে ব্যক্তি প্রকৃত মুসলমান হয়ে বেঁচে থাকা ও বাস করাই যার চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত, অন্যান্য দুনিয়ার তাকে সিদ্ধান্ত চুড়ান্ত যার করাই বাস ও থাকা মবেঁচে সম্মানক সম্পর্ক প্রকার রক্তের এবং মাটি হবে। করতে বাতিল অনুভূতিকে জাতীয়তার প্রকার সকল ও ছিন্ন ভ জাতীয়তার মি অস্বীরতেভিত্তি বংশ মতবাদ জাতীয়তা ইসলামি নয়। প্রতিষ্টিত উপর স্বাদেশিকতার বা গোত্র, | স্থাপিত উপর কর্মাদেশের ও বিশ্বাস দুনিয়ার সনমগ্র মুসলমান সর্বপ্রকার জাতাগত বৈষম্যের উর্ধ্বে থেকে পরস্পরের সুখ দুখের অংশীদার এবং সহযোগী ও সহকর্মী হতে পারে। এক দেশের মুসলমান এবং অন্য দেশের মুসলমানদের মধ্যে ভৌগোলিক বা বংশীয় গোত্রীয় কোনো পার্থক্য নেই। এ ব্যাপারে ইসলামের মূলনীতি এবং পাশ্চাত্য দেশের নিয়মনীতি পরস্পরবিরোধী। সে দেশের জন্য যা শক্তির কারণ ইসলামের , ও ভাঙন তাতে পক্ষে জাতী পাশ্চাত্য সঙ্গী যাহাই ইলামের পক্ষান্তরে ঘটে। বিপর্যয়তার জন্য তাই হত্যাকারী বিষ।

ইকবাল বিলাত গমনের পূর্বে তিনি দেশভিত্তিক অখণ্ড ভারতীয় জাতীয়তাবাদে বিশ্বাসী ছিলেন। কিন্তু বিলাত গমনের পর তাঁর এ মনোভাবে পরিবর্তন ঘটে। তিনি সেখানে গভীরভাবে ইউরোপীয় দর্শন ও ইসলামি দর্শনে অধিকতর পড়াশোনা করে বুঝতে পারলেন যে কুরআনে বর্ণিত ধর্মভিত্তিক তথা তাওহিদ-ভিত্তিক জাতীয়তাবাদই সত্য ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদ নয়| ইউরোপে থাকা অবস্থায়ই তিনি বলতে লাগলেন:

نرالا سارے جہاں سے اس کو عرب کے معمار نے بنایا
بنا ہمارے حصار ملت کی اتحاد وطن نہیں ہے

সারা বিশ্ব থেকে ভিন্নতর করেছেন এ মিল্লাতের ভিত্তিকে আরবের স্থপতি;
দেশ নয় আমাদের মিল্লাত-কেল্লার ভিত্তি। (ইকবাল বাংগেদারা পৃ. ১৪৪)

ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হলো- দেশ, বর্ণ, ভাষা এ গোত্র | ইকবালের মতে এই জাতীয়তাবাদ সৃষ্টি করে সম্প্রসারণবাদ ও আগ্রাসনবাদ; এই জাতীয়তাবাদ জন্ম দেয় বর্ণ বৈষম্যের; এই জাতীয়তাবাদ গোত্রে গোত্রে সৃষ্টি করে ব্যবধান। এতে এক দেশ নিজ দেশের স্বার্থে অপর দেশের প্রতি রাখে লুলুপ দৃষ্টি; এক দেশ কেড়ে আনতে চায় অপর দেশের ধন-দৌলত; এক দেশ হামলা চালায় অপর দোশের উপর; গোরা মানুষ অবজ্ঞা করে কৃষ্ণ মানুষকে; কৃষ্ণ বর্ণের মানুষ গোরা মানুষকে ভিন্ন চক্ষে দেখে; সমাজে আনে শ্রেণীগত আসাম্য। এই জাতীয়তাবাদে পৃথিবীতে জাতির সংখ্যা বেড়েই চলে; দেশে দেশে চলে প্রতিযোগিতা ও বৈরিতা।

(আবদুল্লাহ – ৮০, পৃ. ৩৯)

ইউরোপে থাকাকালীন স্বাদেশিকতা ও জাতীয়তাবাদের ঐতিহাসিক আন্দোলন সমুহ এবং রাজনৈতিক প্রভাব ও তার ফলাফলকে অধ্যয়ন ও পর্যবেক্ষণের সুযোগ মিলেছিলো ইকবালের। তিনি যখন গভীর অভিনিবেশসহকারে চিন্তা করলেন,মানবতা পশ্চিমা জগতের ওপর কিভাবে আধিপত্য বিস্তার করেছে তখন তিনি

Dhaka University Institutional Repository

বুঝতে পারলেন যে, এর ভিত পশ্চিমা সভ্যতার উপর ভিত্তিশীল। পশ্চিমাবাসীদের সর্বপ্রথম চিন্তাধারার উৎস ও অধিকাংশ মতবাদই গ্রীক দর্শন থেকে উৎসারিত। প্রাচীন গ্রীক মনীষীদের রাজনৈতিক ধ্যান- ধারণার ভিত্তি একটা সময় পর্যন্ত চারিত্রিক ও নৈতিক দক্ষতার ওপরই ছিলো; কিন্তু খ্রিস্টীয় দ্বৈত মতবাদ প্রথমদিক থেকেই ধর্ম ও চরিত্রকে রাজনীতি থেকে পৃথক করে দিয়েছিলো।

দেশপ্রেম সত্যপ্রেমের স্থান দখল করে নেয়। প্রাচীনকালের প্রচলিত দেশপ্রেম মানুষ এবং মানবিক দক্ষতাকে বিসর্জন দিয়েছিলো। এলড্যাস হাক্সলে এর মতে স্বাদেশিকতা মূর্তিপূজার ধর্মের আকৃতি ধারণ করে আছে-যাতে প্রধান ব্যক্তিকে খোদার বরণ করা হয় এবং এ প্রভু মানুষের নিকট থেকে অধিক ত্যাগ কামনা করে। এর পূঁজারী হোয়ার ফলে, এ থেকে মানুষের পশুসুলভ চেতনা তথা ঘৃণা,শত্রতা এবং প্রতিশোধের মানসিকতা উদগত হয়। (ফাতেমা-১০৮, ২১৮)

ইকবাল ইউরোপের এই সংকীর্ণ চিন্তাধারা ও কর্মের বিপরীতে যেমনি ছিলেন দুশ্চিন্তাগ্রস্র তেমন ছিলেন বিমুঢ়। সেখানে একদিকে যেমন শত ধর্মের মোকাবেলায় মানবিকতার দর্শনের বড় ধুমধাম করে প্রচার করা হয়ে থাকে, অপরদিকে এই ভুখন্ডে জাতীয়তাবাদ ও স্বাদেশিকতাবাদের ন্যায় এমনি ধ্বংসাত্মক মতবাদের সৃষ্টি করে এ পুরো ভুখণ্ডের মানুষকে প্রতিনিয়ত কষ্ট দিয়ে যাচ্ছে। এ কথা সত্য যে, পশ্চিমাদের অবলম্বিত জাতীয়তাবাদ ও ধর্মহীন রাজনীতির ফলে গত বিশ শতকে ঘটে গেলো দুটি বিশ্বযুদ্ধ। বর্তমান যুগের অধিকাংশ মুসলিম মনীষী এ কথায় একমত যে, স্বাদেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের চেতনাই হলো যুদ্ধ-বিগ্রহের মূল কারণ। (তারিক-৫৩, পৃ. ২৫৫)

বায়তুল মুকাদ্দাসে সমাহিত মাওলানা মুহাম্মদ আলী জান্নাত আশিয়ানকে একজন অমুসলিম জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে, আপনার প্রথম পরিচয় কী? হিন্দুস্তানী অথবা মুসলিম? তখন উত্তর দিয়েছিলেন: ‘আমি প্রথম মুসলিম’ মধ্যখানে ও মুসলিম এবং সর্বশেষ ও মুসলিম। ইসলাম এভাবেই আমার হৃর্য কন্দরে ঠাঁই নিয়েছে। এখন অন্য কোনো চিন্তা-ভাবনার অবকাশ আমার নেই।‘ বেশ’ একথাই আল্লামা ইকবাল তাঁর এ আলোচ্য وطنیت (স্বাদেশিকতা) কবিতায় ব্যক্ত করেছেন। কাজেই ,স্বাদেশিকতা, সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদের এই রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গি সন্মুখে রেখে প্রত্যেক মুসলমান নিজেই এই মীমাংসায় উপনীত হতে পারে যে, দেশ কথাটি যখন কোনো রাজনৈতিক দৃষ্টিকোণ থেব্যবহারকরা হয় তখন তা ইসলামের সাথে সাংঘর্সিক হয়ে দাঁড়ায়। কেননা, কোনো মুসলমান যখন স্বাদেশিকতার এই পদ্ধতি এক জাতীয়তাবাদ হিসাবে গ্রহন করে তখন সে ইসলাম থেকে দূরে অবস্থান করবে। নিঃসন্দেহে স্বাদেশিকতা-যা সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদেরই নামান্তর, তা ইসলামের বিপরীতধর্মী মতাদর্শ বৈ অন্য কিছু নয়। আর এই দুটি দৃষ্টিভঙ্গি সমান্তরাল হতে পারেনা। এ কারণেই ১৯৩৮ সালে মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী দেওবন্দী দিল্লীতে এক জনসভায় যখন বলে ছিলেন:বর্তমান যুগে জাতিগুলো দেশসমুহের ভিত্তিতে গঠিত হয়ে থাকে’-তখন ইকবাল তাঁর এ অনৈসলামি দৃষ্টিভঙ্গির বিরোধীতা করেছিলেনন জোরালোভাবে। প্রকৃত প্রস্তাবে দেশপূজার এ মুর্তি পাশ্চাত্য সভ্যতারই সৃষ্ট-যা মহানবীর আনীত মিশনের শত্রু। ইসলামের দৃষ্টিতে দেশ ও স্বাদেশিকতার ধারণা হচ্ছে এই যে, দেশকে ভালোবাসো এবং সংরক্ষণের ব্যবস্থা করো; কিন্তু যদি পরিস্থিতি এমনই দাঁড়ায় যে, তুমি সেখানে আল্লাহর বাণী বুলন্দ করতে পারেব না তাহলে দেশত্যাগ করতে কুন্ঠিত হয়ো না। কারণ, জীবনের চূড়ান্ত লক্ষ্য দেশ নয়-আল্লাহ ও তাঁর বিধানের আনুগত্য। আর এ কারনেই ইকবাল সমগ্র জীবনব্যাপী শক্তি দিয়ে এই সংকীর্ণ স্বাদেশিক জাতীয়তাবাদের দৃষ্টভঙ্গিকে প্রত্যাখ্যান করেছেন। এবংবাংগেদারা থেকে আরমগানে হেজায পর্যন্ত সকল গ্রন্থে এ বিষয়টি পরিস্কার করেও তুলে ধরেছেন। (চিশতি ১৫, পৃ. ৪১৮-৪২৩)

ইকবালের দৃষ্টিভঙ্গি অনুযায়ী যারা ইসলামের বিশ্ব ব্যাপকতা ও মহান মানবভ্রাতৃত্বের মতবাদ উপলব্ধি করতে পেরেছেন, তাঁরা এই জাতীয়তাবাদের বিরোধিতার ব্যাপারে ইকবালকে ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যদর্শী বলে স্বীকার করতে বাধ্য হবেন। কারণ এই জাতীয়তাবাদ এমন এক মারাত্মক থিওরি, যার নির্মম নিষ্পেষণ ও মানবতার চরম নির্যাতনে জাতীয়তাবাদের পাদপিঠ ইউরোপই আজ অতিষ্ঠ হয়ে আর্তনাদ করে উঠেছে। আর এই স্বদেশিকতা খিত্তিক জাতীয়তাবাদের দু:সহ বিড়ম্বনা হতে মুক্তিলাভের জন্যে আজ তারা সর্বজাতি-সম্মেলন

Dhaka University Institutional Repository

পরিকল্পনার আশ্রয় খুঁজে বেড়াচ্ছেন। ইউরোপীয় জাতি ইকবাল নিতান্ত অন্ধ জাতীয়তাবাদী বলে মনে করেন। এইজন্য অধুনা নিত্য অনুষ্ঠিত সর্বজাতি সম্মেলনে তাদের বিন্দুমাত্র সদিচ্ছা ও সুউদ্দেশ্য থাকতে পারে, একথাও তিনি ঠিক বিশ্বাস করতে পারেননি। তাই তিনি জাতিসংঘকে পরিস্কার ভাষায় কাফনচোর, অ্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর একান্ত বিশ্বাস, এখানে ও ঠিক ইউরোপীয় জাতিসমুহের স্বভাবসিদ্ধ বিশ্বজয়ের চির পুরাতন কুটিল ষড়যন্ত্রই কাজ করছে। এখানে ও 'সর্বজাতি সম্মলনেই প্রধান-মানব সম্মেলনের কোন গিরত্ত বা মর্যাদাই এখানে নেই। কিন্তু এরই বিরুদ্ধে মানবপ্রেমিক ইকবাল আজীবন সংগ্রাম করেছেন। অধুনাবিলুপ্ত লীগ অব নেসন্স' সম্পর্কে ইকবালের আশংকা সত্য প্রমাণিত হয়েছে। লীগ তার অস্থায়ী জীবনে দুর্বল জাতিদের রক্ষণাবেরক্ষণ করতে মোটেই সমর্থ হয়নি এবং নিরস্ত্রীকরণ (Disarmament) প্রচেষ্টা রিমজে মেয়রের কথানুযায়ী (Armament) সমস্ত্রীকরণ-এ পরিণত হয়েছে। এরই ফলে পৃথিবীর উপর দিয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রলয়কর তাণ্ডবনৃত্য ঘটে গেল। লীগ অব নেশন্স এর মর্মান্তিক পরিণতি ইকবালের জীবদ্দশায়ই সুস্পষ্টরূপে পরিলক্ষিত হয়েছিল। সর্বশেষ এইসব দুরারোগ্য ব্যাধির কারণেই লীগ জীবনের শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করতে বাধ্য হল। এরই দিকে ইশারা করে আল্লামা ইকবাল ভবিষ্যদ্বাণী করছিলেন:

بیچاری کئی روز سے دم توڑ رہی ہے
ڈر ہے خبر بد نہ میرے منہ سے نکل جائے
تقدیر تو مبرم نظر آتی ہے ولیکن
پیران کلیسا کی دعا ہے کہ ڈل جائے

কিছুকাল ধরে বেচারার
নাভিশ্বাস উঠে গেছে,
ভয় হয়, আমারই মুখ থেকে
বেরিয়ে না পড়ে দু:সংবাদ
নিয়তি তার মনে হয়
অবধারিত,
যদিও গীর্জায় যাজকরা
করে চলেছে তার শুভ কামনা। (ইকবাল, ১১,-পৃ. ৩২১)

এক শ্রেণির লোক ইকবালকে এই তথাকথিত জাতীয়তাবাদের বিরোধিতা করতে দেখে জন সাধারণত বুঝতে চাহে যে, ইকবাল স্বদেশের স্বাধীনতার বিরোধী ছিলেন। তাদের এই কথায় আমরা যুগপৎ হাসি ও কান্নায় ম্রিয়মান হয়ে পড়ি। আমরা দৃঢ়তার সাথে বলতে পারি,তারা ইকবালের চিন্তাধারাকে মোটেই উপলদ্ধি করতে সমর্থ হয়নি, এমনকি তারা ইকবালের মতবাদ ও চিন্তাধারা নিরপেক্ষ দৃষ্টিকোণ থেকে গভীরভাবে পর্যালোচনা করে দেখতে ও চেষ্টা করেনি। ইকবাল মাতৃভূমির স্বাধীনতার বিরোধী কিংবা গোলামীর পক্ষপাতী ছিলেন বলে যে জাতীয়তাবাদের বিরোধীতা করেছেন, এই কথা কেবল অর্বাচীন ব্যক্তিরাই বলতে পারে। এই বিরোধিতার মূল কারণ কি ছিল সে সম্পর্কে আমরা আদর্শ সমাজ প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। বড়ই দু:খের বিষয়,যে ব্যক্তি জীবন ভরে সকল মানুষ ও মিল্লাতকে 'খুদীর (আত্মদর্শন) পাঠ শিক্ষা দিলেন, যিনি বন্দেগীনামা রচনা করে প্রমাণ করলেন যে, দাসত্ব ও সত্যিকার আযাদীর জীবন দুইটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র ও পরস্পর বিরোধী জিনিস, যিনি সমগ্র

Dhaka University Institutional Repository

মানব জাতীকে সাধারণ আযাধী, সাধারণ ভাতৃত্ব, সাধারণ বিচার ইনসাফ এবং কষ্ট সহিষ্ণুতার অভিনব পয়গাম শোনালেন,যিনি ‘পাসচে-বায়াদ কর্দ ‘জরবে কলীম’ এবং ‘বালে জিবরীল’ প্রভৃতি গ্রন্থে পাক ভারতের গোলামী এবং এর অধিবাসীদের পারস্পরিক বিবাদ বিসম্বাদ ও ঐক্যহীনতার দু:খে অবারিত ধারায় অশ্রু বিসর্জন করিয়াছেন, সেই মহান ব্যক্তি সম্পর্কে কি করে মানুষ এই মত পোষণ করতে পারে যে, রুশোর মতে যে স্বাধীনতার পিপাসা একটি ক্ষুদ্র পোকা-মাকড়ের মধ্যে ও বিদ্যমান এবং যা ব্যতীত কোন চরিত্রই পূর্ণত্ব লাভ করিতে পারে না- অতটুকু স্বাধীনতার স্পৃহাও ইকবালের হৃদয়ে ছিল না। বস্তুত ইকবাল যে, আত্মশক্তির জয়গান গায়েছেন, প্রকৃত স্বাধীনতার উন্মাদনা প্রত্যেকটি মানুষের মর্মমূলে-প্রত্যেকের প্রতি রক্তবিন্দুতে ছড়িয়ে মিশিয়ে দিয়েছেন,তা তাঁর বিরাট কাব্য গভীরভাবে অধ্যায়ন না করলে কিছুতেই হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভপর নয়। আমরা এই শ্রেণির মানুষকে সকল প্রকার হিংসা-বিদ্বেষ ও কুপমণ্ডকতা পরিহার করিয়া উন্মুক্ত হৃদয়-মন লইয়া ইকবাল-সাহিত্য অনুশীলন করিতে অনুরোধ জানাই। এতটুকু কষ্ট স্বীকার করিলে তাহাদের হৃদয়দুয়ার উন্মুক্ত হইবে; প্রকৃত স্বাথীনতা কাহাকে বলে, তাহার সম্যক পরিচয় তাহারা লাভ করিতে পারিবে।

বস্তুত ইকবাল প্রকৃত আযাদীর মোটেই বিরোধী ছিলেন না, থাকতে পারে না। তিনি মনে করেন,আযাদী শুধুই ‘মানুষের মত বেচে থাকার’ জন্যেই নয়, ‘খুদীর ক্রমোন্নতি ও ক্রমবিকাশের জন্যেও এহা অপরিহার্য। গোলামীর হীন ও সংকীর্ণ জীবন মানবতার মর্মান্তিক অবমাননা। ইকবাল নিজে একজন স্বাধীনচেতা মানুষ তাই পৃথিবীর সকল মানুষকে ও তিনি পুর্ণ গ্রহণ করতে না পারলে মানুষের ব্যক্তিত্ব ও চরিত্র পুর্ণত্ব লাভ করতে পারে না। পরাধীন ও পরপদানত মানুষের প্রতি তিনি কিছু মাত্র আশা-ভরসা পোষণ করেন না।

بھروسہ کر نہیں سکتے غلاموں کی بصیرت پر
کہ دنیا میں فقط مردان حر کی آنکھ ہے بینا

নির্ভরযোগ্য নয় গোলামের বিচক্ষণতা,
স্বাধীন মানুষেরে চক্ষুই হচ্ছে দুনিয়ার সত্যদ্রষ্টা। (ইকবাল -১১- পৃ, ৩২৬)

আসল কথা, ইকবাল ছিলেন বিশ্বজনীন ও বিশ্বপ্রেমিক মানুষ। এই জন্যে বিশ্বজনীনতার বিরোধী সকল মতবাদের বিরোদ্ধে তাঁহার তীব্র প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে। আশাবাদী কবি ইকবাল প্রাচ্যদেশের জাতি সম্মেলন সফল হবে বলে মনে করেন, কারণ প্রাচ্য জাতি পংকিল সোদাগরী বুদ্ধি ও লোভ-লালসাকে ঘৃণা করে থাকে। কখন ও কখন ও তিনি মুসলিম জাতিপুঞ্জের নিকট ঐক্য সংস্থাপনের জন্য আকুল আহবান জানিয়েছেন এবং দেশ ও গোত্র বিরোধ দূরীভূত করবার উপদেশ দিয়েছেন। তার একমাত্র কারণ এই যে,বিশ্বজনীনতা ও বিশ্বভ্রাতৃত্ব মূলক আদর্শবাদকের একমাত্র মুসলিম জনগণই বাস্তবরূপ দান করতে সক্ষম। অন্যান্য জাতি জাতীয়তাবাদের তীব্র নেশায় এতদুর উন্মাদ ও দিশেহারা হয়ে ছুটেছেন যে, এই বিশ্বজনীনতার আমন্ত্রণে সাড়া দেয়া তাদের পক্ষে অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে চূড়ান্ত কথা এই যে, ইকবাল মানুষকে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতার সংকীর্ণ গন্ডীর মধ্যে বন্দী দেখতে আদৌ প্রস্তুত নন। এজন্যেই তাঁর রাজনৈতিক চিন্তাধারায় সর্বাধিক গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে আন্তর্জাতিকতার উপর। বস্তুত ইকবালের প্রচলিত মতবাদ অনুযায়ী জাতীয়তাবাদ অপেক্ষা বড় পাপ আর কিছুই হতে পারে না। ইকবালের দৃষ্টিতে জাতীয়তা ও স্বদেশিকতা ইসলামের বিশ্বব্যাপক ও আন্তর্জাতিক ভ্রাতৃত্বের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। ১৯৩৮ সনে এক প্রবন্ধে তিনি স্বদেশিকতার দর্শন সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়া স্পষ্ট ভাষায় একে ইসলামের পরিপন্থী বলে ঘোষণা করেছেন :

Dhaka University Institutional Repository

زمانہ سے سیاسی لٹریچر میں وطن کا مفہوم محض جغرافیائی ن ہین بلکہ "وطن" ایک اصول ہے ہئیت اجتماعی انسانی کا اور اسی اعتبار ر ے بہیانک سیاسی تصور ہے چونکہ اسلام بھی ہیئت اجتماعی انسانی کا ایک قانون ہے اسلئے جب لفظ وطن کو ایک سیاسی تصور استعمال کیا جائے تو نہ اسلام سے متصادم ہوتا ہے

আধুনিক যুগের সাহিত্য ওয়াতন (স্বদেশ নিছক কোনো ভৌগলিক অর্থেরই ধারক নহে ‘ওয়াতন’ হচ্ছে মানবীয় সমাজ সংগঠনেরই একটি বিশেষ আদর্শ এবং এই হিসাবে এহা একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ ও বটে। যেহেতু ইসলাম ও মানবীয় সমাজ সংগঠনেরই একটি বিধান,তাই ‘ওয়াতন’ বা স্বদেশ শব্দটি রাজনৈতিক মতাদর্শ হিসাবে ব্যবহৃত হলে এটা নিশ্চিতরুপে ইসলামের সম্পূর্ণ পরিপন্থী হবে।

কিন্তু ইউরআপীয় জাতিসমুহের লালসা ও পররাজ্য লেলুপতা এবং জাতীয়তাবাদী দেশসমূহের ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা কোন অনুভূতিশীল অন্তরের কাছে সহনীয় হতে পারে না। ইকবাল জাতীয়তাবাদের মূল উৎস ও প্রধান কেন্দ্রকে সুস্পষ্টরূপে উপলব্ধি করে মর্মান্তিকভাবে হতাশ হয়েছেন। ফলে অবিলম্বে তাঁর দৃষ্টি এক উন্নততর ও মহত্তর আদর্শ- ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয় এবং তিনি ইসলামি আদর্শভিত্তিক জাতীয়তায়ই বিশ্বাস স্থাপন করেন। তাই তাঁর কাব্যে এক দিকে যেমন প্রকট হয়ে উঠেছে ইউরোপের উগ্র জাতীয়তাবাদের তীব্র প্রতিবাদ এবং এর প্রতি অপরিসীম ঘৃণা. তেমনি অপর দিকে রয়েছে ইসলামি জাতীয়তার প্রতি অকুন্ঠ বিশ্বাস এবং এর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ। রোমুযে বেখুদী’ গ্রন্থের ১২৯-৩০ পৃষ্ঠায় তিনি বলেছেন:

বর্তমান বিশেব যে কয়টি রাজনৈতিক মতবাদ প্রচলিত আছে তার মধ্যে জাতীযতাবাদ অন্যতম। জাতি বা নেশন বলতে মানুষের একটি সমষ্টিকে বুঝায়;বংশ গোত্র, ভাষা, বর্ণ, অর্থনৈতিক, ঐতিহাসিক ও তামুদ্দুনিক ঐক্য এবং ভৌগলিক আঞ্চলিকতার ওপর সাধারণত জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়। জাতীয়তার বোধ যখন সামগ্রিকভাবে একটি সক্রিয় আন্দোলনে রূপায়িত হয়, তখন তা মারাত্মক রূপ ধারণ করে। বিগত দুই আড়াই শ’ বছর ধরে এই জতীয়তাবাদের যে পরিচয় পাওয়া গেছে, সত্য পৃথিবীর জন্য তা কোনোক্রমেই কাম্য হতে পারে না।

জাতীয় স্বার্থ ও সর্বপ্রকার সুযোগ সুবিধা লাভ করার জন্য জাতীয় উপায় উপকরণ নিযুক্ত করা নীতি অনুসারে অপরিহার্য কর্তব্য। জাতীর পক্ষে যা উপকারী তা-ই মঙ্গলের তা-ই পুণ্যের কাজ। পক্ষান্তরে জাতির পক্ষে যা অকল্যাণকর তা-ই অন্যায়, পাপ-সুতরাং তা পরিত্যাজ্য। এটাই হলো জাতীয়তাবাদের মূল দৃষ্টিভঙ্গি।
ঐক্য ও সম্মিলনের বহু কারণের মধ্য দিয়ে বিশেষ একটি কারণেই জাতীয়তা লাভ করতে পারে-তা যে কারণেই হোকনা কেন, কিন্তু শর্ত এই যে, তাতে এমন একটি বিরাট সংযোজক শক্তি বর্তমান থাকতে হবে যা বিভিন্ন মানুষকে একই বাণী, একই ও মতবাদ একই উদ্দেশ্য ও কর্মের জন্য একত্রিত ও অনুপ্রাণিত করবে এবং একদিকে জাতির বিভিন্ন ও অসংখ্য অংশকে জাতীয়তার সুকঠিন বন্ধনে আবদ্ধ রেখে পরস্পরকে ওতোপোতভাবে জড়িয়ে রেখে সকলকে এক সুদৃঢ় ও পর্বত মত মজবুত করে দেবে। অপরদিকে ব্যক্তির মন ও মস্তিস্ককে এমনভাবে গঠন করে দেবে যাতে সমগ্র জাতরি স্বার্থের ব্যাপারে তারা যেন সকলেই একত্রিত এবং প্রয়োজন হলে সর্বপ্রকার আত্মদানের জন্য প্রস্তুত হয়।

ঐক্য ও সংগঠনের অসংখ্য দিক থাকতে পারে কিন্তু ঐতিহাসিক যুগের সুচনা থেকে আজ পর্যন্ত যত জাতীয়তাই প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তার মধ্যে ইসলামি জাতীয়তা ব্যতীত অন্য সকল জাতীয়তার ভিত্তিই নিম্নলিখিত

Dhaka University Institutional Repository

বিষয়ের কোনো একটি বা অধিকাংশ বা সব ক'টির ঐক্যের উপর স্থাপিত হয়েছে। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় বংশের ঐক্য,স্বদেশের ঐক্য, ভাষার ঐক্য,অর্থনৈতিক স্বার্থ সামর্থ্য,শাসনব্যবস্থার ঐক্য প্রভৃতি।

ইসলামে জাতীয়তাবাদকে ভিন্ন আঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা হয়। মানুষ ও মানুষের মধ্যে ইসলাম কোনো বৈষয়িক,বস্তু ভিত্তিকি কিংবা ইন্দ্রীয়গ্রাহ্য পার্থক্য সমর্থন করবো না ইসলামের দৃষ্টিতে সকল মানুষ একই মূল থেকে উদ্ভুত। বিশ্বের মানবজাতির মধ্যে দল গোত্রের পার্থক্য কেবলমাত্র পারস্পরিক পরিচয় লাভের জন্যই করা হয়েছে। পরস্পরের হিংসা-বিদ্বেষ, গৌরব-অহঙ্কার বা ঝগড়া-ফ্যাসাদ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে নয়। এই বাহ্যিক পার্থক্য ও বিরোধের কারণে মানবতার মৌলিক ঐক্য ভুলে যাওয়া অন্যায়। কুরআনের ভাষায়,''তোমাদের পরস্পরের মধ্যে পার্থক্য করার একমাত্র মাপকাঠি হচ্ছে নৈতিক চরিত্র। বাস্তব কার্যকলাপ এবং সততা ও পাপপ্রবণতা। আল্লাহ বলেছেন, মানব সমাজে দলাদলি এবং বিভিন্ন দলের মধ্যে বিরোধ আল্লাহতায়ালার একটি আযাব বিশেষ। এটা মানুষের পারস্পরিক শত্রুতার বিষেই মানুষকে জর্জরিত করে দেয়।

ফিরাউন যে সকল অপরাধের দরুণ আল্লাহর নিকট অভিশপ্ত ও দণ্ডিত হয়েছিল, ধলাধলি করাকেও কুরআন মজিদে অনুরূপ অপরাধের মধ্যে গণ্য করা হয়েছে। ফিরাউন পৃথিবীতে অংহকার ও গৌরব করেছে এবং পৃথিবীর অধিবাসীদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করেছে।

কুরআন মজিদে বর্ণিত আছে, পৃথিবীর মালিক আল্লাহ, মানুষ জাতিকে এই পৃথিবীতে খিলাফতের মর্যদায় অভিষিক্ত করেছেন। তার সমগ্র বস্তুকেই মানুষের অধীন করে দিয়েছেন। কাজেই বিশেষ কোনো অঞ্চলের দাস হয়ে থাকা মানুষের জন্য জরুরী নয়। সমগ্র কুরআন মজিদে কোথাও বংশবাদ গোত্রবাদ কিংবা আঞ্চলিকতাবাদের সমর্থনে একটি শব্দও খুঁজে পাওয়া যাবে না। কুরআন গোটা মানুষ মানবজাতিকেই সম্বোধন করে ইসলামি দাওয়াত পেশ করেছে। ভূপৃষ্ঠের গোটা মানুষ জাতিকে কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। এ ব্যাপারে কোনো জাতি কিংবা কোনো অঞ্চলের প্রতি বিন্দুমাত্র বিশেষতব বা শ্রেষ্ঠত্ব দান করা হয়নি। দুনিয়ার মধ্যে কেবল মক্কার সাথেই এর বিশেষ সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। কিন্তু সেই মক্কা সম্পর্কে বলার হয়েছে, মক্কার আসল অধিবাসী ও বাইরের মুসলমান-মক্কাতে সকলেই সম্পূর্ণরূপে সমান।

ইসলামে স্বাদেশিকতার ও আঞ্চলিকার পূর্ণ মুলোৎপাটন করা হয়েছে। প্রতিটি মুসলমানই ভরতে পাও ''প্রত্যেকটি দেশই আমার, কেননা তা আমার আল্লাহর দেশ।''

যে সকল গন্ডিবদ্ধ, জড় ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, বৈষয়িক ও কুসংস্কারপূর্ণ ভিত্তির উপর দুনিয়াতে বিভিন্ন জাতীয়তার ভিত্তি স্থাপিত হয়েছে। আল্লাহ এবং তার রাসুল এগুলোকে চুড়ান্তভাবে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিয়েছেন। বর্ণ গোত্র, জন্মভূমি, ভাষা, অর্থনীতি ও রাজনীতির অবৈজ্ঞানিক বিরোধ ও বৈষম্যেও ভিত্তিতে মানুষ নিজেদের মুর্খতা ও চরম অজ্ঞতার দরূণ মানবতাকে বিভিন্ন ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র খণ্ডে বিভক্ত করেছিল, ইসলাম এর সবগুলোকেই চরম আঘাতে চুর্ণ বিচুর্ণ করে দিয়েছে এবং মানবতার দৃষ্টিতে সমসত্ম মানবজাতিকে সমশ্রেণির, সমমর্যাদান সম্পন্ন ও সমান অধিকারী করেছে।

ইসলামি জাতীয়তার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা লাইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। বন্ধুতাব আর শত্রতা সবকিছুই এই কলেমার ভিভিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কলেমার স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে এবং এর অস্বীকৃতি মানুষের মধ্যে চুড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এই আলেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে, থাকে রক্ত মাটি, ভাষা, বর্ণ, শাসন প্রভৃতি কোনো সুত্র এবং কোনো যুক্ত।

বিশ্ব মুসলিম জাতীয়তাবাদ:

ইসলামি জাতীয়তার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে কালেমা, লাইলাহা ইল্লালাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ। বন্ধুত্ব আর শত্রুতা সবকিছুই এই কালেমার ভিত্তিতেই সম্পন্ন হয়ে থাকে। কলেমার স্বীকৃতি মানুষকে একীভূত করে এবং এর অস্বীকৃতি মানুষের মধ্যে চূড়ান্ত বিচ্ছেদ ঘটায়। এই কালেমা যাকে বিচ্ছিন্ন করে, তাকে রক্ত, মাটি, ভাষা, বর্ণ,

শাসনব্যবস্থা প্রভৃতি কোনো সূত্র এবং কোনো আত্মায় তা যুক্ত করতে পারে না। অনুরূপভাবে একই কালেমা যাদেরকে যুক্ত করে তাদেরকে কোনো জিনিসই বিচ্ছিন্ন করতে পারেনা।

ইকবালের জাতীয়তাবাদ ইউরোপের জাতীয়তাবাদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পবিত্র কুরআনে আছে

كنتم خير امة اخرجت للناس

মুসলমানদের সম্বোধন করে আল্লাহ বলেন, তোমরা উৎকৃষ্ট জাতি, তোমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে মানব জাতির কল্যাণ সাধনের জন্য। এখানে আল্লাহ মুসলমানদের শ্রেষ্ঠ ও স্বতন্ত্র জাতিরূপে আখ্যায়িত করেছেন। হাদীসে আছ

কাফিরগণ একই জাতিভুক্ত الكفر ملة واحدة

কুরআন ও হাদীসের মর্মনুসারে ইকবাল বলেন, জাতীয়তাবাদের ভিত্তি হল ধর্মীয় বিশ্বাস তথা তাওহীদ। ইউরোপীয় জাতীয়তাবাদের ফলে দেশে যুদ্ধ-বিগ্রহ, সংঘর্ষ হিংসা-বিদ্বেষের সম্ভাবনা বৃদ্ধি পায়, আর ইকবালের জাতীয়তাবাদে ঐ সব রেষারেষির মাত্রা হ্রাস পায়। ধর্মীয় বিশ্বাসকে জাতীয়তাবাদ তথা ঐক্যের মাপকাঠি ধরা হলে জগতের সব খ্রিষ্টান, সব হিন্দু, সব মুসলমান, ধর্মের ভিত্তিতে ভিন্ন ভিন্ন জাতি সূত্রে ঐক্যবদ্ধ হয়ে ভাই ভাইয়ে পরিণত হতে পারে। এই ধারণার পরিপ্রেক্ষিতে ইকবাল বলেছিলেন: (আব্দুল্লাহ-৩৬, পৃ. ১৪২)

چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا

مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا

চীন ও আরব আমাদের, ভারত আমাদের,

আমরা মুসলমান, সারা জাহান আমাদের দেশ। (ইকবাল -১১, পৃ. ১৭২)

এর অর্থ এই নয় যে, মুসলমানরা সারা বিশ্ব জয় করে নেবে। এর মানে হলো সারা বিশ্বের মুসলমান ভাই ভাই। সারা দুনিয়ায় ইসলামি ভাবধারা ও ইসলামি জীবন ব্যবস্থা তারা ছড়িয়ে দেবে।

বিশ্ব জাতীয়তাবাদ:

ইকবাল জাতীয়তাবাদের প্রবক্তা হলেও এর পাশাপাশি তিনি বিশ্ব জাতীয়তাবাদের ধারণাও পোষণ করতেন। তিনি মুসলমানদের ন্যায় অমুসলমানদেরকেও ভালবাসতেন। তাদের প্রতি তাঁর কোনো হিংসা বিদ্বেষ ছিলো না। সকল মানুষকে তিনি আদম সন্তানরূপে একজাতিভুক্ত বলে বিবেচনা করতেন। কুরআনে বর্ণিত আছে:

كان الناس امة واحدة

পৃথিবীর সকল মানুষ একজাতিভুক্ত।

الخلق عيال الله

সকল মানুষ আল্লাহর পরিবারভুক্ত। আল- হাদিস

كلكم من ادم وادم من تراب

সকল মানুষ আদম সন্তান এবং আদম (আ.) মাটির তৈরি।

Dhaka University Institutional Repository

কুরআন হাদীসের উপরিউক্ত বাণীর আলোকে ইকবাল বিশ্বের সকল মানুষকে আদম-সন্তানরূপে ভাই ভাই বলে মনে করতেন এবং সবাইকে মানব জাতিভুক্ত বলে বিবেচনা করতেন।

তার দৃষ্টিতে ধর্ম, বর্ণ, ভাষা, গোত্র, দেশ, সমাজ, পাপী, তাপী, খোদাভীরু, খোদার আশিক নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করাই মানবতা বিশ্বমানবতা। ইকবাল বলেন:

حرف بدرا بر لب آوردن خطا است　　کافر ومومن خلق خدا است

آدمیت احترام آدمی　　باخبر سثو از مقام آدمی!

بنده عشق از خدا گیرد طریق　　می شود بر کافر ومومن شفیق

মন্দ কথা মুখে আনা পাপ,

কাফির-মুমিন সবাই আল্লাহর সৃষ্টি,

মানবতা কি? মানুষের প্রতি সন্মান প্রদর্শন,

জেনে নাও মানুষের অবস্থান।

আল্লাহ থেকেই নির্দেশ নেয় তার সব বান্দা,

কাফির মুমিনের প্রতি সে সমান দয়ালু। (ইকবাল- ৫ পৃ.-২০৫)

ইকবালের ভাষায় বলতে গেলে:

The world thinkers are stricken dumb. Is this going to be the end of progress and evolution of civillzation, they ask, that men should destroy one another in mutual hatred and make human habitation impossible on this earth? Remember, man can be maintained on this earth only by honouring mankind, and this world will remain a batte-ground of ferocious beasis of prey unless and until the educational forces of the whole world are directed to incucatiog in man respect for mankind

উপরের বিবৃতি ও প্রবন্ধের ভাষার আলোকে আমরা এ মন্তব্য করতে পারি যে,অন্য ধর্মের প্রতি ইকবালের কোন বিদ্বেষ বা বিরূপ ধারণা ছিলনা। তিনি বিশ্বজোড়া শান্তি-শৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন এবং এ কাজে তার কাব্য, চিন্তা ও কর্মকে নিয়োজিত করে রেখেছিলেন

ইসলামি শিল্পকলা এবং পাশ্চাত্য চিত্রকলার উপর প্রভাব:

ইকবাল প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিল্পকলার সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। সপ্তদশ শতকের আগে মুসলিম চিত্রশিল্প ইউরোপে আনা হয়েছিল কিনা তার কোনো প্রমাণ নেই। রেমব্রান্টকই প্রাচ্যের শিল্পকলার প্রতি যথেষ্ট আগ্রহশীল পাশ্চাত্যের প্রথম চিত্রকর মনে করা হতো। দূরপ্রাচ্য থেকে কতিপয় চিত্র হল্যান্ডে পৌছার পর তিনি সেগুলো নকল করেন। এগুলো ছিলো দিল্লির রাজকীয় পরিবারের সদস্যদের ছবি। (ল্যাট্‌ জে এবারসেন্ট,-১১০, পৃ. ৯৯)

অতএব, ইকবালের মতে ইউরোপে ব্যক্তিগতভাবে কোনো শিল্পীর উপর মুসলিম বিশ্বের চিত্র শিল্পের কোনো প্রত্যক্ষ প্রভাব ছিলো না। তেমনি মুসলিম প্রাচ্যের প্রভাব কোনো বড় রকমের চিত্রকলার আন্দোলনকে অনুপ্রাণিতও করেনি। দৃষ্টান্ত স্বরূপ, পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতকে ক্ল্যাসিক্যাল শিল্পের প্রতি নতুন আবেগের ফলে ইটালীয় চিত্রকলার যে নতুন প্রানের সঞ্চার সেরূপ শিল্প চর্চায় মুসলমানদের কোন সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া অসম্ভাব। খুঁজে পাওয়া গেলেও তা বাহ্যিক। ভূমধ্যসাগর অঞ্চলে আরব প্রাধান্যের প্রাথমিক যুগেই এগুলো দেখা যায়। প্রাচ্যের

Dhaka University Institutional Repository

নক্সিবস্ত্র থেকে কিছু কিছু জীবজন্তুর ছবি নকল করা হয়। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একাদশ শতকে বিবলিথেক ন্যাশনেলে) জাতীয় গ্রন্থাগার (বীটাসের অ্যাপক্যালিপসের টীকার পান্ডুলিপিতে এবং মধ্যযুগের প্রথম দিকের অন্যান্য কতিপয় পাণ্ডুলিপিতে এসব চিত্র দেখা যায়।

কিন্তু মুসলিম সংস্কৃতির সঙ্গে খৃষ্টান বিশ্বের সরাসরি যোগাযোগ এবং প্রাচ্যের শিল্প সৌকর্যমূলক জিনিস আমদানির ফলে ভাস্কর্য, স্থাপত্য কিংবা ধাতব শিল্পকর্মে যতটা অবদান সৃষ্টি হয়েছে চিত্রকলার ক্ষেত্রে তা আদৌ হয়নি। প্রাচ্যের উপাদান সমূহের কারূকার্যমূলক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের ক্ষেত্রেই প্রধানত এর ভূমিকা দেখা যায় এবং সেখানে ও ছোটখাট ব্যাপারেই তা সীমাবদ্ধ থাকে। এসব কারূকার্যমূলক উপাদান মুসলমানদের উৎপাদিত রেশমী বস্ত্র ও অন্যান্য শিল্প উপকরণ আমদানির মাধ্যমে পাশ্চাত্যের সংস্পর্শে এলেও এগুলো একান্তভাবে মুসলমানদের উদ্ভাবিত বৈশিষ্ট্যের অন্তভুর্ক্ত ছিলো না। মুসলমানরা তাদের পূর্বসুরিদের কাছ থেকে যেসব জিনিস লাভ করেছে সেগুলো ও এর অন্তভুর্ক্ত ছিলো। অতীতের এ ধরনের শৈল্পিক সম্পদের মধ্যে কালডিয়ার পবিত্র বৃক্ষের ন্যায় অত্যন্ত প্রাচীন কতিপয় প্রচলিত নকশাও রয়েছে। এই নকশাটি সাসানীয় শিল্পকলার মধ্য দিয়ে মুসলিম যুগে এসেছে। আদিম রীতি অনুসারেও এই জীবন বৃক্ষটির দুপাশে দুটি জন্তু পরস্পরের মুখোমুখি থাকে। কিন্তু খৃষ্টান অনুসারে শিল্পীরা প্রায়ই পবিত্র বৃক্ষের কেন্দ্রীয় উপাদানটি পরিহার করেছে। মুসলিম পুর্ববর্তী আদিম যুগের অন্যান্য চিত্রের মধ্যে একটি অপরটির শিকার দুটি জন্তু এবং একই দেহ ও দুই মস্তক বিশিষ্ট জন্তুর ছবি উল্লেখযোগ্য। এগুলো চিত্রকলার চাইতে ভাস্কর্যের মধ্যেই বেশি দেখা যায় এবং শেষোক্ত ক্ষেত্রে প্রায়ই অনুরূপ খোদাই শিল্প থেকে নকল করে গির্জার ক্যাপিটাল) স্তম্ভের শীর্ষদেশ (ও বাস রিলিফে) পটভূমি থেকে উঁচু (খোদাই করা হয়।) হিস্টরি ডি লার্ট টি আই -১১১, পৃ .৮৮৩)

দ্বিতীয় রজারের) ১১১-৫৪ খ্রী- প্যালেসটাইন চ্যাপেলের নকশাশিল্পীদের ন্যায় যেসব মুসলিম শিল্পী মধ্যযুগের প্রথম দিকে খ্রিষ্টান পৃষ্ঠপোষকদের জন্য কাজ করেন তাদের শিল্পকর্মে এ ধরণের কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না।

ক্রুসেডে আমলে মুসলিম প্রাচ্যের সঙ্গে অধিক পরিমাণ যোগাযোগের ফলে মুসলমানদের আলংকারিক উপাদান সম্বলিত জিনিসপত্রের বিশেষভাবে আমদানি ঘটে। এ সময় জেনোয়া, পিসান ও ভেনিসের ন্যায় বানিজ্যিক যোগাযোগ কেন্দ্রের দেশগুলোতে চিত্রশিল্পে এসব উপাদান প্রচলিত হয়। এর ফলে প্রধানত অপরিচিত জিনিসের প্রতি কৌতুহল ও আকর্ষণ থেকে প্রাচ্য বিশ্বের প্রতি একটি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। এর প্রতিফলন চিত্রকলার প্রাথমিক দ্রব্যগুলোতে এবং তা আরো প্রাধান্য পায় টুসকান শিল্পে। চতুদশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধেই এসব ইটালীয় চিত্রে পাগড়িওয়ালা ছবি ও প্রাচ্যের মুখাবয়ব পরিদৃষ্ট হয়। কোনো পবিত্র দৃশ্যে এসব বিদেশী ছবি সাধারণত প্রাধান্য পায় না। কেবলমাত্র আনুসঙ্গিক ক্ষেত্রেই প্রাচ্যের প্রভাব বিশেষভাবে অনুভূত হয়। যেমন পারস্য ও অন্যান্য কার্পেটের প্রতিলিপিতে, অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিদের প্রাচ্যের পোষাকে এবং চিতা বাঘ বানর ও তোতা পাখির ন্যায় ভিনদেশী জীবজন্তুর প্রচলনে । বিস্তারিত প্রাকৃতিক দৃশ্যেও প্রাচ্যের নক্শার ইচ্ছাকৃত অনুকরণমূলক গাছপালা ও পত্রপুষ্প দেখা যায়। ইকবাল *যরবে কলীম* শীর্ষক গ্রন্থে চারুকলা শীর্ষক কবিতায় বলেন:

কেমন সে প্রভাত সমীরণ!
দুনিয়ার জাতির উদ্ভব হয়নি

Dhaka University Institutional Repository

অলৌকিকতা ছাড়া
‘কালিমুল্লাহ’র আঘাত নেই যাতে
সে শিল্প কেমন আবার। (তালিব -১১২, পৃ. ১০২)

কারূকার্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে প্রায়ই আরবি হস্তলিপি ব্যবহারের মধ্যে একটি বিশেষ প্রাচ্য বৈশিষ্ট্য ধার করার প্রমাণ পাওয়া যায়। এটি খৃষ্টান শিল্পের উপর মুসলিম শিল্পের সরাসরি প্রভাবের অন্যতম প্রধান দৃষ্টান্ত যা ইউরোপীয় পণ্ডিত ব্যক্তিদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ১৮৪৬ খ্রিস্টাব্দে আডিয়েন ডি লং পারিয়ার কর্তৃক রিভিউ আর্কিওলজিক এ তাঁর নিবন্ধ ডি এল এম প্লয় ডেস কারেক্টার্স অ্যারাবেস ড্যানস এল অর্নামেন্টশন, চেযলেস পিউপলস ক্রেটিয়েন্স ডি এল অকসিডেন্ট’ প্রকাশিত হওয়ার পর ক্রমবর্ধমান সংখ্যায় এর দৃষ্টান্ত সংগৃহীত হয়। বার্লিংটন ম্যাগাযি- এ মিঃএইচ ক্রিস্টির অত্যন্ত সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলিতে) ১১শ ও ১২শ সংখ্যা’দি ডেভেলপসেন্ট অব অর্নামেন্ট ফ্রম আরাবিক স্ক্রিপটস (ইটালীয় চিত্রকলায় চিত্রকর জটের আমলেই এ- ধরনের আরবি বৈশিষ্ট্য সম্পন্ন কারুকার্যের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন পাডুয়ার অ্যারেনা চ্যাপেলে রিসারেকশন অব ল্যাযারাসে যিশুখৃস্টের ডান কাধের উপর। এ ধরনের কারুকার্যের জন্য ফ্রা অ্যাঞ্জেলিকো এবং পরিচয় সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞতা থেকে ভার্জিনের আস্তিন এবং পোশাকের প্রান্তভাগেও এই নকশা ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাচ্য থেকে আমদানিকৃত বহু ধরন এর রেশমী ও সুতিবস্ত্র কিংবা প্রদীপ ও অন্যান্য পিতলের পাত্রই তাদের এ ধরনের নকশা জ্ঞানের সূত্র। প্রাচ্যের নকসীবস্ত্র থেকে কিছু কিছু জীবজন্তুর ছবি নকল করা হয়।

ইকবাল দর্শন পাশ্চাত্য সভ্যতার উপর চরম আঘাত:

পাশ্চাত্য দর্শনের সীমা নিয়ে বর্তমান বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছে। বাট্রাশু রাসেল তাঁর History of western Philosopsy -তে আরব দেশীয় চিন্তাবিদদের দর্শনকে পাশ্চাত্য দর্শনকে পাশ্চাত্য দর্শনের অন্তভূর্ক্ত

Dhaka University Institutional Repository

করেছেন। তবে, বহুকাল পর্যন্ত পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতিফলন এ দর্শনে প্রকাশিত । সে সভ্যতার সন্মধ্যে ইকবালের মানসে যে প্রতিক্রিয়া দেখা দিয়েছিল তা তার নিজের ভাষায় সুন্দর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

ককুয়তে আফরঙ্গ আজ ইলম ও কনআস্ত
আয জঙ্গী আতস বিরাগশ রোমন আস্ত
হিকমত আয কিত ও বুরীদ যামানীস্ত
মানি এ ইলম ও হনর আসাসানীস্ত

অর্থাৎ ইউরোপবাসীদের শক্তি, জ্ঞান ও বিজ্ঞান থেকেই এই আগুন, তার চেরাগ জ্যোতির্ময়, জামার কাট ছাঁটে কোন জ্ঞান গরিমা নেই। পাগরিজ্ঞান বিজ্ঞানের কোন বিঘ্ন নয়। ''ইকবাল ছিলেন কবি কুলের সিংহ, বিদগ্ধ আরেফ, স্বাধীনতার অগ্রসেনানী, সাধক, হৃদয়বান দার্শনিক উপরন্তু যিনি ছিলেন একজন আশেক, দ্বীনদার মুসলমান, ঐক্যের সিপাহসালার, প্রতি যুগের প্রতি শাখার ক্ষণজন্মা ব্যক্তিবর্গ বিশেষ করে প্রাচ্যের মুক্তিকামী জনগোষ্ঠী মানব ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে যার প্রশংসায় পঞ্চমুখ, ইকবালকে পাশ্চাত্য সভ্যতা ও যে সমস্যাবাদী ও শোষণমুক্ত আগ্রসন, কতিপয় মুসলমানের আত্মবিস্মৃতি, নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতি থেকে তাদের বিচ্ছুতি, পাশ্চাত্য সংস্কৃতি দিকে তাদের অন্ধভাবে ঝুঁকে পড়া, অন্য কথায় ফিরিঙ্গীদের চাকচিক্যময় সংস্কৃতির দিকে তাঁদের ঝোঁক প্রবণতা এবং যে ইসলামি শিক্ষা পূর্ণাঙ্গ মানুষ গড়তে পারে তার প্রতি তাদের ভ্রুক্ষেপহীনতা । তিনি পাশ্চাত্যের আগ্রসন সম্পর্কে বলেন:

فرید زا افرنگ و دل آو یزئ افرنگ   فرید زشیرینی و پرویزی افرنگ
عالم همه ویرانه ز چنگیزی افرنگ   معصر حیم ایاز به تعمیر جهان خی

ফিরিঙ্গীদের বিরূদ্ধে ফরিয়াদ   পাশ্চাত্যের আসক্তির বিরূদ্ধে ফরিয়াদ
ফিরিঙ্গীদের মিষ্টি আর পারভেজী দাপটের বিরূদ্ধে ফরিয়াদ
ফিরিঙ্গীদের চেঙ্গিসী আক্রমণে   গোটা বিশ্ব আজ ধ্বংসপ্রায়
বাইতুল্লাহ আল হারামের স্থপতিরা   বিশ্ব গড়ার কাজে জেগে উঠ। (ইকবাল -৫, পৃ. ২১৭)

মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে কবি উকবাল বলেন:

مسلم استی بی نیاز از غیر شو   اهل عالم را سرپا خیر شو
رزق خود را از دونان میگر   یوسف استی خوش را ارزان مگیر

মুসলিম তুমি মুখাপেক্ষী হয়ো না কারো
বিশ্ববাসীর কল্যাণ তবে হবে আপাদমস্তক তব,
দু'মুঠোর মাঝে দুটি রুটিই কেবল তব সম্ভল নয়
তুমি তো ইউসুফ মূল্য তোমার কম নয়। (ইকবাল -৫ পৃ. ২৬৯)

যে সমস্যাটি আজকের মুসলিম সমাজ বিশেষ করে যুব সম্প্রদায়কে হুমকির সন্মুখীন করেছে তা হলো পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন, যদি ও পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসন একটি নতুন বিষয় নয়। মুসলিম বিশ্ব তাদেরঅনুপ্রবেশের সুচনা থেকে হয়ে আসছে এবং চলছে। তৃতীয় বিশ্বের বেশীর ভাগ দেশে মুসলমানদের জাগরণ, আত্মপ্রত্যয়ের দিকে প্রত্যাবর্তন,সংগ্রাম ও স্বধীনতাকামী আন্দোলনের প্রেক্ষিতে সাম্রাজ্যবাদীদের থাবা বিস্তারের পথ পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়েছে। আজকে বিজ্ঞান প্রযুক্তির জটিল মারপ্যাচে ভু উপগ্রহের মাধ্যমে দেশসমুহের সীমা পরিসীমা আগ্রাসন শুরূ করেছে। পাশ্চাত্য সংবাদ মাধ্যম ও চলচ্চিত্র জগত প্রাচ্যের চরিত্র ও আচার আচরণকে পরিবর্তন করার কাজে দেদার কাজ করে যাচ্ছে। তাদের এ ফাদ থেকে মুক্তি পেতে হলে প্রয়োজন ইসলামের মৌলিক শিক্ষার দিকে গভীরভাবে মনোনীবেশ করা। ইকবালের মতে এ মহান কবির আত্মাকে আল্লাহ প্রশান্তির দিন যার

Dhaka University Institutional Repository

কবিতা পুরোনো হয় না, আজ ও তার কবিতার বাণী তেজোদীপ্ত মহিমায় ভাস্বর হয়ে আছে। ইকবাল পাশ্চাত্য চিন্তাধারার ক্ষেত্র সৃষ্টির মূল ও গভীরতা এবং পশ্চিমা নামকরা দার্শনিকদের অবস্থা বর্ণনা করে তাদের সমালোচনা করেছেন। তাঁর দৃষ্টি ছিল মুসলিম সমাজের সৌন্দর্য্যের দিকে। পাশ্চাত্যের চিন্তা চেতনার মূলে কি আছে তা তাদের নয়া চরিত্র ও বাহ্যিক আচরণের গভীরে খুঁজলেই প্রতিভাত হবে। যেমন তিনি বলেন:

از گروه گوسفندان قدیم   راهب دیرینۀ افلاطون حکیم
در کهستان وجود افگندهسم   رخش او در ظلمت معقول
شمع را صد جلوه از افرون است   گفت سر زندگی در مردان است

পুরনো সাধক প্লাটো জ্ঞান তাপস
অতীত যুগের গুচ্ছপাণ্ডাল দলের একজন
তার বেগবান ঘোড়া বিবেকের আধার হারিয়ে গেছে
সৃষ্টির অস্তিত্বের গভীরে সংক্রমিত করেছে বিষ
বলেছেন জীবন রহস্য রয়েছে মরার মাঝে
মোমবাতির শতগুণ প্রভা তার জমে যাওয়ার মাঝেই রয়েছে। (ইকবাল-৫, পৃ. ১৪৮)

তাই প্লেটো, এরিষ্টটল ও বেকনের দর্শন ও পর্যালোচনা করেছেন তবে তার কথা ছিল এগুলো পড়, কিন্তু তাতে আকৃষ্ট হয়ো না। যেমন বলেছেন:

زمانی با ارسطو آشنا باش   دهی باساز بیکن هم نواهاش
ولیکن ازمقام شان گزار   کن مشوکه اندرین منزل سفرکن

কিছু সময় এরিষ্টটলের সাথে ও পরিচিত হও   বেকনের সুরের তানে তাল ধর
কিন্তু তাদের অবস্থান থেকে অবস্থান থেকে অগ্রসর হও   সেখানে গিয়েই ঘর তৈরি করে থেমে যেয়ো না
সফর অব্যাহত রাখ। (ইকবাল -৫, পৃ. ২৩৪)

অন্যত্র বলেছেন:

و لیکن حکمت دیگر بیاموز رهان خود را ازین مکر شب وروز

তবে অন্যের জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা কর
দিবস রজনীর এসব প্রতারণা থেকে বাঁচার জন্যই তা শেখ। (ইকবাল -৫, পৃ. ২৩৮)

যারা ইসলামি সংস্কৃতির গভীর মর্ম উপলব্ধি না করেই পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ছিন্ন মূল সংস্কৃতির অনুকরণে আত্মহারা হচ্ছে নিজের দেশের উন্নয়নে ও স্বনির্ভরতা অর্জনের জন্য নব নব জ্ঞান বিজ্ঞান আয়ত্তে না এনে পাশ্চাত্যের ভালবাসা আচরণ ও অন্ধকার শূন্য চরিত্র শিক্ষা লাভ করছে পাশ্চাত্যের পওশাককে নিজের ভদ্রতা সৌজন্যতার প্রতীক বানাচ্ছে তাদের উদ্দেশ্যে ইকবাল বলেন:

قوت افرنگ از علم و فن است   از همه آتش چراغش روشن است
حکمت از قطع و برید جمله نیست   مانع علم و هنر عمامه نیست
علم و فن را ای جوان شوخو شنگ   مغز می باید نه ملبوس فرنگ

ফিরিঙ্গিদের শক্তি বিজ্ঞান ও কারিগরীতে
এ অগ্নিতেই তাদের বাতি জ্বলছে
হেকমত বা প্রজ্ঞা জামা ছেড়া নয়
হেকমত, বিজ্ঞান, কারিগরী পাগড়ী পরার বিরোধী নয়।
বিজ্ঞান ও কারিগরীর মাঝে মত্ত হয়ে পড় হে যুবক
তবে ফিরিঙ্গীদের সাথে মনমগজ মিলিত করো না। (ইকবাল-৫, পৃ. ২৭০)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল ও প্রাচ্যের অন্যান্য মুসলমানদের পাশ্চাত্য সংস্কৃতি প্রত্যাখ্যানের অর্থ জ্ঞান বিজ্ঞান ও কারিগরী বিদ্যা বর্জন নয়। উক্ত কবিতার ছন্দ ক'টিতে তা সুস্পষ্ট হয়ে গেছে, পশ্চিমারা জ্ঞান বিজ্ঞানের যে সব কলাকৌশল অবলম্বন করে পাশ্চাত্যের ঐ সমস্ত লোকের মধ্যে দ্বিধা দ্বন্দের সৃষ্টি করে যারা ইসলামের মূল সংস্কৃতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল নয়, সে সব জ্ঞান বিজ্ঞানের ও সমালোচনা করেছেন। বস্তুত ইকবাল এ জ্ঞান বিজ্ঞানের গুরূত্ব এবং এক্ষেত্রে পরিণতি কি হবে তা যুব সমাজের সামনে সুস্পষ্ট করে দিতে চান। এ প্রসঙ্গে বলেন:

در جینوا چیست غیر از مکرفن   صد تواین میش و ان نخچیر من
دانش افرنگیان تیغ بدوش   در هلاک نوغ انسان سخت کوش

মাতালদের কাছে প্রতারণা ও কলাকৌশল ছাড়া আর কি আছে
তোমার শিকার কি মেষ গুলোই
আমার শিকার তো ঐগুলো (সিংহগুলো)

ইকবাল দর্শনের আর একটি গুরূত্বপূর্ণ দিক হল তিনি জাতীয়তা, রুসম রেওয়াজ ও সাম্প্রদায়িকতায় বিশ্বাসী নন। তার বেদনা সকল মুসলমানের বেদনা | এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

من وتواز دل دین نا امیدیم   چوبوی گل زاصل خود را میدیم
دل ماهر دو دین از مردنش مرد   دو تامرگی بیک سودا خریدیم
مسلمانی کی داند رمز دین را   نماید پیش غیر الله جبین را

আমি আর তুমি দ্বীনের জীবণী শক্তি হতে নিরাশ
যেমন ফুল থেকে তার সুবাস কেড়ে নিয়েছে
আমাদের অন্তর মরে গেছে, দ্বীন ও তার সাথে বিদায় নিয়েছে
দুই মৃত্যু একই সদা হিসেবে খরিদ করেছি
যে মুসলমান দ্বীনের ভেদ জানে
গাইরূল্লাহর কাছে মাথা নত করে না। (ইকবাল-৫, পৃ. ১৬৫)

ইকবাল পাশ্চাত্যের বন্দীশালা ও ফাঁদ থেকে বাঁচার এবং নাজাতের একমাত্র পথ দ্বীন ইসলাম ও কুরআনকে আকড়ে ধরার মাঝেই দেখতে পেয়েছেন। যেমন বলেছেন:

ملتی را رفت چون آئین زدست   مثل خاک اجزای اوازهم شکست
مسلم ز آئین ات وبس   باطن دین نبی (ص) این امت وبس
تو همی دانی کی آئین توچیست   زیر گردون سیر تمکین توحید
ان کتاب زنده قران حکیم   حکمت او لایزال است و قدیم
نوغ انسان راپیام آخرین   حامل او رحمت للعالمین
ارج میگیبرد از ونا ارجمند   بنده را از سجده ساز وسر بلند

যে জাতির আইন হাত ছাড়া হয়েছে
মাটির মত তার অংশগুলো ও খসে পড়েছে।
মুসলমানের অস্তিত্বই হল খোদায়ী বিধান
নবী (সা.) এর দ্বীনের গুঢ় রহস্যই তাতে নিহিত।
তুমি কি জান তোমার বিধান?
গোলকের নিচে তোমার অবস্থানের রহস্য কি ?
ঐ জীবন্ত কিতাব প্রজ্ঞাময় কুরআন যার প্রজ্ঞা অনাদি অনন্ত
মানব জাতির জন্য তা চূড়ান্ত পয়গাম।
যার বাহক হলেন রাহমাতুল্লিল আলামীন।

Dhaka University Institutional Repository

আমরা যদি ইসলামি সমাজের সমস্যা ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির আগ্রাসনের দিকে তাকাই এটা সবার কাছে দিবালোকের মত সত্যপ্রমাণিত হবে যে, পশ্চিমারা সাম্মলিত প্রচারযন্ত ব্যবহার করে, টেলিভিশনের অনুষ্ঠানমালা ও ফিল্ম প্রদর্শন করে, নাটক, নভেল, অশ্লীল ম্যাগাজিন প্রকাশ করে, যুব সমাজকে তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির দিকে আকৃষ্ট করছে এবং ইসলামি সংস্কৃতি থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। এর মাধ্যম তাদেরকে এমন এক অস্তিত্বের রূপ দিতে চায়-যা দেয় তাই খাবে, যা খাহেশ তা-ই লিখবে যাকে ইচ্ছা তাকেই মারবে অর্থাৎ যে কাজগুলো তারা ইকবালের যুগে সামরিক হামলা ও তীর কামানের দ্বারা সম্পাদন করত, আজকে প্রযুক্তি ও সম্মিলিত প্রচার মাধ্যম কোন প্রকার প্রতিরোধ ছাড়াই করে যাচ্ছে। তাই আজকে ও ইকবালের কবিতা সম্ভার যুব সমাজের পড়ার মত কবিতা এবং অতীব প্রয়োজনীয় ও বটে।

আশার কথা, ইকবালের এই। আশা আকাঙ্খা আজ ইসলামি ইরানে প্রতিফলিত হয়েছে। মহান নেতা ইমাম খোমেনি (র.) এর নেতৃত্বে কুরআন ও দ্বীনের শক্তিতে বলীয়ান হয়ে ইরানী জনতা পাশ্চাত্যকে ছুঁড়ে ফেলেছে, আর ইসলামকে করেছে সমুন্নত। তাই তো ইরানের জনপ্রিয় কবি আহমদ শরীয়ত দিদার ইকবালকে উদ্দেশ্য করে লিখেছেন:

حضرت اقبال ای علامه فرزان ما　　آسمان شرق را ای اختر تا بان ما
در میان ظلمت او باز استعمار غرب　　نقطه اقبال شرق و مهر نور افشان ما
سوختی چونان چراغ لاله باو شنگری　　ماهم اکنون ز ان تو انسان که بودی
زآن ما　　داشتی خود جوانان عجم روی سخن　　داره پیوند از اخوت جان حود
باجان ما

মহামহিম ইকবাল হে আমাদের জ্ঞান তাপস।
প্রাচ্যের আকাশের হে আলোকোজ্জ্বল রবি
পাশ্চাত্যের সাম্রাজ্যবাদী অমানিশার তিমির মাঝে
প্রাচ্যের সৌভাগ্য, আমাদের প্রিয়তম আলো বিচ্ছুরণকারী
আলোক প্রভা নিয়ে নানা ফুলের বাতির মত তুমি জ্বলে উঠেছ,
আমরা এখন ও পুর্বের মতই তোমার প্রত্যাশায়।
প্রাচ্যের যুবসমাজ ছিল তোমার বক্তব্যের বিষয়বস্তু
আমাদের পরস্পরে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে জয়গান তুমি গেয়েছ। (ইকবাল-৫, পৃ. ২১২)

পরিশেষে আমরা বলতে চাই মহান আল্লাহ তা'য়ালা আমাদেরকে কুরআন আঁকড়ে ধরার তাওফীক দিন আমরা মুসলমানরা যেন গভীর জ্ঞানের বরকতে পাশ্চাত্যের সাংস্কৃতিক আগ্রাসনকে নস্যাৎ করে দিতে পারি। আল্লাহ আমাদের যুব সমাজকে ইসলামের মূল সত্য উপলব্ধি এবং পাশ্চাত্য সংস্কৃতির অন্ত:সারশূন্যতা বোঝার তাওফীক দিন। এ আশাবাদই ব্যক্ত করছি।

ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা বনাম পুঁজিবাদী অর্তনৈতিক ব্যবস্থা:

ইকবাল বলেন, ইসলামি জীবনের অপরিহার্য অঙ্গ হলো ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। আল কুরআন ও সুন্নাহই হলো ইসলামি অর্থনীতির মূল এবং একমাত্র উৎস। ইসলামের পরিপূর্ণ জীবন ব্যবস্থার একটি অপরিহার্য শাখা হলো ইসলামি অর্থনীতি। ইসলামি জীবনাদর্শের মূল লক্ষ্য অর্জনের একটি উপলক্ষ্য ও উপকরণ হিসেবে ইসলামি অর্থনীতি গুরুত্বপূর্ণ ভুমিকা পালন করে। ইসলামি অর্থনীতির সংজ্ঞা দিতে গিয়ে বিশ্ববিখ্যাত আরব মনীষী ইবনে খালদুন তাঁর অমর কীর্তি *আল মুকাদ্দিমায়* বলেছেন, ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে (Masses) ই

Dhaka University Institutional Repository

জনসাধারণের কল্যাণের সাথে সম্পৃক্ত বিজ্ঞান।প্রখ্যাত পাকিস্থানি অর্থনীতিবিদ ড.এস. এম. হাসানুজ্জামানের মতে,

[ইসলামি অর্থনীতি হচ্ছে বস্তুগত সম্পদ আহরণ ও তা ব্যয় বিতরণের প্রক্রিয়ায় অবিচার, জুলুম ইত্যাদি প্রতিরোধে আরোপিত ইসলামি শরীয়তের বিধিনিষেধ সম্পর্কিত জ্ঞান ও বাস্তব ক্ষেত্রে এর প্রয়োগ, যাতে করে আল্লাহ এবং সমাজের প্রতি দায়িত্ব পালন করতে পারে।]

ইকবাল বলেন ধর্ম, অর্থ ও চারিত্রিক শিক্ষার সাহায্য ব্যতীত মানব জাতির অভ্যন্তরীণ ও মানসিক পরিবর্তন সাধন কিছুতেই সম্ভব নয়। তার ভাষায়:

غریبان گم کرده اند افلاک را

درشکم جویند جان پاک را

دین آن پیغمبر حق ناشناس

بر مساوات شکم دارد اساس

দরিদ্র হারিয়ে ফেলেছে তার

জীবনের লক্ষ্য,

পবিত্র জীবনের সন্ধান করে সে

উদরের মাঝে।

সত্য দৃষ্টিহীন এই পয়গম্বরের 'জীবন বিধান'

কায়েম করেছে তার বুনিয়াদ

জঠর সাম্যের উপর। (আ. রহীম- ২০, পৃ. ৬০)

ইকবালের মতে, ইসলামের অর্থনৈতিক জীবন খোদায়ী নির্দেশনাবলীর ওপর প্রতিষ্ঠিত। যথোচিত শ্রমের মাধ্যমে জীবিকা উপার্জন শুধুমাত্র কর্তব্যই নয়, বরং একটি বিরাট পূণ্যের কাজ। জীবিকানির্বাহের জন্য কোনো সক্ষম নিস্কর্মা ব্যক্তির অন্যের উপর নির্ভরশীলতা একটি ধর্মীয় পাপাচার, একটি সামাজিক কলঙ্ক ও একটি লজ্জাজনক অবমাননা যা খুদীকে ধুলিসাৎ করে। ইকবাল বলেন আল্লাহ প্রতিটি মুসলমানকে আত্মনির্ভরশীল হওয়ার ও কারো গলগ্রহ হওয়া থেকে দূরে থাকতে আদেশ করেছেন। জীবিকা উপার্জনের জন্য সকল প্রকার কাজকেই ইসলাম শ্রদ্ধার চোখে দেখে, যতক্ষণ না তাতে অন্যায় ও আপত্তিকর কিছু পরিলক্ষিত হয়। আল্লাহর নির্দেশিত পথে ধন উপার্জন ও জীবন ধারণের ক্ষেত্রে যে বিধান রয়েছে, তা হলো ব্যক্তি ও সমষ্টি তথা সমাজ ও দেশ উভয়ের স্বার্থ ও কল্যাণের প্রতি দৃষ্টি রেখে এ ব্যাপারে এমন একটি যুক্তিযুক্ত ও সঠিকতম মাধ্যমিক পন্থা গ্রহণ করা, যার ভিতর না হয় ব্যক্তির অধিকারের কোনো ক্ষতি সাধন এবং না হয় দেশ ও সমাজের স্বার্থের প্রতি কোনোরূপ আঘাত।

ইসলামি অর্থনীতির কতকগুলো মৌলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে:

যেমন ১. বায়তুল মাল ২. সুদ নিষিদ্ধ ৩. শোষনের উপায় উপকরণ নিষিদ্ধ ৪. ইসলামি অর্থনীতি যাকাত ভিত্তিক ভারসাম্যপুর্ণ সুষম অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করা । ৫. ইসলামি অর্থনীতিতে উৎপাদন,ভোগ ও বন্টনের ক্ষেত্রে হালালকে গ্রহণ করে হারামকে বর্জন করা। ৬. ইসলামি অর্থনীতিতে শ্রমিক ও মালিকের মধ্যে ব্যবধান কমিয়ে সুবিচার ও সুআচরণ প্রতিষ্ঠা করা ৭. মানুষের মৌলিক প্রয়োজর পুরণ যেমন-খাদ্য বস্ত্র, বাসস্থান,

Dhaka University Institutional Repository

চিকিৎসা, ও শিক্ষার পূর্ণ নিশ্চয়তা বিধান করা ৮. অপচয় না করা। উপরোক্ত বৈশিষ্ট্যগুলোর কথাই ইসলামি অর্থনীতিতে বলা হয়েছে।

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা বর্তমান পৃথিবীতে পুঁজিবাদ তথা ক্যাপিটালিজম ও কমিউনিজম এই দুই প্রকার অর্থ ব্যবস্থায়ই বাস্তবে প্রচলিত রয়েছে এই দুই মতবাদই সমগ্র বিশ্ব গ্রাস করে ফেলেছে। পুঁজিবাদ হলো যথেচ্ছ উদর পূর্তির জন্যে খাদ্য গ্রহণ, অন্য কথায় দুই হাতে নির্বিচারের অর্থ লুন্ঠন ছাড়া তার জীবনের অন্য কোন লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নেই এটাই হলো পুঁজিবাদ। এক কথায় পুঁজিবাদী সমাজে এক দল হয় মনিব মহাজন- যাবতীয় ধন-সম্পদের অধিপতি, অবশিষ্ট লোক হয় দরিদ্র নিঃস্ব এবং দাসানুদাস। ইকবাল এগুলো লক্ষ্য করেই বলেছেন:

تمیز بندہ و آقا فساد آدمیت ہے

حذر اے چیرہ دستاں سخت ہیں فطرت کی تعزیریں

প্রভু ও দাসের পার্থক্য

ধ্বংস করে মনুষ্যত্বকে,

হে ঘাতক! সাবধান হও

প্রকৃতির ভয়াবহ প্রতিশোধ থেকে। (আ.রহীম – ২০, পৃ. ৫৯)

পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার প্রধানত ছয়টি মূল নীতির কথা উল্লেখ করা যায়। যথা:

১. পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথা ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার।

২. ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ ও মালিকানা লাভের আকাঙ্খা।

৩. অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুঁজিবাদী মূলনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

৪. মালিক ও শ্রমিকের অধিকারের মৌলিক পার্থক্যকরণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য ।

৫. পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম মূলনীতি হলো ,রাষ্ট্র জনগণের অর্থনৈতিক লেনদেন ও আয় উৎপাদনের ওপর কোনোরূপ হস্তক্ষেপ করতে পারবে না।

৬. পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম মূল ভিত্তি হলো সুদ, জুয়া ও প্রতারণামূলক ।

১.পুঁজিবাদী অর্থনীতির প্রথা ভিত্তি হচ্ছে ব্যক্তিগত মালিকানার সীমাহীন অধিকার।এতে কেবল নিত্যনৈমিত্তিক প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি স্বীয় মালিকানায় রাখারই সুযোগ নয়, তাতে সকল প্রকার উৎপাদনের উপায় এবং যন্তপাতি ইচ্ছামতো ব্যবহার ও প্রয়োগেরই পূর্ণ সুযোগ লাভ করা যায়। ব্যক্তি নিজ ইচ্ছামতো যে কোনো পন্থা ও উপায়ে অর্থোপার্জন করতে পারে এবং যে কোনো পথে তা ব্যয় ও ব্যবহার ও করতে পারে । যেখানে ইচ্ছা সেখানে কারখানা স্থাপন করতে পারে এবং যতদুর ইচ্ছা মুনাফা ও লুটতে পারে । শ্রমিক নিয়োগের ক্ষেত্রে ও রয়েছে অবাধ সুযোগ ও স্বাধীনতা আবার তাদেরকে শোষনের মাধ্যমে ইচ্ছামতো মুনাফা অর্জনের ক্ষেত্রেও কোনো প্রতিবন্ধকতা নেই। ব্যক্তি বা সমগ্র সমাজ সমন্বিত হয়েও কাউকে কোনো প্রকার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না, সে অধিকার কারও নেই।

২.ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ ও মালিকানা লাভের আকাঙ্খা। ব্যক্তিগত সম্পদ আহরণ ও মালিকানা লাভের আকাঙ্ক্ষা মানুষের জন্মগত। মানুষের এই দাবি পরিপূরণ এবং এর বাস্তব রূপায়ণের জন্য ব্যক্তিকে

Dhaka University Institutional Repository

উপার্জন করার এবং এর ফল একহাতে সঞ্চিত করে রাখার সুযোগ করা পুঁজিবাদের অন্যতম মূলনীতি। পুঁজিবাদী মতানুসারে ব্যক্তিমালিক যদি এরুপ অবাধ ও অনিয়ন্ত্রিত সুযোগ লাভ করতে না পারে তাহলে মানুষ কিছুতেই অর্থ উৎপাদনের জন্য উৎসাহী ও আগ্রহী হবে না।

৩. অবাধ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা পুঁজিবাদী মূলনীতির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এরুপ প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দিতা কেবলমাত্র বিভিন্ন শ্রেণি দলের মধ্যেই নয়, পুঁজিবাদী শ্রেণিভূক্ত-একই দলের বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যেও তা কার্যকর রয়েছে। এরুপ প্রতিযোগিতার মূল দার্শনিক ভিত্তি হলো Stuggle for Existence বা বাঁচার লড়াই। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার মতে প্রতিযোগিতার অবাধ স্বাধীনতা অর্থব্যবস্থায় কেবল সামঞ্জস্যেরই সৃষ্টি করে না, প্রচুর উৎপাদন ও ত্বরিত গতিতে উৎপাদনেরও এটা একমাত্র নিয়ামক। এই অবাদ প্রতিযোগিতার ফলে মানুষ বিশ্বরহস্য উদঘাটন করে অভিনব আবিস্কার উদ্ভাবনের কাজে উদ্বুদ্ধ হয়।

৪. মালিক ও শ্রমিকের অধিকারের মৌলিক পার্থক্যকরণ পুঁজিবাদী ব্যবস্থার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।—এই নীতি অনুযায়ী শ্রমিক মালিকের এরূপ পার্থক্য বজায় রেখেও পারস্পরিক সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে দেখা যায়, এরূপ ব্যবস্থার ফলে গোটা মানবসমাজ দ্বিধাবিভক্ত হয়ে গড়ে একদল উৎপাদন উপায়ের একমাত্র মালিক হয়ে পড়ে, অপর দল হয়ে পড়ে নিতান্তই মেহনতি ও শ্রম বিক্রয়কারী জনতা। উৎপাদক শ্রমিকশ্রেণি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় নিজেদের একক দায়িত্বে পণ্য উৎপাদন করে। তাতে মুনাফা অর্জিত হলে তা দিয়ে মালিকেরই সিন্দুক ভর্তি হয়। লোকসান হলেও তা সে নীরবে মেনে নেয়। শ্রমিক শ্রেণির এর জন্য বিশেষ কোনো প্রভাব প্রবর্তিত হয় না। এরই ভিত্তিতে পুঁজিপতিগণ নিজেদের অমানষিক ও কঠোরতম কার্যকলাপকে ন্যায়সঙ্গত প্রমাণ করার চেষ্টা করে। পুঁজিপতিদের যুক্তি হলো যে, মূলধন বিনিয়োগ, পণ্য উৎপাদন ইত্যাদিতে সকল প্রকার ঝুঁকি ও দায়িত্ব যখন তারাই গ্রহণ করে, তখন মুনাফা হলে ও তা এককভাবে তাদেরই প্রাপ্য এবং শ্রমিকদের শোষণ করাও তাদের পুঁজিবাদী অর্থনীতির অন্যতম হাতিয়ার।

৫. ইসলামি অর্থনৈতিক ব্যবস্থার সাথে পুঁজিবাদী অর্থনীতির এ সকল মূলনীতি তুলনামূলক আলোচনা ও পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, ইসলামি অর্থনীতি যে, কোনো মূল্যে সামগ্রিক মানব কল্যাণের জন্য দায়বদ্ধ অপরপক্ষে পুঁজিবাদী মুষ্টিমেয় ব্যক্তির স্বার্থ ও কল্যাণ সাধনে ব্যাপৃত। পুঁজিবাদী মূলনীতিতে সামগ্রিকভাবে মানবসমাজের কল্যাণ সাধিত হতে পারে না।

৬.পুঁজিবাদী মূল নীতিসমূহের দু একটা বিষয় কোনো কোনো ক্ষেত্রে মানুষের জন্য মঙ্গলজনক হলেও অধিকাংশই হচ্ছে মানবতার পক্ষে মারাত্মক অকল্যাণকর। পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার প্রাথমিক পর্যায়ে মানুষের মধ্যে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করলেও পরবর্তী সময়ে এর অভ্যন্তরীণ ত্রুটি বিচ্যুতি জনগণের সামনে সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হয়ে পড়ে। তারা দেখতে পায় যে, সমাজে ধনসম্পদ বৃদ্ধিই পাচ্ছে সত্যি কিন্তু তা মুষ্টিমেয় পুঁজিপতির সর্বগ্রাহী হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ছে আর কোটি কোটি মানুষ নিঃস্ব ও বঞ্চিত হয়ে পড়ছে। পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ধনীকে আরো ধনী এবং দরিদ্রকে নিঃস্ব পথের ভিখারিতে পরিণত করছে। সমাজকে বিভিন্ন শ্রেণিকে বিভক্ত করে তার ভিত্তিমূলক চূর্ণবিচূর্ণ করে দিচ্ছে । একদিকে অসংখ্য পুঁজিপতি মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে ,অপরদিকে দরিদ্র দু:খী সর্বহারা মানুষের মিছিল থেকে ক্ষুধার যন্ত্রনার হাহাকারে বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থা ধনী দরিদ্রের এই সীমাহীন বৈসম্য দেখে পাশ্চাত্য চিন্তাবিদগণ ও বর্তমানে শঙ্কিত হয়ে উঠেছেন। অধ্যাপক কোলিন ক্লার্ক বলেছেন,বর্তমান পুঁজিবাদী সমাজে সর্বাপেক্ষা কম ও সর্বাপেক্ষা বেশি আয়ের মধ্যে শতকরা বিশ লক্ষ গুণ পার্থক্যের সৃষ্টি হয়েছে। এরূপ পার্থক্য ও অসামঞ্জস্য প্রতিটি সমাজে প্রত্যক্ষ করা যেতে পারে।

পুঁজিবাদী সমাজের আর একটি মৌলিক ত্রুটি হলো এখানে পুঁজিপতিরাই এই রাষ্ট্র ক্ষমতার অধিকারী হয়ে থাকেন। পরোক্ষ বা প্রত্যক্ষভাবে পুঁজিপতিগণই শাসক বা সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হয়ে থাকে। অনিয়ন্ত্রিত পুঁজিবাদী সমাজে অসীম বিত্তবৈভবের মালিক হয়ে পুঁজিবাদীরা নানা ধরনের অর্থনৈতিক ও অমানবিক কর্মকাণ্ডকে

Dhaka University Institutional Repository

বৈধ করে যথেচ্ছাচার জীবনযাপনে ব্যাপৃত হয়। এরা অবলীলায় গরিব, দুঃখী কৃষকসহ সকল শ্রমজীবী মানুষকে শোষণ করে । এই মজুদ শ্রেণির, রক্ত পানি করা শ্রমে অর্জিত ধন সম্পদ মালিক শ্রেণীর নিজেদের ইচ্ছামত ব্যয় করে চরম বিলাসী ও অপচয়কারী জীবনযাপন করে। অপরদিকে এসব শ্রমজীবী মানুষ তাদের জীবনের নুন্যতম প্রয়োজন মিটাবার অর্থও লাভ করতে ব্যর্থ হয়। পুঁজিবাদী সমাজের সম্পদের সিংহভাগ মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত হয়ে পড়ার ফলে সমাজের কোটি কোটি মানুষ দারিদ্র্য ও অভাব অনটনের গভীর তলদেশে নিমজ্জিত হয়ে পড়ে। (ফিরোজা – ৩১, পৃ.১২৮)

Dhaka University Institutional Repository

সাহিত্য ও সংস্কৃতি:

প্রাচ্য ও ইসলামের জ্ঞান বিজ্ঞানের প্রতি ইকবাল স্বাধীন সমালোচকের দৃষ্টি নিক্ষেপ করেছেন | মুসলিম সমাজকে নির্জীব,পুঙ্গ ও বিলাসী করে দেয় যে সাহিত্য, ইকবাল তার তিব্র নিন্দা করেন পক্ষান্তরে যেসব চিন্তাশীল মনীষীর গ্রন্থ ও প্রবন্ধরাজী জাতির জীর্ণ দেহে নব জীবনের স্পন্দন জাগিয়ে দেয়, তাদের প্রতি তার হৃদয় অনুপম ভক্তি ও শুভেচ্ছা নিহিত ছিল। তন্মধ্যে ফারসি কবি মওলানা রুমী যাঁর মসনভী আজ ও মানুষের বুকে প্রাচীন প্রেমের করূণ স্মৃতির দুঃসহ জ্বালা জাগিয়ে দেয় ইকবালের নিকট সর্বাদিক শ্রদ্ধা ও ভক্তির দাবিদার|

'জাবিদনামায় ইকবাল মওলানা রুমীকে নিজের পথপ্রদর্শক রূপে মেনে নিয়েছেন, যেমন করে দান্তে ভার্জিলকে গ্রহণ করেছেন নিজের পরিচালক হিসেবে। একথা নির্ভয়ে বলা চলে যে ইকবাল মওলানা রুমীর চিন্তাধারার দীপ্তিমান শিখা হতে যতদুর আলো গ্রহণ করেছেন, তত বেশি আর কারো নিকট হতে তিনি লাভ করতে পারেননি। বস্তুত প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য জ্ঞানবিজ্ঞানের সংমিশ্রণের ফলেই ইকবালের পক্ষে একটা অভিনব,স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ জ্ঞানের রাজপথ রচনা করা খুবই সহজ হয়েছে। প্রাচ্য দেশের দর্শন ও অধ্যাত্মবাদকে পশ্চিমী বুদ্ধি ও বিজ্ঞানের মাপকাঠি দিয়ে তিনি যাচাই করেছেন এবং তার মুকাবিলায় একটা সুসমঞ্জস্য,সুসংবদ্ধ ও সঞ্জীবিত দর্শন সৃষ্টি করেছেন, তাতে পাশ্চাত্যের পরিবর্তে প্রাচ্য ভাবধারারই প্রভাব অধিকতর প্রতিফলিত হয়েছে। ইকবাল নিজেই বলেছেন:

' দুখের বিষয় পাশ্চাত্য জাতিসমূহ ইসলামি দর্শন সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ। আমার অবকাশ হলেই আমি একখানা বৃহদাকার গ্রন্থ রচনা করে ইউরোপীয় দার্শনিকদিগকে জানিয়ে দিতাম যে, আমাদের ও তাদের দর্শনের মধ্যে কত ঐক্য ও সামঞ্জস্য বিদ্যমান। অন্যত্র ইকবাল বলেছেন:
আমার দর্শন প্রাচীন মুসলিম সুফী ও দার্শনিকদের প্রদত্ত শিক্ষার পরি সমাপ্তি ও পরিপূর্ণ মাত্র। আরো স্বষ্ট ভাষায় বলতে গেলে এ নতুন অভিজ্ঞতার আলোকে পুরানের ব্যাখ্যা মাত্র।

বস্তুত ইকবাল জীবনদর্শনের স্বার্থক কবি। তিনি তাঁর কাল্পনিক সৃষ্টির মারফতে ভাবাভেগে ভারাক্রান্ত দিলকে শুধু ভাবমুক্তই করেন নাই, সেই সঙ্গে তামাদ্দুনিক মূল্যমানকে জাতির সাথে তাঁর নিকট সম্পর্ক বিদ্যমান, তাঁর ঐতিহ্য ও নৈতিক দায়িত্বসমূহ তিনি তীব্রভাবে অনুভব করেন। তাঁর সাহিত্য ব্যক্তিগত ও অভ্যন্তরীণ মৌলিকতা ছাড়া সামাজিক ভিত্তিও যথাযথরূপে বিরাজমান। কাব্য রচনা তাঁর কোন বিলাস নহে, এ তাঁর জীবনের উদ্দেশ্য সিদ্ধির উপায় মাত্র।তাঁর জীবন লক্ষ্যের মহানতা ও বিরাটত্বের কারণে তাঁর সাহিত্য উন্নত মর্যদার অধিকারী হয়েছে। বিষয় বস্তুর শ্রেষ্ঠত্বের কারণেই শিল্পীর শিল্প লাভ করে শ্রেষ্ঠত্ব।রচনা চাতুর্য নিখুত হওয়ার দ্বারাই সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত হওয়া জরুরী কিছুই নয়।

সাহিত্য ও শিল্পকে ইকবাল মনে করেন জীবনের খিদমতগার। তাঁর দৃষ্টিতে সার্থক কবি তিনিই হতে পারেন,যিনি নিজের ব্যক্তিত্বের শক্তি ও প্রেমের তেজস্বীতার দ্বারা স্বীয় মন ও মগজের উপর এক অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করতে পারে, আর | এ হচ্ছে শিল্পের প্রাণবন্ত। বীর্যবত্তা ও সৌন্দয্য পিপাসা উভয় ভাবধারাই এখানে পাশাপাশি বিদ্যমান| তিনি বলেন:

دلبری ہے داہری جادو گری است   دلبری باقاہری پیغمبری است

যে মনোজয়ের সাথে
বীর্যবত্তার নাই কোন সম্পর্ক
যাদু ক্রিয়া বলা হয় তাকে,
যে মন আকর্ষণের সহিত
যোগ হয় বীর্যবত্তার
তাই পয়গম্বরী বৈশিষ্ট্য। (ইকবাল – ৫, পৃ. ২৯৫)

Dhaka University Institutional Repository

শিল্প ও সাহিত্য সম্পর্কে তাঁর ধারণার বিশ্লেষণ করে তিনি নিজেই বলেন:

کسی قوم کی روحانی صحب کا دار ومدار اس کے شعرا اور ان کی الہامی صلاحیت پر ہوتا ہے لیکن یہ ایسی چیز نہیں جس پر کسی کو قابو حاصل ہوئی یک عطیہ ے جس کی خاصیت تاثیر کے متعلق اس کا پانے والا اسوقت تک تقیدی نظرایں ڈال سکتا جب تک کہ وہ اسے حاصل نہ کرچکاہو

কোন জাতির আধ্যাত্মিক সুস্থতা নির্ভর করে এ কবি সাহিত্যিক ও শিল্পীদের ইলহামি যোগ্যতার উপর। কিন্তু এ অর্জন করার মতো বস্তু নয়। প্রকৃতপক্ষে এ একটি দান মাত্র, এ পূর্ণরূপে করায়ত্ত হওয়ার পূর্বে এর বিশেষত্ব ও প্রভাব প্রতিক্রিয়া সম্পর্কে কোন সমালোচনা মূলক উক্তি করা সেই দান প্রাপকের পক্ষে ও সম্ভব হয় না।

ইকবালের কাব্য সুনির্দিষ্ট আধ্যাত্মিক ও নৈতিক উদ্দেশ্যের জন্য উৎসর্গীকৃত। তিনি শ্রোতার হৃদয়ে শক্তি ও আকর্ষণের এক অপূর্ব আয়ত্তাধীন করিতে বদ্ধপরিকর । তাঁর সাহিত্যের মূলে দুইটি প্রেরণা বিশেষভাবে বিদ্যমান। একটি হচ্ছে মানব জীবনের সীমাহীন সম্ভাবনা সম্পর্কীয় ধারণা,আর দ্বিতীয় হচ্ছে বিশ্বলোকের উপর মানব মনের আধিপত্য স্থাপন। একথা সত্য যে,বিশেষ উদ্দেশ্যে নিয়োজিত সাহিত্য সাধারণত নিরস,শুস্ক ও শৈল্পিক দৃষ্টিতে নগণ্য হয়ে থাকে। কিন্তু ইকবাল নিজের উদ্দেশ্য ও মূল বক্তব্যকে কাব্যিক চাকচিক্য ও আকর্ষণীয় মালমসলায় ভরপুর করিয়া এমনভাবে পেশ করে যে, পাঠকের মন সহজেই কাড়িয়া লয়। তাঁর কাব্য শৈল্পিক মান ও মর্যাদা হতে কওথাও বিচুযত কিংবা বঞ্চিত হয়নি।

ইকবালের দৃষ্টিতে সত্য ও সৌন্দর্য একই জিনিস,সৌন্দর্যের গভীর সূক্ষ্ম অনুভূতির মাধ্যমে আধ্যাত্মিক ও নৈতিক মূল্যমান অনুধাবন করাই শিল্পের উচ্চতর মর্যাদা নিহিত। তাঁর মতে সৌন্দর্য স ত্যের উজ্বল আশীর্ বিশেষ এবং হৃদয় হচ্ছে সৌন্দর্য দর্পণ।

ইকবালের মতে বিজ্ঞান হতে ভাবাবেগ বিবর্জিত সত্য, আর কবিতা হচ্ছে এমন সত্য,যাতে অন্তরের জ্বালা ও বেদনার সংমিশ্রণ হয়। তিনি বলেন,বুআলী সীনা মানতেক ও বিশ্লেষণমূলক যুক্তিজালে জড়িয়ে পড়ে বিভ্রান্ত হচ্ছে,আর লুশী তাঁর হৃদয়বেগ ও অনুভূতির সাহায্যে মহান সত্য লাভে অতি সহজেই সমর্থ হচ্ছে।

ইকবালের সাহিত্যদর্শন তাঁর আত্মদর্শনের অধীন এবং ওরই অনুগত। সাহিত্য হচ্ছে খুদী প্রকাশের একটি উপায় বা বাহনমাত্র। যে সাহিত্য খুদীর সন্ধান মেলে না, ইকবালের দৃষ্টিতে তা কোন প্রশংসনীয় জিনিস নয়।

ইকবালের মতে, মানুষের খুদী'র পূর্ণত্ব বিধানের পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করাই হচ্ছে প্রকৃতির ধর্ম,তাই প্রকৃতিকে জয় ও অধীন করে লোয়াই নিহিত রয়েছে মানুষের মর্যাদা ও শ্রেষ্ঠত্ব। মানুষের এই চেষ্টা হবে সৃষ্টিধর্মী, প্রকৃতির সাথে অবিরাম সংগ্রাম করে মানুষ লাভ করে তাঁর মানসিক উৎকর্ষতা। জীবনের সকল শক্তিকে জাগ্রত করা এবং জীবনকে পূর্ণতা দান করাই হচ্ছে সংস্কৃতির কর্তব্য। ইকবাল নিজেই লিখেছেন:

'জীবনই হচ্ছে সমস্ত মানবীয় কাজকর্মের মূল লক্ষ্য। জীবন সুন্দর হোক,উন্নতশীল ও বর্ধিষ্ণু হোক ও সকলেরই কাম্য। কাজেই সকল শিল্প ও সাহিত্যেরই এ বিরাট উদ্দেশ্যে নিয়োজিত হওয়া আবশ্যক এবং যার দ্বারা জীবন সর্বাধিক প্রাচুর্য লাভ করবে, তাই ততদুর উত্তম ও উৎকৃষ্ট হওয়ার মর্যাদা পাবে। সর্বাপেক্ষা উন্নত সাহিত্য হবে তা, যা আমাদের মধ্যে জীবনের যাবতীয় জটিলতার সাফল্যজনকভাবে মুকাবেলা করতে পারি । যেসব জ্ঞান বিজ্ঞান ও সাহিত্য-সংস্কৃতি মানুষকে স্বপ্নবিষ্ট করে দেয় এবং জীবনের জন্যে অপরিহার্য পারিপার্শ্বিক নিগুঢ় তত্ব লাভ হতে যা আমাদেরকে গাফিল করে দেয়।,তা মূলত ধ্বংস ও মৃত্যুর সমান। সাহিত্য ও সংস্কৃতি তাই, যা আমাদের মধ্যে নবন জীবন ও জাগরণের সঞ্চার করে, যা গাফলতির প্রচন্ড নেশার উদ্রেক করতো না। সাহিত্য ও

Dhaka University Institutional Repository

শিল্পের লক্ষ্য সাহিত্য ও শিল্পই, অন্য কিছু নয়-এ কথা যারা বলে,তারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করতে আমাদের জীবন ও বীর্যবত্তা ধ্বংস করতে চেষ্টা করে মাত্র। এসব অজ্ঞ বন্দুদের হতে সতর্ক থাকা ই আমাদের কর্তব্য| (আ. রহীম-২০, পৃ.৬৬)

বস্তুত শিল্পী চাহেন স্বীয় শিল্পের সাহায্যে জীবনের অভিব্যক্তি| জীবন সমস্যার সাথে যে শিল্পীর নিকটতম সম্পর্ক নাই, তার সৃষ্টি কৃত্রিম, নিস্প্রাণ ও অন্তসারশূন্য হতে বাধ্য। কবি তার হৃদয়ে উদ্বেলিত ভাবসম্পদকে একটি জীবন্ত জাগ্রত সত্যরূপে উপস্থাপিত করেন। আর কবি যা কিছু তার হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে পারেন, তদোপেক্ষা অধিক বাস্তব সত্য আর কিইবা হতে পারে। মানুষের সর্বাদিক মূল্যবান সম্পদ হচ্ছে তার হৃদয়। এই ‘হৃদয়ের জীবন্ত থাকার নাম জীবন| জীবন যত হীন ও নিকৃষ্টই হোক না কেন, মানুষের নিকট মৃত্যু অপেক্ষা তাই অধিক কাম্য। এই কারণে জীবনবাদী কাব্যই মানুষের পক্ষে অনির্বচনীয় সম্পদ। জীবনের দুইটি দিক রয়েছে। একটি যন্ত্রের মতো সদা কর্মবিরত আর অপরটি নিত্য নতুন রুপলাভ করে ক্রমবিকাশ ও সুষ্ঠু লালন পালনের মাধ্যমে| কবির দৃষ্টি সমক্ষে এই উভয় দিকই দীপ্ত ও সমুজ্জ্বল হয়ে আছে, কিন্তু স্বীয় কাব্যের বিষয়বস্তু হিসাবে জীবনের এই পরিবর্তনশীল দিকটিকেই দেন অধিক প্রাধান্য। এই জণ্যেই তার দৃষ্টি পরিবর্তনশীল ও বিপুল সম্ভাবনাময় জীবনের উপরই নিবন্ধ থাকে প্রতিটি মুহূর্ত| যে পরম নিগুঢ় সত্য কবির তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে, সাধারণ মানুষের দৃষ্টিতে তা কখনো ধরা পড়ে না। কবি তার অভ্যন্তরীণ ভাবধারার দৌলতে গভীর সত্যে অধিকতর গভীরতার সৃষ্টি করেন। পতনশীল শিল্প সামগ্রিক ও নৈতিক জীবনের সাথে সম্পর্ক রক্ষা করে চলতে সমর্থ হয় না। তাই কবি না কখনো আদর্শ নিরপেক্ষ হতে পারেন, না পারে তার কাব্য। কবির প্রকৃতি সম্পর্কে ইকবাল বলেন:

فطرت شاعر سراپا جستجو ست — خالق و پرورد گار آرزوست
شاعر اندر سینه ملت چو دل — ملتی بی شاعری انبار کل
سوز مستی نقسبند عالمی ست — شاعری بی سوز ، مسای ما تمی ست
شعرا مقصود اگر آدم گریست — شاعری هم وارث پیغمبریست

কবির প্রকৃতি নিরন্তর অনুসন্ধিৎসু
সৃষ্টি করে নিত্য নুতন আকাঙ্কা
করে তার লালন-পালন।
কবির মর্যাদা অসীম-
জাতির বক্ষে যেমন দিল,
যে জাতি পায়নি কখনো কাব্যের অপূর্ব প্রেরণা
তা যেন মৃত্তিকার স্তূপ।
কবির হৃদয়জ্বালা
জ্যেআতির্ময় করে তোলে একটি জগত।
মমৃজ্বালা আর আবেদনহীন কাব্যমালা,
অর্থহীন শোকঘাথা মাত্র।
কবিতার লক্ষ্য যদি হয় মানুষ গড়িয়া তোলা
এই কাব্যই হতে পারে
পয়গম্বরীর উত্তারাধিকার (ইকবাল-৫, পৃ. ২৪৬)

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সাস্কৃতিক মূল্যবোধ:

প্রাচ্য তথা ইসলামি সংস্কৃতি বলতে উন্নততর মতাদর্শ, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং সামাজিক ও নৈতিক মূল্যমান। আর এর মৌল ভাবধারা হচ্ছে সে সব মূলনীতি, যার ওপর আমাদের সাংস্কৃতিক কাঠামোর দৃঢ়তা স্থিতি নির্ভরশীল। সে মূলনীতিগুলোকে ব্যাপকভাবে গন্য করলে তা অনেক হবে । তবে পরে সংক্ষেপে বিশিষ্ট মূলনীতিসমূহের উল্লেখ করব।

ইকবালের মতে ইসলামি সংস্কৃতির মূল কথা হল একথা স্বীকার করা যে, মহান আল্লাহ তা'আলা গোটা বিশ্বলোকের এক ও একক স্রষ্টা; তিনিই একমাত্র সার্বভৌম প্রভু। হযরত মুহাম্মদ (স.) দুনিয়ায় আল্লাহর প্রতিনিধি এবং কুরআন মজীদ আল্লাহর কালাম-হেদায়েতের সর্বশেষ বিধান। ইসলামি মতাদর্শ তাওহীদ বিশ্বাস হল সর্বপ্রথম এবং সর্বাদিক মৌলিক বিসয়। আল্লাহ ছাড়া কেউ মা'বুদ নেই (لا إله إلا الله) -এই ঘোষণাটি হচ্ছে তাওহীদের সার নির্যাস, অন্য কথায় আল্লাহকে প্রকৃত মা'বুদ রূপে মেনে নেয়া এবং তাঁরই নিরংকুশ প্রভুত্ব ও কতৃত্ব (সার্বভৌমত্ব) স্বীকার করার পর মানুষ দুনিয়ায় খোদায়ীর দাবিদার অন্যান্য দেব -দেবী, অবতার, রাজা বাদশাহ এবং সম্পদ দেবতার দাসত্বের অভিশাপ থেকে চিরকালের তরে মুক্তি লাভ করতে পারে। তওহীদের এ আকীদার দৃষ্টিতে ইসলামি সংস্কৃতি বংশীয় পার্থক্য, বর্ণগত বৈষম্য -বিরোধ, আর্থিক অবস্থাভিত্তিক শ্রেণী পার্থক্য, ভৌগলিক সীমাভিত্তিক শত্রুতা প্রভৃতিকে আদৌ বরদাশত করতে পারেনা: অথচ এসবের ওপর ভিত্তি করেই গড়ে ওঠেছে দুনিয়ার অন্যান্য সভ্যতা। মানুষে মানুষে যৌক্তিক ও সঠিক সাম্যই হচ্ছে মানুষ সম্পর্কে ইসলামি সংস্কৃতির একমাত্র দৃষ্টি। আল্লাহকে এক ও লা- শরীক সার্বভৌম বলে স্বীকার করা এবং সকল মানুষকে মূলগতভাবে সমান অধিকার সম্পন্ন মেনে নেয়া শুধু মৌখিকভাবে মেনে নেয়াই নয়, বাস্তবক্ষেত্রে ও সেই অনুযায়ী ব্যক্তি জীবন ও সমাজ জীবন পরিচালিত করাই হল ইসলামি সংস্কৃতির মর্মবাণী। ইসলামি সংস্কৃতির দৃষ্টিতে একজন শ্রমঝীবী ও তেমনি সম্মানার্হ যেমন সম্মানীয় কোন কারখানার মালিক নিগ্রো মুষ্ঠিযোদ্ধা মুহাম্মদ আলী ক্লে ও শ্বেতাঙ্গ চিন্তাবিদ মুহাম্মদ মর্মাডিউক পিকথল অভিন্ন শ্রদ্ধার পাত্র। ইসলামি সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তিই তার খাদ্য,বস্ত্র, বাসস্থান,শিক্ষা,চিকিৎসা প্রভৃতি মৌলিক প্রয়োজন বাধে পুরণের অধিকারী। এ অধিকার সত্যিকারভাবে পৌছে দেয়ার ব্যবস্থা করাই ইসলামি সংস্কৃতির সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় দায়িত্ব।

প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির ও অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে পার্থক্য বিস্তর অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রাচ্য অপেক্ষা পাশ্চাত্য যত বেশি উন্নত, শালীনতা ও সংস্কৃতিক ক্ষেত্রে তার চেয়ে অনেক বেশি অনুন্নত। প্রযুক্তিবিদ্যা ও বিজ্ঞান চর্চায় পাশ্চাত্য হতে আমাদের শিক্ষা নেয়ার অনেক কিছু আছে।কিন্তু ধর্ম ও সংস্কৃতির দিগন্ত পাশ্চাত্যকে দেবার আছে অনেক এবং তারাও তা স্বীকার করে। প্রাচ্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির মূল ভিত্তি হলো ধর্ম ও নৈতিকতা। পাশ্চাত্য সভ্যতার ভিত্তি হলো জড় বস্তু এবং অর্থ। জড় বস্তু অপেক্ষা ধর্মের এবং অর্থ অপেক্ষা নৈতিকতার মূল্য অনেক বেশি। পাশ্চাত্যের আর্থিক উৎকর্ষ দারিদ্রের পীড়নে আমরা জর্জরিত। ক্ষুধার পীড়নে হিতাহিতজ্ঞান লোপ হয়। বাঘিনী ক্ষুধার তাড়নায় নিজের সন্তান পর্যন্ত ভক্ষণ করে। অভাবক্লিষ্ট প্রাচ্যের তরুণ আর প্রবীণদের কেউ কেউ অর্থনৈতিক উন্নতির মোহ এবং জড়বাদী ক্ষুধার তাড়নায় নিজেরদের ধর্ম,আদর্শ, নীতি বিসর্জন দিয়ে পাশ্চাত্য সভ্যতার সব কিছু গলাধকরণ করে জাতীয় জীবনে অবক্ষয় নিয়ে আসছেন।
(আলম-১১৩, পৃ. ১৬)
ইকবাল তার বাংগে দারা কাব্য গ্রন্থে ‘’ইউরোপীয় সংস্কৃতি’’ শীর্ষক কবিতায় বলেন:

বুদ্ধিতে দীপ্তিতে ভরা পশ্চিমের জীবনের গতি
প্রেমের সুরাহী দিয়ে পূর্ণ হল প্রাচ্যের জীবন;
উজ্জ্বল প্রেমের পথে বুদ্ধি পায় বাস্তবের পথ
বুদ্ধির পথেই চলে প্রেম তার স্থায়িত্বের দিকে।
জাগো, সবে ভাঁধো এই নব বুনিয়াদ

Dhaka University Institutional Repository

প্রেম আর বুদ্ধি দিয়ে অন্য এক নয়া জগতের। (ওয়াহিদ –ইকবালের শ্রেষ্ঠ কবিতা পৃ. ৮৩)

দান সংস্কৃতি:

বস্তুবাধিগ্রস্থ পাশ্চাত্য হতে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের সময় অজস্র ত্রাণ সাহায্য প্রেরিত হয় দেখে তাঁদের মানবতাবোধে আমরা মোহিত হই। অঢেল উৎপাদনের দেশে যেখানে সমুদ্রে পর্যন্ত খাদ্যশস্য ঢেলে দিতে হয়, তেমন দেশ হতে ভিন্ন দেশের মানুষের জন্যে তাঁদের আয়ের তুলনায় যৎকিঞ্চিত সাহায্য বোধ হয় বিরাট কিছু নয়। তদুপরি দান করা সে দেশের কালচার।

সন্তানের স্বনির্ভরতা:

আমাদের দেশের বিত্তশালীরা তাদের বিপুল ধন সম্পদ অধ:সন্তান কয়েক পুরূষকে অধ:পাতে বা অধ:পতন নিয়ে যাওয়ার জন্যে শুধু পুত্র কন্যার জন্যে রেখে যান। পাশ্চাত্যে তা হয় না। পাশ্চাত্যের শিশুদের মধ্যে আত্মসন্মানবোধ সৃষিট করা হয়। তারা নিজের পায়ে দাঁড়াতে চেষ্টা করে। নিজেদেরকে তারা বাবা - মা এর অপদার্থ, অক্ষম সন্তান মনে করে না ধন সম্পদ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, হাসপাতাল, ইত্যাদির জন্যে প্রায় ৮০-৯০% উৎসর্গ করে যায় পাশ্চাত্যের ৯০% লোক। তাই বিদেশে রিলিফ দ্রব্য প্রেরণ সমাজের জন্যে তেমন বড় কথা নয়। তাছাড়া অস্ত্র প্রতিযোগিতায় যা ব্যয় হয়, তার হাজার ভাগের এক ভাগও দারিদ্র্য ক্লষ্ট দেশের মানুষের জন্যে আসে না।

বয়োবৃদ্ধদের অসহায় অবস্থা:

পাশ্চাত্য সংস্কৃতিতে সবচেয়ে হতভাগ্য এবং অবহেলিত মানুষ হলো বয়োবৃদ্ধ, অসহায় পিতামাতা এবং অবোধ শিশু সন্তান। বয়স্ক ছেলেমেয়ে পিতামাতার সংসারে থাকে না অথবা পিতামাতাকে ছেলেমেয়েদের সংসারে রাখা হয় না। তারা পৃথক জীবন যাপন করে। একজন জোরে নাক ডাকিয়ে ঘুমালে বা টুথব্রাস ঠিকমত ধুয়ে না রাখলে পাশ্চাত্য সমাজে হয় অন্যের প্রতি নিষ্ঠুরতা। এরূপ কারণে পর্যন্ত স্বামী স্ত্রী আদালতের রায়ের তালাকপ্রাপ্ত হয়। বয়োবৃদ্ধ নারী পুরুষ প্রায়শ:ই দেখা যায় একক জীবন যাপন করে। মানবতাবোধের কি অদ্ভুত প্রতিফলন!

পারিবারিক জীবনে একে অপরের প্রতি সহনশীলতা পাশ্চাত্যে একেবারেই কম। চলৎশক্তি রহিত না হওয়া পর্যন্ত বয়োবৃদ্ধরা হাঁট বাজার করে। জীবনী শক্তি নিঃশেষ না পর্যন্ত নিজের রান্না নিজেই করে। আর রান্না করার বা চলাফেরা রা শক্তি যখন থাকে না, তখন রান্নার প্রয়োজন হয় না এমন জিনিস খেয়ে বেঁচে থাকে। কাউকে খবর দেয়ার না থাকলে বা হঠাৎ করে অজ্ঞান হয়ে পড়লে একলা ঘরেই পড়ে থাকে। মৃতদেহের দুগন্ধ বের হলে প্রতিবেশী ফ্লাটের লোকেরা দরজা ভেঙ্গে মৃতদেহ বের করে। এইতো হলো শত শত, হাজার হাজার বুড়োর অবস্থা। বৃদ্ধদের প্রতি এরূপ অমানবিক নিষ্ঠুরতা যে সংস্কৃতিতে চলে, সে সংস্কৃতি অনুকরণের কি অন্ধ প্রয়াসই না আমাদের।

শিশুদের প্রতি অবহেলা:

শুধু যে বৃদ্ধদেরই অবস্থা করূণ তা নয়। অবোধ শিমুদের অবস্থা ও পাশ্চাত্যে তেমন সুখকর নয়। পিতা মাতা রাস্তায় বেড়াতে বের হয়েছে সাথে নিয়েছেন ছোট শিমু এবং পোষা কুকুর কুকুরের গলায় বেল্ট। বেল্টের সঙ্গে লাগান আছে আর একটি চেইন। এ চেইন ধরে বাবা হাঁটছেন। উদ্দেশ্য শিশু যেন ইচ্ছেমতো হেটে ফুটপাতের নীচে না পড়ে, বাবা থেকে দুতিন হাতের বেশি দুরত্বে যেতে না পারে। এ দৃশ্য আমাদের নিকট অসহনীয় কারণ, কুকুর

Dhaka University Institutional Repository

আর শিশু সমস্তরের জীব নয়। পাশ্চাত্য বাস্তববাদী ছোট্ট শিশুর অহংবোধ নেই। কুকুরের মতো শৃঙ্খলাবদ্ধ হলেও শিশু অপমানিত বোধ করে না। অবস্থা ও পাশ্চাত্যে তেমন সুখকর নয়।

এক দুই তিন বছর বয়সের শিশুর সামনে অজস্র খেলনা আর পর্যপ্ত খাবার রেখে একটি দু'তিন হাত লম্বা বেল্ট বা চেইন নিয়ে দিয়ে ঘরে বেঁধে রেখে মা শিশুর সামনে দিয়ে আর এক পুরুষের হাত ধরে ক্লাবে নাচতে চলে যান।

বাবা- মা একসঙ্গে থাকলে দুজনই ক্লাবে বা বাইরে চলে যান। বেল্ট বা চেইন দিয়ে আটকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে হলো শিশু ওযন এর বাইরে গিয়ে ঘরের কোনো কিছু নষ্ট না করতে পারে। কিছুক্ষণ করে অনেকক্ষণ কেঁদে পেন্টিতে পেশাব পায়খানা সহ শিশূ এক সময় ঘুমিয়ে পড়ে।

শিশুদের প্রতি অবহেলা

যে শিশুর প্রতি বাপ মা এমন নিষ্ঠুর, যে শিশু বৃদ্ধ পিতামাতাকে তাঁদের শেষ বয়সে নিজের কাছে রেখে সেবা না করলে তাঁকে কতটুকু দোষ দেয়া যায়।

কুরূচিপূর্ণ পোশাক:

মুসলিম মূল্যবোধ নারীদের পায়ের টাকনুর নীচ পর্যন্ত পোশাকে ডেকে রাখতে হবে। পাশ্চাত্য নারীরা আণ্ডার অয়্যারের উপরে স্কার্ট পরে যা অনেক ক্ষেত্রে হাফপ্যান্ট থেকে খাটো। সন্মুখে বসলে উরুর অংশ সুস্পষ্ট হয়ে উঠে। যেমন দেখা যেতো প্রিন্সেস ডায়ানার উরু। এ কুরুচিপূর্ণপোশাক পরিহিতা পাশ্চাত্য নারী দেখে অতৃপ্ত যুবকেরা আনন্দিত হন। সুরুচিবানগণ দু:খিত হন, দৃষ্টি অন্যদিকে ফিরিয়ে রাখেন। ইকবাল তার জাবিদনামা গ্রন্থে বলেন:

পোশাক পরিচ্ছদে নাসারা, সংস্কৃতিতে হিন্দু
এমন মুসলমান
যাকে দেখে ইহুদিরা পর্যন্ত লজ্জা পায়।

ভারতের মহাত্মা মোহন চান্দ করম গান্ধী হাঁটুর উপরে ধুতি পরে বৃটিশ রাজা পঞ্চম জর্জ এবং রাণী মেরী-র সঙ্গে সাক্ষাত করেছিলেন। তার এ আচরণটি বৃটিশ পত্র-পত্রিকায় কঠোরভাবে সমালোচিত হলে সুরসিক গান্ধী রসাত্মক একটি জবাব দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন, রাণীর স্বামী রাজা একজন বৃটেনবাসীর পরিহিত পোশাকের দ্বিগুণ পরিচ্ছদে বিভূষিত ছিলেন। গান্ধী ছিলেন প্রয়োজনের অর্ধেক পোষাকে । দুই পুরুষের পোশাকের গড় নিলে হিসাব মিলে যায়।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য বিষয়ে ইকবাল নিজের ও অন্য সকল মানুষের অলঙ্গনীয় বাস্তব অক্ষমতার বিষয়টি ধরতে পেরেছিলেন যে, একটি আলোকিত সমৃদ্ধ পৃথিবীর জন্য তাঁর যে আকন্ঠ পিপাসা, তা মিটাতে পারে কেবল আল্লাহ পাক। এটা শুধু মুসলিম উম্মাহর জন্য নয়, সমগ্র মানবমণ্ডলীর জন্য সত্য। অতএব, ইকবালের নিজস্ব কোনো স্বরচিত ও উদ্ভাবিত মানবতার দর্শন নেই; বরং সর্ব কল্যাণময় মানবতা প্রতিষ্ঠার যে ভুবনপ্লাবী নূর অব্যর্থ পথের সন্ধান দিয়েছিলেন সেই নূরই ইকবালের চোখের আলো সেই শ্বাশত পথই ইকবালের যাত্রাপথ। মানবতার প্রশ্নে ইকবাল কুরআন ও রাসূল (সা.) এর জীবনাদর্শেরই একজন বিশ্বস্ত অনুগত ভাষ্যকার। এজন্যই এডওয়ার্ড ম্যাককাথী তাঁর *ইকবাল ও ইউরোপ* প্রবন্ধে খুব পরিস্কারভাবে বলেছেন:

[যে একটি সুন্দর ভবিষ্যৎ নির্মাণের স্বপ্ন আমরা দেখি, ইকবালের দৃঢ়বিশ্বাস তা কেবল সম্ভব 'অতীতের সাথে সংযোগ-সাধনে, অতীতের জীবন্ত ধারাকে অবলম্বনে এবং কুরআনের শিক্ষাকে চিরকালীন স্বীকৃতিদানে।]

ইকবাল বলেন:

ফিরিয়ে আনো সেই পেয়ালা
আর সেই সঞ্জীবনী সুরা
আবার আমাকে আরোহণ করতে দাও
গৌরবের সুউচ্চ চূড়ায়।' (জাফর- ৬০ পৃ. ১৮)

Dhaka University Institutional Repository

আমরা নিশ্চয়ই অনুমান করতে পারি, অনুধাবনও করতে পারি, সঞ্জীবনী সুরাপূর্ণ এই পেয়ালা আসলে ইসলামের পেয়ালা; আর ইকবাল যে পুনরায় গৌরবের সুউচ্চ চূড়ায় আরোহন করতে চান, গৌরব ও চূড়া হলো মানবতার নির্ভুল কামিয়াবী; এবং আমরা এটাও অনুধাবন করতে পারি যে, ইকবাল তাঁর এই কাঙ্খিত বিজয়কে শুধু একজন ব্যক্তির বা শুধু মুসলিম উম্মাহর বিজয় বলে মনে করেন নি, এবং এই বিজয় বিশ্ববিস্তৃত সকল মানুষের বিজয়। এজন্যই তিনি খুব তীব্রভাবে অনুভব করেছিলেন, দেশপ্রেমই যথেষ্ট নয়' এবং ' সংকীর্ণ জাতীয়তাবাদ একটি বিপজ্জনক বস্তু। উপলদ্ধি করেছিলেন, মানব জাতিকে বাঁচানো যাবে না, যে পর্যন্ত বিশ্বের চিন্তানায়কগণ সমগ্র মানবজাতিকে একটিমাত্র মানব পরিবাররূপে চিন্তা ও অনুভব না করছেন।

ইকবাল দেখেছিলেন, গৌরবের সেই সুউচ্চ চূড়ায় কি মানবসভ্যতা আরোহন করতে সক্ষম হয়েছে? না, সক্ষম যে হয়নি তার কারণ, ইকবাল আল-কুরআনের মধ্যে কামিয়াবির জন্য প্রয়োজনীয় শক্তি ও পথ নির্দেশনা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, বর্তমান বিশ্ব সেই আল-কুরআনকে গ্রহণ করতে সর্বতোভাবে অনীহাই প্রকাশ করেছে।

প্রসংগত উল্লেখ্য, ইকবাল দেখেছিলেন মানবমুক্তির জন্য তাঁর সমসাময়িক সময়ে পুঁজিবাদী ও সমাজতন্ত্রীদের সম্পূর্ণ পরস্পর বিরোধী ভুমিকা, সম্পূর্ণ মানববৈরী দুই দানবের লড়াই। তারপর, ইকবাল মৃত্যুর অনেক দিন পর এক দানব তার স্বগৃহেই ভূশয্যা গ্রহণ করলো; দ্বিতীয়: দানবটি এখন বিশ্বময় মাতামাতি করছে। কিন্তু কৌতুকের বিষয়, তারও মুখে 'মানবমুক্তির জয়গান। এবং এই প্রসঙ্গে এই কথাটিই উল্লেখযোগ্য যে.এই হিংস্র দানবটির এখন একমাত্র দুশমন হলো ইসলাম। পুঁজিবাদী পশ্চিমা বিশ্ব ইসলামকে বড় ভয় করে, ইসলামকে দেখে বড় লজ্জা পায়। কারণ, পশ্চিমা পুঁজিবাদী জগৎযত ভালো মানুষের বেশবাস-ই ধারণ করুক, তার কদর্য কুৎসিত চেহারাটা পৃথিবী সমক্ষে তুলে ধরতে পারে একমাত্র ইসলাম; এবং এইজন্যই ইহুদী- নাসারা পশ্চিমাচক্র-যে মানবতার কথা বলছে, আপাতমধুর নারীমুক্তি 'মানবাধিকার'ও 'প্রগতির' কথা বলে তার প্রকৃত উদ্দেশ্য হলো দুটি।

প্রথমত: ইসলাম যে নির্ভুল ও অব্যর্থ মানব কল্যাণের পথ দেখায়, তার বিপরিত পশ্চিমা পুঁজিবাদও যে যথেষ্ঠ মানবপ্রেমী, এটা দেখিয়ে একটা বিভ্রম সৃষ্টি করতে চায়। দ্বিতীয়ত: ইহুদি-নাসারাদের স্বসৃষ্ট উপাস্য দেবতা পশ্চিমা পুঁজিবাদ হলো বহু মানুষের বঞ্চনার উপর গড়ে ওঠে কতিপয়ের সুখ-সৌধ। এই ভয়ংকর ব্যবস্থাপনা যাতে শোষিত-বঞ্চিত মানুষের কাছে একেবারেই অসহ্য হয়ে না ওঠে, এ জন্য গণতন্ত্র, নারী স্বাধীনতা, মানবধিকার, ধর্মনিরপেক্ষতা, মানবপ্রেম ইত্যাদি কতিপয় শব্দের আঁড়ালে পুঁজিবাদ তার ধারালো মানবরক্ত-পিপাসু নখরগুলোকে শুকিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। অতএব, আমরা আজ এই আধুনিক সময়ে যাকে মানবতা বলি বা বলছি, একটু খেয়াল করলে দেখতে পাবো, সেটা আসলে পুঁজিবাদ ও বস্তবাদ সৃষ্ট রক্তাক্ত ক্ষতকে ঢেকে রাখার একটি বালখিল্য অপকৌশল মাত্র। পশ্চিমা বিশ্বের এই প্রচণ্ড ফাঁকি ও মুনাফেকি ইকবাল বুঝতে পেরেছিলেন,বুঝতে পেরেছিলেন বস্তবাদ লালিত আধুনিক পশ্চিমা বিশ্ব যা বলে তা শুধু ফাঁকা চিৎকার, শুধু প্রাচ্য নয়, প্রাচ্য-প্রতীচ্য সমগ্র জগদ্বাসীর জন্য সে এক বিপজ্জনক প্রবঞ্চনা। পশ্চিমা বিশ্ব এই 'মহৎকাজটাই করে চলেছে। যে কারণে কৌতুক ও শ্লেষ মিশিয়ে ইকবাল তাঁর প্রতিপালকের উদ্দেশ্যে এই দুঃখ নিবেদন করছেন যে, তিনি তো আগুন থেকে একটি মাত্র ইবলিস তৈরি করেছিলেন, পশ্চিমা সেখানে আজ মৃত্তিকা থেকে লক্ষ লক্ষ ইবলিস তৈরি করছে। বলা বাহুল্য, প্রতীচ্য এই ইবলিসী বস্তুবাদের অমানবিক উন্মত্ততা সারা জগতের সামনেই আজ একটি ভয়াবহ বাস্তবতা। কিন্তু কত আগেই না ইকবাল এটা ধরতে পেরেছিলেন, বিশ্বটাকে সতর্ক করেছিলেন :

'পশ্চিমা দৃষ্টি আজ অন্ধ
তার মনের চোখ অবরুদ্ধ
গন্ধ ও রং পান করে সে হয়ে উঠেছে মত্ত
অসত্যের কাছে করছে নতি স্বীকার (জাফর- ৬০, পৃ. ২০)

Dhaka University Institutional Repository

ইকবাল ছিলেন এক কালোত্তীর্ণ চিন্তাবিদ ও দার্শনিক। তাঁর চিন্তা ভাবনা ছিল স্থান-কাল পাত্রের উর্ধ্বে গোটা মুসলিম উম্মাহর জন্যে এক চিরন্তন দিকনির্দেশনা। ইসলামি উম্মাহর অংশ হিসেবে তাঁর চিন্তাদর্শকে জানা ও বোঝা দরকার আমাদের প্রয়োজনেই।

ইকবাল বর্তমান শতকে মুসলিম জাহানের অন্যতম শ্রেষ্ঠ চিন্তানায়ক বলে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের সুধী মণ্ডলীর কাছে স্বীকৃতি লাভ করেছেন। জীবন দর্শনের কবি ইকবাল অমূল্য চিন্তাধারা কেবল পাচ্য দেশসমূহে নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানের চিন্তার রাজ্যে এক বৈপ্লবিক ও কল্যাণ অভিসারী পরিবর্তন সাধন করেছে। বিগত কয়েক শতকের পতনমুখী গতিপথে চালিত মুসলমানদের নিষ্ক্রিয়-গতিহীন জীবনে এনেছে অপূর্ব কর্মোদ্যম ও গতিচাঞ্চল্য।

আসলে তাৎক্ষনিক-ভাবে যা'ই মনে হোক না কেন, আবহমানকাল ধরে এটাই বার বার প্রমাণিত হয়ে আসছে যে, মানব-বংশের জন্য মানবতা প্রতিষ্ঠার লক্ষে, মহান আল্লাহ নির্ভুল হেদায়েত মেনে নেয়া ছাড়া দ্বিতীয় কোনো পথ নেই। বিষয়টি মানুষের একেবারেই সাধ্যাতীত; এবং শুধু সাধ্যেরই অতীত নয়, আল্লাহর হেদায়েতকে অস্বীকার করে নতুন কোনো পথ নির্মাণের চেষ্টা রীতিমত মূঢ়তা বরং অনধিকার চর্চাও বটে। ইসলাম এই ধরনের চিন্তা ও চর্চাকে শুধু নিরুৎসাহিত করে না, ক্ষমাহীন ঔদ্ধত্য ও দুঃসাহস বলে বিবেচনা করে। আল্লাহ পাকের বিশেষ অনুগ্রহ যে, ইকবাল এই বাস্তবতাকে যথোচিত ঈমানি দৃঢ়তার সঙ্গে উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

দান্তে যেমন তাঁর *Divine Comedy* –কে ভার্জিলের নেতৃত্বে স্বর্গ সফর করেছিলেন ইকবাল ও তেমনি তাঁর *জাবিদনামে*-তে যাকে প্রাচ্যের *Divine Comedy* বলা হয়- রুমীর নেতৃত্বে বেহেস্তের বিভিন্ন স্তরে ভ্রমণ করেছেন। এই ভ্রমণে তার উপলব্ধি হয়েছে আজ প্রাচ্য –প্রতীচ্য উভয়ই ভুল পথে চলছে।

> প্রাচ্য আল্লাহকে দেখেছে, কিন্তু বাস্তব জগতকে দেখতে পায়নি;
> প্রতীচ্য বাস্তব জগতের সাথে এমনভাবে জড়িয়ে পড়েছে যে,
> আল্লাহ হয়েছেন তার অবহেলার পাত্র। (ওয়াহিদ- ১১৪, পৃ. ৬৭-৬৮)

অতএব, আপাদমস্তক যুদ্ধাস্ত্রে সজ্জিত ইউরোপ- আমেরিকার যে জাতিতে-জাতিতে, দেশে-দেশে, ও মানুষে-মানুষে, অনৈক্য, বিদ্বেষ ও অবিশ্বাস সৃষ্টির হিকমত করছে, সেই হিকমত আজ মানবপ্রেমের বদলে পৃথিবীময় হিংস্রতা সৃষ্টি করছে। হয়ত এই হিংস্রতা দীর্ঘস্থায়ী হবে, মানবতার মুখোশধারীদের কারণে হয়ত মানবতার অপমান আরো বৃদ্ধি পাবে কিন্তু ইকবাল নিরাশ হননি। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করেন, এই পৃথিবী একদিন উজ্জ্বল এক আলোকময় পৃথিবী হবে।

Dhaka University Institutional Repository

উপসংহার:

দীর্ঘ আলোচনা শেষে আমরা বলতে পারি যে, ইকবালের কাব্য সাহিত্যে ইসলামি ভাবধারা ও মুসলমানদের জীবনাচরণ প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দিক দার্শনিক ইকবাল অত্যন্ত জোরালোভাবে তুলে ধরেছেন। এবং অনাগত জাতিকে সঠিক পথের সন্ধান দেয়ার প্রয়াস চালিয়েছেন। তাঁর জীবনের লক্ষ্য ছিল সাধারণ মানব সমাজে একটা নবজাগরণ সৃষ্টি করা। তিনি মতবাদ ও আদর্শ জীবন ব্যবস্থা হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন ইসলামকে। তাই ছিল তাঁর পরিণত চিন্তাধারা ও আকীদা বিশ্বাসের মূল উৎস। ইকবাল 'খুদীর উন্মেষ ও বলিষ্ঠতা বিধানের সাহায্যে প্রাচ্য দেশে এক নতুন জীবনের উদ্যম প্রেরণা জাগিয়ে তুলবার সংকল্প করেছিলেন। এই জন্যেই তিনি মানব জীবনের সকল দিক ও বিভাগ সম্পর্কেই সংক্ষেপে কিংবা বিশদভাবে আলোচনা পেশ করেছেন। ইকবাল বলেন খুদী বিকাশের ফলে যে শক্তির জন্ম হয় তা মানুষের উন্নতি বিধানে গঠনমূলক কার্যে নিয়োজিত হওয়া উচিত। আর ইশ্‌কের নীতির দ্বারা উদ্বুদ্ধ হলে এ সম্ভব হয়ে থাকে। বুদ্ধি হতে প্রাপ্ত জ্ঞান মানুষের মঙ্গল ও অমঙ্গল উভয়ই করতে পারে। কিন্তু ইশ্‌কদীপ্ত জ্ঞান শুধু মঙ্গলই করতে পারে-অমঙ্গল করতে পারে না। ইশ্‌কের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হয়ে যখন মানুষ যখন কাজ করে, তখন সে খোদার সাথে যুক্ত হয় এবং খোদার সহযোগিতা লাভ করে। এজন্যেই ইকবাল খুদীর পূর্ণ বিকাশের উপর সমধিক গুরুত্বারোপ করেন।; এটা ব্যক্তিগত ও জাতীয় জীবনের উন্নতির একমাত্র পথ, এই পথের একমাত্র নীতি ইশ্‌ক।

আমার ক্ষুদ্র উপস্থাপনটি তাঁর বিরাট সাহিত্যে বিক্ষিপ্ত সেই আলোচনা সমূহেরই আংশিক সমষ্টিমাত্র। তাঁর এবম্বিধ আলোচনা ও মতবাদ চিন্তাধারাকে খুদী, বিনয় ও পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি তীব্র ঘৃণা-ইকবাল সাহিত্যের এই মৌলিক উপাদান ও বিষয়বস্তু হতে মোটেই বিচ্ছিন্ন করে দেখা যেতে পারে না। সৃষ্টিদর্শন, খুদীদর্শন, মুসলিম চিন্তা দর্শন, মানবতাবাদ, শিক্ষাদর্শন, সভ্যতা, সংস্কৃতি, ঐক্য ও সম্প্রীতি, এসব মৌলিক উপাদান ও বিষয়বস্তুকে কেন্দ্র করেই ইকবালের বিরাট সাহিত্য ভাণ্ডার রচিত হয়েছে। রাজনৈতিক আলোচনা স্বাভাবিকভাবেই তার সাহিত্যের অসংখ্য বিষয়বস্তুর অন্তর্ভূক্ত রয়েছে। কিন্তু ইকবাল যে তথাকথিত রাজনীতি চর্চাকারীদের ন্যায় কোন রাজনীতিক ছিলেন না, তা সর্বজনবিদিত। কিন্তু সেই সঙ্গে একথাও সত্য, তিনি জাতিকে প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক নেতৃত্বদানে কখনও কুণ্ঠিত হতেন না বা তা হতে পশ্চাদপদ থাকতেন না। তিনি নিজেই নিজের সম্পর্কে বলেছেন:

ہزار شکر نہیں ہے دماغ فتنہ تراش
ہزار شکر طبیعت ہے ریزہ کارمیری
ہوائے بزم سلاطین دلیل مردہ دلی
کیا ہے حافظ رنگین نوائے رازیہ فاش

হাজার শোকর ,
উচ্ছৃখল নয় আমার মস্তিস্ক,
স্বভাব আমার ভেঙে গড়া,
শাহী দরবারে সন্মানের আকাঙ্খা-
সে তো মৃত মনেরই পরিচয়।
হাফিজের মধুক্ষরা কণ্ঠে
প্রকাশ লাভ করেছে এ রহস্য।

Dhaka University Institutional Repository

বস্তুত বৃটিশ ভারতের মুসলমানদের জাতীয় ও তমদ্দুনিক আন্দোলনের সাথে আল্লামা ইকবালের গভীর সম্পর্ক ও কার্যকরী যোগাযোগ বর্তমান ছিল। তদানীন্তন মুসলিম লীগের পাকিস্তান প্রস্তাব আল্লামা ইকবালেরই রাজনৈতিক চিন্তা গবেষণা ও কল্পনার ফল, তা কার না জানা আছে। পাক ভারত বাংলাদেশ ইসলামি আন্দোলন সমূহের উপর ইকবালের প্রভাব অত্যন্ত সুস্পষ্ট। তাই রুশো ও ভল্টেয়ারের সাহিত্যে ফ্রান্সে যে বিপ্লব সৃষ্টি করেছে, এশিয়া কিংবা পাক-ভারত বাংলা উপমহাদেশে ইকবালের সাহিত্য যে একদিন অনুরূপ এক ইসলামি বিপ্লব সৃষ্টি করতে সমর্থ হবে। তাতে ইকবাল সাহিত্য অভিজ্ঞ কারো একবিন্দু সন্দেহ থাকতে পারে না।

ইকবাল আধুনিক মুসলিম চিন্তাবিদ তথা খেয়ালী মনীষীদের মধ্যে অন্যতম প্রতীভা। তিনি যুগান্তকারী চিন্তা-নায়কছিলেন। মুসলিম জাতির অধ:পতন তাঁর মধ্যে পীঁড়া দিয়েছিল। তিনি একদা বিশ্ববিজয়ী মুসলিম জাতির অধ:পতনের কারণ অনুসন্ধান করেন এবং তার কাব্য দর্শনে বক্তৃতার মাধ্যমে জাতির অধো:পতনের কারণসমূহ বিশ্লেষণ করেন ও সমাধানের নির্দেশ করেন। তিনি আত্মকলহ, ক্ষুদ্র স্বার্থ ও বিভেদ ভুলে মুসলমানদেরকে ইসলামের সাম্য, মৈত্রী ও বিশ্বভ্রাতৃত্বের পতাকাতলে সমবেত হতে আহ্বান করেন। তাঁর মুখে ধ্বনিত হয়েছে ধ্বনিত হয়েছে ভৌগলিকতার উর্ধ্বে সমাসীন বিশ্বাসী মানুষের বিশ্বজনীনতা। তারানা-এ মিল্লী, বাংগেদারায় ইকবাল বলেন:

چین و عرب ہمارا، ہندوستاں ہمارا
مسلم ہیں ہم، وطن ہے سارا جہاں ہمارا

চীন ও আরব আমাদের, ভারত আমাদের,
আমরা মুসলমান, সারা জাহান আমাদের দেশ।

আজ বিশ্বের মুসলিম রাজনীতিবিদ, সাহিত্যিক ও দার্শনিকেরা ইকবালের প্রদর্শিত পথে অগ্রসর হচ্ছেন। ইকবাল চেয়েছেন এক নতুন সমাজ (মিল্লাত) সৃষ্টি করতে, যেখানে থাকবে না ধনিক সম্প্রদায়ের অর্থলিপ্সা তথাকথিত অভিজাত সম্প্রদায়ের বৃথা দর্পণ। ইকবালের পরিকল্পিত সমাজে প্রত্যেক মানুষ পাবে আত্মবিকাশের পূর্ণ অধিকার-খুদীর অপরিসীম সম্ভাবনাকে করবে বাস্তবায়িত। এই সমাজের আদর্শ ইনসানিয়াতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, এ পদ্ধতিই হল ইশক। ইকবালের মতে ইশকের শক্তিতে শক্তিমান হলেই ইনসানিয়াতের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা সম্ভব। ক্ষুদ্র স্বার্থ বুদ্ধি ও ভৌগলিক সীমারেখা অতিক্রম করে বিশ্বভ্রাতৃত্ব প্রতিষ্ঠাই মুসলিম সমাজ ব্যবস্থার চরম লক্ষ্য। আজ দুনিয়া যেন মহামানবতা প্রতিষ্ঠার স্বপ্ন দেখছে।

ইকবাল ছিলেন বিপ্লবী চিন্তাবিদ। তিনি ইসলামিক শিক্ষাকে বৈপ্লবিক দৃষ্টিকোণ হতে বিচার করেছেন। তিনি বলেন যে, প্রতীচ্যের অভিজ্ঞতাবাদের সাথে ইসলামের বিরোধ নেই। তিনি তাঁর প্রখ্যাত গ্রন্থ-The Reconstruction of Religious Thought in Islam - এ সমকালীন দার্শনিক মতবাদসমূহের সঙ্গে ইসলামের শিক্ষা যে বাস্তবধর্মী ইসলাম সে অভিজ্ঞতার বিরোধী নয়, ইসলাম যে বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিক আলোচনার প্রেরণা জোগায়, ইকবাল তা সুস্পষ্টভাবে দেখিয়েছেন। ইসলাম মানুষের সামগ্রিক পূর্ণতার নির্দেশাবলী ইহজগৎও পরজগতের সমন্বয় সাধন করে মনুষ্য জীবনের সর্বোচ্চ মূল্যবোধসমূহের বাস্তব রূপায়নের পথ নির্দেশ করেন। এই জগতই পরজগতের ভিত্তি। এটা অলীক বা অবান্তর নয়।

নৌসর্গিক ঘটনাবলী ও বিভিন্ন জাতির উত্থান-পতনের মধ্যে বিশ্বাসীদের জন্য জ্ঞানের নির্দেশ রয়েছে বলে কুরআন তারস্বরে ঘোষণা করে। ইকবালের মতে, কুরআন পূর্ণ জীবনবোধের দর্পণ। শুধু স্বর্গ-নরক,

Dhaka University Institutional Repository

পাপপুণ্যের ওজন করবার জন্য ইসলামের আবির্ভাব ঘটেনি। ইসলাম স্বভাব ধর্ম। ইজতিহাদ বা গবেষণা ইসলামের প্রাণশক্তি। কাজেই ইসলাম মানব সমাজের অগ্রগতির সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ। আজকের মুসলিম চিন্তাবিদ ও প্রগতিশীল মুসলিম জনসাধারণের মধ্যে ইকবালের অপরিসীম প্রভাব রয়েছে। তাঁদের কাব্য সাহিত্য, দর্শন. শিল্পকলা, সঙ্গীত ইকবালের চিন্তাধারার ছাপ সুস্পষ্ট।

ইকবালের চিন্তাধারা শুধু মুসলিম জাতিকেই উদ্বুদ্ধ করনি। বিশ্বের প্রগতিশীল মানবমনকে ও আন্দোলিত করেছে। ইকবালের খুদীর ধারণা আজ আধুনিক চিন্তাবিদদের আলোচ্য বিষয়ের অন্তর্ভূক্ত খুদীর ধারণাই ইকবাল দর্শনের মূল সুর। খুদী বাস্তব সত্তা মানুষের সকল শক্তি ও কর্মের কেন্দ্র। খুদীর বিকাশই সৃষ্টির লক্ষ্য। খুদীর বিকাশ শুধু মানুষের মধ্যেই এই সৃষ্টি প্রেরণা সর্বাদিক সক্রিয়। খুদীর সাধনায় মানুষ অমরতা লাভ করে, পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে নিরবচ্ছন্ন সংগ্রামের মধ্য দিয়ে চলে খুদীর বিকাশ পরিক্রমা। ইকবাল খুদীর সীমাহীন সম্ভাবনার দিকে মুসলিম জাতির দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বাইরের জীবন দ্বিমুখ দর্শনের প্রভাব হতে মুক্ত থাকতে তাদের উদাত্ত আহ্বান জানান। তাঁদের মতে, খুদীর পূর্ণ বিকাশের মাধ্যমেই মানুষ আল্লাহর খলিফা পদে অধিষ্ঠিত হতে পারে। ইকবাল বলেন:

When the self is made strong by love.
Its prowes rules the whole world.
The Heavenly sage who adorned the sky with stars
Plucked these buds from the though of the self .
Its hand becomes God's hand
The moon is split by its fingters
It is the atbitrator in all anbrrels of the world.
Its command is obeyed by Darius and Jamshid
[Secrets of the self transiation by R.A. nicholson of Asrari Khudi]

উপরোক্ত আলোচনা হতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ইসলামের মরমীকার্য ও দার্শনিক ইকবালের চিন্তাধারা খেয়ালী মানব মনে আলোড়ন সৃষ্টি করেছে মুসলিম জাতিকে দিয়েছে জাগরণের মহামন্ত্র। আধুনিক মুসলিম জগতে যে, রেঁনেসা পরিলক্ষিত হচ্ছে তার অগ্নিপুরুষ যুগস্রষ্টা ইকবাল।

গ্রন্থপঞ্জী

১. খালেদ নাযির, সূফী, *ইকবাল দোরূনে খানে* (উর্দু), ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তান, ২০০৩ খ্রি.।

২. খুরশীদ, আব্দুস সালাম, *সার গোযাসতে ইকবাল,* (উর্দু) ইকবাল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৭৭ খ্রি.।

৩. আবু সাঈদ, নুরূদ্দীন, *মহাকবি ইকবাল,* আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি.।

৪. জাভীদ ইকবাল, (সংকলক) *কুল্লিয়াতে ইকবাল* (উর্দু),ভূমিকা।

৫. মুহাম্মদ ইকবাল, *কোল্লিয়াতে আশআ'রে ফারসিয়ে এক্কবা'ল* (ইকবালের ফারসি কাব্য সমগ্র) কিতাব খানায়ে, সানাই, ইরান, ১৯৬৪ খ্রি.।

৬. সিরাজুল হক, আল্লামা ইকবালের জীবন ও কর্ম, *নিউজ লেটার,* (ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা,-এর সাবেক মাসিক মূখপাত্র,) নভেম্বর, ১৯৯৭ খ্রি.।

৭. *বার গুজিদেয়ে আশয়ারে ফারসি,* ইকবাল লাহোরী ১৯২৯ খ্রি: ।

৮. *ইকবাল নামা,২য়* খণ্ড, শেখ আতাউল্লাহ ১৯৩৪ খ্রি:।

৯. মুহাম্মদ আবু তাহের সিদ্দিকী, *আল্লামা ইকবাল,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, প্রিয়াংকা প্রিন্টিং এণ্ড পাবলিকেশন্স, নয়া পল্টন, ঢাকা, ডিসেম্বর, ১৯৮৬ খ্রি.।

১০. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ইকবাল ও নজরূলের কাব্যে ভাবধারা,* ইসলামি ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইফাবা প্রকাশনী, জুন-২০০৩ খ্রি.।

১১. মুহাম্মদ ইকবাল, *কোল্লিয়াতে ইকবাল উর্দু,* (ইকবালের উর্দু কাব্য সমগ্র) ইকবাল একাডেমী লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৯৪ খ্রি.।

১২. মুহাম্মদ শহিদুল্লাহ, *শহীদুল্লাহ রচনাবলী* (১ম খণ্ড ইকবাল অংশ), বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৪ খ্রি.।

১৩. আব্দুস সালাম নাদাভী, *ইকবালে কামেল,* (উর্দু) আযমগড় প্রেস, লাহোর, ১৯৯১ খ্রি.।

১৪. *হায়াতে ইকবাল,* (উর্দু) ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তান এর সাহিত্য বিকাশ থেকে প্রকাশিত, ১৯৯৯ খ্রি.।

১৫. চিশতি, ইউসুফ সেলিম, *বাংগে দারা মা'য়া শারাহ* (উর্দু), এতেকাদ পাবলিশিং হাউস, নয়াদিল্লী, ভারত, ১৯৯১ খ্রি.।

১৬. সাইয়্যেদ, সাইয়্যেদ গোলাম রেযা, *এক্কবা'ল সেনাসি,* (ফারসি), ইকবাল একাডেমী, তেহরান, ১৩৩৮ সৌর বর্ষ।

১৭. *ইকবাল বা কামাল,* (উর্দু) সংকলিত প্রবন্ধসমূহ), তাজ বুক ডিপু, লাহোর, পাকিস্তান,১৯৬৮ খ্রি.।

১৮. বারনী, সাইয়্যেদ মুজাফফর হোসাইন, *নাকশে এক্কবাল দার আদবে পা'রসি* হেন্দি (ফারসি), ইসলামিক গাইডেন্স মিনিস্টারি, ইরান, ১৩৬৪ সৌরবর্ষ।

১৯. হুসাইন সাদবারান, *এক্কবাল সেনাসি* (ফারসি), সাযেমানে তাবলিকাতে ইসলামি, তেহরান, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরান, ১৩৭১ সৌরবর্ষ।

২০. মুহাম্মদ আব্দুর রহীম, *ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তাধারা,* ইসলামিক ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ, ডিসেম্বর-১৯৮৩ খ্রি,।

২১. জওহারলাল নেহরু, *বিশ্ব ইতিহাস প্রসঙ্গ,* (Glimpses of world History) এর বাংলা অনুবাদ আনন্দ পাবলিশার্স লিমিটেড, কলকাতা,জানুয়ারী ১৯৯১, খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

২২. রফিক জাকারিয়া, *ইকবাল শায়ের আওর সিয়াসাতদান* (উর্দু), দেহলোভী, আব্দুস সালাম, প্রফেসর কর্তৃক অনুদিত) আনজুমানে তারাক্কীই উর্দু (হিন্দু), নিউ দিল্লি খ্রি.।

২৩. *ইকবাল সেনিন কে আয়নে মে* (উর্দু) ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তানের এর সাহিত্য বিভাগ থেকে প্রকাশিত, প্রথম প্রকাশ, ১৯৯৯ খ্রি. ।

২৪. Shaml00, *Speeches and statements of Iqbal*. Al Manar Academy, Lahore, Pakistan, 1948 .

২৫. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *মুসলিম জাগরণের কয়েকজন কবি-সাহিত্যিক*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৯০ খ্রি.।

২৬. হামযা ফারকী, *সাফারনামায়ে ইকবাল উর্দু*, ইকবাল একাডেমী পাকিস্তান, প্রথম প্রকাশ ১৯৯৮খ্রি.।

২৭. সাফাইরী, *শা' হীন মুকাদ্দাম, নেগা' হী বে এক্কবা' ল* (ফারসি) ইকবাল একাডেমী লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৮৯খ্রি.।

২৮. মুহাম্মদ সুলতান, *শিকওয়া ও জওয়াবে শিকওয়া*, আল্লামা ইকবাল সংসদ, ২০০৬ –খ্রি.।

২৯. সরকার, *মো. সোলায়মান আলী, ইবনুল আরাবী ও জালালউদ্দীন রুমী*, বাংলা একাডেমী ঢাকা, জুন, ১৯৯৪ খ্রি.।

৩০. আবুল হাসান আলী নাদাভী, সাইয়্যেদ, *নোকুশে ইকবাল*, উর্দু) মাজলিসে নাশরিয়াতে ইসলাম, করাচী, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৭৫ খ্রি.।

৩১. ফিরোজা বেগম, *প্রাচ্য রাষ্ট্রে চিন্তা*, এঞ্জেল প্রেস এ্যান্ড পাবলিকেসন্স, প্রকাশকাল ২০০৬ খ্রি.।

৩২. আসার ইকবাল (*ইকবাল সম্পর্কিত উর্দু প্রবন্ধ সংকলন, রশিদ, গোলাম দস্তগীর কর্তৃক সম্পাদিত)*, মালেক এদারেয়ে এশারাতে উর্দু, হায়দারাবাদ, ১৯৪৬ খ্রি.।

৩৩. সাইয়্যেদ মুহাম্মদ ইকরাম, *এক্কবা' ল দার রাহে মৌলভী*, (ফারসি) ইকবাল একাডেমী লাহোর, পাকিস্তান, ২য় সংস্করণ, ১৯৭২ খ্রি.।

৩৪. চিশতি ইউসুফ সেলিম, *আরমুগানে হেজায মা' য় শারাহ* (উর্দু), এতেকাদ পাবলিশিং হাইস ,নয়াদিল্লী ,ভারত, ১৯৯২ খ্রি.।

৩৫. ফররুখ আহমদ, *আহমদ রচনাবলী*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৬ খ্রি.।

৩৬. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *ইকবাল কাব্যে ইসলামি ভাবধারা*, বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন, ২০০৬, খ্রি.।

৩৭. মুহাম্মদ ইকবাল, *জাবিদনামা*, ইকবাল একাডেমী, লাহোর পাকিস্তান, ১৯৩২খ্রি.।

৩৮. শরীফ বাকা, *পাশ্চাত্য মনীষীদের দৃষ্টিতে রাসুল আকরাম (স) মদীনা পাবলিকেসন্স,ঢাকা*, ২০০৬,খ্রি.।

৩৯. মুহাম্মদ ইকবাল *যরবে কালীম*, ইকবাল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৩৬, খ্রি. ।

৪০. মুহাম্মদ ইকবাল, *আসরারে খুদী*, (আব্দুল মান্নান তালিব কর্তৃক বাংলায় অনুদিত),আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ২০০২ খ্রি.।

৪১. ফাহমিদ-উর রহমান, *ইকবাল মননে অন্বেষণে*, ইকবাল সংসদ, ঢাকা, ১৯৯৫ খ্রি.।

৪২. মূর্তজা মোতাহারী, *চলতি শতাব্দীর ইসলামি আন্দোলন*, হিজবুল্লাহ প্রকাশনী, ঢাকা, ১৪০৪ খ্রি.।

৪৩. রশীদুল আলম, *মুসলিম দর্শনের ভূমিকা*, সাহিত্য সোপান বগুরা, স্টার কম্পিউটার, ১৯৯৭,খ্রি.।

৪৪. যরীফ সিরাতে ইকবাল,

৪৫. মেহের, গোলাম রাসুল, *মাতালেবে বাংগেদারা* (উর্দু) কিতাব মানযেল, লাহোর,পাকিস্তান,১৯৫৬ খ্রি.।

৪৬. মুহাম্মদ ইকবাল, ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তান লাহোর, ১৯৩৬ খ্রি.।

৪৭. মুহাম্মদ ইকবাল, *পাচ চে বায়াদ করদ*, আয় আকওয়ামে শারক, ইকবাল একাডেমী, পাকিস্তান, লাহোর,১৯৩৬ খ্রি.।

৪৮. মুহাম্মদ আব্দুল হাই, *ভাষা ও সাহিত্য*, ইস্ট বেঙ্গল পাবলিশার্স, ঢাকা, ১৩৭০ বাংলা।

৪৯. ক্যামব্রিজ, *হিস্ট্রি অফ ইসলাম*, ২য় খণ্ড, ।

৫০. লিওনার্ড, *ইসলামের নৈতিক ও আত্মিক মূল্যায়ন*, লন্ডন,১৯০৯ খ্রি.।

৫১. মুহাম্মদ ইকবাল,*আসরার-ই রমুযে-ই বেখুদী*, ইকবাল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান,১৯১৮ খ্রি,।

৫২. *সমাজ সভ্যতায় ইসলামের অবদান*, ওয়াটিপন, ১৯৬৩ খ্রি.।

৫৩. তারিক জিয়াউর রহমান সিরিজী, *ইকবাল কাব্যে মুসলিম মানস ও মানবতা*, ইসলামি প্রজাতন্ত্র ইরানের সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, ঢাকা ফেব্রয়ারী,২০১৩ খ্রি।

৫৪. মুজিবর রহমান, *ইসলামে ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন*, আল্লামা ইকবাল সংসদ, এঞ্জেল প্রিন্টিং প্রেস, ঢাকা, ২০০৫ খ্রি.।

৫৫. মুহাম্মদ ইকবাল, *বালে জিবরীল*, ইকবাল একাডেমী, লাহোর, পাকিস্তান, ১৯৩৬ খ্রি.।

৫৬. চিশতি, ইউসুফ সেলিম, *শারহে বালে জিবরীল*, (উর্দু), এতেকাদ পাবলিশিং হাউস, দিল্লি, ভারত, দ্বিতীয় সংস্করণ, এপ্রিল, ১৯৭৭ খ্রি.।

৫৭. জাভেদ ইকবাল, *তাসহিলে কালামে ইকবাল, পায়ামে মাশরিক*, (উর্দু) ইকবাল একাডেমী, লাহোর পাকিস্তান, ১৯৯২ খ্রি.।

৫৮. অমিয় চক্রবর্তী, *ইকবালের কবিতা* , শব্দসঙ্গ, তৃতীয় সংকলণ, ১৯৯১ শব্দসঙ্গ, প্রকাশনা প্রকল্প।

৫৯. Muhammad Munawwar, *Iqbal and Quranic Wisdom*, Iqbal Academy, Pakistan 6th Edition, 2003.

৬০. আবু জাফর , *আল্লামা ইকবাল* কবি ও নকীব, প্রকাশনা আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা ,২০০৪ খ্রি.।

৬১. মুহাম্মাদ সুলায়মান, *ইকবাল লাহোরীর জীবনী*, প্রকাশনায় কামরান মোকাদ্দাম, রামীন, তেহরান, প্রথম প্রকাশ ১৩৬২ (১৯৮৩) খ্রি.।

৬২. মুহাম্মদ শাফী, মুফতী *তাফসীর মারেফুল কুরআন* অনুবাদ ও সম্পাদনা, মাওলানা মহিউদ্দীন খান, কুরআন মুদ্রণ প্রকল্প, মদীনা সৌদি আরব, ১৪১৩ হি,।

৬৩. মুহাম্মদ গোলাম রসুল, *ইকবাল প্রতিভা*, ইসলামিক ফাইন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৯৮০ খ্রি.।

৬৪. মুহাম্মদ জালালউদ্দীন রুমী, *মাসনভী মা' নভী*, নিকেলসন সম্পাদিত, আমীর কাবীর প্রকাশনা, তেহরান,ইরান, ৭ম প্রকাশ ১৩৬০ (১৯৮১) খ্রি.।

৬৫. যারীন কুব কর্তৃক অনূদিত, *ফান্নে শেরে আরাস্তু*, প্রকাশনায় সাজেমানে নাশর ও কিতাব, তেহরান, ইরান,১৩৬৪ (১৯৮৫) খ্রি.।

৬৬. মনিরউদ্দীন ইউসুফ, *ইকবালের কাব্য সঙ্কলন*, আল্লামা ইকবাল সংসদ জানুয়ারী-মার্চ, ১৯৯৫, খ্রি,।

৬৭. নজরুল, গীতি সংকলন, (খন্ড-৩)।

৬৮. *ইকবাল ও নজরুল কাব্যে ভাবধারা*, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা জুন, ২০০৩ খ্রি.।

৬৯. সালিহী, সুবুলুল, *হাদায় ওয়ার রাশাদ*, খণ্ড-৫।

৭০. আহমদ আলী, *খালিফাতুল রাসুলিল্লাহ আবু বকর সিদ্দীক,* বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার, ঢাকা, অক্টোবর, ২০১৩ খ্রি.।

৭১. চৌধুরী শামসুর রহমান, *সুফি দর্শন,* দিব্য প্রকাশ সংস্করণ, ঢাকা, ফেব্রয়ারী-২০০২ খ্রি.।

৭২. হাদীস মেশকাত, *বাবুস শাফায়াতে ওয়ার রাহমাতে আলাল খাল্ক,* ঢাকা, ১৯৮৬ খ্রি.।

৭৩. মুহাম্মদ শফিকুল্লাহ, *ইসলামে নৈতিক শিক্ষা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ,, ঢাকা,২০১০খ্রি.।

৭৪. মুহাম্মদ তাহের ফারুকী, *সিরাতে ইকবাল,* ।

৭৫. মুহাম্মদ ইকবাল, *বাংগে–ই-দারা,* ইকবাল একাডেমী, লাহোর,পাকিস্তান, ১৯২৪খ্রি.।

৭৬. মুহাম্মদ আব্দুল মালেক, *ইসলামে নৈতিক শিক্ষা,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.।

৭৭. শারহুল আকাইদিন-নাসাফিয়া পৃ ৮২, কাওয়াইদুল ফিক্‌হ পৃ. ৪২৪ সংক্ষিপ্ত ইসলামি বিশ্বকোষ ১০ম খন্ড।

৭৮. *মিশকাত* (বাংলা) ১ম খন্ড.।

৭৯. মুহাম্মদ ইকবাল, *পায়ামে মাশরিক,* ইকবাল একাডেমী, লাহোর পাকিস্তান, ১৯২৩ খ্রি.।

৮০. কাজী মুহাম্মদ যরীফ, *ইকবাল, কুরআন কা রোশন* মে, ২৪৯।

৮১. আল হাদীস, *ফাতহুল বারী,* ইব্‌নে হাজার আসকালানী, ১০ম খন্ড ।

৮২. এ এস. ট্রিটন, *ইসলাম আকিদা* ও আমল লন্ডন, ১৯৫১ খ্রি.।

৮৩. মুহাম্মদ আব্দুল্লাহ, *আল্লামা ইকবালের রাজনৈতিক চিন্তা ও কর্ম,* ঝিঙেফুল, বাংলাবাজার , ঢাকা, ২০০৮ খ্রি.।

৮৪. *খিলাফতে ইসলাম,* লন্ডন, ১৮৯৬ খ্রি.।

৮৫. মুহাম্মদ ফজলুর রহমান, *ইসলামে নৈতিক শিক্ষা,* জাতীয় শিক্ষাক্রম পাঠ্যপুস্তক বোর্ড, ঢাকা ২০০০ খ্রি.।

৮৬. হিরোস, হিরো ওয়ারশিপ, *এ্যান্ড দি হিরোইক ইন হিস্ট্রি,* লন্ডন, ১৯৮৮ খ্রি.।

৮৭. *Mohammedanism* London, 1916 .

৮৮. উইলসন ক্যাশ, *ইসলামের প্রশস্ততা,* লন্ডন, ১৯২৮.খ্রি.।

৮৯. মুহাম্মদ আবু তালেব, *সাইন্স ফ্রম আল কুরআন,* র্যাকপাবলিকেশন্স, ঢাকা, ফেব্রয়ারী, ২০০৯খ্রি.।

৯০. দিলারা হাফিজ, *সপ্তবর্ণা,* লুব্ধক প্রকাশনা, ঢাকা, জানুয়ারী,২০১৫ খ্রি.।

৯১. কাজী নজরুল ইসলাম, *অনামিকা,* সিন্ধু হিন্দুল, সঞ্চিতা, করাচি, ১৯৫০ খ্রি.।

৯২. মুহাম্মদ ইকবাল, *যরবে কালিম,* আব্দুল মান্নান সৈয়দ কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনূদিত আল্লামা ইকবাল সংসদ, ঢাকা ২০০৩ খ্রি ।

৯৩. মুহাম্মদ ইকবাল , *গুলসানে রাযই জাদিদ* ১৯৩৭ খ্রি.।

৯৪. মুহাম্মদ ইকবাল *রোমুযে বেখুদী,* ইকবাল একাডেমী, লাহোর , পাকিস্তান, ১৯১৮ খ্রি.।

৯৫. মুহাম্মদ ইকবাল, *বালে জিব্রীল,* প্রকাশকা ১৯৩৬ খ্রি:।

৯৬. আব্দুর রহীম, *ইসলামি রাজনীতির ভূমিকা* ।

৯৭. আব্দুর রহীম ,*দৈন্দিন জীবনে ইসলাম,* ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ইফাবা প্রকাশনা, ২০০৮ খ্রি.।

৯৮. Iqbal Letter of Iqbal to Jinnah Introduction.

৯৯. মুহাম্মদ ইকবাল, বালে জিবরিল, প্রকাশকাল ১৯৩৫ খ্রি.।

Dhaka University Institutional Repository

১০০. আব্দুস সালাম নদবী, *ইকবাল ইনসানে কামিল* ।

১০১. মুহাম্মদ ইকবাল, জুমহুরিয়াত, *পায়ামে মাশরিক*, ১৯২০ খ্রি.।

১০২. A Hasam, Iqbakl his political thought after the cross road. P.82.

১০৩. সিরাজুল হক, *এত্তেহাদে ইসলামি আওর আল্লামা ইকবাল*, (উর্দু), ২০০২, পাকিস্তানের ইসলামাবাদে ইকবাল ওপেন ইউনিভার্সিটিতে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক ইকবাল সেমিনারে পঠিত প্রবন্ধ.

১০৪. জাভেদ ইকবাল, *আফকারে ইকবাল* (উর্দু) ইকবাল একাডেমী লাহোর, পাকিস্তান-১৯৯৪ খ্রি.।

১০৫. Abdur Rahim. *khawaja*,(Editor) Centaral Iqbal Committee lohore Pakistan.

১০৬. চিশ্তি ইউসুফ সেলিম, *যারবে কালীম মা' রা শারাহ* (উর্দু) এতেকাদ পাবলিশিং হাউস, নয়াদিল্লী,ভারত প্রথমপ্রকাশ,মে ১৯৯১ খ্রি.।

১০৭. মুহাম্মদ *ইকবাল, বাংগে দারা*, প্রকাশকাল, ১৯২৮ খ্রি.।

১০৮. ফাতেমা তানভীর, *উর্দু শায়েরী মেঁ ইনসান দোস্তী উর্দু জি এস পি জি কলেজ*, সুলতানপুর উত্তর প্রদেশ, ভারত ১৯৯৪ খ্রি.।

১০৯. আবুল হিকীম, খলিফা, *ডক্টর ফেক্‌রে ইকবাল* (উর্দু) এডুকেশন বুক হাউস, আলীগড়, ভারত ২০০২ খ্রি.।

১১০. ল্যাট জে এবারসেন্ট, *ওরিয়েন্ট এট অকসিডেন্ট*, প্যারিস, ১৯২৮ খ্রি.।

১১১. আদ্রে মাইকেল, *হিস্টরি ডি ল্যাট টি. আই. এস.* কিউ. কিউ. প্যারিস,১৯০৫ খ্রি.।

১১২. মুহাম্মদ ইকবাল *যরবে কলীম*, (তালিব আব্দুল মান্নান কর্তৃক বাংলা ভাষায় অনুদিত) আল্লামা ইকবাল সংসদ, এ্যাঞ্জেল প্রিন্টিং প্রেস, জানুয়ারী ২০০৩ খ্রি.।

১১৩. এ. জেড.এম শামসুল আলম, *মুসলিম সংস্কৃতি*, মুহাম্মদ ব্রাদার্স, তাওয়াক্কুল প্রেস, আগষ্ট -২০০৮ খ্রি.।

১১৪. আব্দুল ওয়াহিদ, *ইকবাল মানস*, আল্লামা ইকবাল সংসদ, এ্যাঞ্জেল প্রিন্টিং প্রেস, ডিসেম্বর-২০০৩ খ্রি.।